উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৪শ বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩৩৬ সাল। { ১ম সংখ্যা

নূতন বৎসরে।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

হে হরি! হে দয়ানিধে! হে করুণাসিন্ধো! এই নূতন বৎসরে এমন কিছু ধরাইয়া দাও—যদবলম্বনে তোমাকে পাইবার বা তোমাতে সর্ব্বদা থাকিবার সমস্ত শক্তি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে।

নিস্তরঙ্গ জলধি। ভিতরে স্বভাবতঃ তরঙ্গ উঠিল। তরঙ্গ ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া ভাসিল ভাঙ্গিল। নিস্তরঙ্গ জল, তরঙ্গ চঞ্চল জল। উভয়েই জল—এক জল স্থির অন্য চঞ্চল। এই প্রভেদ।

শক্তিপূর্ণ নিস্তরঙ্গ জলরাশির মত এক স্থির পরম শান্ত চৈতন্য। এই অখণ্ড চৈতন্যের ভিতরে সঙ্কল্প তরঙ্গ। শক্তিপূর্ণ অখণ্ড চৈতন্যের উপরে মন ভাসিতেছে, ভাঙ্গিতেছে আবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে—সর্ব্বদা আছাড় কাছাড় খাইতেছে। তরঙ্গ উঠা, অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠা মনের স্বভাব। যতদিন মন থাকিবে ততদিন সংসার আড়ম্বরের মূল এই সঙ্কল্প উঠিবেই। মনের নাশ হইলেই চৈতন্যভাবে স্থিতি। ইহাই মুক্তি।

যার মনে যত তরঙ্গ তার মন তত চঞ্চল আর তত ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রকে যত যত বৃহৎ করিতে পারিবে তত ততই ইহা স্থির হইতে থাকিবে। ক্ষুদ্র মন নাচিতেছে এই নিস্তরঙ্গ আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড পদার্থের উপরে। মনের কথা কওয়া বন্দ কর তখন তুমি আপন স্বরূপ দেখিয়া—আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া শান্ত হইয়া যাইবে।

জপ বল, ধ্যান বল, আত্মবিচার বল মনের বিষয় তরঙ্গ বন্দ করিয়া মনকে ভগবানে ডুবাইবার জন্য। ভগবানই ত আত্মা। ইঁহার উপরেই সকল মন নাচিতেছে। মনকে ঈশ্বর কথায় ডুবাইয়া ডুবাইয়া কথা শূন্য কর সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার ভিতরে জাগ্রত হইলেন।

ভগবান্ ভগবান্ যে লোকে করে এই ভগবান্ কোথায়? ভগবান্ অনলে অনিলে নীলনভস্তলে সর্ব্বত্র আছেন সত্য—সমস্তই তাঁহার উপরে ভাসিয়াছে সত্য—সর্ব্বত্র তাঁহাকে স্মরণ করায় সুখ আছে সত্য কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে হইবে মনের ভিতরে। মন যাঁহার উপরে ছুটিতেছে তাঁহাকে ধরিতে হইলে মনের ছুটাছুটি বন্দ করা চাই। তরঙ্গ জল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়—কেবল একটা চঞ্চলতাই ইহাকে শান্ত জল হইতে ভিন্ন করিয়া তরঙ্গ নামে অভিহিত করিতেছে। এই চঞ্চলতা দূর কর যাহা চাও পাইবে।

সন্ধ্যা আহ্নিক কর, জপ ধ্যান কর সঙ্গে সঙ্গে মন বাজে বিষয়—কথাও কয়, আলোক অন্ধকার একসঙ্গে কর্ম্ম করে, ইহাতে ডুবা হইতে পারে না। খুব সতর্ক হইয়া মনের বাজে-কথা-কওয়া বন্দ করিতে হইবে।

মনের কথা কওয়া বন্দ করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিতে হইবে। ইচ্ছাশক্তি যার যত দুর্ব্বল তার চিত্তও তত দুর্ব্বল। চিত্ত দুর্ব্বল মানুষ বড় ক্লেশ ভোগ করে। হৃদয় দৌর্ব্বল্য দূর করিতে হইলে মনের কথা-কওয়া বন্দ করা চাই। যতদিন মন থাকিবে ততদিন এটা বিষয় লইয়া ছুটপাট্ করিবেই। সেইজন্য মনকে নিবৃত্তি মার্গে লইয়া যাইতে হইবে।

নিবৃত্তি মার্গে যাইবার উপায় হইতেছে সত্য বস্তু গ্রহণ এবং অসত্য বস্তু ত্যাগ। সত্যের গ্রহণ আদৌ কঠিন নহে কিন্তু মিথ্যা ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে পরে মিথ্যাকে অজস্র উপেক্ষা করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। আত্মাই সত্য—আর সমস্তই "যাহা দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা" সমস্তই মায়া কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। একেবারে তাড়াইতে না পার, সব মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য কর আর সঙ্গে সঙ্গে সত্য যাহা ধরা আছে তার নাম ঘন ঘন কর একসঙ্গে দুই চলুক তখন মন নষ্ট হইয়া যিনি আছেন তাঁহাতে স্থিতি হইবে।

নূতন বৎসরে তবে ধরিবার কি পাওয়া গেল? মনকে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ—এই বিষয়-কথা কহিতে দেওয়া হইবে না—তজ্জন্য মনের ইচ্ছাশক্তি বাড়াও। মনকে নিরন্তর ধরিয়া বল "না—কথা কহিতে পাইবে না"। তথাপি যখন কথা কহিবে তখন ইহাকে ধমকাও; এই ধমকান এত তীব্র ভাবে করিতে হইবে যে স্বপ্নে কোন কিছু দেখিলেও যেন মনটা ধমক খায়। মনকে তিরস্কার করা প্রধানতঃ আবশ্যক। হতভাগ্য এতদিন তোমার নিজত্ব না ছাড়িয়া আমায় কত যাতনা দিলে—তোমার নিজত্বের জ্বালায় তুমি শাস্ত্র মানিলে না, গুরু বাক্য মানিলে না—না মানিয়া আমার এই দশা করিলে। আহা! যে আমার পরম বন্ধু, যে আমার অকালের সহায়, যাহার আশীর্ব্বাদে আমি জীবন পাইতাম, সে আমায় কত সাধিল, কত বলিল—কিন্তু হতভাগ্য তুমি—তুমি কিসের লোভে আমাকে মুগ্ধ করিয়া আমার আপনার জনকে আমার আপনার হতেও আপনারকে পর করিয়া আমায় এই দশায় আনিলে? আর আমি তোমার ইচ্ছায় চলিব না তোমার ইচ্ছা অগ্রাহ্য করিয়া শাস্ত্রের ইচ্ছা গুরু ইচ্ছা মত চলিব। ইহার কৌশল হইতেছে মন এখানে ওখানে যাওয়া সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করে তাহা করিও না আর আমার প্রিয় সম্বন্ধে যা অনিচ্ছা করে, সেই অনিচ্ছাকে ইচ্ছাশক্তি জাগাইয়া কার্য্য কর; এই যে ব্রত গ্রহণ করিতে যাইতেছি ইহাতে আমার সহায় কে হইবে? সহায় হইবেন তিনি—যিনি সকলের সহায়। যে নিত্য সর্ব্বশক্তিমানের উপরে দাঁড়াইয়া

মনটা বিষয় বিষয় করে তাঁর সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া, তাঁহাকে নালিশ করিয়া করিয়া মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়াও।

এই ভাবে কখন ধমকাও, কখন ঈশ্বরের কথা শুনাও কখন ঈশ্বরের কাছে নালিশ কর, কখন বা ঈশ্বরের কথা শুনাইয়া ইহাকে আদর কর—এইভাবে চলিতে বলা হইতেছে।

মন কিন্তু এত দুষ্ট যে ইহাকে ধরাও কষ্ট। ইহা যে ভুলায় সে ভুল ধরাও কঠিন। সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার সময় অন্য কথা মনে উঠিলেই জানিও মন সংসার আড়ম্বর তুলিতেছে। বৈরাগ্য দ্বারা ইহাকে জব্দ করিয়া অভ্যাসের বস্তুর নাম রূপ গুণ লীলাতে ডুবাও—তারপরে স্বরূপের সংবাদ দাও।

ধরিতে পারিলে ত? না পারিয়া থাক তবে মরিবে—শেষে প্রলাপ বকিয়া বকিয়া কোথায় যে যাইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—সেখানে বহু কষ্ট পাইবে। তাই বলি এখনও সাবধান হও, এখনও সময় আছে। সময় না থাকিলে যাতে তাতে পার সময় কর।

আর একটি অনুষ্ঠান সর্ব্বদা রাখ। এইটি হইতেছে সর্ব্বদা নাম কর। আর মনকে ধর ও উপরে যাহা যাহা বলা হইল তাহা কর, তবেই সুন্দর ভাবে সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকিতে পারিবে, এই করিতে করিতে সর্ব্বাধারে ডুবিয়া যাইবে। এই সব করিতে তিনি আজ্ঞা করিতেছেন—এই সব কর দুঃখ যাইবে নতুবা আমার ইহা হইলনা উহা হইল না—এই সমস্ত বৃথা দুঃখ গাথা গাহিয়া কোন দিকে অগ্রসর হইবে তাহাই বল?

এই সব কর ভাল হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা মনোঘট রিক্ত করিবার উপায় হইতেছে প্রথমেই শক্তিগুলিকে শিবোন্মুখী করিয়া মহাপ্রলয়ের চিন্তা কর, করিয়া দেখ বুঝিবে অন্য সমস্তই মিথ্যা একমাত্র ইষ্টই সত্য। মন ইষ্ট ভিন্ন অন্য যাহা তুলিবে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য

করিতে অভ্যাস কর। সঙ্গে সঙ্গে তোমার নামই যে নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতারের নাম, ঐ নামীর রূপ গুণ লীলা শাস্ত্রস্বাধ্যায়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর, শেষে নামের স্বরূপ ভাবিয়া, অখণ্ড চৈতন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নাম করিতে করিতে স্থির হইয়া যাও, ইহার জন্য যাহারা জানিয়াছেন তাঁহারা শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করুন ইহাই অমৃতত্বের পথ।

শিবরাত্রি।

এই দুরন্ত সংশয়ের যুগে যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাস করিতে পারেন তাঁহারা নিশ্চয়ই পুণ্যবান্ কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাসের বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, অনুভব করিতে পারেন, তাঁহাদের ভাগ্যের সীমা নাই।

আজ ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি। নিবিড় অন্ধকারে ধরা আচ্ছন্ন। চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেও এই রাত্রে কি জানি কি এক অপূর্ব্বতা, কি এক পবিত্রতা যেন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে।

কোথা হইতে এই পবিত্রতা আসিল? শাস্ত্র বলেন,—শিবের প্রিয়া রাত্রি এই শিবরাত্রি! এই রাত্রিতে দেবাদিদেব ভূতলে আগমন করেন, সমস্ত লিঙ্গে আবির্ভূত হয়েন, আর লোকে যে শিবপূজা করে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি সেই পূজা গ্রহণ করেন। ৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা' পুস্তক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শিবতত্ত্ব ও রাত্রিতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যকীয় উপদেশই জানিতে পারেন। মাঘ—ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিব ভূতলে আগমন করেন, এতৎ-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায় "নিশি ভ্রমন্তি ভূতানি শক্তয়ঃ শূলভৃদ্‌যতঃ। অতস্তস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সত্যাং তৎ পূজনং ভবেৎ॥" ভূত-পিশাচাদি সকল, দেবীগণ এবং শূলভৃৎ শঙ্কর—শিবরাত্রিতে

ইহাঁরা বিচরণ করেন, অতএব চতুর্দ্দশী থাকিতে রাত্রিতে শিবরাত্রি ব্রত কর্ত্তব্য।

"মাঘমাসস্ত কৃষ্ণায়াং চতুর্দ্দশ্যাং সুরেশ্বর।
অহং যাস্যামি ভূপৃষ্ঠে রাত্রৌ নৈব দিবা কলৌ॥

নাগরখণ্ড—স্কন্দপুরাণ।

শঙ্কর স্বয়ং বলিতেছেন, কলিতে আমি মাঘ মাসের (ফাল্গুন মাসে যখন পড়ে তখনও) কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠে গমন করিব, দিবসে যাইব না।"

"লিঙ্গেষু চ সমস্তেষু চলেষু স্থাবরেষু চ।
সংক্রমিষ্যাম্যসন্দিগ্ধং বর্ষপাপবিশুদ্ধয়ে।
তস্মাদ্রাত্রৌ হি মে পূজাং যঃ করিষ্যতি মানবঃ
মন্ত্রেরেতৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ বিপাপঃ স ভবিষ্যতি॥

স্কন্দপুরাণ-নাগরখণ্ড।

"এই তিথির রাত্রিতে এক বৎসরের সঞ্চিত পাপসমূহের বিশুদ্ধির নিমিত্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত লিঙ্গে আমি সংক্রমণ করি, স্থাবর জঙ্গম অখিল লিঙ্গে আমার শক্তির আবেশ হইয়া থাকে। অতএব মানব এই রাত্রিতে আমার পূজা করিবে, চতুর্দ্দশী রাত্রিতে যে মানব আমার পূজা করিবে সে নিশ্চয় নিষ্পাপ হইবে। জীবনে একবারও যে পূর্ব্বদিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন করিয়া পরদিন উপবাস, রাত্রি জাগরণ ও চারি প্রহরে চারিবার শিবপূজা করে, সে নিশ্চয়ই উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।"

"শিবরাত্রিব্রতং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
আচণ্ডালমনুষ্যাণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥"

ঈশান সংহিতা।

"সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তরপূজকঃ।
ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ॥"

নৃসিংহপরিচর্য্যা ও পদ্মপুরাণ।

"শিবরাত্রি ব্রত সর্ব্বপাপ নষ্ট করে, ইহা আচণ্ডাল সকলকেই ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করে, এই ব্রতে সকলেরই অধিকার আছে; সূর্য্যোপাসক, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য সকলেরই এই ব্রত কর্ত্তব্য। যিনি শিবরাত্রি ব্রতবহির্মুখ,

যিনি এই ব্রত করেন না, তিনি অন্য দেবতার পূজা করিয়া কোন ফল পান না।”

আর তুমি যে হতাশ হইয়া বল আমার যে কিছুই হইল না, আমি যে স্থায়ী ভাবে কোন কিছুই ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না—এই আশা সম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার আশ্বস্ত হওয়া উচিত। সংশয়ের বীজ হৃদয়ে রাখিলে ইহা প্রথমে সর্ষপ-পরিমাণ হইলেও শেষে ইহাই প্রকাণ্ড আকার ধরিয়া তোমাকে কুপথে লইয়া যাইবে।

“তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আশাকে সত্যা ও অনৃতা এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে আশা ফলবতী হয় না, যে আশা আশারূপেই থাকিয়া যায়, তাহা অনৃতা বা মিথ্যা আশা। যে আশা ফলবতী হয়, তাহা সত্য। আজ না হয় কালান্তরে আমি ইহা নিশ্চয় পাইব, আমার ইহা নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যাঁহারা কাল প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সত্য আশা স্থান পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বাক্য এই—

“তমাশাব্রবীৎ। প্রজাপত আশয়া বৈ শ্রাম্যসি। অহমু বা আশাস্মি। মাং নু যজস্ব। অথ তে সত্যাশা ভবিষ্যতি।” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।২ “নিশ্চিতস্য লাভস্য প্রতীক্ষণং আশা। অনিশ্চিতস্যাপেক্ষা কামঃ। * * * সা দ্বিবিধা হ্যাশা অনৃতা সত্যা চ॥ ফলরহিতা আশা অনৃতা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-ভাষ্য।”

(২)

এই ভারতে এমন স্থান নাই যেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নাই। এক ৺কাশীধামে কত লিঙ্গ যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার সংখ্যা করা যায় না। দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, অবন্তিতে মহাকাল, কাবেরি-নর্ম্মদা সঙ্গমে মান্ধাতাপুরে ওঁকারেশ্বর প্রজ্বলিকাতে শ্রীবৈদ্যনাথ,সদঙ্গনগরে শ্রীনগনাথ, উত্তরাখণ্ডে কেদার, গোদাবরী-তীরে সহ্যপর্ব্বতের শীর্ষে ত্র্যম্বক মহাদেব, সেতুবন্ধে রামেশ্বর, ডাকিনী শাকনিকাতে ভীম মহাদেব, বারাণসীতে শ্রীবিশ্বনাথ, ইলাপুরে ঘৃষ্ণেশ্বর মহাদেব।

অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায়—

“লোকানামুপাদেশার্থং পরমাত্মা রঘূত্তমঃ।
কোটিশঃ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গানি সর্ব্বশঃ॥”

শ্রীভগবান রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজ্য করিতে করিতে লোক সকলের উপকারের জন্য ভারতের সর্ব্বস্থানে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ভগবান্ বাল্যকালে এবং রাজা হইয়াও বহুবার ভারতের সর্ব্বস্থানে পর্য্যটন করেন।

(৩)

শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে আজকালকার সংশয়াত্মা মানুষের কতপ্রকার যে ধারণা তাহা বলা যায় না। শিবলিঙ্গ কোন্ বস্তু এতৎ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায় :—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

আকাশের নাম লিঙ্গ, পৃথিবী আকাশের পীঠ বা বেদিকা ; এই আকাশ সর্ব্বদেবের আলয় ও সকলের লয়স্থান বলিয়া লিঙ্গ নামে অভিহিত। "আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ" অষ্টমূর্ত্তিতে আকাশকে ভীম মহাদেব বলা হইয়াছে। আকাশই মহাদেবের বিরাট মূর্ত্তি এবং সকল দেবতার লয়স্থান ; যোগিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করেন।

শিব শব্দের অর্থও হইতেছে যাহাতে সকলে শয়ন করে—ইনি শিব ইনি মঙ্গলময়। "সত্যং শিবং সুন্দরং"ইনিই। আর শিবরাত্রিতে যে রাত্রি শব্দ পাওয়া যায় তাহার অর্থ হইতেছে প্ররময়তি ভূতানি ইতি। রাত্রি প্রকৃষ্টরূপে ভূতগণকে আনন্দ প্রদান করেন। উপরময়তি—ধ্রুবীকরোতি স্থিরীকরোতি ইতি। জীবের চঞ্চলতা হরণ করিয়া কিছুকালের জন্য বিশ্রান্তি প্রদান করেন যিনি, তিনি রাত্রি। "রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীম্। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্" রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট ; রাত্রিকে ভুবনেশ্বরী বলা হয়। "যা রাত্রিভুবনেশ্বরী" ইত্যাদি, নাগোজীভট্ট এই ব্যাখ্যা করেন।

দেখা গেল লিঙ্গ শব্দের অর্থ যাহাতে সমুদায় জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় ; ইনিই ব্রহ্ম। আর গৌরীপট্ট—শিবলিঙ্গের আধার। গৌরীপট্ট অর্থ জগতের যোনি মূল-প্রকৃতি মহামায়া। তবেই হইল গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গ হইতেছে মূলপ্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মেরই অনুকল্প। চৈতন্য ও শক্তিরই উপাসনা হইতেছে শিবলিঙ্গোপাসনা।

(৪)

শিবরাত্রিতে শিব শিবা অন্যান্য দেব-দেবীর সহিত ভূপৃষ্ঠে যে আগমন করেন, ইহা কি প্রকারে হয়? সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের গমনাগমন কোথায়? উপনিষদ্ শিব সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণস্বরূপিণঃ।
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

রুদ্রহৃদয়োপনিষদ্।

পূর্ণ যিনি তিনি কোথায় গমন করিবেন? আকাশ পূর্ণ—আকাশ কোথায় যাইবে? আকাশ কি গ্রামে প্রবেশ করে, না নগরে ঘুরিয়া বেড়ায়?

স্বরূপে যে শিব পূর্ণ তিনি কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম। তিনি কোথাও গমন করেন না সত্য আর এই নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া অবলম্বনে যখন সগুণ হয়েন তখনও ইনি সকল পদার্থে থাকিয়াও অব্যক্তরূপ। গীতা এই নির্গুণভাবে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছেন "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্।" আবার সগুণ-ভাব ধরিয়া বলিতেছেন—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"। স্বরূপ বা নির্গুণ এই দেহে আছেন কিন্তু কিছুই করেন না—কিছুই করান না—আবার ইনিই সগুণ হইয়া সমস্ত জগত ব্যাপিয়া থাকিলেও ইনি অব্যক্ত মূর্ত্তি। এই চৈতন্য ও শক্তির কথাই বেদ বহুভাবে বলিতেছেন। শিব শক্তির সম্বন্ধে বেদ বলিতেছেন :—

"উমারুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
ব্যক্তং সর্ব্বমুমারূপ-মব্যক্তং তু মহেশ্বরম্॥"

স্থাবরজঙ্গম যা কিছু আছে—সমস্ত প্রজা শিবশক্তিময়ী—উমারুদ্রাত্মিকা। যাহা ব্যক্ত, তাহাই উমা তাহাই শক্তি—যাহা অব্যক্ত, তাহাই শক্তিমান্ মহেশ্বর। উপনিষদ্ কতই বলিতেছেন—উমা নারী রুদ্র নর—তস্মৈ নমোনমঃ। রুদ্র ব্রহ্মা উমা বাণী, রুদ্র বিষ্ণু উমা লক্ষ্মী, রুদ্র সূর্য্য উমা ছায়া, রুদ্র সোম উমা তারা, রুদ্র দিবা উমা রাত্রি, রুদ্র যজ্ঞ উমা দেবী, রুদ্র বহ্নি উমা স্বাহা, রুদ্র বেদ উমা শাস্ত্র, রুদ্র বৃক্ষ উমা বল্লী, রুদ্র গন্ধ উমা পুষ্প, রুদ্র অর্থ উমা অক্ষর, রুদ্র লিঙ্গ আর উমা পীঠ—এই তস্মৈ তস্মৈ নমো নমঃ করার অন্ত কোথায়? ইহাও কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম—এই যে জগদাকার মূর্ত্তি—ইহাও কিন্তু অব্যক্ত মূর্ত্তি।

কিন্তু শিবরাত্রিতে যে মূর্ত্তি সর্ব্বত্র ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করেন—সব লিঙ্গের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়াও কিন্তু সে মূর্ত্তি দর্শন স্পর্শনের যোগ্য—অতি রমণীয় মূর্ত্তি। "ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ—ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য শক্তিমান্ অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, নয়নাভিরাম মূর্ত্তি ধারণ করেন।

এই যে ক্ষুদ্র লিঙ্গমূর্ত্তি গড়িয়া মানুষ শিবপূজা করে, তাঁহাকে কিন্তু "রজত গিরিনিভ" একবার ভাবনা করিয়া লইতে হয়। ভাবিতে হয়—ক্ষিতিমূর্ত্তি ধরিয়া ইনিই সর্ব্ব মহাদেব, জলমূর্ত্তি ধরিয়া ইনি ভবমহাদেব, অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া ইনি রুদ্র মহাদেব, বায়ুমূর্ত্তি ধরিয়া ইনি উগ্র মহাদেব, আকাশ-মূর্ত্তি ধরিয়া ইনি ভীম মহাদেব, যজমান মূর্ত্তি ধরিয়া ইনি পশুপতি, সোম মূর্ত্তি ধরিয়া ইনি মহাদেব, আর সূর্য্য মূর্ত্তি ধরিয়া ইনি ঈশান মহাদেব। নমো নমঃ যে করিতে জানে—আমার কিছু নয় যে বলিতে অভ্যাস করে, তাহার কোথায় অভাব এই ভগবানের? পুষ্পদন্ত কতই নমো নমঃ করিয়াছিলেন—

"নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমিতি সর্ব্বায় চ নমঃ।"

হে নির্জ্জনারণ্যপ্রিয়! তুমি অতি নিকটে—আহা! সকলের হৃদয়ে; তোমাকে নমস্কার, তুমি অতি দূরে—অবিশ্বাসীর হৃদয়ে থাকিয়াও বহুদূরে; তোমাকে নমঃ। হে স্মরহর! তুমি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র—তোমার ঐ নিরাকাররূপে তোমাকে নমঃ, তুমি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ তোমার ঐ সর্ব্বাত্মক হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌রূপে তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিনয়ন! তুমি বৃদ্ধতম—পুরাতন—সকলের আদি তোমাকে নমঃ, তুমি যুবতম প্রলয়ের পরেও যুবার যুবা তুমি, তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ব্ববস্তুর আধার, তুমিই সর্ব্বস্বরূপ, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমো নমঃ করিতেছি।

এই পুষ্পদন্ত তোমার ধৃত-মহিম-দিব্য বপু দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"বিয়দ্ব্যাপী তারাগণ-গুণিতফেনোদ্গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষত-লঘু দৃষ্টঃ শিরসি তে
জগদ্দীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি—
ত্যনেনৈবোন্নেষং ধৃত-মহিম-দিব্যং তব বপুঃ॥"

আকাশব্যাপী গঙ্গাজল প্রবাহ—আকাশের তারার মত ফেনোদ্গম গঙ্গাবক্ষে উঠিতেছে, লয় হইতেছে—আকাশে তারার মত আকাশব্যাপী গঙ্গাবক্ষে ফেনোদ্গম কত সুন্দর—এই আকাশ ব্যাপী গঙ্গা প্রবাহ—ইহা তোমার মস্তকে বিন্দু অপেক্ষা বিন্দু—অতি ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে—আহা! কত বড় তুমি! আবার সেই সলিলপ্রবাহ বলয়ের ন্যায় সমুদ্র বেষ্টিত জগৎকে দ্বীপাকার করিয়াছে—তোমার মস্তকে গঙ্গা—সেই গঙ্গার জলপ্রবাহ সাগর নাম ধারণ করিয়া পৃথ্বীকে বেষ্টন করিয়া আছে—তোমার দিব্যশরীর যে কত বড় আহা! অপূর্ব্ব বিরাট্ পুরুষ তুমি—তুমি কত বড়, তাহা অনুমান করিবে কে?

মনে মনে এই বিরাট পুরুষের ভাবনা করিয়া তোমার ঐ "বামাঙ্গে দধতম্" সুন্দর ধ্যানমূর্ত্তি দেখ দেখি! আহা! কি সুন্দর!

সুন্দর দক্ষিণামূর্ত্তি। মস্তকে জটাভার। তন্মধ্যে জটাটবীবিহারিণী গঙ্গা। মৌলিবদ্ধ জটামূলে, বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত ভাল-তটে চন্দ্রকলা। কণ্ঠে নাগোপবীত। গলদেশ-গরলপ্রভায় তুমি নীলকণ্ঠ। চক্ষু অনল-প্রভা-তুল্য উজ্জ্বল। এক হস্তে ত্রিশূল, অপর হস্তে নর-কপাল। তৃতীয়ে বর, চতুর্থে অভয়। হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল দেহ। বামাঙ্গে প্রালেয়-শৈলাত্মজা জগজ্জননী আহা! এই ভক্ত ক্লেশ-হর হর হর মহাদেব কত সুন্দর।

তাইত ধ্যানে পাওয়া যায়—

"মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং জটে চ গঙ্গা জলং
ব্যালং বক্ষসি চানলঞ্চ নয়নে শূলং কপালং করে।
বামাঙ্গে দধতং নমামি সততং প্রালেয়শৈলাত্মজাং
ভক্তক্লেশহরং হরং স্মরহরং কর্পূরগৌরং পরম্॥"

এই শিবরাত্রিতে এই শিবের বন্দনা কর—করিতে করিতে বল,—

"বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্ক বহ্নি নয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্।

সুন্দর এই মূর্ত্তি। জগজ্জননী ভগবতী পার্ব্বতীর দক্ষিণ হস্ত উমাপতির স্কন্ধদেশে অর্পিত। উমানাথকে স্পর্শ করিয়া হররাণী আলুথালু হইয়া গিয়াছেন। অঙ্গের বসন বিগলিত হইয়া গিয়াছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। সে স্পর্শে লজ্জার

বন্ধন নাই। দক্ষিণ হস্ত বাম স্কন্ধ হইতে এরূপভাবে লম্বিত যাহা দেখিলে মনে হয় হররাণী বুঝি সব হারাইয়া ফেলিতেছেন—বুঝি শঙ্কর-স্পর্শে শঙ্করই হইয়া যাইতেছেন—কোথাও চঞ্চলতা নাই। শঙ্করের স্পর্শে শ্রীপার্ব্বতী বিভোর হইয়া দেবাদিদেবকে দেখিতেছেন। আর মহেশ্বর? ভাল করিয়া দেখ দেখি—কোথায় দৃষ্টি? পার্ব্বতীর আলিঙ্গনে এই অনেজৎ এর কোথাও বিচলন নাই। নয়নে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দেখ—দেখিবে এই দেবতা জগৎ ছাড়িয়া অন্য কোন রাজ্যে আপনি আপনি যেন চলিয়াছেন। অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহের মত, তরঙ্গ-লুকায়িত জলধির মত, নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত, স্থির শান্ত চলন-রহিত হইয়া কোথায় গিয়াছেন, কে বলিবে? যেন দৃশ্য-প্রপঞ্চ মার্জ্জন করিয়া প্রপঞ্চ দর্শনরূপ গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ, কি এক আনন্দে, কি এক অপরিসীম আনন্দে আনন্দময় হইয়া রহিয়াছেন, ইনি যেন আনন্দঘন মূর্ত্তিতে চাহিয়া চাহিয়া ত্রিভুবন পরিপূরিত করিতেছেন।

বলনা এমন দেবতা আর কোথায়? অমৃত ও গরল এক অঙ্গে ধারণ করিতে পারে কে? কপালে চন্দ্রকলা সুধাবর্ষণ করিতেছে, আর কণ্ঠে হলাহল সর্ব্বাঙ্গে বিষধর সর্প—বল এই বিষামৃত আর কোথায় দেখ? এই দেবতাকে ভজিয়া সংসার হলাহলকে অমৃত কর, ইহাই ত আদর্শ।

ভগবান্ বাল্মীকির রামায়ণ হইতে একটী স্তব দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। প্রাণাত্যয়ে ইহা শ্রুত্য, নিত্য পাঠের জন্য ইহা নহে।

"নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত।
ভূতভব্যমহাদেব হরিপিঙ্গল লোচন॥
বালস্ত্বংবৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ।
অর্চ্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ॥
হরো হরিতনেমী চ যুগান্ত দহনো বলঃ।
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ॥
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ।
কালশ্চ বলরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ॥
দেবান্তগস্তপোঽন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ।
শূলপাণির্বৃষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ॥
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ।
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবনঃ॥

সর্ব্বগঃ সর্ব্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ।
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিনাকী ধূর্জ্জটিস্তথা॥
মাননীয়শ্চ ওঁকারো বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠসামগঃ॥
মৃত্যুশ্চ মৃত্যুভূতশ্চ পারিযাত্রশ্চ সুব্রতঃ॥
ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণা-পণব-তূণবান্।
অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্য্যনিভস্তথা॥
শ্মশানবাসী ভগবানুমাপতিরনিন্দিতঃ।
ভগস্যাক্ষিনিপাতী চ পূষ্ণো দশননাশনঃ॥
জ্বরহর্ত্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ।
উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তো বিশাম্পতিঃ॥
উন্মাদী বেপনকরশ্চতুর্থো লোকসত্তমঃ।
বামনো বামদেবশ্চ প্রাক্ প্রদক্ষিণবামনঃ॥
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষরূপী চ ত্রিজটী কুটিলঃ স্বয়ম্॥
শক্রহস্ত প্রতিষ্টম্ভী বসূনাং স্তম্ভনস্তথা॥
ঋতুর্ঋতুকরঃ কালো মধুর্ম্মধুকলোচনঃ।
বানস্পত্যো বাজসনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ॥
জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্ম্মা ভূতভাবনঃ॥
ত্রিনেত্রো বহুরূপশ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ।
দেবদেবোঽতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা॥
নর্ত্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সর্ব্বজীবময়স্তথা॥
সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী চ সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষকঃ।
মোহনো বন্ধনশ্চৈব সর্ব্বদা নিধনোত্তমঃ॥
পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্ব্বহরস্তথা।
হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্ধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ॥
ময়া প্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম॥
জপমেতদ্দশগ্রীব কুর্য্যাচ্ছত্রুবিনাশনম্॥
অক্ষসূত্রং গ্রহীত্বাতু জপেন্মন্ত্রমিমং শুভম্॥"

অমৃতাভ।

(১)

যখন ভারত ব্যাপি, অধর্ম্মের কোলাহলে,
ছেয়েছিল এ বিশ্ব সংসার।
তখন জাহ্নবী তীরে অবতরি নদীয়ায়
পাপী তাপী করিলে উদ্ধার ॥

(২)

শুষ্কজ্ঞান-চর্চ্চা ল'য়ে যখন সকলে ব্যস্ত
ভক্তি হীন অন্তর সবার।
হরি নামামৃত সুধা ঢালিয়া নরের প্রাণে,
ভক্তি গঙ্গা বহালে আবার ॥

(৩)

সেই হরি নাম ধ্বনি প্রেমে গদগদ ভাব,
প্রেম-অশ্রুঝরা নিরন্তর।
অমৃতাভ দেবরূপ যেন হেরিতেছি চোখে
পুলকেতে পূরিছে অন্তর ॥

(৪)

দিবানিশি সংকীর্ত্তন তাহাতেও নাহি ক্লান্তি,
মগ্নভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
কিসে ভাবে তন্ময় নাহি কোন বাহ্যজ্ঞান,
চরাচর সব বিস্মরণ ॥

(৫)

ভক্ত যদি আসে কেহ আলিঙ্গন দাও তাবে,
উচ্চ নীচ জাতি না বিচারি'।
এ হেন মধুর ভাব সম্ভবে কি তোমা ছাড়া
ওহে প্রভো! এভব কাণ্ডারী ॥

(৬)

তোমার বিশাল বক্ষ বিশাল জলধি মত
নিরবধি ভক্তিতে উছল।
পুরিতে সমুদ্র হেরি ভক্তিভাবে মনঃপ্রাণ
কেন নাহি হইবে চঞ্চল॥

(৭)

গরুড় স্তম্ভের পাশে জগন্নাথ দরশনে,
ভক্তিভরে হ'লে আত্মহারা।
অনিমেষ দু'নয়নে চেয়ে র'লে দেবপানে,
অবিরল বহে অশ্রু ধারা॥

(৮)

দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি,' নিরন্তর হরিনাম
গেয়েছিলে তুমি দিবানিশি।
প্রেম-অশ্রু বরিষণে সর্ব্বঅঙ্গ তিতাইলে,
তুমিদেব! প্রেমিক সন্ন্যাসী॥

(৯)

আর্য্য অনার্য্যের হরি এস হৃদে একবার,
ভক্তি বিন্দু মাগি এককণা।
পতিত পাবন নাম সার্থক করহ প্রভো!
দূর কর সকল ভাবনা।

(১০)

দাও সেই চক্ষু নাথ, বিশ্বভরি' তবরূপ
মনশ্চক্ষে দেখি একবার।
হৃদয়ের যত ভ্রান্তি, দূর করি দাও নাথ
দিব্যদৃষ্টি অনন্ত বিথার॥

(১১)

অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি প্রভু,
বিপন্নের পরিত্রাণকারী।
জগতের পিতাতুমি, আতুরের শান্তি স্থল
এস প্রভো! হৃদে দয়া করি'॥

শ্রীহেমলতা রায়। রাজসাহী।

আরম্ভে মাং নমস্কুরু।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

মন্মনা হও—মনের অন্য সমস্ত চলন বন্ধ করিয়া সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আমি—আমি বাসুদেব—আমাতে মন স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হও, আমার স্বরূপে মনকে অচল কর;

মদ্ভক্ত হও—আমার নাম, গুণ, লীলা, শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন, পঠন পাঠন দ্বারা আমার ভজনাকর।

মদ্‌যাজী হও—মন, বাক্য, শরীর সমস্তই আমাতে অর্পণ করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতি পালন জন্য সমস্ত কর্ম্ম করিয়া করিয়া আমার পূজা কর।

মাং নমস্কুরু—সর্ব্বত্র আমিই আছি, ভিতরে আমি বাহিরেও সব মূর্ত্তিতেই আমি—সব দেখিয়া আমাকে স্মরণ করিতে করিতে, আমাকে তোমার সকল দুঃখ জানাইয়া তৎপ্রতীকার জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে আমাকে নমস্কার করার অভ্যাস কর—আমার কিছুই নাই সব তোমায় বলিয়া বলিয়া আমাকে ভিতরে বাহিরে নমঃ—ন মম করিবার অভ্যাসটি পাকা করিয়া ফেল।

মাং নমস্কুরু—এইটি বৈদিক সাধনা। এমন বস্তু কোথায় যেথানে আমি নাই? বিশাল জগৎ—সমস্ত স্থাবর জঙ্গম লইয়া আমাতেই ভাসিয়াছে—আমি সত্য, জ্ঞান, আনন্দ—আমার বিদ্যমানতা সকলেই—সারবস্তু আমি—আমি ভিন্ন আর সমস্তই অসার জানিয়া সকল বস্তু ধরিয়া আমাকে মনে মনে নমস্কার ও দুখঃ প্রতীকার জন্য প্রার্থনা করার অভ্যাস কর। সূত সংহিতা এই বৈদিক মার্গের অনুষ্ঠানে এবং এই বৈদিক মার্গের প্রচারে—সকল নরনারীর অধিকার আছে বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, অন্ত্যজ জাতি সকলেরই এই জ্ঞান যজ্ঞে অধিকার আছে বলিতেছেন।

সকল নরনারী বিশ্বাসে সর্ব্বত্র আমি অছি স্মরণ করিতে পারে। আমিই সব হইয়া, সব সাজিয়া, সবরূপে রূপ মিশাইয়া দাঁড়াইয়া আছি, খেলা করিতেছি—সকলেই ইহা স্মরণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে। যিনি আমার আত্মা তিনি আমার সেবা লইবার জন্য আমার ইষ্ট দেবতা—আবার ইষ্ট দেবতাই সব সাজিয়া সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে বাহিরে আছেন ইহার স্মরণে যে কত আনন্দ তাহা যিনি ভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন।

যাঁহারা মায়া মোহিত হইয়া এই জ্ঞান-যজ্ঞ ও ধ্যান-যজ্ঞ অভ্যাস না করিয়া সংসার মুক্তির চেষ্টা করেন তাঁহারা "পায়সান্নং পরিত্যজ্য ভক্ষয়ন্তি মহাবিষম্" তাঁহারা পায়সান্ন ত্যাগ করিয়া মহাবিষ ভক্ষণ করেন, "স নভো ভক্ষণেনৈব ক্ষুন্নিবৃত্তিং করিষ্যতি—এইরূপ ব্যক্তি আকাশ খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। আর

"জ্ঞান যজ্ঞোড়ুপেনৈব ব্রাহ্মণো বাহন্তাজোহপিবা।
সংসার সাগরং তীর্ত্বা মুক্তিপারং হি গচ্ছতি॥"

ব্রাহ্মণ হউক বা অন্য জাতিই হউক, এই জ্ঞান যজ্ঞরূপ ভেলা দ্বারা সংসার সাগর পার হইয়া সকলেই মুক্তি রূপ পরপারে যাইতে পারে।

মানুষের হতাশ হইবার ত কোন কারণ নাই। এত বড় সহায় যার তার আবার ভয় হইবে কিরূপে? মন ত সত্ত্বরজস্তম ভাব নিরন্তর তুলিবেই, ইহাতে সুখঃদুঃখও নিরন্তর মনে ভাসিবে—মানুষ আপনার দেবতার নিকট সর্ব্বদা দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া করিয়া প্রণাম করুক—হইবেই।

অন্যরূপ করিয়া এই কথাই বলা যাইতেছে।

জগদেক নাথ তুমি! জগজ্জীবন তুমি! জগতের একমাত্র আনন্দ স্থান তুমি! তোমায় ছাড়িয়া মানুষ কোথায় আনন্দ পাইবে? সংসারে সুখ লাভ করিতে মানুষ এত ছুটাছুটি করে কেন? যাঁহারা নিপুণভাবেও সংসার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও জনে জনে জিজ্ঞাসা কর একমাত্র উত্তর পাইবে ভগবানকে বাদ দিয়া সংসার সুখ ভোগ করিতে যিনি ছুটিবেন, সংসার সুখের পশ্চাতে যে অতি ভীষণ দুঃখ আছে তাহাও তাঁহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। হায়! সংসারের সকল সুখই নিতান্ত ক্ষণিক, তাহার পরে দুঃখের বিষম কষাঘাত। এই ক্ষণিক অস্থায়ী সুখের জন্য মানুষ কোন্ মোহে আক্রান্ত হইয়া দুঃখের ঐ দারুণ কষাঘাত লইতে প্রস্তুত হয়? মানুষ কেন জ্ঞানী জনের কথা শুনিয়া সাবধান না হয়? উপদেশ ত সর্ব্বত্রই আছে। মোহনাশের উপদেশ কোথায় না পাওয়া যায়? চণ্ডীতে, গীতাতে, ভাগবতে, রামায়ণে কোথায় না মোহনাশের কথা আছে? হায় মোহ! জানিয়া শুনিয়া মানুষ এই মোহে পড়ে কেন? মোহনাশিনী থাকিতেও মানুষ কেন তাঁহার শরণে আসিয়া সংসার করে না? সংসার ত করিতেই হইবে। কত যত্ন করিয়া সংসার করিবার কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছ—ইহা ত তোমার কর্ম্মেরই ফল। তবে আবার সেই কর্ম্ম বাড়াইয়া আবার এই দুঃখময় সংসারে আসিবার জন্য মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পুনঃ পুনঃ জনন মরণের পথে

ছুটে কেন? আহা! করুণাময় তুমি, ক্ষমাসার তুমি, শ্রীভগবান্ তুমি! তুমি থাকিতে মানুষের আবার ভয় কি? আহা! তিনি যে সর্ব্বদা ডাকিতেছেন—দুঃখী জীব শত দোষ করিয়া থাক, শত পাপ করিয়া থাক, সহস্র অপরাধ করিয়া থাক তবু আমি তোমার আছি, তোমাকে কোলে লইবার জন্য আমি হস্ত প্রসারণ করিয়া আছি, তুমি আমার দিকে ফির, আমার কাছে আইস আমি তোমাকে নির্ম্মল করিয়া আমার অভয় ক্রোড়ে তোমায় রাখিব, তোমার ভয় নাই। সংসার করিতে হয় কর কিন্তু আমায় লইয়া সংসার কর। আমার জন্য তোমার সব কার্য্য কর, তোমার সকল কার্য্যে আমার সহায়তা প্রার্থনা কর, আমি ধীরে ধীরে তোমার কর্ম্মক্ষয় করিয়া দিয়া তোমাকে সর্ব্বদা আমার কাছে রাখিব। আমি তোমার হৃদয়ে আছি, তোমার বাহিরেও সকল বস্তু ধরিয়া আছি—আর কিছু পার আর না পার—আমি তোমার আছি ইহা বিশ্বাস করিয়া আমাকে নিরন্তর প্রণাম করিয়া করিয়া সকল কর্ম্ম করিয়া যাও। সর্ব্বদা আমার নাম জপিয়া জপিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া করিয়া মাং নমস্কুরু করিতে করিতে তোমার কর্ম্ম করিয়া যাও। কোন কর্ম্ম করিওনা আমাকে না স্মরিয়া,আমাকে নমঃ না করিয়া—আমি তোমার সব ভাল করিয়া দিব। তোমার ভয় নাই—তুমি যাই হওনা কেন আমাকে স্মরিয়া স্মরিয়া আমার নাম জপিয়া জপিয়া সকলকে দেখিয়া আমাকে মনে মনে নম কর—নম কর,তোমার সব ভাল হইবে। এইটি অবলম্বন করিয়া মানুষ দেখুক ইহাতেই দুঃখ দূর হইবে—তখন মানুষ আপনিই বলিতে পারিবে এই মাত্র মনটা বড় হা হুতাশ করিতেছিল কিন্তু স্মরণ করিতে করিতে সে সব ভাল করিয়া দিয়া গেল। করিয়া দেখ হয় কি না হয় তার "জামিন রহে তুলসী দাস"। তাই বলি দুঃখ আসিলে বা শারীরিক মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হইলে একবার ভাবনা কর ক্লেশরূপে আসিয়াছ—আসিয়াছ আমার অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র করিতে; আমি সব সহিয়া তোমার নমস্কার করি। সূতসংহিতা বলিতেছেন জগতে যাহা কিছু দেখ বা শুন "ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যানি মহাত্মভিঃ" তাহাকেই মহাত্মারা বলিতেছেন—সেই ভাবিয়া নিত্য উপাসনা করিবে।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, মেরুমন্দর পর্ব্বত, নদী, নদ, দেবতা, ঋষি, বাপী, কূপ, তড়াগ, বন, সমুদ্র, দিক, বিদিক, দিন, রাত্রি, আগামী কাল অণ্ডজ, জারজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, শঙ্কর জাতি, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, মহাপাতক, পাতক, উত্তম মধ্যম অধম ধর্ম্মজ্ঞবিপ্র, সুখদুঃখ

সুখদুঃখের ভোগ, বিধি, নিষেধ, বিদ্যা, অবিদ্যা, পুত্রবতী, বন্ধ্যা, বাদ প্রতিবাদ —যখন যাহা আসিবে তাহাই সে—এই ভাবে সকল ব্যাপারে তাহাকে স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাহারই উপাসনা করিবে।

যদ্‌যদস্তি ত্বয়া ভাতি যদ্‌যন্নাস্তি ত্বয়াঽপি চ
তদ্ তদ্ ব্রহ্মতয়া নিত্যমুপাস্যং ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।

যাহা যাহা আছে—আহা তোমার দ্বারাই বা তোমাতেই তাহা প্রকাশিত— যাহা নাই তাহাও তুমি—সবই তুমি সবেই তুমি এই মনে করিয়া—তোমার স্মরণে সব সহ্য করিতে করিতে সেই প্রিয়েরই উপাসনা কর—ইহার নাম জ্ঞান যজ্ঞ বা ধ্যান যজ্ঞ।

এই বৈদিক মার্গে জীবন্ত দেবতাই সর্ব্বত্র বিরাজিত—চেতন পুরুষই উপাস্য জড় উপাস্য নহে ইহাই বলা হইয়াছে। চৈতন্য কোথায় নাই—চৈতন্যের উপরেই জড় ভাব।

আর্য্য ঋষিগণ এই বৈদিক মার্গই প্রচার করিয়াছেন। শক্তি সম্পন্ন হইয়াও যিনি ইহা প্রচার করেন না তিনি মহাপাতকী এইরূপ ব্যক্তিকে বিনাশ করিলেও পাপ হয় না।

যো হি স্থাপয়িতুং শক্তো ন কুর্য্যাৎ মোহতোনরঃ।
তস্য হন্তা ন পাপীয়ান্ ইতি বেদান্ত নির্ণয়ঃ।

আর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৈদিক মার্গ স্থাপনে উদ্যোগ করিয়াও যিনি অক্ষম হয়েন —যিনি সম্পূর্ণ করিতে না পারেন, এইরূপ ব্যক্তিও সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করেন। আর বিদ্যাভিমানী হইয়া যিনি এই বেদমার্গ প্রবর্ত্তককে বিতণ্ডা দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করেন তিনিও মহাপাতকী হয়েন।

যিনি বৈদিক মার্গে অবস্থান করেন তিনি সর্ব্বত্র রাজার মত পূজা প্রাপ্ত হয়েন আর "তস্য ক্রীড়ন্তি পিতরো যাস্যামঃ পরমাং গতিম্" বৈদিক মার্গাবস্থিত জনের পিতৃলোকেরা এই বলিয়া উল্লসিত হয়েন যে আমার বংশের এই সন্তান দ্বারা আমরা পরমগতি—পরম পদ—প্রাপ্ত হইব।

আমরা বলি—আমার কর্ম্মে তারে স্মরণ করা—নিত্য কর্ম্মে স্মরণ করা, প্রাণায়ামে স্মরণ করা, বাহিরে লোকসঙ্গে স্মরণ করা, প্রকৃতির সর্ব্ব বস্তুতে স্মরণ করা, দুঃখে স্মরণ করা, সুখে স্মরণ করা,—আমার কর্ম্ম আমি করিতে প্রাণপণ করি—আমার যাহাতে ভাল হয় তাহা সে নিশ্চয়ই করিয়া দিবে এই বিশ্বাস যিনি দৃঢ় ভাবে হৃদয়ে রাখিতে পারেন তিনিই যথার্থ বিশ্বাসী, তাঁরই সব হয়।

শ্রীশ্রীসদাশিবঃ শরণং।

শ্রী১০৮ গুরুদেবচরণারবিন্দেভ্যো নমো নমঃ॥ নমো গণেশায়॥ নম আদিত্যায়॥ সরস্বত্যৈ॥ বেদস্বরূপ শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমো নমঃ॥

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগ-ত্রয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর জীবনী বর্ণনে প্রয়াস।

ভূমিকা।

প্রায় দেড় বৎসর হইল আরাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী তাঁহার নয়নাভিরাম, সর্ব্বজীবকল্যাণাশ্রয়, ভক্তজনের পূজার একমাত্র আধার, দিব্যদর্শন স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই অসেচনক প্রিয়দর্শন মূর্ত্তির যাঁহারা সর্ব্বদাই দর্শন করিতেন, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বেদ-শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্মোদ্ভাসক মধুর উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক যে শ্রোতৃবর্গ তাঁহাদের তত্ত্বোপদেশ শুশ্রূষা চরিতার্থ করিতেন. সেই কল্যাণশক্তির বিশিষ্ট সম্পদ, করুণাধার, রম্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া যাঁহারা সদা তৃপ্ত হইতেন, তৎপাদবিহনে তাঁহারা যে ইদানীং জীবন্মৃতবৎ অবস্থান করিতেছেন, অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার দিব্যরূপের, তাঁহার জ্ঞান ও যোগসম্পদের, তাঁহার অশেষ কল্যাণগুণগ্রামের ধ্যানই এখন একমাত্র শান্তিদায়ক অবলম্বন, সন্দেহ নাই। তাই স্বামীজীর প্রাগুক্ত এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য ভক্তগণও শীঘ্র তাঁহার জীবনেতিহাস প্রকাশ করিবার জন্য এ দীনকে একাধিকবার অনুরোধ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই বলিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত।

বিলম্ব হইতেছে বলিয়া অন্যান্য কারণেও অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ‘এতদিন হইয়া গেল, এত বড় লোকের তিরোধানে কিছু করা হইল না, তাঁহার জীবনের বিবরণ প্রকাশ করা হইল না’ বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। অনেকে বিলম্বে জনসাধারণের হৃদয় হইতে তাঁহার স্মৃতির বিলোপপ্রসঙ্গের আশঙ্কা করিয়া ব্যস্তও হইয়াছেন! পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত, তবে শেষোক্ত আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল কোন লোকোপকারক খ্যাতনামা পুরুষের তরোভাবে, সাধারণতঃ অতি অল্পকাল পরেই তাঁহার জীবনী

প্রকাশিত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে মৃত্যুর পরদিনেই তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংবাদপত্রাদিতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। তাহার তুলনায় স্বামীজীর জীবনচরিত প্রকাশে অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছে, স্বীকার করিতেছি, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না আশা করি, ইহাতে প্রকৃত উপকার্য্যের উপকার বিষয়ে কোন হানির সম্ভাবনা নাই। তাঁহার অবিলোপী স্মৃতির ও বিলোপ প্রসঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই। যাঁহারা তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে কোন দিন জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় হইতে সে রমণীয় মূর্ত্তি ও সে মধুর বাণীর স্মৃতি, সে অবিদ্যাধ্বান্ত নিবারক উপদেশের জ্যোতির্ম্ময় চিরপ্রকাশ তাঁহাদের বর্ত্তমান জীবনে কখন তিরোহিত হইবে না। জন্মান্তর পরিগ্রহেও তাহার সংস্কার বিলুপ্ত হইবে না। তাঁহাকে দর্শন করিবার বা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ বা পাঠ করিবার ভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই। এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে তাঁহার প্রকাশয়িষ্যমাণ জ্ঞানোপদেশগুলি পাঠ করিবেন তাঁহাদের হৃদয়েও তাঁহার উপদেশসমূহ এবং তাঁহার তৎপ্রতিফলিত স্বরূপ নিত্য আসনই অধিকার করিবে। এ ছবি, এ সংস্কার নিত্য, অবিলোপী। তবে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখেন নাই বা দেখিতে পান নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতির চিরস্থিতি আমরা আশা করি না, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ ব্যস্ততাও নাই।

বিলম্বের কারণ।

বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কয়েকটী বিশিষ্ট কারণে এরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল যাহাতে ঈদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। দীর্ঘকাল শোকে আচ্ছন্ন থাকা জ্ঞানবানের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়! অনেকে আমাকে এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা সত্য বটে, কিন্তু আমি ত জ্ঞানবান নহি, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমি এখনও সে জ্ঞানলাভ করিতে পারি নাই যদ্দ্বারা শোকের রাজ্য অতিক্রম করিতে পারা যায়। কয়েকটী কারণে শোক আমার হৃদয়কে বিশেষতঃ অধিকার করিয়াছিল। হৃত বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব, রমনীয়ত্ব বা দৌর্লভ্য যত যত অধিক হয়, মানবের তজ্জনিত শোক তত অধিক হইয়া থাকে। আমি যে বস্তু হারাইয়াছি, তাদৃশ সর্ব্বসুখপ্রদ রমনীয় বস্তু জীবনে আর দ্বিতীয় অনুভব করি নাই, তাই তদ্বস্তুর অভাবজনিত শোক আমাকে এত অধিক কাল সমাচ্ছন্ন

করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আমার এক দিনও মনে হয় নাই যে স্বামীজী এ সময়ে, এত শীঘ্র তাঁহার কল্যাণলীলা সম্বরণ করিবেন; তাই আমি ইহার নিমিত্ত একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, তাই আমি অনেকতঃ অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং দীর্ঘকাল অবধি নিরন্তর অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিলাম। কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহে অশক্ত দেখিয়া অবশেষে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক এ অধমকে একাধিকরূপে আশ্বস্ত করিলেন। অনেকতঃ আশ্বস্ত হইলেও এখনও সম্পূর্ণরূপে এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য হইতে পারি নাই। তবে সকলের আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন, অযোগ্য হইলেও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম। সুধীগণ কৃপাপূর্ব্বক আমার অযোগ্যতা জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করুন। ভগবান্ এই জ্ঞান-ও-শক্তিদরিদ্রকে কৃপা করুন।

ক্রমশঃ

শ্রীভীষ্মদেবের ঈশ্বর বিশ্বাস। *

(১)

শ্রীভীষ্মদেবকে জানেন না এমন লোক বোধ হয় এদেশে অতি অল্পই আছেন। তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বরজ্ঞানী এবং পরিপূর্ণ ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন, সেইজন্য বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যের কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না, কারণ তিনি সাধনবলে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করেন, এজগতে কিছুই তাঁহার অবিদিত থাকে

---

* মহাভারতের শান্তিপর্ব্বীয় ভীষ্মস্তব অবলম্বনে লিখিত (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়)

১। মৈত্রেয়ি! আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৪। ৫। ৬ মন্ত্র।

২। "জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং প্রকরণাদসংনিহিতত্বাচ"। ব্রহ্মসূত্র। ৪।৪।১৭।

"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্"। তৈ। ১,৬।২। সর্ব্বেষু লোকে কামচারো ভবতি।" ছান্দোগ্য। ৭।২৫।২, ৮।১।৬।

[না বা থাকিতে পারে না; ১ তাই সচ্চিদানন্দময় ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন যে "শ্রীভীষ্মের তিরোভাবে এই পৃথিবী "নষ্টচন্দ্রেব শর্ব্বরী" চন্দ্রবিহীন রজনীর ন্যায় হইয়া যাইবে।" ভীষ্মদেব যে কেবল জ্ঞানী ও ভক্তই ছিলেন তাহা নহে, তিনি প্রচণ্ড ক্ষাত্রশক্তির জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন এ কথা কে না জানে? সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত, এ জগতে কোন শক্তি তাঁহার করায়ত্ত নহে? ২। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ প্রাঙ্গণে লীলাময় চক্রধারী রথচক্রধারণ করিয়া ভীষ্মের বিশ্ববিজয়িত্ব স্বয়ংই ঘোষণা করিয়াছেন। কেনই বা তিনি তাহা করিবেন না? যিনি সর্ব্বদা বৃহদ্ব্রহ্মে বিচরণ করতঃ তাঁহারই বৃহতী শক্তির সন্তানরূপে জগতে চিরপরিচিত, শক্তিধর সন্তানপ্রসবিনী সেই শক্তির সঙ্গে শক্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ংই মিলিবেন ইহা ত স্বাভাবিক, "শিবঃ শক্ত্যাযুক্তঃ" ইহা যে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ, ইহা কি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের পরাজয়; না লীলাতত্ত্ব? অনন্তলীলাময়ের বীর্য্যবান্ সন্তানের এই শক্তির কথা আর্যমহাভারত বিশাল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন! কুরুক্ষেত্রের সর্ব্বলোক ক্ষয়কর মহাযুদ্ধ প্রাঙ্গণে মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষে শ্রীভীষ্মদেবই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, তখন তিনি জরাজীর্ণ পরম বৃদ্ধ, তখন তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর, তাই পঞ্চম বেদ মহাভারতমন্ত্রদ্রষ্টা পরমর্ষিও তাঁহাকে "কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ' বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। ঋষি কেনই বা এতাদৃশ পুরুষকে সম্মান করিবেন না? কারণ "মৈত্র্যাদিগুণের * উদয়ে বিশ্বাত্মা ভগবান্ যাঁহার

* মৈত্রীকরুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাত শ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥

(যোগদর্শন সূত্র সমাধিপাদ ৩৫)

১। "যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।"
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমার্গ ইব স্বয়ম্ ॥

(ভাগবত। ৪ স্কন্ধ—৯ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক।)

ইহা ভাগবতের ধ্রুবচরিত্রের শ্লোক। ভক্ত ধ্রুব হরি দর্শন করিয়া গৃহে আসিলে তাঁহার বিমাতা সুরুচি পূর্ব্বের হিংসাভাব ভুলিয়া স্নেহাশ্রুজলে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। পরমর্ষি সেই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক বলিয়াছেন।

প্রতি সদা প্রসন্ন, নিম্নভূমির উদ্দেশ্যে বিনতজলের ন্যায় সর্ব্বভূতই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন"—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। ১ সেইজন্য শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবকে ঋষি এইভাবে স্মরণ করিয়াছেন—

"বিকীর্ণাংশু রিবাদিত্যো
ভীষ্মঃ শরশতৈশ্চিতঃ।
শুশুভে লক্ষ্যাপরয়া
বৃতো ব্রাহ্মণসত্তমৈঃ॥"

"ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ পরিবৃত শ্রীভীষ্মদেব অস্তগামী সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন"। বিশ্বের এই অপূর্ব্ব মানবশ্রেষ্ঠের সেই অদ্ভুত শোভাদির কথা ভাল করিয়া বুঝিবার বা বুঝাইবার মত সৌভাগ্য আমার নাই, কিন্তু এতাদৃশ পুরুষের পরম পূত চরিত চিন্তা কলি উপহত আত্মার বিশেষ উপকারী—এ বিশ্বাস আমার—আছে, তাই "শ্রীভীষ্মদেবের ঈশ্বর বিশ্বাসের" কয়েকটি কথা আজ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

(২)

জ্ঞানী ভক্ত ঊর্দ্ধরেতা মহাবীর ভীষ্মদেব কুরুক্ষেত্র মহাসমর প্রাঙ্গনে শরশয্যা-শায়িত অবস্থায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন যে—

১। "যে নমস্তন্তি গোবিন্দং
ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্।"

"যাঁহারা গোবিন্দকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের কোনই ভয় থাকে না।"

২। "কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়।"

"যাঁহারা শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করেন তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না।"

৩। "কৃষ্ণব্রতাঃ কৃষ্ণ মনুস্মরন্তঃ।
... ...
প্রবিশন্তি কৃষ্ণম্‌··· ·····
আজ্যং যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে।"

মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার উদ্দেশ্যে হিংস্রেরাও হিংসা ত্যাগ করিয়া থাকে" (অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" সাধনপাদ—৩৫।)

যাঁহারা সতত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতঃ তাঁহাকেই জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছেন, তাঁহারা মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতির অগ্নিতে প্রবেশের ন্যায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন।" তাৎপর্য্য এই যে—অগ্নিদেবতা যেমন প্রদত্ত ঘৃতাহুতিকে আত্মসাৎ করেন, শ্রীভগবান্‌ও তাদৃশ ভক্তকে সেই ভাবে **আত্মসাৎ** করিয়া থাকেন।

৪। প্রাণকান্তার পাথেয়ম্
সংসারোচ্ছেদ ভেষজম্।
দুঃখশোক পরিত্রাণম্
হরি রিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"

"**হরি**" এই অক্ষর দুইটি প্রাণকান্তারের পাথেয় স্বরূপ, তাৎপর্য্য এই যে—কান্তারে পতিত নিরাশ্রয় পথিকের ন্যায় প্রাণপ্রয়াণ সময়ে জীব নিতান্তই অসহায় হয়; **হরিনাম** সেই পরকালের পথে **পাথেয় স্বরূপ**, সংসার রোগ উচ্ছেদের পরম ঔষধ অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ, এবং শোকও দুঃখের পরিত্রাণ কারী।

(৩)

১। ঈশ্বরকে প্রণাম করিলে জীবের কোন ভয় থাকে না; ২ ঈশ্বরকে প্রণাম করিলে জীবের পুনর্জন্ম হয় না; ৩—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করেন, তিনি তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া লয়েন; ৪—হরিনাম পরকালের একমাত্র সম্বল সংসার রোগের ঔষধ এবং শোক দুঃখ হারী শ্রীভীষ্মদেবের ইহাই বিশ্বাস ছিল; সেইজন্য তিনি শরশয্যায় শায়িত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গভীর বিশ্বাসে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া আকুল প্রাণে ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে

"তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ"

বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীভীষ্মদেবের এই বিশ্বাস ধ্যান ও প্রণামের কথা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ভীষ্মদেবের মত জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বদাই ভগবানকে ধ্যান ও প্রণামাদি করিতেন ইহা বলাই বাহুল্য, তথাপি শরশয্যাকালে তাঁহার মুখে এই স্তব ফুটিয়াছে কেন? তাহা কি আমি বুঝিতে পারি? ভীষ্মদেব সাময়িকভাবে শরশয্যাশায়িত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গভীর বিশ্বাসে ভগবানের ধ্যান ও প্রণামাদি করিয়াছিলেন, আর আমার অবস্থা? আমি সংসার শরশয্যায় শায়িত হইয়া অসংখ্য রিপু শরের তীব্র আঘাতে নিয়ত জর্জ্জরিত, তথাপি তাঁহাকে

ধ্যান প্রণাম করা ত দূরের কথা তিনি যে আছেন এ বিশ্বাসই আমার নাই ; যদি আমি ভগবান্‌কে বিশ্বাসই করিতাম, তবে ভীষ্মদেবের মত বলিতাম যে—

"শরাভিঘাতাদ ব্যথিতং মনো মে মধুসূদন !
গাত্রাণি চাবসীদন্তি, ন চ বুদ্ধিঃ প্রসীদতি ॥
নচ মে প্রতিভা কাচিদস্তি কিঞ্চিৎ প্রভাষিতুম্।
পীড্যমানস্য গোবিন্দ ! বিষানল সমৈঃ শরৈঃ
বলং মে প্রজহাতীব, প্রাণাঃ সন্ত্বরয়ন্তি চ।
মর্ম্মাণি পরিতপ্যন্তি, ভ্রান্তচিত্ত স্তথাহহম্ ॥

* * * * *

সাধু মে ত্বং প্রসীদস্ব দশার্হকুল নন্দন !
তৎ ক্ষমস্ব মহাবাহো ! * * *
ন দিশঃ সম্প্রজানামি নাকাশং নচ মেদীনীম্।
কেবলং তব বীর্য্যেন তিষ্ঠামি মধুসূদন !"

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব—৫৩ অধ্যায়—৬—১১।

আহা একি অবস্থা ! ইহা কি আমি বুঝিতে পারি ? আহা ভীষ্মের মত মহাবীর জ্ঞানীভক্তও বলিতেছেন—"হে মধুসূদন ! শরাভিঘাতে আমার মন ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন, বুদ্ধি অপ্রসন্ন, প্রতিভা অস্তমিত, আমি কি বলিব ? হে গোবিন্দ ! বিষানল সমান শরাঘাতে আমার বল ও প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইতেছে, আমি ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছি। হে দশার্হকুলনন্দন তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি দিক আকাশ পৃথিবী কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হে মধুসূদন ! আমি কেবল তোমার বীর্য্যবলেই বাঁচিয়া রহিয়াছি।"

---

* জীবের এই অসহায় অবস্থার বর্ণনা শ্রুতি এই ভাবে করিয়াছেন—

তস্যহ এতস্য হৃদয়স্যাগ্রং
প্রদ্যোততে, তেন, প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি
চক্ষুসো বা মূর্দ্ধো বা অন্যেভো বা শরীর দেশেভ্যঃ ;
তমুৎক্রামন্ত ; প্রাণোহনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং
সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি……ইত্যাদি ॥"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।৪।৪।২।

সাময়িক শরশয্যায় ভীষ্মদেবের এই অবস্থা! আর আমি সতত সংসারশয্যা শায়িত অবস্থায় অসংখ্য রিপুশর তাড়িত! আমি ত বলিতেছি না—"মধুসূদন! আমার মন ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন, বুদ্ধি মলিন, প্রতিভা অস্তমিত!" আমি কি বলিতে পারি?" হে গোবিন্দ! ঐ রিপুশর আমার দেহে বিষের বিষমজ্বালা উপস্থিত করিয়াছে" আমার মর্ম্মে কোনরূপ দাহ নাই, আমি কেমন করিয়া বলিব—"হে দয়াময়! আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হও"। কিন্তু আমাকে আজ বলিতেই হইবে —

"তৎক্ষমস্ব"—(অপরাধ ক্ষমা কর)

"প্রসীদস্ব"—(প্রসন্ন হও)

আমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে—হে সর্ব্বশক্তিসম ভগবন্ তোমার বীর্য্যবলেই আমি জীবিত রহিয়াছি—

কেবলং তব বীর্য্যেণ
তিষ্ঠামি মধুসূদন!"

শ্রীভীষ্মের মত গভীর বিশ্বাসে ভগবৎপদে আত্মনিবেদন করিতে না পারিলে আমার গতি হইবে না. সাধুগণ! আশীর্ব্বাদ কর আমার যেন তাহাই হয়।

শ্রীশরৎ কমল স্মৃতিন্যায় সাংখ্যতীর্থ।

অভাব ও পূরণ।

প্রকৃতির নিয়ম—অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়; তবে পরিমাণ বা মাত্রার অনুপাতে অভাবের পূরণ। জড়জগতে এই অভাব ও পূরণ স্বভাবতঃ প্রত্যক্ষ হয়; যথা অত্যধিক উত্তাপের পরই বারিবর্ষণ হয়, বায়ুর অস্বাভাবিক স্থিরতার পরই প্রবল বায়ু বা ঝড় বহিয়া থাকে; অবিশ্রান্ত বর্ষার পরই উজ্জ্বল রবি-কর জগৎ উদ্ভাসিত করে; অমাবস্থার গাঢ় অন্ধকারের পরই সুস্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণের উদয় হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জীব-জগতে এই নিয়মের একটু পার্থক্য আছে। জড়-জগতে অভাবের পরিমাণ বা মাত্রার অনুপাতে, আর জীব-জগতে অভাবের অনুভূতির

পূরণের নিয়ম।

পরিমাণ বা মাত্রার অনুপাতে পূরণ হয়; কারণ জড়-জগতে অনুভবের পাত্র নাই, জীব-জগতে আছে। জীব-জগতে অভাবের অনুভূতিই উহার পূরণের কারণ হইয়া থাকে। পূরণের আগ্রহ, অনুভূতির পরিমাপক অর্থাৎ যে পরিমাণে পূরণের জন্য আগ্রহ হয় সেই পরিমাণে অনুভূতির মাত্রা বুঝা যায়; তবে অভাব ও তাহার পূরণের জন্য তদনুভূতিসৃষ্ট আগ্রহেরও সীমা নাই, পূরণেরও সীমা নাই; সুতরাং কোন কালেই অভাবপূর্ত্তির আগ্রহের ও পরিপূরণের পূর্ণতা অনুভূত হয় না।

জীবের প্রকৃত অভাব কি?

যদভাবে আত্মার পরিপুষ্টি অথবা তৃপ্তি বা সুখ বা আনন্দ লাভ হয় না তাহাই জীবের প্রকৃত অভাব বা দারিদ্র্য।

অভাবের ভ্রান্ত ধারণা ও তজ্জনিত দুঃখ ভোগ।

এই সুখ বা আনন্দ প্রত্যেক জীবেরই লক্ষ্য এবং উহা প্রাপ্তির জন্য একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জীবকে অস্থির ও পীড়িত করিতেছে। কিন্তু জীব এমনই এক আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়াছে যে শতবার আবর্ত্তনে ঘুরিয়াও তাহার ব্যাকুলতার পদার্থ অন্বেষণ করিয়া পাইতেছে না। ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছায় ধাবিত হইয়া মায়া-মৃগ-তৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইতেছে ও সুখরূপ সলিল ভ্রমে বিষয়-মরুর উত্তপ্ত বালুকার মধ্যে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। পিপাসার শান্তি না হওয়ায় পুনরায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। এই প্রকারে সৃষ্টির প্রভাত হইতে বহু জন্ম পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন পাদার্থেই সুখ বা আনন্দ পাইতেছে না, তখন বিষয়ের অতীত যাহা অতি মধুর, স্নিগ্ধ ও আনন্দের উৎস তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িয়া, সে প্রকৃত কোন্ দ্রব্যের কাঙ্গাল-তাহার অভাব বা দারিদ্র্য কি তাহা অনুভব করিবার সুকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রকৃত অভাবের অনুভূতির পরবর্ত্তী অবস্থা।

প্রকৃত অভাব বা দারিদ্র্যের অনুভূতির সহিত জীবের হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম-সুধাপানের তৃষ্ণা যতই বর্দ্ধিত হয়, বাঞ্ছা-কল্প-তরু প্রেমময় ভগবান ততই তাঁহার প্রেম-তুষার-বিগলিত হিমস্নিগ্ধ অমিয় প্রেম-বারি ধারায় জীবের তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিতে চান, কিন্তু চতুরালীর এমনি খেলা যে সুস্নিগ্ধ অমিয় প্রেম-ধারা যতই জীবের তৃষিত চিত্ত-রসনায় পতিত হয়, ততই তৃষার নিবৃত্তি না হইয়া

ঘৃতসংযোগে হোমাগ্নির ন্যায় উহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এবং তিনি আনন্দে তাঁহার অক্ষয় অমিয়ধারার উৎস খুলিয়া দেন। এইরূপে ক্রোড়স্থিত শিশুর মুখে প্রসূতির স্তনপ্রবাহিত পীযূষধারার ন্যায় ভগবান ও জীবের মধ্যে একটী ধারা প্রবাহিত হয়। ভূধর হইতে নিম্ন উপত্যকা ভূমির দিকে যেমন তুষার-বিগলিত ধারা স্রোতস্বিনী-রূপে প্রবাহিত হয়, তেমনই ভগবান হইতে অক্ষয় অমিয় ধারার স্রোত প্রবাহিনীর ন্যায় ভাসিয়া জীব-জগতের প্রেম-সমৃদ্ধি ও জীবন-সঞ্চার করিয়া থাকে। স্রোতস্বিনী যেমন তাহার উভয় উপকূলস্থিত বহুজনপদের লোক সঙ্ঘের পিপাসা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করিয়া থাকে, তেমনি একটী ভক্তের ধর্ম্ম-জীবনে ভগবানের যে পূত অমিয় প্রেম-ধারার নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয়, তাহাতে একটী সমাজের ধর্ম্ম-জীবন গঠন করিয়া বিষয় পিপাসার অবসাদ সাধন ও ভগবৎ প্রেম-পিপাসার উদ্দীপন ও পূরণ করিয়া থাকে।

বিরহ ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

প্রকৃত অনুভব করিলে বুঝা যায় প্রাপ্তি অপেক্ষা অথবা প্রাপ্তির পূর্ণতা অপেক্ষা প্রাপ্তির আশাযুক্ত অভাবই সুখের। মিলনের সুখ বিরহের দুখের অনুপাতে হইলেও প্রাপ্তি অপেক্ষা বিরহে প্রাপ্তির আশা অধিকতর সুখের বলিয়া মনে হয়। এরূপ হওয়ার কারণ, বিরহে অভিলষিতের প্রাপ্তিজন্য অভিলাষ ও তজ্জনিত আগ্রহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসহকারে চিত্ত-পটে অভি-লষিতের মূর্ত্তির ধ্যান হয়। ঐ ধ্যান যত সুখকর বলিয়া অনুভূত হয় তত উহা স্থায়ী হইয়া ধারণায় পরিণত হয় এবং পরে সেই অভিলষিতের রূপে ও প্রেমে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলে তন্ময়তা বা সমাধি জন্মে। কিন্তু সমাধিতে আত্মসত্তার জ্ঞান বা স্বতন্ত্র

প্রেমতত্ত্ব।

উপলব্ধি থাকে না; এজন্য ভক্তবাঞ্ছাকল্প-তরু প্রেমময় ভগবান তাঁহার প্রেমাভিলাষী ভক্তকে বিমল প্রেম-সুখ বা আনন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য একটু লুকোচুরি খেলেন ও মাঝে মাঝে ক্রোড়স্থিত শিশুর মুখ হইতে প্রসূতির স্তন-আকর্ষণের ন্যায়, একটু অন্তরালে থাকিয়া ভক্তের চিত্তপ্রবাহিতা প্রেম-তরঙ্গিণীর স্বচ্ছ সলিলে বিরহের ঝড় তুলিয়া প্রেমের তরঙ্গে তাঁহার মধুর মূর্ত্তিখানি

চঞ্চল ভাবে নাচাইয়া ভক্তকে নাচান। এই লুকোচুরিতেই বিরহ —বিরহে প্রেমের আতিশয্য। বিরহ উদ্দীপিত করিয়া, আগ্রহের মাত্রা বাড়াইয়া ব্রজগোপীকে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ করিবার মানসে রাসলীলায় ভগবানের সহসা অন্তর্দ্ধান। * এই লুকোচুরির ভগবান এই জন্য ভক্তের এত আদরের। আমার মনে হয় প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার শ্রীভগবানের সহিত মিলন অপেক্ষা বিরহই প্রেমরাজ্যের সম্পৎ। দুর্ব্বিসহ বিরহের আকুলিবিকুলিতে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী তরুলতাকে শ্যাম নটবরের নবজলধর মূর্ত্তি বলিয়া শ্রীমতীর আলিঙ্গন প্রভৃতি বিরহবিধুর সুমধুর ভাব, এই জন্য ভক্তের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যানের বিষয় হইয়াছে। বিরহ ছাড়িয়া দিলে ভক্তের প্রেম ও মাধুর্য্য আস্বাদনের আর কিছুই থাকে না। বিরহই প্রেমিকের সম্পৎ—বিরহের পথই প্রেমের পথ। বিরহ ও "সখী-সংবাদ," না থাকিলে ভক্তের চিত্ত-বিনোদন কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইত না।

* ব্রজগোপীর মনে ভগবৎপ্রাপ্তির অহঙ্কারের উদয়হেতু ভগবানের হঠাৎ অন্তর্দ্ধান যাহা পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা শ্লোকের শব্দগত ব্যাখ্যা হইলেও উহা শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধানের উদ্দেশ্যজ্ঞাপক বলিয়া মনে হয় না।

আত্মস্থ অবিচ্ছেদ্য শক্তি বা বৃত্তি নিচয় বাহ্যতঃ পৃথকভাবে মূর্ত্তিমতী করিয়া শ্রীভগবান লীলা সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব মূর্ত্তিমতী ভগবৎশক্তিতে অহঙ্কারের উদয় অস্বাভাবিক। মতান্তরে গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা; যখন তাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছিল এবং যখন তাঁহারা এমন কি ভগবানের স্পর্শসুখ পর্য্যন্ত অনুভব করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মনে অহঙ্কারের উদয় হওয়া দূরে থাক উহার কল্পনাও অসম্ভব; যেহেতু আলোক ও অন্ধকারের সমকালে একস্থানে স্থিতি অসম্ভব। মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম্মুখে তমোরাশির স্থিতি যদ্রূপ অসম্ভব শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ বিদ্যমানতায় ততোধিক তদীয় অঙ্গস্পর্শে ব্রজগোপীর মনে অহঙ্কারের উদয় তদ্রূপ অসম্ভব। অহঙ্কারের নাশ না হইলে যখন ভগবৎপ্রাপ্তি দূরের কথা তাঁহার ভজন সাধন পর্য্যন্ত হয় না তখন ভগবান যেখানে স্বয়ং মূর্ত্ত হইয়া বিদ্যমান সেখানে অহঙ্কারের স্থিতি কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস অমিয় ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন না। রাধা ভাবই ভক্তের এবং প্রেম-তীর্থের প্রত্যেক যাত্রীরই অনুসরণীয় পন্থা ও আদর্শ।

আচরণ দ্বারা প্রেমতত্ত্বের সাধনা

এই পন্থা দেখাইবার জন্য অর্থাৎ আচরণ করিয়া বুঝাইবার জন্য দীনবৎসল ভগবান, যখন দুর্ভাগ্য জগজ্জীব বিষয়াসক্তিসৃষ্ট মোহের আবরণে আপনাকে আপনি ঘিরিয়া ঘিরিয়া অবনতির অতলস্পর্শ স্তরে ডুবিতেছিল তখন, মানুষরূপে কাঙ্গালের ঠাকুর হইয়া আসিয়া নিজ সহচর প্রভু নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে জীবের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া তাহার দারিদ্র্য বা অভাবের অনুভূতি-পিপাসা জাগাইয়া পিপাসা নিবৃত্তির জন্য প্রেম-সুধা-সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে সাগরের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা শুষ্ককর্ম্ম-পঙ্কিল বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া বারিধিতটে জগন্নাথদেবের চরণস্পর্শে প্রেমে উচ্ছলিত হইয়া লবণাম্বুরাশিকেও সুধাসিক্ত করিয়াছিল, সেই সুধার আস্বাদন বুঝি বারিধি ভুলিতে পারে নাই, তাই আগ্রহের আবেগে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া এখনও জগন্নাথ-দেবের চরণে আসিয়া পতিত হয়। এই আগ্রহ জীবের শিক্ষার বিষয়। অভাবের অনুভূতিতে প্রাপ্তির জন্য অভিলাষ ও আগ্রহ আগ্রহেই পূরণ।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ।
কৈপুকুর লেন, শিবপুর।

শ্রীকিশোরীকুণ্ড ও শ্রীমদ্দাস গোস্বামী।

[শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ]

শ্রীরাধা গোকুল চন্দ্রের জয় হউক—শ্রীরাধামাধব যুগলিত তনু শ্রীগৌর সুন্দরের জয় হউক ও শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সুবলিত" শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বদ বৃন্দের জয় হউক, শ্রীবৃন্দারণ্য নিকুঞ্জ বিলাসিনী শ্রীরাধা কুণ্ডেশ্বরীর অপার অসীম অহৈতুকী করুণায় শ্রীবৃন্দাবনের মুকুটমণি সদৃশ শ্রীরাধাকুণ্ডে ক্ষণকালের জন্য যাদৃশ সর্ব্বথা অযোগ্য জীবের বাসের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। শ্রীকুঞ্জের মঞ্জুমহিমা ও বিপুল মাধুর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল উক্তি আছে সে বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু যাহা শাস্ত্র পাঠেও পাওয়া যায় না, কেবলই অহৈতুকী করুণা লভ্য সেইটী হইতেছে উক্ত মাধুর্য্য রস বোধ। উহা কোন শাস্ত্র যুক্তির মধ্যে নাই। কারণ শ্রীকুঞ্জের তত্ত্ব মাধুর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ ভূয়সঃ উল্লেখ দেখা যায় তাহার একবিন্দুও আমাদের মত প্রাকৃত দৃষ্টি সম্পন্ন সংসারী দৃষ্টির নয়নপথের পথিক হয় না। সেই কিরণের ঘটা—মানিকের ছটা—সেই মণিময় কল্প তরুতলে রতন বেদিকা—সেই প্রবাল মুক্তামণ্ডিত তটভূমি অথবা কেকা কলরব মুখরিত, কোকিল কাকলী কুজিত, ভ্রমর ঝঙ্কৃত, সরোজ সুরভি বাসন্তী মলয়ানীল সেবিত শ্রীকুণ্ডনীর তীরস্থ বাণীরকুঞ্জ—ইহার কিছুইত আমাদের চর্ম্মচক্ষে দৃষ্ট হয় না। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি—যাঁহারা এই সকল ধাম তত্ত্বালোচনা করিয়া হয়ত সুদীর্ঘ জীবন সমাপন করিয়াছেন তাঁহাদের চক্ষেও এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কণিকার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ইহা অতীব দুর্লভ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমলাশ্রিত শ্রীগৌড়িয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বর্ণিত ও সাক্ষাৎ অনুভূত সেই প্রেমানন্দ নিকেতনের—মহাভাবলোকের মহামাধুর্য্য যাহা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী স্পর্শ মণি অনুসন্ধানে বারাণসী হইতে আগত ব্রাহ্মণকে দেখাইয়াছিলেন কিম্বা যাহা শ্রীমদ্দাস গোস্বামী তদীয় "স্তবাবলী" বা মহাভাব স্পর্শমণির স্পর্শনে অফুরন্ত আবেগ, যাহা গীতাকারে বিগলিত হইয়া সংসার সন্তপ্ত মানবকে শীতল করিতেছে সেই গীতিকাব্যাবলীর মধ্যে বর্ণিত রম্য বৃন্দাবন ও "সুরভি রাধা কুণ্ড যাহা সন্দর্শন করিয়া ভাবের আতিশয্যে তিনি আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই ভাবের বৃন্দাবন ত দেখি না কিন্তু

দেখিনা বলিয়াই যে উহা নাই তাহা বলা যায় না, কারণ আমাদের দৃষ্টির গতি আর কত দূর? অনন্ত বিস্তৃত অসীম আকাশ ও অপার সাগরের বিপুল বিশালতার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাইনা কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দৃষ্টির বাহিরে যে কোন বস্তু নাই তাহা বলা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানাচার্য্যেরা বলেন যে এমন তারকা আছে যাহার আলোক এখনও এ জগতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধেই যখন এরূপ তখন অপ্রাকৃত বস্তু দর্শনের জন্য যে বিভিন্ন প্রকারের দৃক্‌শক্তির উন্মেষ প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। সেইজন্য শ্রীজীবগোস্বামীপাদ তদীয় "গোপাল চম্পূ" গ্রন্থের প্রথমে ধাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন "অদৃশ্যমতচক্ষুষা" ও শ্রীমদ্দাস গোস্বামীও শ্রীরাধামাধবের লীলা বিলাস দর্শন জন্য দিব্য দৃষ্টি ভিক্ষা করিয়াছেন যথা—

"সা ত্বং বিধাস্যসি নচেন্মমনেত্রদানম
কিং জীবিতেন মম দুঃখ দাবাগ্নিদেন।"

অর্থাৎ হে করুণাময়ী শ্রীরাধে, যদি তুমি তোমার লীলা দর্শনে আমাকে দিব্য দৃষ্টি দান না কর তাহা হইলে এই দুঃখ দাবানলপ্রদ জীবনে প্রয়োজন কি? যাহা হউক শ্রীরাধাকুণ্ডের অমৃত সলিল যাহা শ্রীভানুনন্দিনী ও তদীয় প্রিয় সখীবৃন্দের হস্তে খনন দ্বারা আবির্ভূত হইয়াছে ও যাহা সর্ব্ব তীর্থময় তাহার স্বরূপ ও মাধুর্য্য আমাদের দৃষ্টি গোচর না হইলেও বস্তুর শক্তি যেমন তর্ক অপেক্ষা করেনা, এইরূপে উপলব্ধি হয় যে যদি কোন জন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রীকুণ্ড সলিলে অবগাহন করেন ও শাস্ত্র বাক্যে আস্থা সম্পন্ন হন তবে কালে তাহার চিত্তবৃত্তির পরিমার্জ্জন ও ক্রমে প্রেমাবির্ভাব হইবেই। ইহা শ্রীপাদ গোস্বামিগণ বহু শাস্ত্রযুক্তি ও অনুভব সিদ্ধ প্রমাণদ্বারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু "আদৌ শ্রদ্ধা" আমাদের সেই খানেই ত্রুটী। প্রেম আবির্ভাবের ক্রম দেখাইতে গিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রথমেই শ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেম নবমতলে অবস্থান করে। ভাবের মহা অট্টালিকার ভিত্তিই হইতেছে শ্রদ্ধা। সেই শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নাই, সেইজন্য ভক্তি লাভ দুর্ঘট হয়। জ্ঞানলাভের পক্ষেও শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়াছেন যথা "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" কিন্তু আমাদের তাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলেও যাহারা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নেত্রে অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের চরণ আশ্রয় করিয়া তদ্ভাবে ভাবিত

হইলে বোধ হয় বস্তুর কিছু আস্বাদন হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রীকুণ্ড দর্শনে গমন করিলে প্রথমেই শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর কথা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেয়সী—প্রেয়সী সরসীতীরাশ্রয় পূর্ব্বক অতুল অশ্বৈর্য্য ও নিখিল আশা বিবর্জ্জিত হইয়া জীবনের শেষদিন অবধি—"প্রভুদত্ত" স্থানে কেমনভাবে তিনি শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর অপার করুণার দিকে চাহিয়া একনিষ্ঠচিত্তে শ্রীরাধামাধবের ভজন পরায়ণ ছিলেন ও রাগ যজ্ঞে ঋত্বিক রূপে মানবকে দুর্গম রাগবর্ত্মে প্রেরিত করিবার জন্যই যেন কৃপালোক বর্ষণ করিয়া নিজের অপাপবিদ্ধ জীবনকে প্রেম ভজনের আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, সেই কথাটাই হৃদয়ে প্রথমে জাগিয়া উঠে। কারণ জীবভাবে সাধকরূপে তাঁহার যে অসামান্য ভজন নিষ্ঠা ও অলৌকিক বিরাগপূত উৎকণ্ঠা বিহ্বলা ও আর্ত্তিময়ী প্রেমভক্তির উচ্ছাস যাহা বর্ষা বারির বিপুল বেগ পুষ্টা দুকুল প্লাবিনীতটিনীর মত সাগর সন্ধানে ছুটিয়াছে তাহা জগতে অতীব বিরল। যাঁহারা তাহার পূত জীবন চরিত আলোচনা করিবেন তাঁহারাই বোধ হয় অসঙ্কোচে মানিবেন যে ঈদৃশবিরাগী প্রেম ভজনাবতার জগতের ইতিহাসে প্রায়শঃই দৃষ্ট হয় না। তদীয় শ্রীস্তবাবলী নামক গ্রন্থে যে সকল কবিতা দৃষ্ট হয় তাহা ভাব-মাধুর্য্যে রস-গাম্ভীর্য্যে ভাষা-পারিপাট্যে ও আস্বাদন-প্রাচুর্য্যে পূর্ণ। যাঁহারা কেবল সাহিত্যের দিক দিয়াও আলোচনা করিবেন তাঁহারাও নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন না। শ্রীবিলাপ কুসুমাঞ্জলী, প্রার্থনামৃত, প্রেমাম্ভোজ স্তবরাজ, উৎকণ্ঠাদশক অভীষ্ট প্রার্থনা ষ্টক, প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশক শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু প্রভৃতি স্তবসমূহ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীপাদ তাঁহার নিভৃত হৃদয় কুঞ্জ হইতে বিলাপ কুসুম চয়ন করিয়া নিবিড় নয়ননীর-সিঞ্চন করতঃ প্রীতি সূত্রে যে মালা গ্রন্থন করিয়া তদীয় হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধিকাচরণে অর্পণ করিয়াছেন তাহা জগতের সাহিত্য ক্ষেত্রে ছন্দে, পদলালিত্যে, প্রসাদগুণে ও উপমা অলঙ্কারে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। এরূপ প্রগাঢ় লালসাময়ী দৈন্যাত্মিকা প্রার্থনা, এরূপ বিরহের জ্বালাময়ী উদ্দাম উচ্ছাস সংস্কৃত সাহিত্যে অতীব বিরল। শ্রীব্রজ বিলাস স্তবে তিনি শ্রীব্রজপরিকর হইতে আরম্ভ করিয়া তত্রস্থ তরুলতা নদী নদ পর্ব্বত প্রভৃতি সকলের নিকট পরমভক্ত সাধকোচিত ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য রোগ শোক অপনোদনপূর্ব্বক শ্রীব্রজরাজকুমার যেন তদীয় ভজনে নিযুক্ত করেন এইজন্য আর্ত্তিপূর্ণ ভাষায় বিজ্ঞাপন করিতেছেন

কিন্তু শ্রীবিলাপ কুসুমাঞ্জলিতে সিদ্ধ দেহাভিনিবেশ নিবন্ধন তিনি যেন স্বীয় প্রাণেশ্বরীর জন্য "বিরহদহ্যমানা" তরুণী সেবিকার মত ব্যাকুলা—নিরীক্ষণামৃত দানে তদীয় বিগাঢ় বিরহ-সন্তপ্ত জীবনকে শিশিরীকৃত করিতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। দেহজাত বিলাপ এখানে বিলাপিত। এখানে যে শোক তাহা দেহ জন্য নহে কিন্তু প্রিয়তম বস্তু দর্শনাভাব নিবন্ধন; যাহা চলচপলার চকিত চমকের মত তাঁহার বিরহ ঘনাবৃত হৃদয়াকাশে স্ফুরিত হইতে না হইতেই মিলাইয়া যাইতেছিল যে বিদ্যুদ্দাম কান্তিময়ী লীলাময়ী দেবী তদীয় হৃদয়কুঞ্জে সহসা আবির্ভূত হইয়াই অন্তর্হিতা হইতেছিলেন, তাঁহাকেই চিরতরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুল। ইহাই দেবদুর্লভ নিবিড় নৈরাশ্য যাহা পাশ্চত্য কবিরা Devine discontent বা melancholy রূপে আখ্যা দিয়া দুঃখের চরম বিলাস দেখাইয়া সাহিত্য ভাণ্ডার রত্নে পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ দেখিতেছেন "শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠম্" বিরহিনীর নয়নে সকল জগতই শূন্যময় প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক। সকল দিক পূর্ণ হইলেও তাহার পক্ষে শূন্য। সে রিক্ততা কোন প্রাকৃত দ্রব্য দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে না। তাই কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

"শূন ভেল নগরী, শূন ভেল সগরী" (সকলি)

তিনি হৃদয়ের দেবীর সন্দর্শন বিনা এক মুহূর্ত্তও যেন জীবন ধারণ করিতে পারিতেছেন না। তাই আর্ত্তিভরে প্রার্থনা করিতেছেন।

"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞেয় দেবিত্বং নয়মাং চরণান্তিকে"।

অর্থাৎ হে দেবি! আমি তোমারই, অন্যের নহে। এই কথা জানিয়া আমাকে তোমার চরণসরোজে স্থান দাও। আহা! ইহাই প্রকৃত আর্ত্তি। মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণায়, রোগে, শোকে, শীতাতপে কাতর হয় কিন্তু সে কাতরতা কতক্ষণ স্থায়ী, অল্প বস্তুর জন্য কাতর হইলে অল্প বা খণ্ডিত বস্তু লাভেই শান্ত হওয়া যায় কিন্তু যে কাতরতা জাগিলে আহার নিদ্রা ভোগ সুখ অনায়াসেই ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রও তরুতল আশ্রয় করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন, যে বিশাল কাতরতা অখণ্ড বা ভূমা বস্তু লাভ জন্য তাহা তৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দূরীভূত হয় না। যে আর্ত্তির জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুও জীব শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন "হেন আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা" সেই আর্ত্তির সিন্ধু স্বয়ং

বিপ্রলম্ভ রসঘন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী যেরূপ শ্রীগম্ভীরা মন্দিরে দেখিয়াছেন ও তদীয় 'দ্বিতীয় স্বরূপ' গোস্বামী স্বরূপের মধ্য দিয়া যেরূপে শ্রীমৎ রঘুনাথের মধ্যে কৃপা সঞ্চারিত হইয়াছে সেইরূপেই তাঁহার ভজন জীবন গঠিত হইয়াছে, সেইরূপ ভাবচ্ছবিই তদীয় হৃদয় সরসিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা শ্রীপাদ মুক্তকণ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গস্তব কল্পতরু স্তবে স্বীকার করিয়া অতি দৈন্য সহকারে বলেন—

যো মাং দুস্তরগেহ নির্জ্জল মহা কূপাদপার ক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ

অর্থাৎ যিনি আমাকে গৃহরূপময়কূপ হইতে কৃপারজ্জুদ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন সেই চৈতন্যদেবকে ভজনা করি। মহা সম্পদ্দাবাদপি মুদ্ধৃত্য কৃপয়া স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনপি মাং ন্যস্যমুদিতঃ উরোগুঞ্জাহারম প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন শিলাং দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ান্মাং মদয়তি। অর্থাৎ পতিত এবং কুৎসিত জন আমাকে যিনি কৃপাদ্বারা মহৎ সম্পদরূপ দাবানল হইতে উদ্ধার করতঃ স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছেন এবং যিনি প্রিয়রূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষস্থলে গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা দান করিয়াছেন সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। আবার শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকট কাতর হইয়া জানাইতেছেন।

"হে শ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়া প্রিয়মতীব তয়োরীতি মাং
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাং।
"মম বিরহ হতাধা প্রাণ রক্ষাং কুরুস্ব।"

অর্থাৎ হে শ্রীকুণ্ড! তোমার মধ্যে শ্রীরাধিকা তদীয় প্রিয়তমের সহিত আনন্দে ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি যদি তাহার অতিশয় প্রিয় হও তাহা হইলে বিরহ কাতর আমার জীবন স্বরূপ তাঁহাকে দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। মণি মুকুতা মালা বিনিন্দিত বিলাপ মালায় শ্রীগ্রন্থখানি এই প্রকার সমলঙ্কৃতা। এই শ্রীকুণ্ড ত্যাগ করিয়া শ্রীমৎ রঘুনাথ কোথাও গমন করেন নাই। তাঁহার জীবনে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় ছিল যে শেষ দিন অবধি শ্রীগিরি গোবর্দ্ধনের কোমল

ক্রোড়ে ব্রজে জাত ফল মূল ও তর্কাদি সেবা করিয়া এই স্থানেই দেহ রক্ষা করিবেন। তাই বলেছেন ;—

"স কুণ্ডমতব লোলাক্ষি স্ব প্রিয়য়া সদাস্পরম।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতি।"

অর্থাৎ হে চঞ্চল নয়নে শ্রীরাধে! এই রাধাকুণ্ড তোমার প্রাণবল্লভ ব্রজরাজ নন্দনের নিত্য বিহার স্থান। অতএব এই কুণ্ড তীরে আমার নিত্য নিবাস ও স্থিতি হউক। পুনরায় বলিতেছেন,—

"কৃপাঞ্চেন্নযোবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তদা
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকলমঙ্গং নিবসতি" ॥

অর্থাৎ যদি রাধামাধব কৃপা না করেন তবে হে রূপমঞ্জরি তুমি এরূপ কর, যেন শ্রীকুণ্ডে আমার সকল অঙ্গ বাস করে অর্থাৎ দেহত্যাগ হয়। এই বহুদিন সঞ্চিত আশা লতিকা শ্রীরাধা রাণীর করুণামৃত সিঞ্চনে সঞ্জীবিতা হইয়া কালে ফলবতী হইয়াছিল। অনেক কবিতার মধ্যেই শ্রীপাদের সাধক ও সিদ্ধ দেহোচিত উৎকণ্ঠা ও লালসার উদ্গম দেখা যায়। সাধক দশায় প্রার্থনা করিতে করিতে যেন অন্তর্মনে নিত্য সিদ্ধ ভাব দেহের স্ফুর্তি নিবন্ধন আপনাকে শ্রীব্রজপরিকরভুক্ত জ্ঞানে সাক্ষাৎ শ্রীরাধামাধবের লীলা বিলাস মানসনয়নে সন্দর্শন করিতেছেন ও তদীয় রাগমার্গ গুরু শ্রীরূপমঞ্জরীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

"তমালস্য ক্রোড়ে স্থিত কণক জ্যোতিঃ প্রবিলসৎ
প্রসূণাং লোলালিং সখি কলয় বন্ধ্যাং চিরমিমাং
তিরস্কর্ত্তুং মেঘ দ্যুতি মঘভিদোঽঙ্কে স্থিত চল
দৃশং স্মেরাং রাধাং তড়িদতি রুচিং স্মারয়তি যা॥

অর্থাৎ হে সখি রূপমঞ্জরী! প্রসূন সমূহ বিলসিত চঞ্চল অলিকুল শোভিত তমাল ক্রোড়ে কণক জ্যোতিকে দর্শন কর। যেহেতু এই স্বর্ণ জ্যোতি সান্দ্র পয়োদ তিরস্কারী শ্যামসুন্দরের অঙ্কস্থিতা চঞ্চল মৃগনয়না সোহাগস্মিতা শ্রীরাধাকে স্মরণ করাইতেছেন।

কিরূপ তীব্র আকাঙ্খায় ও লৌল্যবাসিত হৃদয় হইয়া তিনি শ্রীযুগল-কিশোরের দর্শন লাভ করিতে বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ধ্যাননিমজ্জিত যোগীর মত রমনীয়। যথা—

"চকোরীব জ্যোৎস্নাক্তৃত মমৃতরশ্মিং স্থিততড়ি-
দৃতম দিব্যাম্বোদম নবমিব রটচ্ছাতক বধূঃ
তমালং ভৃঙ্গীবোত্তত রুচি কদা স্বর্ণ লতিকা
শ্রিতাং রাধাশ্লিষ্টং হরিমিহ দৃগেষা ভজে॥"

অর্থাৎ চকোরী যেমন চন্দ্রিকাযুক্ত চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে, অচলা চপলা সম্বলিত মনোহর নব জলধরকে শব্দায়মান চাতকী যেমন আলিঙ্গন করে, এবং ভ্রমরী যেমন সমুদিত কান্তি ও স্বর্ণলতিকাশ্রিত তমালকে আলিঙ্গন করে সেইরূপ রাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে কবে আমার দুনয়ন দর্শন করিবে। পুনরায় বলিতেছেন—

"মধু মধুর নিশায়াং জ্যোতিরুদ্ভাসিতায়াং
সিত কুসুম সুবাসঃ কণ্প্ত কর্পূর ভূষা
সুবলসখমুপেতা দূতিকাঙ্গস্ত হস্তা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রসান্দয়ত্বং॥"

অর্থাৎ হে রাধিকে জ্যোৎস্না পুলকিত সুমধুর বাসন্তী রজনীতে শুভ্র কুসুম তুল্য বস্ত্র ও অঙ্গে কর্পূর ভূষা লেপন করিয়া সুবল সখার অনুগামিনীও বৃন্দাদূতীর স্কন্ধে হস্ত ক্ষেপন করিয়া জ্যোৎস্না অভিসারকালে স্বীয় দর্শন দান দ্বারা ক্ষণকালও আমার নেত্রের আনন্দ বিধান কর। অন্যস্থানে বলিতেছেন—

"কদা শুভ্রে তস্মিন্ পুলিনবলয়ে রাসমহসা
সুবর্ণাঙ্গী সঙ্ঘেঽহমহমিকা মত্তমতিষু
হরৌ যাতে নীলোপল নিকষতাং জিষ্বরগুণা
দগুণাদস্মান্ দিব্য দ্রবিনমিব রাধা মদয়তি।"

অর্থাৎ নির্ম্মল যমুনা পুলিনে শ্রীরাসমণ্ডলে সকল সুবর্ণাঙ্গী গোপীগণ "আমিই সুন্দরী আর কেহই নহে" এইরূপে রাস সৌন্দর্য্যে উন্মত্তচিত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের নীল নলিননিভ অঙ্গ নিকষ পাষাণ (স্বর্ণ পরিক্ষিত হয় যাহাতে) স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ স্বর্ণ পরীক্ষক যেরূপ নিকষ পাষাণে সুবর্ণ পরীক্ষা করিয়া

যেটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতেই অনুরক্ত হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গরূপ নিকষ পাষাণ দ্বারা স্বর্ণাঙ্গী গোপীগণকে আলিঙ্গন করিয়া যে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধিকার উৎকৃষ্ট বুদ্ধিহেতু আসক্ত হইয়াছেন সেই ব্রজ-রমণী-মুকুট মণি কবে আমাকে আনন্দিত করিবেন। এস্থলে কি শব্দালঙ্কার কি অর্থালঙ্কার কি পদলালিত্যে কি ভাবমাধুর্য্যে সকলদিক দিয়াই কবিত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী প্রকটিত হইয়াছে। এত বিরহ বেদনা, এত ভাব আতিশয্য ভাষা স্থানে স্থানে যেন তাহা বহন করিতে অসমর্থ। যথা—

"উদ্দামনর্ম্মরসকেলি বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধামুকুন্দ যুগলং ললিতা বিশাখে
গৌরাঙ্গ চন্দ্রমিহরূপ যুগং ন পশ্যন্
হা-বেদনা কতিসাহে স্ফুটরে ললাটঃ।"

অর্থাৎ শ্রীরাধামাধব ললিতা বিশাখা গৌরাঙ্গচন্দ্র, রূপ, সনাতনকে না দেখিয়া আর কত বেদনা সহ্য করিব ইত্যাদি। ইহা সাধক দশোচিত প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা। তাহার পরক্ষণেই অন্তর্মনে লীলা বিশেষ অনুভব করিয়া শ্রীরূপমঞ্জরীকে বলিতেছেন,—

"রচয়তি হরিবারাদ দৃগ্বিভঙ্গেন নব্যাং
রবিরিব কমলীন্যা পুষ্পকান্তি করেণ।"

অর্থাৎ সূর্য্য যেমন কিরণ দ্বারা কমলিনীর কান্তি প্রকাশ করে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে নয়ন ভঙ্গীদ্বারা শ্রীরাধার বদনকমলে মৃদুহাস্য বিকশিত করিতেছেন। পুনশ্চ

"উপগিরি গিরিধর্ত্তুঃ সুস্মিতে বক্ত্রবিম্বে
ভ্রমতি নিভৃত রাধানেত্র ভঙ্গী ছলেন
অতি তৃষিত চকোরী লালসেবাম্বুদস্যো
পরি শশিনি সুধাঢ্যো মধ্য আকাশদেশং"

অর্থাৎ হে রূপমঞ্জরী যেমন আকাশে মেঘের উপর সুধাপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে অতি তৃষাতুরা চকোরীর লালসা ধাবিত হয় সেইরূপ শ্রীগোবর্দ্ধনগিরি সমীপে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর হাস্যসুধা পূর্ণবদন-চন্দ্র বিম্বে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরাধা চকোরী নেত্র ভঙ্গিমা ছলে ভ্রমণ করিতেছেন। এইরূপ ভাব ও ভাষায় শ্রীস্তবাবলী

গ্রন্থখানি পূর্ণ। বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থখানির অন্যান্য স্থান উদ্ধৃত হইল না। কেবলমাত্র শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাহ্য দেহানুসন্ধান শূন্য হইয়া কিরূপভাবে ব্রজলীলা রসসিন্ধুতে মগ্ন থাকিতেন ও ব্রজরস বর্ণনে কিরূপ তিনি সিদ্ধহস্ত তাহা দেখাইবার জন্য কয়েকস্থান হইতে অতি অল্পসংখ্যক কবিতা উদ্ধৃত হইল। ব্রজরসের উপাসনা কেবল ভক্ত দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেইজন্য রাগানুগামার্গী সাধককে কতখানি দেহগেহ বিস্মৃত হইয়া আপনার স্বরূপোন্মেষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিরন্তর একান্ত মনে শ্রীবৃন্দাবনে আলি বেষ্টিত শ্রীরাধামাধবের ও অনুগম্যমানা সখীর কথারত হইয়া লীলা স্মরণ করিতে হইবে, তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। অনেকের ধারণা যে রাগমার্গে বিধিমার্গের ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয় না। কিন্তু গোস্বামী-পাদগণের মত তাহা নহে। যদিও রাগোৎপত্তির কারণ হইতেছে কেবলই ব্রজভাবে লোভ বা রুচি কিন্তু তাহা হইলেও শাস্ত্রাদির অপেক্ষা আছে কারণ শাস্ত্রে যে প্রকার ব্রজবাসীগণের রাগের আতিশয্য দেখা যায় তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। বিধিমার্গে ও রাগমার্গে প্রভেদ এই যে, শ্রবণকীর্ত্তনাদি বৈধি ভক্তিতে শাস্ত্র শাসন ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহাই রাগমার্গে রাগ প্রেরিত হইয়া অনুষ্ঠেয়। রাগ মনোধর্ম্ম বলিয়া রাগমার্গে স্মরণের প্রাধান্য হইলেও উহা যুগধর্ম্ম শ্রীনাম কীর্ত্তনাধীন।

যে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এই আনন্দলীলা নিকেতনে শ্রীযুগল—কিশোরের লীলামাধুর্য্যে অবগাহন করিতেছেন তিনিই কিন্তু সাধক দশায় পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত—ভজনের নিয়মাবলীর কিছুমাত্র ত্রুটী বা পরিবর্ত্তন নাই। তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলেন—"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।" যিনি কুসুম কোমলা প্রেমভক্তির নির্ঝরিণী, তিনিই আবার ভজন বিষয়ে সুমেরুবৎ সুকঠোর। এইরূপে তাঁহার জীবন রাগানুগা সাধকের সর্ব্বথা আদর্শ ও অনুকরনীয় হইয়াছে, শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর স্বরূপালোচনা করিতে যাইলে দেখা যায় যিনি শ্রীব্রজলীলার রতিমঞ্জরী তিনিই গৌরলীলার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসহায় অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে শ্রীমৎ রঘুনাথ, সুতরাং সেদিক দিয়া দেখিলে তাহার পক্ষে ঈদৃশ বিলাস বৈভব আহার নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকুঞ্জে কেবলই 'কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন আশ্চর্য্যজনক নহে। কিন্তু তাঁহার ঈদৃশ জীবন দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর জগতে রাগানুগা সাধনের স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ বৈরাগ্যপূতা প্রেমভক্তি আপনি আচরণ করিয়া যিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন সেই

মন্মহাপ্রভুর পার্ষদ সকল দেশে সকল কালে শ্রদ্ধার পাত্র। ঈদৃশ মহাপুরুষ যে দেশেও যে কালে আবির্ভূত হন কেবল তদানীন্তন সেই দেশ কাল যে তদীয় শিক্ষা ও জীবন দ্বারা গৌরবান্বিত হয় তাহা নহে, তাঁহার সমুদ্রকোটী গম্ভীর জীবন মাহাত্ম্য ও ভজন পারিপাট্য সুদূর ভবিষ্যতে মানব সমাজকে আশার আলোকে প্রদীপ্ত করিয়া ভজনমার্গে উন্নত করে।

শ্রীকিশোরীকুণ্ড তীরস্থ তদীয় ভজন কুটীরে যদিও আর কেহ তাঁহার নয়ন-নীহারসিক্ত বিরহাতাপতপ্ত পরিম্লদিত বদন-কমল দর্শন করিতে বা বীণাবিনিন্দিত করুণ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিতে পাইবে না; যে বিরহানল তদীয় হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল তাহা মিলনোচ্ছ্বাসে নির্ব্বাপিত হইয়াছে ও বিরত বিলাপ আর্ত্তি চিরতরে মিলনানন্দে বিলীন হইয়াছে কারণ শ্রীমদ্দাস গোস্বামী নিত্য লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কৃপা ও ভাব প্রেরিত অক্ষর সমূহ শ্রীগ্রন্থাকারে অশেষ কল্যাণ বিধানার্থ জগতে বিদ্যমান আছেন। শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে গ্রন্থ সঙ্গ দ্বারাও অনেক উপকার আশা করা যায়। তদীয় সমাধি মন্দিরে এখনও ভক্তগণ ভক্তিঅশ্রু অর্ঘ্য প্রদান করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড তটাশ্রয়ী, বিরত সকল কর্ম্মী, সেই রাগ ভজন বীর—সেই রাজপুত্র ভিখারীর চরণে কোটি কোটি নমস্কার। হিমালয়ের শিখরের মত যাঁহার জীবন উচ্চাদর্শে গঠিত সেই অত্যুচ্চ প্রদেশে জীবের গমনোপায় নাই কিন্তু নিম্ন হইতে বিস্ময় বিহ্বল হইয়া সসম্ভ্রমে তদীয় শ্রীচরণারবিন্দে ভক্তিঅশ্রু ধৌত ভাব কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করা যাইতে পারে। তিনি আমাদের দুর্গমরাগ-ভজন পথে কৃপালোক বর্ষণ করিয়া প্রকৃত পথপ্রদর্শকরূপে সহায় হউন ইহাই শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা ও অভিলাষ।

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

একদিন প্রাতে সাধুবাবার নিকট গিয়া বসিলে তিনি একটী গল্প বলিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। গল্পটীর তাৎপর্য্য এই যে ভগবান কৃপা করিয়া যাহা আমাদের দান করেন তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা না করিলে কিম্বা তাহার অসদ্ব্যবহার করিলে তিনি তাহা পুনরায় আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। আমরা যতই তাঁহার দানের মর্য্যাদা বুঝিয়া সদ্ব্যবহার করিব তিনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তত মুক্তহস্ত হইবেন। যদি তাঁহার দত্ত দানের অপব্যবহার দেখেন, তবে তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন এই বিষয় উদাহরণ দিয়া তিনি সেদিন যে গল্পটী বলিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—

এক স্থানে একজন খুব বড় রাজা ছিলেন। একদা তিনি বহু লোকজন সমভিব্যাহারে এক অরণ্যের মধ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে বন্য জন্তুর অনুসরণে বহুদূর আসিয়া পড়ায় সঙ্গী হারা হইয়া পড়িলেন। এদিকে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে রাজা অতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে জলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নিকটে কোন জলাশয় না থাকায় রাজা যখন পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সময় দূরে কাঠুরিয়ার কাট কাটিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। শব্দ অনুসরণ করিয়া রাজা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও কাঠুরিয়ার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। নিকটে কোন পুষ্করিণী না থাকায় সে ব্যক্তিও বহু দূর হইতে নিজের জন্য কিছু পানীয় জল আনিয়াছিল। রাজার ব্যাকুল প্রার্থনায় সে ব্যক্তি সেই জলটুকু রাজাকে পান করিতে দিল। রাজা জল পান করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইলেন। রাজা ঐ ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ায় তাহাকে পুরস্কার দিবার ইচ্ছায় তাহার ঠিকানা জানিয়া লইলেন। এদিকে রাজার সঙ্গিগণ অন্বেষণ করিতে করিতে রাজার নিকট আসিলে তিনি তাহাদের সহিত রাজবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কয়েক দিন পর রাজা ঐ কাঠুরিয়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার অতি প্রিয় চন্দন বৃক্ষের বাগানখানি ঐ ব্যক্তিকে উপহার দিলেন। বহু দিন পর রাজার একবার ইচ্ছা হইল যে তাঁহার ঐ অতি সুন্দর প্রিয় বাগানখানি গিয়া দেখিয়া আসিবেন। তিনি মনে করিলেন, নিশ্চয়ই ঐ

ব্যক্তিটী আরও নূতন নূতন বৃক্ষ রোপণ করিয়া এবং পুরাতন বৃক্ষগুলিরও যত্ন করিয়া বাগানখানির অধিক শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু রাজা বাগানে উপস্থিত হইয়া বাগানের অবস্থা দর্শনে একেবারে হতাশ ও মহা দুঃখিত হইলেন; কারণ বাগানের শ্রীবৃদ্ধি দূরের কথা ঐ ব্যক্তির অযত্নে ও অমনোযোগে বাগানে প্রচুর জঙ্গল হইয়াছে এবং অনেক বৃক্ষ জল সেচন অভাবে মরিয়া গিয়াছে। আর রাজা দেখিলেন ঐ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সুন্দর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চন্দন বৃক্ষগুলি কাটিয়া পোড়াইয়া কয়লা প্রস্তুত করিয়াছে। সেইজন্য বাগানের স্থানে স্থানে কয়লার স্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার অতি প্রিয় বাগানখানির এইরূপ দুরবস্থা দৃষ্টে রাজা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন; তিনি বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বাগানখানি কাড়িয়া লইতে আদেশ দিলেন।

এই কাহিনীর মর্ম্ম এই যে যদি আমরা তাঁহার দত্ত দানের এইরূপ অসদ্ব্যবহার করি তবে তিনিও হাত গুটাইয়া লইবেন। তিনি যাহা কৃপা করিয়া আমাদের দান করিয়াছেন তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার জানা চাই। যত্নপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া উহা উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা চাই। এ বিষয়ে অমনোযোগী হইলে বা যত্নের অভাব হইলে তিনি অনুপযুক্ত পাত্রের নিকট হইতে দান কাড়িয়া লইতে পারেন।

এই যে স্বাস্থ্য, অর্থ, সম্পত্তি, রাজ্য, ক্ষমতা বা কোন প্রকার শক্তি এ সকলই তাঁহার প্রদত্ত গচ্ছিত দান মনে করিয়া এ সকলের উপযুক্ত মত সদ্ব্যবহার করা উচিত ও বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ত্রুটী হইলে তাঁহার এই সব মহৎ দান হইতে আমরা বঞ্চিত হইতে পারি। পূর্ব্বকালে রাজর্ষিগণও এইরূপ ভাবে রাজ্য রক্ষা ও প্রয়োজন মত মমত্ব বুদ্ধিবিহীন হইয়া তজ্জন্য যুদ্ধবিগ্রহাদিও করিয়া গিয়াছেন।

একদিন দ্বিপ্রহরের পর সাধুবাবার নিকট কৈলাসপাহাড়ে গেলে তিনি আমাদের নিকট রাজা, শিখীধ্বজ ও জীবন্মুক্তা রাণী চুড়ালার গল্পটী বলিয়া শুনাইয়াছিলেন। পরমধার্ম্মিকা রাণী জীবন্মুক্তা অবস্থা লাভের জন্য বহুদিন ধরিয়া তপস্যা করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তাঁহারই বৈরাগ্যমূলক বাক্যে রাজার অন্তরে তপস্যার বাসনা জাগিল ও তিনি তপস্যার্থে রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন এবং বহুদিন ধরিয়া শত সাধনা করিয়া মনে করিলেন তিনি সর্ব্বস্ব

ত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন ও সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ ত্যাগ করায় এবং বহুদিবসাবধি সাধনা করায় এখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ছদ্মবেশধারী "কুম্ভ"-রূপী রাণী চূড়ালা তখনও রাজাকে বলিতেছেন, "হে রাজন্, এখনও তোমার সর্ব্বত্যাগ হয় নাই।" কুম্ভবেশধারী রাণীর বাক্যে রাজা শিখীধ্বজ মহাআশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন ও তাঁহার বসিবার একমাত্র আসন খানি, জপমালা, কমণ্ডলুটি ও কয়েকটী ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিতে গেলেন। তখন কুম্ভরূপধারী রাণী চূড়ালা বলিলেন, "বাহিরের এসকল বস্তু অগ্নিসাৎ করিলে সর্ব্বত্যাগ হয় না, ভিতরের অহং অভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগই যথার্থ সর্ব্বত্যাগ।" শিক্ষক কুম্ভের এবম্প্রকার বাক্যে রাজা শিখীধ্বজ তখন আরও অধিক কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রাজা যখন বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ কঠোর তপস্যায় রত থাকিবার পর সম্পূর্ণ বাহ্য জ্ঞানহীন হইয়া প্রায় সমাধি অবস্থা লাভ করিলেন, তখনও কুম্ভ ধ্যানস্থ হইয়া দেখিতেছেন, এখনও রাজার সম্পূর্ণ শিক্ষার চরম হয় নাই। কারণ রাজার অন্তরে এখনও সত্ত্বগুণ লেশ রহিয়াছে; ত্রিগুণাতীত অবস্থায় রাজা এখনও পৌছান নাই। রাণী তখন কোন বিশেষ ক্রিয়া দ্বারা রাজার বাহ্য চৈতন্যের সঞ্চার করিলেন এবং আরও কিছুদিন বিশেষরূপ সাধনার পর যখন বুঝিলেন রাজার এখন সম্পূর্ণ আমিত্ব বুদ্ধি লোপ হইয়াছে ও সর্ব্বরূপে উপযুক্ত হইয়া এতদিনে রাজার দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে তখন রাজাকে আরও অশেষবিধ কঠিন পরীক্ষান্তে রাণী কুম্ভরূপ ত্যাগ করিয়া নিজে আত্ম-প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন, "হ'লে আত্মদৃষ্টি, সুধাপূর্ণ সৃষ্টি, চূর্ণ গর্ব্ব অহঙ্কার।" রাজন্! এইবার চল উভয়ে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া অবশিষ্ট রাজ্যের প্রতি যাহা আমাদের কর্ত্তব্য আছে তাহা নির্ব্বাহ করি, কারণ বন এবং রাজধানী এখন উভয়ই আমাদের নিকট তুল্য হইয়া গিয়াছে এখন রাজপ্রাসাদে বাস করিলেও আমাদের আর কোন আশঙ্কা নাই। বিশেষরূপ সাধনার ফলে তখন রাজা এবং রাণী উভয়েই জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন রাজা এবং রাণী রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া আমিত্ব বুদ্ধিবিহীন যাহা কর্ম্ম ছিল তাহা সানন্দে সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া যথাকালে উভয়ে সমাধি যোগে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্বার্থবুদ্ধি থাকে ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত কর্ম্মের অধিকার জন্মে না। নিঃস্বার্থ অবস্থায় তবে প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভ হয়, কারণ স্বার্থপূর্ণ ব্যক্তিগণ দ্বারা কখনও জগতের প্রকৃত কল্যাণকর কোন মহৎ

কর্ম্ম তাদৃশভাবে আচরিত হওয়া সম্ভবপর হয় না এবং তাঁহারা আমিত্ব বুদ্ধি-যুক্ত থাকায় নিঃস্বার্থভাবে মঙ্গলজনক কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাদি সুসম্পন্ন করিতে পারে না।

এই গল্পটী করিয়া সাধুবাবা তাহার মর্ম্ম বুঝাইলেন যে তৃষা ও আমিত্ব ত্যাগ না হইলে কেহই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না এবং আমিত্ব অভিমান ত্যাগই হইল সর্ব্বত্যাগ।

মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে সুধাকর কৃত "চূড়ালা চরিতামৃত" পুস্তকখানি আমি পড়িয়াছিলাম, কাজেই সাধুবাবার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের বিষয় কিছু কিছু বলিতে-ছিলাম, শুনিয়া সাধুবাবা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি ত মা, দেখিতেছি এ গল্প জানেনই।" এইরূপ গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল ও বড় আনন্দে সময় অতিবাহিত হইতেছিল কিন্তু আমাদের কনিষ্ঠা কন্যাটী পিপাসার্ত্ত হওয়ায় বাড়ী আসিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল। সাধুবাবা তাহা জানিতে পারিয়া সাগ্রহে পানীয় জল দিতে চাহিলেন। সাধুবাবার পানীয় জল রাখিবার প্রণালী বড় চমৎকার তাঁহার গৃহখানির অদূরে একটি খড়ের চালযুক্ত মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাহার উপর তিন চারিটী মাটির কুঁজা ভরিয়া নিকটস্থ কুতনিয়া নদী হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করাইয়া আনিয়া কুঁজার মুখগুলি সমস্ত কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। উহার উপরটী মাত্র খড়ের চালদ্বারা আবৃত, আর চতুর্দ্দিকে খোলা থাকায় কুঁজাগুলির গাত্রে অবাধে রৌদ্র বাতাস লাগে, তাহাতে জল বেশ ভাল ও শীতল থাকে। কিন্তু ইহাঁকে আমাদের জন্য অনর্থক ব্যস্ত হইতে দেওয়া সঙ্গত নয় মনে করিয়া যখন আমরা বাড়ীতেই যাই বলিয়া উঠিলাম তখন সাধুবাবা স্বয়ং উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন ও "চিত্তরঞ্জন" নামক তাঁহারই স্বহস্তে প্রস্তুত এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল রঙের কয়েকটী বটিকা বাহির করিয়া আনিয়া আমাদের হস্তে দিলেন ও উহা হইতে একটী বটিকা আমাদের কন্যাকে মুখে দিয়া চুষিতে বলিলেন। বটিকাটী বেশ সুস্বাদু ও উহাতে বোধ হয় পিপারমেণ্ট দেওয়াছিল, কারণ উহা মুখে দিয়া কিঞ্চিৎ চুষিতেই মুখের মধ্যে শীতল হইয়া গেল এবং তাহাতে পিপাসা নিবারণ হইল। আমাদের কন্যাটী সেদিন সাধুবাবার প্রস্তুত ঐ বটিকা খাইয়া বেশ খুসী হইয়া-ছিল। এইরূপ জিনিষ সঙ্গে থাকিলে পাহাড় পর্ব্বতময় স্থানে রৌদ্রের মধ্যে ভ্রমণ বেশ সুবিধাজনক হয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ অনেক স্থানেই উপযুক্ত সময় হয়ত শীঘ্র পানীয় জল পাওয়া তেমন সহজসাধ্য হয় না।

পশ্চিম দেশের শীতকালের ভয়ঙ্কর শীতে ও ততোধিক শীতল ভীষণ কষ্টকর বাতাসের মধ্যে মাত্র একটী পাতলা গৈরিক আলখেল্লা গায়ে দিয়া প্রাতে যখন সাধুবাবা তাঁহার নূতন নির্ম্মিত বারাণ্ডায় শীতল সিমেণ্টের উপর প্রসন্ন মুখেই বসিয়া থাকিতেন ও ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে পশ্চিম দেশের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে আমরা হাঁটিয়া সাধুবাবার নিকট গিয়া রৌদ্রের প্রখরতার জন্য যখন কষ্ট অনুভব করিতাম এবং তখনও পাহাড়ের উপর গিয়া যখন দেখিতাম সাধুবাবা উন্মুক্তস্থানে রৌদ্রের মধ্যে সূর্য্যের দিক হয়ত মুখ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে অবিচলিত ভাবে বসিয়া আছেন, তখন আমরা খুব আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন করিয়া বলিতাম। তিনি তেমনি প্রশান্তভাবে মৃদু কোমল কণ্ঠে বলিতেন, "সাধুলোকের শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এসকল সহ্য করা অভ্যাস করিতে হয়, ইহাত তাহার তুলনায় কিছুই নয়।" আমরা তাঁহার নিকট বসিয়া অনেক সময় তাঁহার পূর্ব্বকার কথা সকল শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতাম। যদিও তিনি তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিতে তত ইচ্ছুক নন, তবুও আমাদের আগ্রহাতিশয্যে কখনও কখনও কিছু গল্প বলিয়া শুনাইতেন। প্রথমে বার বৎসর বয়সের সময় ইনি গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছেন। আমাদের পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ প্রশ্নে ইনি একদিন বলিয়াছিলেন যে তৎপর এক সময় বার বৎসর কালাবধি কি শীত কি গ্রীষ্মে ইনি একমাত্র কেবল কৌপীনই পরিধান করিয়াছিলেন, অন্য কোন বস্ত্র ব্যবহার করেন নাই। সেই সময় অতিশয় শীতপ্রধান দেশেও বার বৎসরকাল ইনি কোন লোকালয়ে কিম্বা গৃহমধ্যে বাস করেন নাই। অনাবৃত স্থানে, অথবা কোন বৃক্ষতলে বিছানাদি কিম্বা অন্য কোনপ্রকার সামগ্রী বর্জ্জিত অবস্থায় কিরূপভাবে কাটাইয়াছেন তাহা গল্প করিয়া বলিয়াছিলেন; আরও এমন অনেক কথা আছে যে আমি নিজে মুখে তাহা বলিব না। আমরা উঁহার পূর্ব্বের বিষয় শুনিতে যেমন আনন্দ পাই তেমনি উহা আরও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি। একদিন আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'এত যে বন জঙ্গলে পাহাড় পর্ব্বতে দীর্ঘকালাবধি ভ্রমণ করিতেছেন, কোন দিন ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িয়াছেন কি?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, দুইদিন উন্মুক্ত স্থানে ও একদিন ঘরের মধ্যে বসিয়া লৌহশিক দেওয়া মুক্ত জানালার অপর দিকে ব্যাঘ্র দেখিয়াছিলেন। 'ব্যাঘ্র দেখিয়া কি করিলেন, ভয় হইল না,' ইত্যাদি অনবরত আমাদের সাগ্রহ প্রশ্নে তিনি তেমনি অনুত্তেজিত মৃদুকোমল কণ্ঠে

আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে একদিন প্রাতে কোন একটী স্থানে পাহাড়ের উপর রুদ্ধ একটী কক্ষে লৌহশিক দেওয়া জানালার নিকট বসিয়া প্রত্যূষে তিনি একখানি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে জানালার অপর দিকে একটী ব্যাঘ্র দেখিতে পাইলেন। ব্যাঘ্রটী বোধ হয় ক্ষুধার্ত্ত ছিল, কারণ সে ঐ ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিল। আমরা সকলে শুনিয়া বলিয়া উঠিলাম, "আপনি তখন কি করিলেন?" সাধু বাবা বলিলেন, "আমি আর কি করিব? প্রথমে চুপ করিয়া পড়িতেই থাকিলাম। অবশেষে ব্যাঘ্রটী ওখানেই রহিয়াছে দেখিয়া ব্যাঘ্রকে বলিলাম তুমি কেন এরূপ ব্যস্ত হইতেছ? তোমার মধ্যেও যা আছে আমার মধ্যেও তাহাই আছে, কেবল বাহিরের আকৃতিতে যা' পৃথক।" এই প্রকার তাহার প্রতি কিছু কোমল ব্যবহার করিলে সে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পরে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। সাধুবাবা বলিলেন ঐ স্থানে পাহাড়ের উপর তিনি আরও দুই মাস কাল ছিলেন কিন্তু আর কোন দিন সেখানে ব্যাঘ্রটীকে দেখেন নাই। কত সময় এদিকে ওদিকে বেড়াইয়াছেন কিন্তু আর কোন দিন ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়েন নাই।

সাধুবাবার এই "তোমার মধ্যেও যা' আছে, আমার মধ্যেও তাহাই আছে, কেবল বাহিরের অকৃতিতে যা' পৃথক" কথাটী আমাদের মত অজ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অদ্ভুত লাগিতে পারে বটে কিন্তু কথাটী অত্যন্ত সত্য। ভগবদ্গীতায় আছে—

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।"

অর্থাৎ তিনি সমস্ত ভূতে অবিভক্ত—প্রকৃতপক্ষে এক, কিন্তু বাহ্য উপাধির পার্থক্য হেতু পৃথক পৃথক বলিয়া মনে হয়।

সে যাউক, অন্য অন্য দিন উন্মুক্ত স্থানে ব্যাঘ্র দেখিয়া কি করিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন যে তিনি এবং আরও "তিন মূর্ত্তি" এই চারিজন একদা কোন গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিবার উপক্রম হইতেছিল যে পথে সাধুগণ চলিয়াছিলেন তাহা বনের ভিতরে অতিশয় সঙ্কীর্ণ পথ। এমন সময় হঠাৎ সেই পথেরই সম্মুখে অদূরে কয়েকহস্ত দূরে দেখিতে পাইলেন একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র। বাঘ্রটীও ঐ পথে তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল। তাঁহারা চারিজন যেমন ব্যাঘ্রটীকে দেখিয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন. ব্যাঘ্রটীও সেইরূপ

উহাদিগকে দেখিয়া থামিয়া দাঁড়াইল। অন্য কোন দিকে পথ কিম্বা যাইবার উপযুক্ত পরিষ্কার স্থান ছিল না যে সেই দিকে তাঁহারা যাইবেন। ইঁহারা নির্ব্বিকারভাবে খানিকক্ষণ ঐস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, কিন্তু ব্যাঘ্রটীও যখন নড়িল না তখন উঁহাদের মধ্যে যিনি অগ্রবর্ত্তী সাধু ছিলেন, তিনি ব্যাঘ্রটীর উদ্দেশ্যে বলিলেন "আমাদের তুমি পথ দাও। অথবা যদি আমাদের মধ্যে তোমার কেহ ভোগের পদার্থ থাকে তবে তাহাকে গ্রহণ কর।" ব্যাঘ্রটী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে একটা শব্দ করিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে অতি আগ্রহের সহিত বাবার এই গল্প শুনিতেছিলাম।

পরে তৃতীয় দিনের কথা আমরা জিজ্ঞাসা করায় সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, কামাক্ষ্যাতীর্থের নিকট, কোন নদীতীরে উনি এবং আরও "দুই মূর্ত্তি" রাত্রি কালে বিশ্রাম করিতেছিলেন উনি এবং অপর একটী সাধু গায়ে চাদর ঢাকা দিয়া সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া শুইয়াছিলেন ও তৃতীয় সাধুটী তাঁহাদের নিকটে বসিয়া ছিলেন। এমন সময় সেখানে একটী ব্যাঘ্র আসায় ব্যাঘ্রটীকে দেখিয়া তৃতীয় সাধুটী উঁহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "সিং আয়া।" আমরা শুনিয়া খুব কৌতুহলী হইয়া সকলেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা শুনিয়া ভয় পাইলেন?" কি করিলেন" ইত্যাদি। সাধুবাবা কিন্তু তেমনি প্রশান্তভাবে কোমল স্বরে বলিলেন, "আমরা কি করিব? উহাকে নিবারণ করিব এমন ত কোন অস্ত্র শস্ত্র আমাদের নিকট নাই যে তাহা প্রয়োগ করিব, সুতরাং আমরা চুপ করিয়া রহিলাম।" উঁহাদের নিকট অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "না।" আশ্চর্য্য এই যে ব্যাঘ্রটী কিন্তু উঁহাদের কাহাকেও কোনরূপ আক্রমণ না করিয়া, অল্পক্ষণ পর অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, আর একদিনের একটী ঘটনা এইরূপ বলিলেন, উনি এক বনের ধারে ছিলেন, এই সময় এক সাহেব বনে ব্যাঘ্র শিকার উদ্দেশ্যে সেই বনে আসেন। সাহেব ব্যাঘ্রের উদ্দেশ্যে যে গুলি করেন তাহা ব্যাঘ্রের না লাগায় ব্যাঘ্র সাহেবকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। সাহেব ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে পলাইতে গিয়া অদূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আসিয়া উঁহার আশ্রয় লয়, তৎপর উনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসেন। উঁহার আশ্রয় লওয়ায় ব্যাঘ্র আর সাহেবকে আক্রমণ করে নাই।

আর একদিনের একটী ঘটনা সাধুবাবা এইরূপ বলিলেন যে একদিন

তিনিও আরও কয়েকজন সাধু এক ময়দানে রাত্রিবাসের জন্য অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; এমন সময় দেখিলেন তথায় কতকগুলি গরু আসিয়া উঁহাদের নিকট আশ্রয় লইল। উঁহারা মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'গরুগুলি অগ্নি দেখিয়া এখানে আসিয়াছে—না—ইহারা আমাদেরই আশ্রয়ে থাকিতে চায়, দেখিলে হয়, ইহা মনে করিয়া সাধুগণ ঐ স্থান ত্যাগ খানিক দূরে অন্যত্র গিয়া আড্ডা পাতিলেন। খানিকক্ষণ পর দেখিলেন যে অগ্নির উত্তাপ ত্যাগ করিয়া গরুগুলি পুনরায় ঠিক তাঁহাদেরই নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে উহারা তাঁহাদেরই আশ্রয়ে থাকিতে চায়। সে দিন গুরুগুলি সমস্ত রাত্রিই উঁহাদের নিকট যাপন করিয়াছিল। খুব সম্ভব উহারা হিংস্র জন্তু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উঁহাদের আশ্রয় লইয়াছিল।

একদিন সর্প সম্বন্ধে কথা উঠায় সাধুবাবা বলিয়াছিলেন এই পাহাড়ের উপর যখন তাঁহার জন্য এই গৃহখানি প্রস্তুত হইতেছিল তখন মাটি খুঁড়ায় অতি প্রকাণ্ড এক শ্বেত বর্ণ বিষধর সর্প বাহির হইয়াছিল। যাহারা ঐ স্থানে কর্ম্ম করিতেছিল সর্পটী তাড়িয়া আসায় তাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। সাধুবাবা তখন ঐ স্থানে থাকায় হস্তে তুড়ি দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সর্পটীকে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করায় সে চলিয়া গিয়াছিল। সর্পটী চলিয়া গেলে মিস্ত্রিগণ আসিয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সর্প দেখিয়া ইঁহারা যেরূপ ভীত হন না, তেমনি সর্প দ্বারা ইঁহাদের কোন অনিষ্টও হয় না, কারণ কৈলাস পাহাড়ে গ্রীষ্মের সময় প্রায়ই বড় বড় সর্প বাহির হয় কিন্তু তাহাদের দ্বারা ইঁহার কোনই অনিষ্ট হয় না।

আমরা সাধুবাবার নিকট ঐ সকল গল্প শুনিয়া যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "আপনার ব্যাঘ্র কিম্বা সর্পাদি দেখিয়া ভয় হয় না?" তদুত্তরে সাধু-বাবা অবিচলিত ভাবে মধুর কণ্ঠে বলিতেন, "ভয় কি? বাঘ, নাগ, ও সাধু, ইহারাত বনেই বাস করিয়া থাকে।"

প্রকৃত সাধুব্যক্তিগণের মন সম্পূর্ণ অহিংস হওয়ায় ও তাঁহারা হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়া একেবারে ভয় শূন্য ও নির্ব্বিকার থাকায় বোধ হয় ঐ জীবের অন্তঃকরণে ও ঐরূপ ভাব প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্য তাহারা তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করে না।

সাধুবাবার বাসের জন্য তখন একখানি গৃহই পাহাড়ের উপর ছিল, গৃহখানি

সর্ব্বদাই অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতাম। সাধুবাবার নিকট তখন জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু তবুও সাধুবাবার ভক্তপ্রদত্ত আবশ্যকীয় যাহা দুই চারিটি দ্রব্য ছিল আমাদের নিকট তাহা বড় সুন্দর বোধ হইত। সাধুবাবার সামান্য তৈজসপত্রের মধ্যে তখন কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ঘটী ছিল, উহার গঠন যেমন সুন্দর তেমনি উহা অতি হাল্‌কা। একদিন ঘটিটী দেখিয়া আমরা ভাল বলায় সাধুবাবা উহা কত হাল্‌কা দেখিবার জন্য ঘটিটী আমাদের হস্তে দিয়াছিলেন। ঘটিটী অন্যত্র বহিয়া লইয়া যাইবার সুবিধার জন্য ঐ ঘটিটীর গলায় লাগাইবার উপযোগি একটী ফিতার মত সামগ্রী তাঁহার কোন ভক্ত ব্যক্তি প্রস্তুত করিয়া বাবাকে উপহার দিয়াছেন। ঠিক ঐ প্রকারের অত বড় ও অমনি গঠনের কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী সুন্দর ঘটী বাবার আছে দেখিয়াছিলাম। একদিন সাধুবাবার খানকয়েক পুস্তক জড়ান একখানি বড় রুমাল দেখিয়াছিলাম তাহাতে দেবনাগরী অক্ষরে রঙ্গিন সুতা দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে ভাল ভাল দুই চারটা কথা লেখা রহিয়াছিল। যেমন "হে গুরো! এই দুঃখময় সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমনরূপ কষ্টের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর।" ইত্যাদি। তাঁহার অন্নবস্ত্রাদি রাখিবার বেতের জন্য একটী বাক্স আছে তাহার উপরিভাগ লালবর্ণের কাপড় দ্বারা মোড়ান এবং তাহারও উপর অন্য রংয়ের সুতা দ্বারা দেবনাগরী অক্ষরে দুই একটী কথা লিখিয়া তাঁহার কোন ভক্ত শিষ্য তাঁহার নিকট ঐটী পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা যে এইরূপ সাধুবাবার মহামূল্য সুমধুর উপদেশ শ্রবণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাবার নিত্য ব্যবহারের অতি সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রীগুলি পর্য্যন্ত সাগ্রহে লক্ষ্য করিয়া দেখি এবং কত সময় কত অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া বসি তাহাতে সাধুবাবা কিছুমাত্র বিরক্ত হন না, বরং স্নেহময়ী মাতা যেরূপ সন্তানের অজস্র আবদার নির্ব্বিকারচিত্তে সন্তোষের সহিত সহ্য করিয়া থাকেন সেই প্রকার আমাদের কৌতূহলও তিনি সস্নেহে নিবারণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গৃহে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের একটী বৃহৎ খল দেখিয়াছিলাম উহাতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইত। সেই সকল ঔষধ লইতে বহু দূর হইতে বহু ব্যাধিযুক্ত অনেক ব্যক্তি উঁহার নিকট আসিত। প্রার্থীকে উনি দুরারোগ্য যক্ষ্মা এবং হাপানি আদি উৎকট ব্যাধির ঔষধও দিয়া থাকেন। শুনিয়াছি এইরূপ দুরারোগ্য ব্যাধিও তাঁহার দত্ত ঔষধে আরোগ্য হয়।

সাধুবাবা একদিন বলিয়াছিলেন পশ্চিমাঞ্চলের সুগভীর ইন্দারাগুলি হইতে জল উঠাইবার যেরূপ বন্দোবস্ত আছে তাহাতে এক প্রকার ভয়ঙ্কর ঘর্ঘর শব্দ

উত্থিত হইয়া থাকে। তাহাই সাধুবাবা বলিয়াছিলেন বহু পথাতিক্রমজনিত শ্রান্তকলেবর আতপতাপক্লিষ্ট তৃষ্ণাতুর জলান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী যদি কোন অশ্বারোহী ব্যক্তি জলপানে তৃষ্ণা ও পথশ্রান্তি দূরীকরণকল্পে ঐরূপ একটী ইন্দারার নিকট উপস্থিত হয় এবং ঐ ইন্দারা হইতে জল উঠাইবার কালীন ভয়ানক ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইলে যদি তাহার অশ্ব ঐ শব্দ শ্রবণে ভীত চকিত হইয়া পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় কি ঐ পথিক জলপান হইতে সেই সময় বিরত হইবে? অশ্বটী ঐ প্রকার শব্দ শ্রবণে ভীত ও চমকিত হইলেও ঐ ব্যক্তি অশ্বকে যে প্রকারে পারে সংযত করিয়া ঐ ইন্দারা হইতে জল উঠাইয়া পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ এবং পথশ্রান্তি দূর করিবেই করিবে, কারণ তদ্ভিন্ন তৃষ্ণাতে এবং আতপতাপজনিত পথশ্রমে তাহার প্রাণ যায়।

সাধুবাবা এই গল্প বলিয়া উদাহরণ দিয়া আমাদের ইহাই পরে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে তেমনি এই সংসারের দারুণ কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়া ভগবৎ নাম লওয়া সম্ভবপর নয়, কোলাহল যখন নিবৃত্ত হইবে তখন অবসর মত ভগবৎ নাম লইব ইহা ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যে প্রকারেই হউক ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তির মত এই অবাধ্য অসংযত চঞ্চল চিত্তকে বশে আনিয়া যে প্রকারেই হউক তাঁহার নামে, তাঁহার দিকে ইহার গতি করিতেই হইবে। তবে এই সংসার যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তের অবসাদ দূর হইয়া চিত্ত সতেজ, সবল ও সরস হইয়া উঠিবে। যেমন একটী কথা আছে "সমুদ্রে শ্রান্তে কল্লোলে স্নাতুর্মিচ্ছন্তিবর্ব্বরাঃ" অর্থাৎ মূর্খ বর্ব্বর ব্যক্তিগণই মনে করে সমুদ্র কল্লোল থামিলে সমুদ্রে নামিয়া অবগাহন করিব কিন্তু যেমন অবিশ্রান্ত সমুদ্র কল্লোল কখনই কোন সময়ের জন্য থামিবার নয় সুতরাং ঐ মূর্খ ব্যক্তিগণেরও ইহ জীবনে কখনও সমুদ্রে স্নান সম্ভবপর হইবে না তেমনি যদি কেহ মনে করে এই সংসারের কোলাহল নিবৃত্ত হউক, চতুর্দ্দিকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হউক, তাঁহার নামে মনে অনুরাগ জন্মুক তখন ভগবৎ স্মরণ করিব তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বর্ব্বর ব্যক্তিগণের মত ইহ জীবনে ঐ সকল ব্যক্তির আর ভগবৎ নাম লওয়া ঘটিয়া উঠিবে না, কারণ বহুজন্মের বহু সংস্কারবশে এ চঞ্চল চিত্ত সর্ব্বক্ষণই নানাদিকে প্রধাবিত হইতেছে। তাহাকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত করিয়া নিয়মিত ভাবে নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধনাদি চালাইতে হইবে, নচেৎ কোন দিনই ভগবৎ পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইবে না এবং এই অফুরন্ত দীর্ঘ পথের কোনদিনই আর অবসান হইবে না। (ক্রমশঃ)

দেশ কাল পাত্রানুসারে—

সাধন ধর্ম্ম রক্ষার উপায়।

(সিদ্ধসাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত)

টীকা। দেশ ভারতবর্ষ, কাল কলিযুগ, পাত্র আর্য্যসন্তান, ইহারই অনুসারে শাস্ত্রোক্ত স্বধর্ম্ম রক্ষার উপায়—উদ্ভাবন।

পক্ষান্তরে—দেশ ইংরাজ রাজের অধিকৃত, বহুবিধ জাতিধর্ম্ম বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকৃতিজনপূর্ণ ভারত ভূখণ্ড, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ। কাল ধর্ম্ম উপধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিকট সংগ্রাম ভূমি বহুবিধ বিজাতীয় শিক্ষা দীক্ষার লীলাস্থলী উনবিংশ শতাব্দী। পাত্র, অন্নদায়ে জর্জ্জরিত, সংসারভারে নিত্য পীড়িত বহুপরিবার বেষ্টিত বিজাতীয়-ধর্ম্মভাব-দীক্ষিত, বিজাতীয় ভাষাভাব শিক্ষিত ও দাসত্বে উপজীবিত বর্ত্তমান সামাজিক বর্গ। ইহাঁদিগের স্বধর্ম্ম শাস্ত্রানুশাসিত পূর্ব্ব পুরুষ বর্গের চিরসেবিত স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম, তাহারই রক্ষা অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহস্র সহস্র বিঘ্ন বাধা ইত্যাদি সত্ত্বেও যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তাহা প্রতিপালনের উপায় অর্থাৎ সংসার ও পরদাসত্ব এ উভয় রক্ষা করিয়া সাধনধর্ম্মের যতটুকু অনুষ্ঠান হইতে পারে, শাস্ত্রের অবিরোধে তাহার ব্যবস্থা প্রচার।

বিগত কতিপয় বৎসরে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারকগণের বহুল পরিশ্রমের ফলে সমাজের যে একটু সজীব ধর্ম্মভাবের অনুকূলবায়ু বহিয়াছে, তাহাতে আমাদের প্রতি সামাজিকবর্গের অনুরোধ এই যে, আর্য্যধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মবিভাগের শীর্ষস্থানীয়, ইহা আর এক্ষণে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই ভগবদ্বাক্যের সারবত্তা সৌভাগ্যক্রমে সমাজের অনুভবে আসিয়াছে, কিন্তু যতই কেন ধর্ম্মপ্রচার হউক না, উদরান্নের সংস্থান না হইলে সকল উপদেশই মরুভূমিতে জলসেক। ইংরাজী ভাষার শিক্ষা, আর চাকরী বৃত্তি, এই উভয় রক্ষা করিয়া সাধনধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে, এরূপ উপায় উদ্ভাবন না হইলে "ধর্ম্মরক্ষা হইল না" বলিয়া বর্ত্তমান আর্য্য সমাজের প্রতি অনুযোগ করা বৃথা।

সামাজিকগণের এই অনুরোধে বাধ্য হইয়াই আমাদের এ অবতারণা। ইহাতে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অব্যাহত থাকিবে, এ ভরসা কিছুতেই করিতে পারিনা, তবে শাখা প্রশাখার কিছু কিছু বাদ দিলে যদি মূল রক্ষা হয় ইহাই ভরসা। আর, ইহাও আশা যে, মূলে জল বা বল পাইলে শাখা প্রশাখা পুনর্ব্বার সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া ফলপুষ্পে সুশোভিত হইলেও হইতে পারে, যদি পুনর্ব্বার নিজ নিজ ফলপ্রসবকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, করুণাময়ীর কৃপাকটাক্ষে এ সংসারে কিছুই বিচিত্র নহে। দক্ষিণানিলের প্রবাহ দেখিয়া বসন্তের অনুমান করা অভ্রান্ত, যদি বসন্ত না আসিবে, তবে মলয়ানিল বহিল কেন? যদি মায়ের বাসন্তী পূজাই না হইবে, তবে বসন্ত বনে ফুলই বা ফুটিল কেন? আর্য্যসমাজে আবার এ ধর্ম্মভাবের প্রবাহই বা বহিল কেন?

অধিকাংশ লোকের সংস্কার এই যে, ধর্ম্ম সকল পৃথক্ পৃথক্, বাস্তবিক তাহা নহে, ধর্ম্মের শেষ তত্ত্ব যিনি, তিনিও এক বই দুই নহেন, ধর্ম্মও এ জগতে এক বই দুই নহে। তবে ধর্ম্মের নামে যা। কিছু পার্থক্য, তাহা ধর্ম্মের পার্থক্য নহে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথপদ্ধতির পার্থক্য। আর্য্য ধর্ম্ম বলিলে বুঝিতে হইবে, আর্য্যগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ, আর অনার্য্য ধর্ম্ম বলিলেও বুঝিতে হইবে অনার্য্যগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ; কিন্তু অনার্য্যের ধর্ম্ম নহে। এই আর্য্য অনার্য্যভেদ, বর্ত্তমান সমাজে উৎসন্ন প্রায়। আজ আর্য্যেরও যে ইংরাজীশিক্ষা, অনার্য্যেরও তাহাই—, এক স্কুল কলেজে গিয়া আর্য্য অনার্য্য উভয়েই এক আসনে বসিয়া একই আর্য্য বা ম্লেচ্ছগুরুর অনুশাসনে সমভাবে অবস্থিত। উভয়ের একই চাকরীবৃত্তি।

আশ্রমধর্ম্মের মূলভিত্তি বর্ণভেদ এক্ষণে চারিবর্ণের পরিবর্ত্তে দুই বর্ণ মাত্র অবশিষ্ট। যথা—মিশ্রবর্ণ ও অমিশ্রবর্ণ আর্য্য ও অনার্য্য। এই জন্যই কলি-যুগের প্রতি ভগবান্ ভূত ভাবনের আজ্ঞা এই যে, "গার্হস্থ্যশ্চৈব সন্ন্যাস আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে।" কলিযুগে দুইই মাত্র আশ্রম; হয় গার্হস্থ্য না হয় সন্ন্যাস। দাসত্ব করিয়া সংসারে থাকিতে পার তবে থাক; আর না হয় একে বারে সংসার ছাড়িয়া, রাজ্য ছাড়িয়া, দেশকুল জাতি গোত্র, পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র সকল ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া দূর হইয়া যাও। "সাবধান! ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থের কথা ভ্রমেও কখন মনে আনিও না। কেননা, মনে আনিলে তাহা মনেই থাকিবে; বনে গিয়া না পাইবে গুরুকুল, না পাইবে বানপ্রস্থের উপযুক্ত স্থান।" কলির প্রারম্ভেই এই ভগবদাজ্ঞার বিজয়পতাকা ভারতের গগনাঙ্গনে

উড়িয়াছে, কাহার সাধ্য সেই পতাকার কালদণ্ড অবনত করে? তথাপি আশ্রমধর্ম্মের যে যে অংশ এখনও বর্ণভেদ অতিক্রম করিয়া যায় নাই, বুঝিতে হইবে তাহা ধার্ম্মিকের সমগ্র ধর্ম্মজীবনের জন্য নহে, তবে নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ অন্নপ্রাশন উপনয়ন শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সাময়িক তরঙ্গের আংশিকমাত্র। কদাকার পুরুষের কঙ্কালময় কালো শরীরে নকল শাটীনের পোষাক যেমন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তাহা দেখিতে সুন্দর; তদ্রূপ ঐ সকল ক্রিয়াকলাপের সময়ে সমাজের শরীরে ও স্ব স্ব বর্ণোচিত আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও তেমনি উজ্জ্বল দেখায়; কিন্তু জামাটী খুলিয়া ফেলিলে যে কঙ্কাল সেই কঙ্কাল; তেমনি ঐ সকল ক্রিয়াকর্ম্মের হোমের ধূমটুকু, আর ঢাকঢোলের বাজনাটুকু মিটিয়া গেলেই আবার সেই যে কদাকার সেই কদাকার, যে একাকার সেই একাকার। পক্ষান্তরে—শাটীনের জামার প্রভায় কালো রংএর দেহটী যেমন উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি আবার দেহের ঐ কালো রঙ্গের প্রভায় জামাটী ও মলিন দেখায়; তদ্রূপ এই সকলে ক্রিয়াকাণ্ড সময়ে হোমের ধূমে আমাদিগের দেহ হইতে নকল আর্য্য গন্ধ বাহির হইলেও আমাদিগের সংসর্গে কিন্তু হোমের ধূম হইতে অনার্য্য গন্ধই ফুটিয়া বাহির হয়। তাই বলিতেছি যে, গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিয়া শাটীনের জামা পরিয়া সং সাজিয়া এ নাটক আর ভাল লাগে না। এখন একবার যবনিকা তুলিয়া ভিতরে বাহিরে যাহা হইয়াছে, তাহা এক করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার প্রয়োজন। এতাবতা আমরা ইহা বলিতেছি না যে, আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যতটুকু রক্ষা করিতে পার তাহা কর; কিন্তু তাহা আর নিখুত খাঁটী হইবার নহে। লোকের চোখে ধূলা দিলেও আপন আপন মনঃ প্রাণ আর তাহাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবাল্মীকি ও দেবী অহল্যা।

(১)

তপস্বীপ্রবর মহাকবি বাল্মীকি তাঁহার বড় সাধের রামায়ণের মধ্যে দেবী অহল্যার বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই অহল্যা তাঁহার কল্পনার বিজৃম্ভন নয়। সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা পরম সত্যকে লাভ করিবার পর অসত্য কল্পনাপূর্ণ অসার উপন্যাস লিখিবার প্রবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ারাম মানুষের মনোরঞ্জন দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের লালসা যে তাঁহার ছিল না একথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন।

আপনার ইষ্টদেবতার লীলাকীর্ত্তনের আনন্দ দ্বারা নিজের জীবনকে সার্থক করিবার জন্য ও শিষ্যপরম্পরায় জীব কল্যাণ সাধনের জন্যই আপন গুরুর উপদেশে এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশ ও আশীর্ব্বাদে মুনীশ্বর বাল্মীকি এই রামায়ণী গঙ্গার আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইষ্টলীলার সহিত দেবী অহল্যার একটা ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল বলিয়া রামায়ণে অহল্যা প্রসঙ্গ স্থান লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে দেবী অহল্যার যতটুকু বিবরণ শুনাইয়াছিলেন তাহার অধিক কোন পৃথক কথাই তিনি আপন গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে দিন ভারতের বিশুদ্ধবুদ্ধি নরনারীগণ দেবী অহল্যার চরিত্রগত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন সেই দিনই তাঁহারা ইহাঁকে প্রাতঃস্মরণীয়ার উচ্চ আসন দান করিয়াছিলেন এবং তদবধি আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধর্ম্মশীল নরনারীই দেবী অহল্যাকে নিঃসঙ্কোচে প্রাতঃস্মরণীয়া বলিয়া সম্মান করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে এমন কতকগুলি শিক্ষিত মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা হিন্দু সমাজের পৃষ্ঠে তীব্র কষাঘাত করিয়া আনন্দ লাভের জন্য এই মহৎ চরিত্রকেও মসীলিপ্ত করিতে কুণ্ঠীত হন না। আপন পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্রের প্রতি এই যে কঠোর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা, তাহাতে দেবী অহল্যার কোনই ক্ষতি হয় না, কিন্তু উহা যে অবজ্ঞাকারীর স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণকেই যথেষ্ট অবমানিত করে ও তাঁহাদের বিচার বুদ্ধিকেও যথেষ্ট অবনমিত করে, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। বিশেষতঃ আমাদের বুদ্ধির দোষে কোন অতীত মহৎ চরিত্র যাহাতে দুষ্টরূপে প্রদর্শিত না হয় বা এইরূপ প্রদর্শনের ভিতর দিয়া যাহাতে আমাদের স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষগণ অযথারূপে ভ্রান্তবুদ্ধি বা মূঢ়বুদ্ধি বলিয়া চিত্রিত বা প্রমাণিত না হন,

তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা কবীশ্বর মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ গ্রন্থের আদিকাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড অবলম্বনে অহল্যা চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মহামুনি বাল্মীকির অনুসরণ করিলে দেখা যায়, সতী ও সাধ্বী নারীর পক্ষে যাহা গুরুতম অপরাধ, দেবী অহল্যা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রবর্ত্তক কারণ ছিল বিশ্বহিতৈষণা। নিতান্ত ঘৃণিত ইন্দ্রিয় চাপল্য এই অধর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু নয়। কিন্তু বিশ্বহিত—লক্ষ্য কৃত হইলেও অপরাধ—অপরাধ। এই নিমিত্ত তিনি একদিকে যেমন কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি কোটি কোটি নরনারীর কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃতজ্ঞ ভারতের হৃদয়ে প্রাতঃস্মরণীয়ার রত্ন সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। যিনি জগতের পরম কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় এমন দণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, জগৎ যদি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য না দেয়, জগৎ যদি তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয়ার উচ্চ আসন দান না করে, জগৎ যদি আপনার মূঢ়বুদ্ধিতার দর্পে অন্ধ হইয়া অবজ্ঞা ও অবমাননার তিক্ত নৈবেদ্য দ্বারা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিতে প্রয়াস করে, তবে বুঝিতে হইবে, জগতের বড় দুঃসময় আসিয়াছে। কৃতজ্ঞতা, মনুষ্যত্ব, জীবের পরম আশ্রয় স্বরূপ আত্মবিসর্জ্জন প্রবণ মাতৃত্ব, শীঘ্রই জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে।

মহর্ষির লিখিত বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, যেরূপ দেশ কাল ও পাত্রের সমাবেশ হইলে মনুষ্যের পদস্খলন হয়, দেবী অহল্যার করুণ কাহিনীতে সেরূপ দেশ কাল পাত্রের কোন সংস্রবই ছিল না। অহল্যার আবির্ভাব কাল—সত্যযুগ, ধর্ম্ম যখন পূর্ণাঙ্গ ও স্বতঃপ্রতিষ্ঠ। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ইহাঁর পিতা। ইনি প্রজাপতি বিধাতার তপস্যা সম্ভূতা মানসী কন্যা। মানসী কন্যা বলিয়াই "অযোনিসম্ভবা," আর সেই জন্যই যৌন কাম বিকারের লেশমাত্রও ইহাঁতে ছিল না। কারণ মৈথুনী সৃষ্টিতেই মাত্র এই কাম বিকার সম্ভব, অন্যত্র নয়।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, ইনি "প্রযত্নাৎ নির্ম্মিতা ধাত্রা"—বিধাতা দ্বারা বড় যত্নে গঠিতা। শুধু ইহাই নহে, প্রজাপতি নিজে বলিয়াছেন এই কন্যা কি রূপে, কি গুণে, সর্ব্বপ্রকারেই অনিন্দনীয়া—"রূপ গুণৈ রহল্যা স্ত্রী"। 'হল্য' শব্দের অর্থ বিরূপতা। কোনরূপ বিরূপতা এই কন্যাতে ছিল না বলিয়া বিধাতা সাধ করিয়া এই অনিন্দনীয়া কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন "অহল্যা"—"অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্"। ক্রমশঃ।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি সম্পাদিত

দেহতত্ত্ব

দেহী সকলেই অথচ দেহের আভ্যন্তরিক খবর কয় জনে রাখেন? আশ্চর্য্য যে, আমরা জগতের কত তত্ত্ব নিত্য আহরণ করিতেছি, অথচ যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল করিয়া থাকি, সেই দশেন্দ্রিয়ময় শরীর সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। দেহের অধীশ্বর হইয়াও আমরা দেহ সম্বন্ধে এত অজ্ঞান যে, সামান্য সর্দ্দি কাস বা আভ্যন্তরিক কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলেই, ভয়ে অস্থির হইয়া দুই বেলা ডাক্তারের নিকট ছুটাছুটি করি।

শরীর সম্বন্ধে সকল রহস্য যদি অল্প কথায় সরল ভাষায় জানিতে চান, যদি দেহ যন্ত্রের অত্যদ্ভুত গঠন ও পরিচালন-কৌশল সম্বন্ধে একটি নিখুৎ উজ্জ্বল ধারণা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি সম্পাদিত "দেহ তত্ত্ব" ক্রয় করিয়া পড়ুন এবং বাড়ীর সকলকে পড়িতে দেন।

ইহার মধ্যে—কঙ্কাল কথা, পেশী-প্রসঙ্গ, হৃদ্-যন্ত্র ও রক্তাধার সমূহ, মস্তিষ্ক ও গ্রীবা, নাড়ী-তন্ত্র মস্তিষ্ক, সহস্রার পদ্ম, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির সংস্থান এবং উহাদের বিশিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি—শত শত চিত্র দ্বারা গল্পচ্ছলে ঠাকুরমার কথন নিপুণতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা মহাভারতের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ, উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ইহা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের এবং গ্রাম্য চিকিৎসকবৃন্দ-বান্ধবের, নিত্য সহচর হউক।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে—(৪১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা মূল্য মাত্র ২৸৵০ আনা, ডাঃ মাঃ পৃথক।

শিশু-পালন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত, ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আকারে, বহু চিত্র সম্বলিত হইয়া সুন্দর কার্ডবোর্ডে বাঁধাই, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা; মূল্য নাম মাত্র এক টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত।

কৃষক—কৃষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র। চাষের বিষয় জানিবার শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা।

উদ্দেশ্য :—সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কৃষিযন্ত্র ও কৃষিগ্রন্থাদি সরবরাহ করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা করা। সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ করা হয়, সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই সুপরিক্ষিত। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে।

শীতকালের সব্জী ও ফুল বীজ—উৎকৃষ্ট বাধা, ফুল ও ওলকপি, সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুনা বাক্স ১৷৷০ প্রতি প্যাকেট ।০ আনা, উৎকৃষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভার্বিনা, ডায়াস্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা বাক্স একত্রে ১৷৷০ প্রতি প্যাকেট ।০ আনা। মটর, মূলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, টমাটো ও কপি প্রভৃতি শস্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেম্বরের নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। **বাজে যায়গায় বীজ ও গাছ লইয়া সময় নষ্ট করিবেন না।**

কোন্ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জন্য সময় নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম ।০ আনা মাত্র। সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনা মাশুলে একখানা পুস্তিকা পাঠান হয়। অনেক গণ্যমান্য লোক ইহার সভ্য আছেন।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, টেলিগ্রাম "কৃষক" কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্রলিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "উৎসবের" নাম উল্লেখ করিবেন

"উৎসবের" নিয়মাবলী

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২৪শ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩৩৬ সাল। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

২৪শ বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩৩৬ সাল। | ৩য় সংখ্যা

বর্ষাগমে লীলাচিন্তা।

কোথা হইতে সরস বরষার আগমনে নিদাঘ তাপতপ্ত নিখিল বিশ্ব নব প্রাণে সঞ্জীবিত হইল? কোথা হইতেই বা এই করুণার ধারার মত অবিরাম বারিধারা তৃষাতুর ধরণীর উপর ঝরিয়া পড়িল? দেখিতে দেখিতে সকল আকাশ নব নীরদচ্ছায়ায় ঢাকিয়া গেল। মেঘমেদুর চির-শ্যামল আকাশের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতে কত সুখ! আহা এই গগনে গগনে নবীন মেঘের গুরু গরজনধ্বনি কেমন ভীষণ মধুর! এই বাদলের সজল কাজল মেঘের ঘটা দেখিয়া কত অতীত সুখস্মৃতি হৃদয়াকাশে উদিত হইল—কোন্ সুদূরের সোণার স্বপন মানস-নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই সুখস্মৃতির ঘন ঘোরে নয়ন মুদিয়া আসিল—সকল গাত্রে মহানন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিল। এই ঘন বরষায় বিরহিনী কুহুরীর কাতররব শ্রুতি গোচর হইলে কি এক অব্যক্ত আকুলতায় প্রাণ ভরিয়া যায়। ঘন বনচ্ছায়ে তৃণদল আঁখি শীতলকারী মেঘের আভায় পুলকিয়া উঠিতেছে—আবার সবুজ তৃণতরুলতা বিতানে সেই শ্যামল শোভা কেমন ধীরে ধীরে সুদূরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিশিয়াছে। নীপ নিকুঞ্জে কাহার জন্য কদম্ব কেশর পুলকাকুল হইয়া ঝলকে ঝলকে ঝরিয়া পড়িতেছে? স্নিগ্ধ মধুর সরস শীতল মেঘের আলোছায়ার খেলা দেখিতে কত সুন্দর। আহা! এত সুষমা, প্রকৃতির মধ্যে কোথা হইতে

আসিল—কোন্ সুন্দরের অদৃশ্য হস্তের সোণার কাটির পরশে এত শোভা উথলিয়া উঠিতেছে? কে এমন আপনাকে মানব নয়নান্তরালে লুকাইয়া জলে স্থলে নদী নদে আকাশে বাতাসে অসীমরূপের রেখা ফুটাইয়া তুলিতেছে এবং রসের ধারায় নিখিল ভুবন পরিপ্লুত করিতেছে? সে কে, যে তাহার সুষমা ভাণ্ডার শূন্য করিয়া আপনাকে অনন্তকাল ধরিয়া প্রকাশ করিতেছে—প্রতি মুহূর্ত্তেই যাহার শোভা নবনবায়মান হইয়া মানবের প্রাণে ব্যাকুল বাঁশরী বাজাইতেছে। আহা এত রূপ এত রস যাহার—যে রূপে রূপে অপরূপ—যে সীমার মাঝে ভূমা তাহারই অনন্ত রূপরশ্মির একটী ক্ষীণ রেখাপাতে সকল ভুবন এমনি করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, না জানি সে নিজে কত সুন্দর। তাই মনে হয় "কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি"। ঐ দেখ বিটপী শ্রেণী অবিশ্রাম প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে এবং তাহার ফলে সে কেমন নিবিড় করিয়া কাহার অজানা পবন পরশে পুলকিতা হইতেছে। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একখানি কাল মেঘ নামিয়াছে, চপলার চকিত চমকে সেই মেঘখানি যেন বহু খণ্ডবৎ মনে হইতেছে এবং মাঝে মাঝে তাহারই অঙ্গে তড়িল্লতা জড়াইয়া আছে। এই দৃশ্য কত মনোমুগ্ধকর—কত সুন্দর। প্রেম বিভাবিত নেত্রে এই বিশ্বরূপ দেখিয়া মন কি আপনা আপনি বিনা আয়াসে কোন অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দধামে নিভৃত নিকুঞ্জ লীলা নিকেতনে চলিয়া যায় না? স্থূল দেহ ত এই স্থানেই পড়িয়া থাকে কিন্তু অন্তশ্চিন্তিতভাব দেহের গতিরোধ করিতে পারে, জগতে এমন কোন বস্তুই নাই। সেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মের মধ্যে যিনি অবস্থান করেন তিনি তাহারই সাহায্যে থাকিয়া চিরমুক্ত বিহঙ্গমের অসীম প্রেমগগনে উড়িয়া বেড়ান। তিনি বিপুল সুদূরের অসীম আহ্বানে আর স্থির থাকিতে পারেন না। এই প্রাবৃটের শ্যামল শোভার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রেম যজ্ঞে আমন্ত্রণ লিপি পাইয়া থাকেন এবং প্রতি পত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে চকিতে চকিত হইয়া কাহার গোপন আগমন প্রতীক্ষা করেন। সহসা দূরাগত মনপ্রাণ হরণকারী মধুর মুরলী নিক্বণে তিনি উদাস হইয়া ব্যাকুল প্রাণে সেই নানা বিহগ কাকলী কূজিত কেকা কলরব মুখরিত কেতকী কাননের দিকে চাহিয়া থাকেন। মনে আশা ঐ বুঝি বাঁশীতে মেঘ রাগ আলাপ করিতে করিতে আসিয়া কেহ চির বিরহের দীপক্-স্মৃতি জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবে। এই আশায় আশায় কত যুগ কাটিয়া যায়—কত কাল মানস-মুরতির রূপধ্যানে চলিয়া যায়—কুঞ্জ কুটীরের দ্বার খুলিয়া রাখিয়া

নীরব নির্জ্জন বনপথে কোন্ চিরকিশোর পান্থের আশায় বসিয়া থাকে। এই যে পূজার জন্য মালা গাঁথা, প্রদীপ জ্বালা, লীলার স্রোতে ভেসে যাওয়া তাহাতে কত সুখ তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে—অজানার উদ্দেশে প্রেমের সাগরে গানের তরী ভাসান যে কত প্রীতিপ্রদ তাহা "মূকাস্বাদনবৎ" নিজেই অন্তরের অন্তরতম হৃদয় মধ্যে অনুভবনীয়। কাননভূমি ঝিল্লি রবে মুখরিত--বরষার ঘন ধারার বিরাম নাই—সে যেন নূপুরধ্বনির মতই বাজিতেছে।

এই ঘন বরষার দিনে 'বর্ষণার' দৃশ্যাবলী মানস নয়নে দেখিতে কত সুখ। সেই তৃণ তরুগুল্মাচ্ছাদিত শুভ্র পর্ব্বতটী নয়নে ভাসিয়া উঠে ও আনন্দোৎসব চিহ্নিত লীলাস্থলী সমূহ মনে পড়ে। আর মনে পড়ে বাদলাভিসারের কথা। এমনিতর বর্ষার নিবিড় নীরদ জাল সমাকীর্ণ আকাশ, এমনই ঝিমি ঝিমি বাদল বরিষণ "শঙ্কিল পঙ্কিল বাট"। এই দুর্দ্দিনে পুরবাসীরা তাহাদের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাবটের নির্জ্জন বেণু বন বীথীকার পথ কোথাও শব্দ নাই ক্বচিৎ পত্রাবলীর উপর বারিধারা পতন শব্দ বিরাট নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময় কুঞ্জ হইতে বংশী ধ্বনি ভাসিয়া আসিল—কনক কেতকী কুসুম গৌরী প্রেমময়ী কর্ণে শ্রবণ করিয়া পুলকাকুলা হইলেন, অভিসারে প্রস্তুত হইলেন, যিনি চিরদিন রাগাতিশয্য নিবন্ধন প্রিয় দর্শন লাভ করিলে মহা দুঃখকেও সুখকর বলিয়া বোধ করেন, পক্ষান্তরে প্রিয়াদর্শন ঘটিলে মহা সুখও যাহার নিকট দুঃখকর বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অসমোর্দ্ধ রাগবতী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অভিসারে গমন করিতেছেন। প্রেমাতিশয্যে যাহার স্বাভাবিক কুল লজ্জা ভয় ত্যক্ত হইয়াছে, যাহার নিখিল চেষ্টা কান্তের জন্য তিনি কি নিজ সুখ দুঃখ গণনা করিতে পারেন? এই জন্য অন্ধকারাবৃত বর্ষা রজনীতে নানা বিঘ্ন সঙ্কুল সুদীর্ঘ দুর্গম পথ দিয়া প্রেমে আত্মহারা হইয়া চলিয়াছেন। এমন নিবিড় অন্ধকার যে নিজ দেহ পর্য্যন্ত সেই আঁধারে দর্শন হইতেছে না। তাই রসিক ভাবুক কবি শ্রীগোবিন্দদাস গাহিয়াছেন,—

"অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ,
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ।"

তথাপি অন্তরে শ্যামল চন্দ্র উদিত হইয়াছেন। সেই কোটিরাকা চন্দ্র নির্ম্মছিত শ্যাম চন্দ্রের আলোকচ্ছটায় হৃদয় উদ্ভাসিত, সকল পথ আলোকিত—তাহারি সাহায্যে চলিয়াছেন। সেইজন্য কুঞ্জে উপস্থিত হইলে শ্রীরাধা মাধবের

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কবি তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। শ্রীমাধব কহিতেছেন "এ অমাবস্যার বর্ষা রজনী, কি করিয়া বনপথে আসিলে?" শ্রীমতী বলেন যে আশ্চর্য্য কি, মন্মথে উজ্জ্বল মনমথ বাতি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, মনোরথে চড়িয়া আগমন করিয়াছেন সেইজন্য সুদূর পথ এত শীঘ্র আসিয়াছেন। সিদ্ধান্তের দিক দিয়া দেখিলে শ্রীব্রজ মণ্ডলের ভূমি শ্রীকৃষ্ণলীলারূপ স্ফার সঙ্কোচ সামর্থ্য যুক্ত। ইহার দ্বারা রাগৌৎকট্য দর্শনই কবির হার্দ্দ্য। যাহার হৃদয় কোটি কুসুম শরাঘাতে জর্জ্জরিত তাহার উপর বারিবর্ষণ আর অধিক কি! প্রেম দহনে যাহার হৃদয় সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে তাহার পক্ষে এক্ত দহনভীতির অবসর কোথা? এই বর্ষার ঘোর রজনীতে সঙ্কাকুল দুর্গম পথে অভিসার প্রস্থিতা শ্রীভানুনন্দিনীর চিত্রটী ধ্যান নিমজ্জিত মহাযোগীর মত অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ভাব দেহে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি নেত্রে রাগানুগামার্গীয় সাধক ভক্ত দর্শন করিয়া থাকেন ও শ্রীমতীর সাগর সদৃশ অসীম অতল স্পর্শী ভাব মাধুর্য্য ও নিরুপাধি প্রীতিতে সর্ব্ব দুঃখ সহিষ্ণুতা সন্দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া যান.........ও মনে করেন যে এরূপ রাগাতিশয্য জগতে কিম্বা জগতাতীত পরব্যোম বৈকুণ্ঠাদিতেও দৃষ্টি গোচর হয় না। শ্রীবৃন্দাবনেই রাগের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় সঙ্কল্পকল্পদ্রুমে এইরূপ প্রাবৃট কালীন শ্রীরাধা-মাধবের লীলা বিলাস ভাবনেত্রে দর্শন করিয়া কহিতেছেন।

"বহিরণু ঘন গর্জ্জিতং সবর্ষং, গৃহমনুতল্প বরব্যোমরশীতম্॥
তদনুবসিত শস্তবস্ত্র মেতন্মিথুনমনুস্মরচিত্ত গৌর কৃষ্ণম্॥"

হে মন, পটগৃহের বহির্দ্দেশে মেঘ গর্জ্জন ও বর্ষণ হইতে লাগিল, গৃহ মধ্যে উত্তম শয্যা, ঈষৎ শীত এবং অত্যাশ্চর্য্য বসনধারী গৌর কৃষ্ণবর্ণ—শ্রীরাধামাধব বিরাজ করিতেছেন—তুমি স্মরণ কর।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে অভিসার অর্থে সাধারণতঃ নায়ক নায়িকার সঙ্কেত স্থলে মিলনের জন্য গমন করাই বুঝায়, কিন্তু বৈষ্ণব মহাভাবুক কবিগণ যেরূপ হৃদয়ের ভাষা দিয়া অভিসার বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সামান্য নায়ক নায়িকার মিলন বর্ণন করা তাঁহাদের মত ভক্তি প্রাণ প্রেমিক মহাজনগণের উদ্দেশ্য নহে, উহার নিগূঢ়তর অর্থ আছে। যাহারা লীলার দিক দিয়া উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ তাহারা ভক্তের দিক দিয়াও দেখিতে পারেন, এই বর্ষাভিসারের অর্থ ভক্তের সকল দুঃখ ও বাধা দমন পূর্ব্বক

ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া ও ভক্তকে দুঃখানল স্পর্শ করিয়া তদীয় হৃদয়ের সকল মলিনতা অপসারণ পূর্ব্বক ভগবানের প্রেমাভিসারে আহ্বান। হৃদয়বান মানব মাত্রই এই অভিসার লীলা নিবিড় দুঃখের দিনে হৃদয় কুঞ্জে অনুভব করিয়া থাকেন। যখন ঘন বরষার সজল কাজলে মেঘের মত হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিয়া বিষাদ কালিমা দেখা দেয়—যখন শ্রাবণের ধারার মতই দুঃখের বরষায় নয়ন ধারা অবিরল ভাবে ঝরিয়া বক্ষ সিক্ত করিয়া দেয় তখন অনুভবী ভক্ত জীবাত্মা সেই দুঃখের দিনে পৃথিবীতে কিছুই সুখকর দেখিতে পান না, একা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া যেন হৃদয় দেবতার জন্য ব্যাকুল হন ও বাহিরের শত ঝঞ্ঝাবাত অগ্রাহ্য করিয়া তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত অন্তর্মুখী হন। এইরূপে ক্ষণকালের জন্য দেহ গেহ বিস্মরণ পূর্ব্বক অন্তরে অন্তরতম দেবতার সহিত অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। এইরূপে লীলা ও তত্ত্ব দুই দিক দিয়াই বর্ষাভিসার ভক্তগণের পরম আস্বাদনীয়।

মানবের হৃদয়ের ভাব ও গ্রহণ সামর্থ্য অনুরূপেই বস্তুর আবেদন হইয়া থাকে। এ তত্ত্বটী বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রজাপতি কোন সময় দেব, মনুষ্য ও অসুর সম্প্রদায়ে মেঘ গর্জ্জন ধ্বনি দ্বারা 'দকার' উপদেশ করিয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি দেবগণ শুনিলেন 'দাম্যথ' এই শব্দ হইতেছে অর্থাৎ 'সংযত হও'। কৃপণ স্বভাব মানব শুনিল 'দত্ত' অর্থাৎ 'দান কর,' ও ও নিষ্ঠুর অসুরগণ শুনিল 'দয়ধ্বম্' অর্থাৎ 'দয়া কর'। এইরূপ বর্ষাগমে মেঘোদয়ে কৃষীর প্রাণে বারি বর্ষণ শস্যোৎপাদন হইবে বলিয়া আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। ভেকের কলরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শিখীর আনন্দ নৃত্য দেখা যায়। মেঘনির্ম্মুক্ত জীবন-জীবন চাতকের মর্ম্মে মর্ম্মে আনন্দ তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, প্রোষিত ভর্ত্তিকার হৃদয় বিরহচ্ছায়া ঢাকিয়া দেয়। আর ভাবুক কবির হৃদয়ে-সাগরে অনেক স্মৃতির তুফান উঠে। ইন্দ্রধনু রঞ্জিত শ্যামল নব জলধর উদিত দেখিয়া কবি কালিদাসের হৃদয়ে শিখিপিচ্ছ বিভূষণ শ্যাম সুন্দরের কথাই স্মৃতি পথে উদিত হইয়াছিল। তাই তিনি তদীয় মেঘদূতে বর্ণন করিয়াছেন;

'রত্নচ্ছায়া ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে,
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ,

অর্থাৎ হে পয়োধর! ঐ দেখ, পদ্মরাগাদি মণিপ্রভা মিশ্রণের ন্যায় প্রিয়দর্শন ইন্দ্রধনু পুরোভাগে উইকাবৃত মৃত্তিকা স্তূপ হইতে আবির্ভূত হইতেছে; উহা দ্বারা তদীয় শ্যামল দেহ অতিশয় শোভাসম্পন্ন হইবে এবং বোধ হইবে, যেন তুমি উজ্জ্বল কান্তি শিখী পুচ্ছ; বিভূষিত নবনীলোচিত গোপবেশধারী কৃষ্ণের দিব্য সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া লইয়াছ।

এইরূপে দেখা যায় যে একই বস্তু বিভিন্ন ভাবাপন্ন মানবের নিকট বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

বৃদ্ধের প্রতি।

ওহে বৃদ্ধ! তুমি অত—

তোমার কথা পরে শুনিতেছি কিন্তু তুমি কে? আরও—আরও বৃদ্ধ। চির বৃদ্ধ বা চির নূতন—তোমার পরম সত্তারূপ আমি। কি বলিবে বল?

অত হায় হায় করিতেছ কেন? কিছু হইলনা বলিয়া হতাশ হইলে কোন দিকে অগ্রসর হইবে?

কি করিব কিছুই যে হইতেছে না। লব্ধ ভূমিকত্ব হইতেছে কৈ?

এখনও সময় আছে। আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করনা।

আর কি কিছু পারিব? নূতন করিয়া কিছু হইবে কি?

হইবে বৈকি। যাহা জীবন ধরিয়া করিয়াছ তাহা গুছাইয়া লইয়া মূল ব্যাপারটি করিবার এইত প্রশস্ত সময়। যাহা করিয়াছ তাহার কিছুই বিফল হয় নাই।

বল বল—আমার আশা জাগিতেছে—মূল কার্য্যটি কি করিব।

শাস্ত্রের কথা দিয়া বলিব না অমনি বলিব?

দুই বল। প্রথমে শাস্ত্রের কথা দিয়া বল পরে বলিও নিজের কথা দিয়া।

আচ্ছা—গীতার একটি শ্লোক গ্রহণ কর।

বল— যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায়কল্পতে ॥২।১৫

যে পুরুষকে—হে পুরুষর্ষভ অর্জ্জুন—এই সব ব্যথা দিতে পারেনা, যে ধীরী ব্যক্তি সুখে দুঃখে সমান সেই অমর হইয়া যায়। বুঝিতেছ—বৃদ্ধ হইতেছ—

বৃদ্ধ হইতেছ—বলিয়া হা হুতাশ কর কেন অমর হইয়া যাও—মোক্ষ লাভ কর।

হওয়া যাইবে কি ? সে জন্য কি করিতে বলিতেছেন ?

"এতে" এই সমস্ত যাহাকে ব্যথা দিতে পারেনা—কি সমস্ত ! বুঝিয়াছ কি ?

শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে যে ব্যথিত হয় না—এই ত ?

হাঁ—সুখ ও দুঃখকে যে সমান ভাবে গ্রহণ করে—সুখেও যা দুঃখেও তা যে এই সকলে অবিচলিত সেই মুক্তি লাভ করে।

কিরূপে ইহা হইবে ?

এই দীর্ঘ জীবন লইয়া কত কি ত করিলে এখন একবার স্বরূপ চিন্তার উপর লক্ষ্য রাখিয়া চা! গোবিন্দ আমায় কৃপা কর, কৃপা কর বলিয়া জপ কর ধ্যান কর আর আত্মবিচার অভ্যাস কর।

কি বলিতেছ ?

যাহার জন্য সাধন ভজন করিলে সেই মূল ব্যাপারটি বলিতেছি।

কি তাহা ?

পারিবে তাহা করিতে—নিরন্তর করিতে ?

প্রাণপণ করিব। বল।

উপাসনা যে কর তাহা কিন্তু খণ্ড অখণ্ডকে উপাসনা করে অখণ্ড হইবে বলিয়া। ব্যষ্টি সমষ্টিকে উপাসনা করে সমষ্টি হইবে বলিয়া। জীব শিবকে উপাসনা করে শিবত্ব পাইবে বলিয়া। হরি হইবে বলিয়া হরির উপাসনা—হরি হইয়া হরি ভজিতে হয়। গায়ত্রী হইয়া গায়ত্রী জপিতে হয়—ব্রহ্ম হইয়া গায়ত্রী জপিতে হয়।

উপাসনার তত্ত্ব কি এইরূপে ভাবনা ?

নিশ্চয়ই।

স্বরূপের ভাবনা কর—সর্ব্বদা কর—পরে অন্য যাহা করিতে চাও করিও। মনে রাখিও জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার ইহাই হইল সমস্ত সাধনা।

মার্জ্জন-মন্ত্র।

ব্রহ্মচারী। ভগবন্! 'ধন্বন্যাঃ'! 'নূপ্যাঃ'! 'সমুদ্রিয়াঃ'! 'কূপ্যাঃ'! এই কয়েকটা 'আপঃ' এই পদের বিশেষণ, এই বিশেষণ সমূহের সার্থকতা কি?

আচার্য্য। ধন্বন্ শব্দের অর্থ মরুভূমি ধন্বন্ বা মরুভূমিতে যাহা আছে তাঁহাই ধন্বন্য। 'ধন্বন্যাঃ আপঃ'--মরুভূমির জলরাশি। আর অনূপ শব্দের অর্থ জল বহুলদেশ—এমন দেশে যাহা আছে তাহাই অনূপ্য বা নূপ্য। 'নূপ্যাঃ আপঃ,—জল বহুল দেশের জল রাশি। ধন্বন্য—জল অব্যক্ত, আর অনূপ্য জল সুব্যক্ত। ভাব এই—হে জলরূপিণি! তুমি কোথাও (মরুভূমিতে) গুপ্ত স্বরূপা, আবার জলাকীর্ণ স্থানে তোমার জলদেহ ব্যক্ত। মরুভূমিতে তুমি নাই তাহা নহে—তুমি তথায় আবরণের উপর আবরণ লাগাইয়া রহিয়াছ—একেত জলই তোমার আবরণ তাহার উপর আবার ঊষর ভূমির দুর্ভেদ্য আবরণে তাহা ও আবৃত করিয়াছ কোথাও বা নিরাবরণ সুন্দর আপন জল দেহ সুব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছ। মা মানস রাজ্যে ও যেমন কখন কোথাও বিকসিত হও, হইয়া পিপাসিত দৃষ্টি আপ্যায়িত কর, শত চেষ্টায় ও তোমার সন্ধান পাওয়া যায় না, পিপাসা ক্লান্ত জীবের আরও পিপাসা বাড়াইয়া থাক, বাহিরেও তোমার সেই একই লীলা—কিন্তু মা আমরা যে সতত তোমার ঐ স্বরূপ সাগরে লবণ পুত্তলিকার মত ডুবিয়া যাইতে চাই—মরুভূমিতে যেখানে তুমি অব্যক্ত সেখানেও আমাদের কল্যাণ কর—অর্থাৎ সন্তান যেমন মায়ের অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার মাতৃস্তন ধারা পান করিয়া আপ্যায়িত হয় আমরা ও যেন সে ঊষর ভূমির দুর্ভেদ্য কবচ উন্মোচন করিয়া তোমার লুক্কায়িত নিত্যোদিত কল্যাণ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে পারি। আর জলপ্লাবিত (অনূপ) দেশেও তুমি আমাদের কল্যাণ কর অর্থাৎ তোমার ঐ ব্যক্ত প্রাকৃত জল প্রবাহে যেন আমার ভাবনা ভাসিয়া না যায় আমাদের ভাবনা যেন জলাবৃত তোমার কল্যাণ স্বরূপে পৌঁছিতে পারে; এইরূপ 'সমুদ্রিয়া' 'কূপ্যাঃ' এই দুইটী 'আপঃ' এই পদের বিশেষণ; সমুদ্র গর্ভে তুমি সমুদ্রিয়াঃ কূপমধ্যে তুমি কূপ্যাঃ সমুদ্রের জল রাশি ব্যাপক, কূপের জলরাশি ব্যাপ্য। সমুদ্র জল ব্যাপক হইলেও সে ব্যাপকতা প্রাকৃত, প্রাকৃত-ব্যাপকতা চিত্তকে আপন ব্যাপ্তির ছাঁচে প্রসারিত করিলেও তাহা সীমাবদ্ধ-জড়। মা! সমুদ্রের জলরাশি হইয়া আমাকে প্রাকৃত প্রসারণে প্রলুব্ধ করিয়া ভুলাইয়া রাখিও না। সে

ব্যাপ্তির মধ্যে ও তোমার নিরতিশয় জ্ঞাপক কল্যাণমূর্ত্তি ধরিয়া আমায় আপ্যায়িত করিও। আবার কূপের সীমাবদ্ধ জলরাশি স্পর্শ করিয়া তোমার যে অসীম স্বরূপ লুক্কায়িত আছে কূপজলময়ি! তুমি আমাকে সেই স্বরূপ ভূত কল্যাণের ভাজন করিও। মা তুমি আমার আনন্দময়ী এবং আনন্দময়ী রূপেই সর্ব্বব্যাপিনী, জাগতিক ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থেই, তুমি আছ · তোমায় আবরণ করিয়া সুখ দুঃখ মোহময়ী তোমার প্রকৃতি আছেন—প্রাক্তন কর্ম্মফলে আমার চিত্তে যখন সত্ত্বস্ফুরণ হয় তখন আমার চিত্ত বাহিরের পদার্থগুলি সুখ দুঃখ মোহকর হইলেও তাহা হইতে সুখকরত্বই গ্রহণ করে—আর যখন চিত্তে রজোগুণ প্রবল হয় বহু সঙ্কল্প বিকল্প যখন চিত্তকে দুঃখময় করিয়া তুলে, তখন বাহিরের বস্তুর রজোভাগও আমার হৃদয়ের দুঃখ বাড়াইয়া তুলে। এইরূপ আমার মোহের উদয়ে বাহ্যবস্তুরও মোহময়ী শক্তি আমাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু মা, প্রকৃতির এই সুখ দুঃখ মোহের ছলনায় আর কতকাল কাটাইব? নিত্য কল্যাণরূপিণী তুমি—সন্তানের দুষ্কৃতি—বিজৃম্ভিত সুখ দুঃখ মোহের অবগুণ্ঠনে কতকাল আর আবৃত থাকিবে? এই দুর্ভাগ্যের আবরণ অপসারিত কর সুখ দুঃখ মোহের অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর তবেই তোমার সন্তান তোমার নিরাবরণ-সুন্দর স্বরূপ সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া নিত্য কল্যাণ লাভ করিতে পারে; ইহাই তাহার চিরবাঞ্ছিত কল্যাণ এই কল্যাণই 'শন্নঃ' 'শমনঃ' ইত্যাদি শব্দ লইয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে।

যাহা হউক তৎপর জলদেহে আপনার অমৃতময় স্বরূপ ঢাকিয়া যিনি কোশাতে অবস্থিত তাঁহার চরণোদক মনে করিয়া ঐ জলের এক এক বিন্দু যখন তুমি মস্তকে সেচন করিতেছ—তখন দেহের জড়তা কাটিতেছে—এবং নীহার রাশির মধ্য হইতে শ্রীসূর্য্যদেব যেমন উদিত হন, সেইরূপ দৈহিক জড়তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তোমার স্নেহময়ী সুখপ্রসন্নবদনা শ্রীজগদম্বা বিকশিত হইয়াছেন। তখন অন্তরে বাহিরে সেই মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তোমার হৃদয় যেন আনন্দে বিগলিত হইতে থাকিবে। আর মন্ত্রের শব্দরাশি লইয়া তুমি যেন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছ আপন প্রার্থনা জানাইতেছ। যখন সৌভাগ্য ফলে এই ভাবরাশি ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে তখন জন্ম জন্মান্তরের প্রার্থনার ফলরূপিণী এই কল্যাণময়ী শ্রীজগদম্বাকে পাইয়া তোমার চিত্ত অন্য কল্যাণ লাভে উদাসীন হইয়া এই কল্যাণময়ীর চিরদর্শনের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবে।

ব্রহ্ম—ভগবন্! আপনি শ্রীজগদম্বা সাবিত্রীকেই কল্যাণরূপিণী বলিয়া শন্ন আপ ইত্যাদি মন্ত্র অবলম্বনে তাঁহারই প্রার্থনা তাঁহার নিকট করিতে বলিতেছেন। আমার মনে হইতেছে—জগতের জীব দুঃখের সাগরে ভাসিতেছে এই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগঃ,শোক, দারিদ্র্য, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি দুঃসহ দুঃখরাশি সংসারসাগরে তরঙ্গের মত নিত্যই লাগিয়া আছে—এই সংসারের জীব হইয়া নিজে শ্রীজগদম্বা দর্শনের জন্য লালায়িত হওয়া কি স্বার্থপরতা নহে? এবং এইজন্যই এই সমুদয় দুঃখরাশির বিনাশরূপ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা কি সঙ্গত নহে?

আচার্য্য—বৎস! তোমাদের কল্যাণ হউক,এই আশীর্ব্বাদ যদি কোন জনসঙ্ঘের মধ্যে উচ্চারিত হয়,তাহা হইলে সেই জন-সঙ্ঘের মধ্যে যিনি যে কল্যাণের অভাবে বিব্রত—তিনি সেই কল্যাণলাভের জন্য আশীর্ব্বাদ বাক্য ব্যবহার করেন ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ কল্যাণ মানবের প্রার্থনীয়? যাহা অনিত্য কল্যাণ কেহই সে কল্যাণ প্রার্থনা করে না। জাগতিক কল্যাণ অনিত্য একটু বিচার করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। দুর্ভিক্ষ মহামারী কতবার আসিল গেল. প্লাবন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কতবার আসিয়াছে গিয়াছে, মানব প্রত্যক্ষ চেষ্টা না করিলেও ইহারা আইসে, মানব বরাবর রাখিতে চেষ্টা করিলেও ইহারা থাকে না, ইহারা আপন মনে আপন বিহার-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার জীব আপাত মনোরম সুখের মোহে পড়িয়া যে দুষ্কৃতি সঞ্চয় করিয়াছিল সেই দুষ্কৃতির আকর্ষণ লুপ্ত হইলে ইহারা চলিয়া যায়। ইহারা আগমাপায়ী যাতায়াত ইহাদের স্বভাব—এইজন্য ইহা সহ্য করিয়া স্থায়ি কল্যাণলাভের জন্য প্রয়াস করাই শ্রুতির অনুমোদিত। শ্রীভগবানও গীতামুখে বলিয়াছেন—আগমাপায়িনো ঽনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত!

বৎস! জগতে বহু দুঃখ আছে প্রতীকার ত অনেক হইতেছে কিন্তু তাহাতে কি স্থায়ী ফল হইতেছে? যে অবস্থার সংযোগে দুঃখ আসিয়াছে মানব কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া সে অবস্থার প্রতীকারার্থ প্রত্যক্ষ ও আনুমাণিক উপায়ে ত কত চেষ্টাই করিতেছে, ব্যষ্টি শক্তি বিফলমনোরথ হইলে সমষ্টি শক্তি গঠন করিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছে কিন্তু ব্যষ্টি শক্তিই হউক আর সমষ্টি শক্তিই হউক—অসাধক মানবের শক্তি সীমাবদ্ধ এই সীমাবদ্ধ শক্তির কার্য্য-ফলও সীমাবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে মানবের অবস্থা যখন কর্ম্মফলের নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে, তখনই পুনরায় দুঃখরাশি পূর্ব্বমূর্ত্তিতে বা নবীন মূর্ত্তিতে জীবের

নিকট উপস্থিত হয়। এই জন্যই ভারতের মহর্ষিগণ লৌকিক উপায়ে উদাসীন হইয়া—গুরূপদেশ লব্ধ অলৌকিক উপায়ের শরণাপন্ন হইয়া দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা আপন দুঃখ খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখ খণ্ডন করিয়াছিলেন। আর অধুনাতন জীব আপন দুষ্কৃতিবশে অলৌকিক উপায়ে শ্রদ্ধাহীন সুতরাং অলৌকিক উপায় সেবনের উপযোগী একাগ্রতা একনিষ্ঠা ও সংযমের অভাজন, শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠানে অসমর্থ, অসমর্থের সম্বল বচন মাত্র। সুতরাং আধুনিক জীব স্বীয় অসামর্থ্য বচন-মায়ায় গোপন করিয়া সনাতন পন্থার দোষানুসন্ধান-পরায়ণ, ইহারাই জনহিতকর কর্ম্মযোগ্যতা লাভের জন্য সাধনাকে স্বার্থপরতা মনে করেন। ফলতঃ যোগ্যতালাভের সাধনা স্বার্থপরতা নহে—কারণ তাহা হইলে বিদ্যার্থী যখন জাগতিক সর্ব্ববিধ দুঃখের প্রতীকারার্থ বিদ্যানুশীলন করেন, তাহাও স্বার্থপরতা বলিতে হয়, অথচ এই স্বার্থপরতায় যাঁহারা অসিদ্ধ, এমন মূর্খজনের চেষ্টায় কোন্ দুঃখের প্রতীকার হওয়া সম্ভব? অবশ্য আমরা যে জগদম্বা বলিতেছি—যাঁহারা ইহাঁর সীমাশূন্য স্বরূপ স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া—তাঁহারই ব্যবহারে দেহভোগ্য সুখ সৃষ্টির প্রয়াস করেন, তাহাদিগকে স্বার্থপর বলিলে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

যাহা হউক এখন মন্ত্রার্থ চিন্তায় মনোযোগ কর—বলা হইয়াছে প্রণবরূপিণি! জলময়ি জননি! এই যে পঞ্চপাত্রে বা কোশায় জল রহিয়াছে ইহা তোমার স্থূলদেহ—তুমি এই দেহে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছ—দূরদেশাগত প্রজার নিকট পর্দ্দানসী রাণা যেমন যবনিকার আড়ালে থাকেন—সেইরূপ। পর্দ্দার আড়ালে রাণী আছেন তিনি আমার কাতর প্রার্থনা শুনিতেছেন জানিয়া দীনহীন দূরাগত প্রজা যেমন তাহার অভাব অভিযোগ তাহার প্রার্থনা তাঁহার নিকটে নিবেদন করে—আমরাও সেইরূপ তোমার দীনহীন প্রজা তুমি জলরূপ আবরণের আড়ালে থাকিয়া আমাদের প্রার্থনা শুনিতেছ ভাবনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছি—মা তুমি আমাদের কল্যাণ কর তুমিই গীতায় বলিয়াছ—

মাত্রাস্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

শুনিয়াছি বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলেই তাহার ফলে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব দুঃখ উপস্থিত হয়—কিন্তু ইহারা যাতায়াতশীল—অনিত্য, তোমার উপদেশ—ইহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। আমরা তোমার উপদেশ প্রতিপালন করিব—সুতরাং সাময়িক দুঃখের প্রতীকারের জন্য বা সুখলাভের

জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিব না করিতেছি না আমরা কল্যাণ চাহিতেছি তুমি কল্যাণরূপিণী—তোমার সন্তান তোমায় চাহিতেছি—তুমি ভরিত চৈতন্য রূপিণী, আমাদের হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছ সত্য—আপন অঙ্গ—জ্যোৎস্নায়—হৃদয়াকাশ প্লাবিত করিয়া রহিয়াছ সত্য কিন্তু যে পাপরাশির বাধায় আমরা তোমার সেই ভরিত রূপ রাশি দেখিতে পাইতেছি না—তুমি সেই পাপরাশি দূরীভূত কর—রাহুগ্রাস যেমন যেমন নির্ম্মুক্ত হইতে থাকে তেমন তেমন শশধর শোভা যেমন লোক লোচনের বিষয়ীভূত হয়—সেইরূপ পাপের আবরণ যেমন যেমন সরিয়া যাইতে থাকে তেমন তেমন কল্যাণময়ী হৃদয়বিহারিণী তোমার কল্যাণময়স্বরূপ আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইবে। পাপ বাধা দূর হইবার পর নিত্যাদিত তোমার নব বিকসিত স্বরূপকেই আমরা—'শং' বা কল্যাণ বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীভীষ্মদেবের ঈশ্বর বিশ্বাস।

(১)

শ্রীভীষ্মদেব সাময়িকভাবে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রাঙ্গনে শরশয্যায়শায়িত অবস্থায় সর্ব্বান্তঃকরণ দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করতঃ গভীর বিশ্বাসে বলিয়াছেন—

"যে নমস্যন্তি গোবিন্দং
ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্॥"

"যে গোবিন্দকে নমস্কার করে তাহার কোনই ভয় থাকে না।" আমার অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত! আমি সংসার শয্যায় সতত রিপুশরশয্যা শায়িত হইয়াও সেই সর্ব্বভয়হারিকে স্মরণ করা ত দূরের কথা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেও পারি না! কিন্তু আমাকে আজ এই ভীষ্মবাণীতে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে—

"যে নমস্যন্তি গোবিন্দং
ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্।"

যে দিন আমি বিদ্যা সম্পৎ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব শ্রীগুরু চরণে দান করতঃ বলিতে পারিব আমার সর্ব্বস্ব তোমার, আমিও তোমার, সেই দিন গুরু স্নেহ ও আশ্বাসের বাণী শুনাইবেন—

"অভয়ং বৈ জনক ! প্রাপ্তোঽসি"

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৪।২।৪।

তিনি নিজেও বলিয়াছেন—

"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো
দদাম্যেতৎ ব্রতং মম।" রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড।

দয়াল বলিয়াছেন "সর্ব্বভূতেয় অভয় দান আমার ব্রত!" আহা আমি কি আজ উহা বিশ্বাস করি? সিন্ধু যে বিন্দুকে বুকে ধরিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্বেলিত হইয়া সতত ডাকিতেছেন সে গভীর গর্জ্জন ত এ বধিরকর্ণে প্রবেশ করে না।

আমি এ সংসারে আসিয়া কত দুঃখই পাইতেছি। কিন্তু দুঃখহারীকে অবিশ্বাস করিয়া স্বক্ষমতায় দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু ভীষ্মদেব বলিতেছেন

যং সুরাসুরগন্ধর্ব্বাঃ
সিদ্ধা ঋষি মহোরগাঃ।
প্রযতা নিত্যমর্চ্চন্তি
পরমং দুঃখভেষজম্॥

তুমি সুরাসুর গন্ধর্ব্ব যাহাই হও না কেন দুঃখের হাতে নিস্তার নাই, ঐ দেখ—

"বিততো মৃত্যু পাশঃ"

"কাল জাল ফেলেছে এ জল দেখিয়ে গভীর"—তুমি কোথায় পলাইবে? সর্ব্বত্র মৃত্যুদুঃখ সুবিস্তৃত রহিয়াছে। সর্ব্বদুঃখের পরম ঔষধ— ভগবচ্চরণশরণ ভিন্ন দুঃখের হাতে কিছুতেই নিস্তার নাই। তাই ভীষ্মদেব গভীর বিশ্বাসে বলিতেছেন—"দেব, দানব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ সতত সংযত হইয়া দুঃখের পরম ঔষধ যে ভগবান্‌কে সর্ব্বদাই অর্চ্চনা করিতেছেন, আমি শর শয্যাশায়িত অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।" অভিপ্রায় এই যে— ঘোরতর সংসার বিপদে মগ্ন হইয়াও যাঁহার নাম বিবশভাবে কীর্ত্তন করিলেও

জীব সদ্যঃ পবিত্র হইয়া পরমগতি লাভ করে, সেই ভয়েরও ভয় স্বরূপ অভয় দাতা শ্রীভগবানকে যে অন্ত্যকালে স্মরণ করিতে পারে তাহার পরমগতি লাভ অবশ্যম্ভাবী”—তাই ভীষ্মদেব শরশয্যাশায়িত হইয়া তাঁহাকে গভীর বিশ্বাসে স্মরণ, প্রণাম ইত্যাদি করিয়াছেন।

শ্রীভীষ্মদেব যাদৃশ পুরুষ, শরশয্যায় শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ না করিলেও তাঁহার পরমগতির বাধা হইত না, কারণ তিনি নিয়ত ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মে যিনি নিয়ত বিচরণ করেন ব্রহ্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন? আমার মত জীবের যে **“অন্ত্যে নারায়ণ স্মৃতিই”** একমাত্র সম্বল ইহাই উপদেশ করিবার জন্যই ভগবদ্দ্রষ্টা শ্রীভীষ্মদেব অন্ত্যকালে তাদৃশ ভগবদ্‌বিশ্বাসে শ্রীভগবান্‌কে তাদৃশভাবে স্তবাদি করিয়াছেন।

পঞ্চম বেদ আর্ষ মহাভারত ভীষ্মদেবের এই ভগবদ্ বিশ্বাস, ভগবৎস্মরণ, ভগবৎস্তুতি প্রভৃতি যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কুরুক্ষেত্রের সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ দরিদ্র প্রভৃতিকে দানাদি করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ লব্ধ-রাজ্য পুত্র পৌত্রাদি শোক পরিতপ্ত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে দান করিয়া **“সুখমাস্তে”** সুখে আছেন।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির—**“কৃতাঞ্জলিঃ বাসুদেবমভ্যগচ্ছৎ”**—করজোড়ে শ্রীভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—**“তব প্রসাদাৎ ভগবন্! বয়ং রাজ্যমনুপ্রাপ্তাঃ”** “হে ভগবন্! তোমারই প্রসাদে আমরা এই রাজ্য লাভ করিয়াছি।” লীলাময় কোন উত্তর না দিয়া ধ্যানযুক্ত হইলেন! এ আবার কি লীলা? যিনি সকলের ধ্যানের বস্তু তাঁহার আবার ধ্যান কেন? তাই ধর্ম্মরাজ পরমবিস্ময়ে বলিলেন—**“কিমিদং পরমাশ্চর্য্যম্”**—এ আবার কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! লীলাময়! এ আবার তোমার কি লীলা? তুমি পাষাণের মত নিশ্চল হইলে কেন—**“পাষাণ ইবনিশ্চলঃ”** হে মাধব! তুমি কাষ্ঠকুড্যশিলার মত নিশ্চেষ্ট হইলে কেন—**“কাষ্ঠকুড্যশিলা” “ভূত্বো নিরীহশ্চাসি মাধব!”** আমি প্রপন্ন হইয়া যাচ্ঞা করিতেছি তোমার এই ধ্যানলীলারহস্য উদ্‌ঘাটিত কর—

“ত্বৎপ্রপন্নায় ভক্তায় শিরসা প্রণতায় চ।
ধ্যানস্যাস্য যথাতত্ত্বং ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং বর॥”

লীলাময় শ্রীভগবান্ মৃদুমধুর হাস্য করিয়া ধর্ম্মরাজকে বলিলেন—

"শরতল্পগতোভীষ্মঃ
শাম্যন্নিব হুতাশনঃ।
মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাঘ্র
স্ততো মে তদ্‌গতং মনঃ॥"

শ্রীভগবানে কতখানি গভীর বিশ্বাস থাকিলে এইরূপ ধ্যান করা যায়? যে ধ্যানের শক্তিতে অনাদিনিধন আদ্য পুরুষোত্তম বিশ্বাত্মা ভগবান্ কাষ্ঠকুড্য শিলাভূত নিরীহ হইয়া বলিতেছেন—"আহা! ভক্ত ভীষ্ম আমার শরশয্যাশায়িত হইয়া অগ্নির মত নিভিতে বসিয়াছে, তাই অনন্যশরণ হইয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম আমাকে ধ্যান করিতেছে—আমি আর স্ববশে নাই, আমি আজ ভীষ্মের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছি।"

বিশ্বাত্মা ভগবান্ ভীষ্মাত্মায় মিশিয়া গিয়াছেন—এ কিরূপ কথা? ইহা কি আজ আমি বুঝিতে পারি? প্রাণপ্রয়াণ সময়ে কতখানি গভীর বিশ্বাসে কতখানি আকুলকণ্ঠে ডাকিলে কত গভীর ধ্যানে ভগবানকে স্মরণ করিলে তিনি আমার বুকে আসিয়া ঐ ভাবে সুখে থাকেন তাহা ভীষ্মদেব জগৎকে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আরও বলিতেছেন যে—

"একীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামম্
মনঃ সংযম্য মেধয়া।
শরণং মামুপাগচ্ছ—
ত্ততো মে তদ্‌গতং মনঃ॥"

সেই মনোময়ভারূপ পুরুষ বলিতেছেন—

শ্রীভীষ্মদেব মনকে সংযত করতঃ যোগজমেধা দ্বারা সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রামকে এক করিয়া আমাকে শরণ লইয়াছেন, তাই আজ আমার মন তাঁহাতে মিশিয়া গিয়াছে!"

যে সময়ে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ মন ইহারা শক্তিহীন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং

"হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে"

ঐ অবস্থায় যখন "আত্মা নিষ্ক্রামতি"—তখন সেই পরম অশরণ অবস্থায় মনঃ সংযম পূর্ব্বক সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রামকে এক করিয়া শ্রীভগবানের চরণ শরণ করা কিরূপ ব্যাপার? ইহা আমি বুঝিতে পারি কি? সর্ব্বদা শ্রীভগবানের লীলাস্মরণপূর্ব্বক তাঁহার নাম করার অভ্যাস না থাকিলে, অন্তাকালে সেই অভয় চরণ স্মরণ করা অসম্ভব। পরব্রহ্মে সতত বিচরণশীল নিয়ত ব্রহ্মচারী শ্রীভীষ্ম-দেবের পক্ষে উহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু আমার পক্ষে ইহা কি ভাবে সম্ভব হইবে তাহাও শ্রীভীষ্মদেব গভীর বিশ্বাসমুখে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণব্রতাঃ কৃষ্ণ মনুস্মরন্তো
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে কৃষ্ণদেহা প্রবিশন্তি কৃষ্ণ—
মাজ্যং যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে॥"

কৃষ্ণকে যিনি জীবনের ব্রত স্বরূপ করিয়া প্রাতে সায়ং দিবারাত্র সর্ব্বদা স্মরণ করেন তিনি কৃষ্ণদেহ হইয়া মন্ত্রসংস্কৃতঘৃতের ন্যায় তাঁহাতে প্রবেশ করেন। সুতরাং অন্তাকালে শ্রীভীষ্মের মত পরমাগতি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের স্মরণ প্রয়োজন। অশোকবনে দয়িতবিরহতাপতপ্তা মাতা সীতার শ্রীরামধ্যানবর্ণনায় বৃদ্ধ ঋষি বাল্মীকি এবং দৈত্যবালকগণের সঙ্গে শ্রীপ্রহ্লাদের আলাপ বর্ণনায় নারায়ণমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সর্ব্বদা ভগবৎ স্মরণতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন (!) বাল্মীকির সে বর্ণনায় সার কথা এই

"সর্ব্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী।"

সর্ব্বাত্মা দ্বারা প্রাণারাম রামকে স্মরণ করতঃ রামদয়িতা সীতা রামময় হইয়া গিয়াছেন। বঙ্গ কবি কৃত্তিবাস উক্ত ঋষি বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"ঐ মোর রাম!
পত্রে পত্রে
ছত্রে ছত্রে দুর্ব্বাদল শ্যাম।"

জীবন সংগ্রাম পর্য্যুদস্ত সতত দুঃখ তপ্ত আমি মায়ের এই মূর্ত্তি ধ্যান করিলে বুঝিতে পারিব যে—বিপদের বিষম ঝঞ্ঝাবাতে কি ভাবে প্রাণারামকে বুকে

ধরিয়া আরামে থাকা যায়। অশোক বনে মাতা সীতা রাবণ প্রপীড়িতা হইয়া রাম স্মরণে রামময়ী হইয়া গিয়াছেন; আর আমি?

ভববনে বদ্ধ পাপ পীড়িত হইয়া
একবারে তাঁর নাম গিয়াছি ভুলিয়া।

প্রহ্লাদ দৈত্য বালকগণকে বলিয়াছেন যে—"হে অসুর আত্মজগণ শ্রীভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করা কিছু কঠিন কার্য্য নহে, কারণ তিনি স্বতঃসিদ্ধ আত্মমূর্ত্তিতে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বাস করিয়াছেন—"

"নহ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বদা॥"

ভাগবত। ৭ম স্কন্ধ প্রহ্লাদ বাক্য

অতএব যিনি সর্ব্বভূত আত্মা সুতরাং আমারও আত্মা তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ কঠিন কার্য্য হইবে কেন? তাই শ্রীভীষ্মদেব তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন—

"যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বম্
যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং
তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥"

"যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল কারণ এবং যিনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত সেই সর্ব্বময় শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি।", সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের স্মরণ ভিন্ন সর্ব্বরূপে তাঁহার উপলব্ধি হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। জগতের অপূর্ব্ব মহাপুরুষ নিয়ত ব্রহ্মচারী শ্রীভীষ্মদেব সমগ্র জীবন দ্বারা ঐ সত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন আর্য্যমহাভারত বলিতেছেন—

"অভিগম্য তু যোগেন ভক্তিং ভীষ্মস্য মাধবঃ।
ত্রৈলোক্যদর্শনং জ্ঞানং দিব্যং দত্ত্বা যযৌ হরিঃ॥"

বিশ্বনাথ বিশ্বের মধ্যেই বিরাজিত, বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বনাথকে ধরিতে হইবে, শ্রীভীষ্মদেব জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা বিশ্বরূপেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহাকে "**সর্ব্বাত্মনে নমঃ**"— বলিয়া প্রণাম করিতে পারিয়াছেন। বিশ্বাত্মা মাধবও ঐশ্বরযোগ দ্বারা ভীষ্মের তাদৃশ

ভক্তিকে গ্রহণ করতঃ "ত্রৈলোক্য দর্শন জ্ঞান" দান করিলেন। ইহাই জীবের চরম ও পরম কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের কিঞ্চিৎ উন্মেষের আশায় ভীষ্মপ্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি ভাগ্যে থাকে তবে একথা আরও বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশরৎকমল ভট্টাচার্য্য।

সাধন ধর্ম্মরক্ষার উপায়।

(সিদ্ধ সাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব লিখিত।)

মনুষ্যই এ পার্থিব জগতে চতুরশীতিলক্ষ জীবের মধ্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞানগুণের আধারভূমি ও সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রধান জাতি। জগতের সকল জীবই অপূর্ণ, পূর্ণ কেবল মনুষ্যজাতি; তাই, পূর্ণজ্ঞানপরিপূর্ণ শাস্ত্রের আদেশ বুঝিবার, বুঝাইবার এবং কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার তাহারই আছে। শাস্ত্র মন্ত্রময়—বাঙ্ময়; সেই মন্ত্রশক্তি বাক্‌শক্তি যাহাদিগের নাই, তাহারা শাস্ত্রের আজ্ঞায় লোকাতীত গুরুগম্ভীর তত্ত্বসকল আয়ত্ত করিবে কি উপায়ে? তদ্রূপ মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে, যে পরিমাণে সেই বাক্‌শক্তি ও মন্ত্র-শক্তিবিবর্জ্জিত, সে সেই পরিমাণে অপূর্ণ জাব, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তও সত্য এবং সেই সত্যের দ্বারে পিতামাতা গুরুজন আত্মীয়স্বজন যিনিই কেন না হউন, কাহারও অব্যাহতি নাই। কারণ, পিতামাতা গুরুজন তোমার আমারই গুরু-জন; শাস্ত্রেরও গুরুজন নহেন, শাস্ত্র যাঁহার আজ্ঞা তাঁহারও গুরুজন নহেন। ধরিয়া লও, যে যুক্তিতে পিতামাতা বলেন, পিতামাতার আজ্ঞালঙ্ঘন সন্তানের মহাপাপ, সেই যুক্তিতেই তাঁহারা নিজেরাও পাপের দায়ে অব্যাহতি পাইতে-ছেন না। কারণ, কাহার নাম পাপ, কাহার নাম পুণ্য, তাহা তাঁহারা শিখিয়াছেন বুঝিয়াছেন শাস্ত্রের নিকট হইতেই। কেননা গুরুজনের আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে পাপ হয় কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া ভিন্ন তাঁহাদেরও আর উপায় নাই। এইরূপে নিজের পক্ষ সমর্থনের সময়ে শাস্ত্রকে

তাঁহারা যখন একবার প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন অন্য সময়ে সে শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষা করিবার শক্তিসামর্থ্য তাঁহাদের কি আছে? বরং যে পাপের ভয় আজ তাঁহারা সন্তানকে দেখাইতেছেন, সেই পাপের ভয় দেখাইয়াই প্রকারান্তরে তাঁহারাও সেই পাপে লিপ্ত হইতেছেন। একজন্মের পিতামাতার আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে যদি পাপ হয়, তবে এ অনন্তকালে কোটী কোটী জন্মজন্মান্তরের পিতামাতা যিনি, তাঁহার আজ্ঞা শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া আজকালকার পিতামাতা মহাপাপী অপেক্ষাও মহাপাপী কি না, তাহা একবার সেই যুক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট হইতেই বুঝিয়া লও। ডিপুটী ম্যাজিষ্টার কালেক্টর জজ সবজজ মুন্সেফ ইত্যাদি ধর্ম্মাধিকরণের কর্ম্মচারিবর্গ নীতিশাস্ত্র আইনের অভিজ্ঞ বলিয়া তোমার আমার পক্ষে বিচারক হইলেও ভারতেশ্বরীর নিকটে যেমন তিনিও একজন সাধারণ প্রজা বই আর কিছুই নহেন; জন্মদান লালন পালন, বিদ্যাবুদ্ধি গৌরবাদিতে পিতামাতাও তদ্রূপ তোমার আমার নিকটে পাপপুণ্যের নির্ণয়কর্ত্তা গুরুজন হইলেও সেই অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর রাজ্যে একজন সাধারণ জীব বই আর কিছুই নহেন। তথাপি যদি তাঁহারা আপনাকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ অভিজ্ঞ ন্যায়ান্যায়ের বিচারক বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অধিকন্তু এইটুকু হয় যে, একজন অনভিজ্ঞ সাধারণ প্রজা অপরাধী হইলে সেই বিচারকের নিকটে তাহার যে দণ্ড হইবে; আবার আইনের অভিজ্ঞ সেই বিচারক যদি সেইরূপ কোন অপরাধে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন, তবে তাঁহার দণ্ড সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা দশগুণ শতগুণ অধিক হইবে, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত; কেন না তিনি জ্ঞানকৃত পাপী;—তদ্রূপ অনভিজ্ঞ সন্তানও পিতামাতার নিকটে অপরাধী হইলে সেই পাপে যে পরিমাণে দণ্ডিত হইবে, পিতামাতা আবার সেই অপরাধে অপরাধী হইলে জগৎ পিতা বা জগন্মাতার নিকটে ততোধিক শতদণ্ডে দণ্ডিত হইবার কথা। তাই এখন জিজ্ঞাসা করি যে সন্তানকে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে দেখিলে পিতামাতা যদি বিরুদ্ধাচারী এবং বিরুদ্ধশাসনকারী হয়েন, তবে সে পিতামাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সন্তান পাপী হইবে কোন্ শাস্ত্রের কোন্ যুক্তি অনুসারে? যে শাস্ত্রের আজ্ঞাবলে পিতামাতা আজ গুরুজন বলিয়া গৌরবিত, সেই শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া দুর্জ্জনতার পরিচয় দিয়াও তাঁহারা গুরুজন থাকিতে চাহেন কোন্ সাহসে? যে আইনের বলে বিচারক আজ বিচারক, বিচারক নিজে সেই আইনের অবজ্ঞা করিলে তিনি বিচারক থাকিবেন কাহার বলে? তাই, শাস্ত্রানুসারে ইহাই

বুঝিতে হইবে যে, মানবকুলে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই শাস্ত্রের দাস। শাস্ত্রের বাক্য ঈশ্বরের আজ্ঞা; পিতামাতা যদি সেই ঈশ্বরাজ্ঞার বিরুদ্ধে আজ্ঞা প্রদান করেন, তবে সে সময়ে তাঁহাদের সে আজ্ঞা গুরুজনের আজ্ঞা বলিয়া কখনই গ্রাহ্য নহে। পিতামাতা উন্মাদগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত হইলে গুরুজন হইলেও সে সময়ে তাঁহাদিগের সেই সকল প্রলাপ আজ্ঞা যেমন পিতামাতার আজ্ঞা না বুঝিয়া বিকারের আজ্ঞা বা উন্মাদের আজ্ঞা বলিয়া বুঝিতে হইবে; স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধচারী হইলে সে পিতামাতাকেও তদ্রূপ উন্মাদগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত মনে করিয়া দূর হইতে প্রণাম করিতে হইবে। তবে পিতামাতা সত্য সত্যই বিকার-গ্রস্থ কি না, তাহাও বুঝিবার বিষয়। বুঝিবার উপায়, হয় চিকিৎসকের মুখে, আর না হয় রোগের নিদান কোথা হইতে হইল তাহারই মূল নিদানশাস্ত্রে। স্থূলকথা, যাহার যাহা স্বভাব, তাহার অভাবও ভাবান্তরের প্রভাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে, উহা হয় উন্মাদ, না হয় বিকারের লক্ষণ।

তাই, আমরা শাস্ত্রানুসারে দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ্য বৃত্তি রক্ষা করাই ব্রাহ্মণের স্বভাব, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হউন, আর বি, এ, বি. এল, এম, এ, বিএল, এম এস, আর, সি, আই, আর, রায় বাহাদুর রাজা মহারাজা, জজ মাজিষ্টার কালেক্টর মুন্সেফ, শিক্ষক মহাজন ধনী জমীদার, কুলীন শ্রোত্রিয়, গুরু পুরোহিত যিনিই কেন না হউন, যিনি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে, তাঁহাকেই উন্মাদে বা বিকারে ধরিয়াছে। হইতে পারে তিনি লোকসমাজে ধনী মানী জ্ঞানী গুণী, কিন্তু শাস্ত্রের দ্বারে হয় মদান্ধ দাম্ভিক অসুর, স্বেচ্ছাচারী পিশাচ পশু; আর না হয় সংসারে বিষয়ের দাস অন্ধ ভ্রান্ত স্বার্থপর জড়জীব অথবা নরকের কীট বিশেষ। তাই তিনি তোমার গুরুজন হউন, আর স্বজন হউন, শাস্ত্রের নিকটে দুর্জ্জন বই আর কিছুই নহেন। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া এইসকল গুরুজন স্বজনের অবিচারে অত্যাচারে যদি দেহক্ষয় পর্য্যন্তও করিতে হয়, তবে সেস্থলেও জানিবে—ভগবানের অমোঘ আজ্ঞা—"স্বধর্ম্মেনিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" স্বধর্ম্মে নিধন হয় সেও মঙ্গল, তথাপি পরধর্ম্ম কি ইহলোকে, কি পরলোকে উভয়স্থলেই ভয়ঙ্কর। আর স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেহক্ষয়ের আশঙ্কা ও আতঙ্ক কোন কালেই নাই, সে পক্ষেও ভগবানের আজ্ঞা—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অল্প হইলেও তাহা ইহপরলোকের মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে"। অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, আর্য্যসমাজের প্রত্যেক

নরনারীর কর্ণকুহর যাঁহার পবিত্র চরিত্রে চিরভূষিত সেই আদি দৈত্যকুল তিলক-কুমার ভগবদ্ভক্তচূড়ামণি মহাত্মা প্রহ্লাদই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। হিরণ্যকশিপু অবশ্যই প্রহ্লাদের গুরুজন ছিলেন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, গুরু বলিয়া প্রহ্লাদ পিতার প্রতি কোন অহিতাচরণও করেন নাই, বরং প্রহ্লাদের ধর্ম্মদ্রোহী মদান্ধ দৈত্যরাজ স্বাভাবিক পুত্রস্নেহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া ঔরসজাত শিশু পুত্রের প্রতি চিরশত্রুর ন্যায় অসম্ভব অলৌকিক অত্যাচার সকল নিয়ত অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। পিতৃআজ্ঞার অবজ্ঞাকারী অপরাধী পুত্রের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া দৈত্যরাজের ত দোষগ্রস্ত হইবার কথা ছিল না; পিতার আজ্ঞা নিয়ত অবনত মস্তকে প্রতিপালন করাই পুত্রের ধর্ম্ম, তবে সে ধর্ম্মচ্যুত হইয়াও প্রহ্লাদই বা ভগবানের নিকটে দণ্ডিত হইলেন না কেন? আর সেই শাস্ত্রবাক্য অনুসারেই পুত্রের দণ্ডবিধান করিয়া হিরণ্যকশিপুরই বা অসম্ভব মৃত্যুকাণ্ড ঘটিল কেন? আজকালকার দৈত্যজাতির পিতামাতার দলও ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবেন, সাধনধর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিকটে বিরুদ্ধাচারী হইলে সকল পিতারই ঐরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। পিতার আজ্ঞা অবনত মস্তকে প্রতিপাল্য, যদি তাহা স্বধর্ম্মের অনুমোদিত হয়। অন্যথা, জানিবে—পিতার আজ্ঞা হইলেও তাঁহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাক্য বিষবৎ পরিহার্য্য। কর্ণপুত্র বৃষকেতু পিতার আজ্ঞানুসারে অতিথির সেবার জন্য নিজ দেহ পর্য্যন্ত দান করিলেন যে স্থলে পিতার আজ্ঞা অতি কঠোর হইলেও উহা তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অনুমোদিত; তাই মহারাজ কর্ণ অতিথি ব্রাহ্মণের সেবার জন্য স্বহস্তে পুত্রহত্যা করিয়াও ভগবৎপ্রসাদে হতপুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"পাতীতি পিতা"। যিনি রক্ষাকর্ত্তা তাঁহারই নাম পিতা। যিনি যে ভাবে যে পরিমাণে রক্ষা করেন, তিনি সেই ভাবে সেই পরিমাণে পিতা। এইজন্যই পিতৃত্ব পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥"

যিনি অন্নদান করিয়া দেহরক্ষা করেন, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, যাঁহার কন্যাকে বিবাহ করা হইয়াছে, যিনি জন্মদান করিয়াছেন, আর যিনি উপনয়ন সংস্কারে সাবিত্রী দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সেই আচার্য্য গুরু, এই পাঁচ জনকেই পিতা বলিয়া জানিবে।" এই পাঁচ জনের মধ্যেও আবার

পূর্ব্বোক্ত চারিজনই সংসারধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা পিতা, শেষোক্ত আচার্য্য গুরুই কেবল ইহলোকে পরলোকে সাধনধর্ম্মের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা পরম পিতা। এই জন্যই মনু বলিয়াছেন—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।"

উৎপাদক ও ব্রহ্ম (বেদমন্ত্র) দাতা, এই উভয়বিধ পিতার মধ্যে বেদদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ।" ভগবানের নিজ মুখের আজ্ঞা —

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।"

আচার্য্যকে আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না।"

শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষয়াচার্য্যমূর্ত্তিস্থঃ"

সেই ভগবানই স্বয়ং আচার্য্যমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া শিষ্যকে পরম তত্ত্বে যোজিত করেন।" মনু আরও বলিয়াছেন,—

"তত্রাস্য মাতা সবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥"

সেই উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্মে ব্রাহ্মণকুমারের মাতা হয়েন সাবিত্রী (গায়ত্রী) এবং পিতা হয়েন আচার্য্য।" (বুঝি বা এই ভয়েই আজকাল্কার পিতা সকল পুত্রের উপনয়নে নিজেই আচার্য্য গুরু হইয়া থাকেন।) এখন, ব্রাহ্মণকুমার! জানিও যে পিতামাতা তোমার শাসন করিয়া ভয় দেখান, তাঁহারা তোমার মানবজন্মের পিতা মাতা; কিন্তু যে জন্মে তুমি আজ দ্বিজ বলিয়া গৌরবিত তোমার সেই দেবজন্ম উপনয়নসংস্কারে মাতা হইলেন গায়ত্রী পিতা হইলেন, আচার্য্যগুরু। তোমার মানবজন্ম ও দেবজন্ম, উভয় জন্মের পিতামাতার মধ্যে কোন্ পিতামাতার শ্রেষ্ঠত্ব, তাহাও মানবকুলের আদিপুরুষ মনুর মুখেই শুনিলে; এখন বল তুমি কোন্ পিতামাতার আদেশ প্রতিপালন করিবে? আচার্য্য তোমাকে বলেন ব্রহ্মচারী হইতে, জন্মদাতা পিতা বলেন কর্ম্মচারী হইতে গায়ত্রীমাতা বলেন ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিতে গর্ভধারিণী জননী বলেন চাকরীর জন্য সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে। বল তুমি এখন ইহার মধ্যে কাহার আদেশ প্রতিপালন করিবে? আমরা লৌকিক যুক্তিতেও যতটুকু বুঝি, তাহাতেও বর্ত্তমান জন্মের পিতামাতাকে উপেক্ষা করিয়া যেমন জন্মান্তরের পিতামাতাকে

ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি না; তদ্রূপ ব্রাহ্মণকুমার! তুমিও তোমার বর্ত্তমান দ্বিজজন্মের পিতামাতা আচার্য্য ও গায়ত্রীর আজ্ঞা অবহেলা করিয়া জন্মান্তরের অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কাররূপ দ্বিজজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী মানবজন্মের পিতামাতার ধর্ম্মবিরোধী বাক্য এবং ব্যবহারের অনুসরণ করিতে পার না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সন্তানকে রক্ষা করাই পিতার ধর্ম্ম, যে পিতা যে পরিমাণে অধিক রক্ষা করেন, তিনি সেই পরিমাণে তত সমধিক গৌরবার্হ। ইতিমধ্যে আবার যিনি ইহলোক পরলোক উভয়স্থলে সন্তানকে সমভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বথা সম্পূর্ণ পিতা বলিয়া গৌরবিত। আর্য্য পিতা মাতা এই গৌরবেই চিরপূজিত ছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা প্রাণপ্রিয় পুত্রকে ইহ পরলোকের ভয় হইতে রক্ষার্থ সর্ব্বাগ্রে তাহাকে আচার্য্যগুরুর চরণে সমর্পণ করিতেন। কলির জীবের অদৃষ্টক্রমে আজকালকার পিতামাতা পরলোক বিষয়ে ঘোর নাস্তিক অথবা জন্মান্ধ হইয়া দিন দিন সে গৌরব সে পূজা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। যাঁহাদিগের নিজেরই পরলোকের ভয় ভাবনা নাই, তাঁহারা পুত্রের পরলোকের ভয় ভাবনা যে ভাবিবেন সে আশা আর কোথায়? তাই বলিতে ছিলাম, ইঁহারা যে দিন পুত্রের পরলোক শুভাশুভ চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই অর্দ্ধেক পিতৃত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাহার পর ইহলোকের জন্য যে অর্দ্ধেকভাগ অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেও নানা প্রকার কুশিক্ষা কুসংসর্গ কুবৃত্তি কু-অধ্যবসায়ের নিয়ত প্রশ্রয় দিয়া অর্দ্ধেক ভাগও হারাইয়াছেন। আজকাল্‌কার পিতা,পুত্রের জন্মদাতা হইয়াও নিজেই পুত্রহত্যার মন্ত্রণাদাতা, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

যে পিতার প্রশ্রয়ে প্ররোচনায় অনার্য্য অনুষ্ঠান দোষে সন্তান ইহপরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইলেন, সে পিতাকে পুত্রের হন্তা না বলিয়া পিতা বলিব কোন্ উপায়ে? তাই বলি বলিতেছি—যে পিতা বাল্যকালে হইতে তোমার পূর্ব্বপুরুষাবলীর নাম না শিখাইয়া স্কুল কলেজে পাঠাইয়া প্রকারান্তরে ম্লেচ্ছ যবনের বংশাবলীর নাম তোমার কণ্ঠস্থ করাইয়াছেন, যে পিতা তোমার উপনয়ন সময়ে বেদবেদাঙ্গের অধ্যাপক তাপস আচার্য্যের হস্তে তোমাকে সমর্পণ না করিয়া যদৃচ্ছাচারী ধর্ম্মবঞ্চক পুরোহিতের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন অথবা এই সকল কুবৃত্তিসত্বেও দাম্ভিকতায় অন্ধ হইয়া নিজেই তোমার আচার্য্য গুরুর ভার গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চয় জানিও—সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন। উপনয়নের সময় হইতে মৌঞ্জী মেখলায় যে পিতা তোমার কটীতট

সম্বন্ধ না করিয়াছেন, ভস্মস্তোম-ত্রিপুণ্ড্র তিলকে তোমার ব্রাহ্মণদেহ অলঙ্কৃত না করিয়াছেন, রুদ্রাক্ষতুলসীমালায় তোমার কণ্ঠবক্ষঃ শিখাশিরঃ বাহুসন্ধি সুশোভিত না করিয়াছেন, পবিত্র প্রতিগ্রহ প্রদানে তোমার অন্নময় কোষ পূত পবিত্র না করিয়াছেন, সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন। যে পিতা তোমাকে প্রাতঃস্নান করাইয়া কাষায়বসন পরাইয়া কুশাসনে বসাইয়া নিজগৃহে দেবস্থানে অথবা নদীতীরে সূর্য্যাভিমুখে তোমায় প্রাতঃসন্ধ্যা না করাইয়াছেন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন ত্রিকালে প্রত্যক্ষজ্যোতিস্ময় পরব্রহ্ম সূর্য্যমণ্ডলে মহাশক্তিস্বরূপিণী গায়ত্রীর ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী ত্রিমূর্ত্তির ধ্যান ধারণা করিতে শিক্ষা দেন নাই, ত্রিসন্ধ্যায় রক্তচন্দনমিশ্র জলপূর্ণ অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া—অক্ষত দূর্ব্বা কুশ তিল কমল করবীর কুসুমদানে সেই অর্ঘ্য সুসজ্জিত করিয়া প্রত্যক্ষ ভগবান্ সূর্য্যদেবের অভিমুখে মন্ত্রপূত করিয়া তাহা প্রদান করান নাই, নিশ্চয় জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন। যে পিতা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় অন্ততঃ একসন্ধ্যায় শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজায় তোমাকে ব্যাপৃত দেখিয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করেন নাই, যে পিতা নিজগৃহে দেবদেবীর নিত্যনৈমিত্তিক উপাসনা আরাধনা মহোৎসবে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে সুসজ্জিত অলঙ্কৃত করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে দেবতায় সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রণাম করিতে আদেশ করেন নাই, যে পিতা নিজ বংশের আরাধ্য দেবতামূর্ত্তিতে তোমার আশৈশবসিদ্ধ অচলাভক্তির বীজ রোপণ করেন নাই, তীর্থ দর্শনে দেবদর্শনে যাত্রা করিতে যে পিতা তোমাকে আগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ সহকারে সর্ব্বাগ্রে সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই, পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধদিনে পিণ্ডদানের পর যে পিতা তোমাকে গললগ্নীকৃতবাসে পিতৃপুরুষের সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া "আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও—এই তোমাদের ভাবী জলপিণ্ডের আশা ভরসার স্থল" বলিয়া গদগদকণ্ঠে তোমাকে সঙ্গে করিয়া নিজ পিতৃপিতামহের উদ্দেশ্যে প্রণত না হইয়াছেন, জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন।

উপনয়নের পর হইতে যে পিতা তোমাকে কুপ্রতিগ্রহ, কুসংসর্গ ও কুভোজন হইতে নিবৃত্ত করেন নাই, যে পিতা তোমার দণ্ড বিসর্জ্জনের পর হইতেই তাপসের তপোবনে অথবা ব্রহ্মচারীর আশ্রমে তোমাকে গুরুকুলবাসের জন্য পাঠাইয়া দেন নাই, জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন! যে পিতা তোমাকে বাল্যকাল হইতে বীরাসনে পদ্মাসনে অথবা স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিতে, বিভূতি গঙ্গামৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিতে, মৃগচর্ম্ম বল্কল

কাষায় কৌপীন পরিধান করিতে, প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে কুশকুসুমসমিধ বিল্বপত্র তুলসীপত্র আহরণ করিতে, নিজবেদোক্ত শাখানুসারে ত্রিসন্ধ্যায় অগ্নিমণ্ডলে হোম করিতে, স্বাধ্যায়ে সর্ব্বদা আচার্য্যগুরুর চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে এবং বেদমন্ত্র শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন নাই, জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন। বেদবেদাঙ্গ ও বেদান্তশাস্ত্র পরিহার করিয়া জীবিকার জন্য ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ধর্ম্মানুগত স্বধর্ম্মতত্ত্ববিরহিত ভগবত্তত্ত্ব বিবর্জ্জিত ব্রহ্মবৃত্তি বিরোধিত ক্ষণভঙ্গুর জগতের অকিঞ্চিৎকর স্থূল স্থূল পার্থিব বিষয় সম্বলিত উপবিদ্যা বা অবিদ্যার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিয়া নিজবংশে ও তোমার এই উপবীত ব্রাহ্মণদেহে শূদ্রত্ব অনার্য্যত্ব বা ম্লেচ্ছত্ব যবনত্ব পৌছাইয়া দিয়া, তোমার জন্মজন্মান্তরের বহু পুণ্যফলে উপার্জ্জিত এই ব্রাহ্মণজন্ম অধঃপতিত করিয়াছেন, জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন। দেবতার দাসত্ব, গুরুর দাসত্ব, ধর্ম্মের দাসত্ব, পূর্ব্বপুরুষের দাসত্ব পরিহার করাইয়া যে পিতা ম্লেচ্ছ যবন বা শূদ্রের দাসত্বের জন্য তোমাকে লালায়িত করিয়াছেন, বেদ দেব গুরু ব্রাহ্মণ চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রাখিয়া ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যার জন্য তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া ব্রাহ্মণোচিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত দৈনন্দিন ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে তোমাকে শিক্ষা প্রদান করেন নাই; শম দম ধৈর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সুসজ্জিত হইতেউপদিষ্ট করিয়া তোমাকে পূর্ণমানবত্বের অধিকারী করেন নাই, অধিকন্তু বিলাসিতা অলসতা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতির প্রশ্রয় দিয়া তোমাব জন্মান্তরপুণ্যফললব্ধ মানবত্বের অবলোপ করিয়াছেন জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন। যে পিতা তোমাকে ত্রিংশদ্ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে দ্বাদশবর্ষ-বয়স্কা কন্যার অথবা চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃ-ক্রমের পূর্ব্বে অষ্টবর্ষ বয়স্কা কন্যার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না করিয়াছেন কিংবা হীন-কুলজাতা দুর্লক্ষণা দুশ্চরিত্রা ব্যঙ্গাঙ্গী বা বিকৃতাঙ্গী অথবা ধনক্রীতা পত্নী নামের অযোগ্যা দাসীবদ্ ব্যবহার্য্যা ভার্য্যার সহিত তোমাকে সংযোজিত করিয়া তাহারই গর্ভোৎপন্ন পুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজ পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ জল পিণ্ড লোপ করিয়াছেন, জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন। যে পিতা তোমার ষোড়শবর্ষবয়ঃক্রমে যথাশাস্ত্র গুরুর নিকটে নিজ পূর্ব্বপুরুষের উপাসিত কুলদেবতার মহামন্ত্রে তোমাকে দীক্ষিত না করিয়াছেন; যে পিতা তোমার অভীষ্টদেবতার ধ্যানধারণা উপাসনায় উত্তর সাধকরূপে তোমার সহায় না হইয়া তোমার এবং তাঁহার নিজের জন্মজীবন সার্থক না করিয়াছেন,

সেই পুণ্যফলে নিজ পূর্ব্বপুরুষ পিতৃলোকের মুক্তিদ্বার উদঘাটিত না করিয়াছেন, বিবেক বৈরাগ্য ও সাধনার তীব্রতেজে তোমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া অভীষ্ট দেবতার চরণাম্বুজে তাহা অঞ্জলি প্রদান না করিয়াছেন, জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন; যে পিতা তোমাকে যে কোন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া কেবল অর্থলোভে দিগদিগন্তে ভিক্ষাপর্য্যটনে বিব্রত দেখিয়া সুখী হইয়াছেন, অথচ তোমার বিষয় বৈরাগ্য ও সিদ্ধিসাধনার সূত্রপাত দেখিলে অন্তরে ক্ষুব্ধ দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়াছেন, জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন। আর অধিক কি, যে পিতা তোমাকে নিজের সন্তান জানিয়া মায়া মমতা বাড়াইয়া স্বহস্তে লালন পালন করিয়া ধর্ম্মের সোপান পরম্পরায় সেই সাধের প্রিয়পুত্রকে নিত্য সুখ-শান্তিধামে ব্রহ্মময়ীর চরণপ্রান্তে পৌঁছাইয়া না দিয়া, অধিকন্তু নরকের জন্য অধঃপাতে অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছেন বা রাখিয়া গিয়াছেন, জানিও সে পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা নহেন!!

ক্রমশঃ।

যাবে?

যাবে?

কোথায়?

মৃত্যু সংসার সাগর পারে।

সংসারকে আমি অত ভয়ানক মনে করি না।

নাই কর, কিন্তু ক্লেশও ত পাও। কেন পাও জান? সংসার তোমাকে অতিশয় বন্ধন দশায় আনিয়াছে তাই। সংসার আসক্তি মুক্ত হইতে পারিলেই সুখী হইতে পারিবে।

কিসের বন্ধন?

ভবভোগ মহাহি পাশৈঃ—একটা মহাসর্প—একটা কালসর্প এই সর্প শরীর দিয়া তোমাকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়াছে। ভবঃ সংসারো ভোগঃ

শরীরং যস্য তাদৃশো যো মহানহিঃ কালস্তদীয়ৈঃ পাশৈঃ বন্ধনৈঃ। হইবে এই বন্ধন হইতে মুক্ত ? দেখনা কেন—ভোগই তোমার বন্ধন কিনা ? "শরীর ভোগার্থমহর্নিশং নরঃ" মানুষ শরীর ভোগের জন্য অহর্নিশ কত দুঃখ পাইয়া কর্ম্ম করিতেছে—ভাল করিয়া দেখ তোমার স্বাধীনতা যে নাই তাহা বুঝিবে। ভোগের অধীন হইলেই দুঃখ। ভোগরূপ কাল সর্প মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই মানুষের দুঃখ। কতদূর ভোগলুব্ধ মানুষ তাহা দেখ। সকল জীবই দুঃখ পায় যারা ভোগ লোলুপ। সর্প ভেককে গলাধঃকরণ করিতেছে, ভেক সাপের গলার ভিতরের মাংসখণ্ডকে খাদ্য কীট মনে করিয়া উহাকেই খাইতে যাইতেছে—কি আশ্চর্য্য—নিজে মরিতেছে—মরিবারকালেও ভোগ পাইয়া লুব্ধ তাই শাস্ত্র বলিতেছেন

যথা ব্যালগলস্থোঽপি ভেকো দংশানপেক্ষতে।
তথা কালাহিনাগ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্॥

খেয়ে খেয়েই যে মানুষ মরে—কালসর্পের উদরে ছুটে তাহা যাহারা দেখে না তারা মানুষ নয় তারা পশু। মানুষ কেবল ভোগই খুঁজে—কিন্তু ভোগই যে কাল সর্পের মুখ ব্যাদান—তাহা দেখে না—এমনি মোহ মানুষের। জরা ব্যাঘ্রীর মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসিয়াছে এও মানুষ দেখে না—বলত ইহাদের দুঃখ কত ? তাই বলিতেছিলাম ভবভোগ মহা-অহি-পাশ হইতে মুক্ত হইবে ?

হইব।

তবে—প্রত্যহ একবার করিয়া যুদ্ধকাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ের ৭০ শ্লোকটীর ভাবনা কর।

কি বলনা ?

যে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধসত্ত্বা
ধ্যায়ন্তি তস্য চরিতানি পঠন্তি সন্তঃ।
মুক্তাস্ত এব ভবভোগমহাহি পাশৈঃ
সীতাপতেঃ পদমনন্ত সুখং প্রয়ান্তি॥

সংসারের ভোগই হইতেছে শরীর যায় এইরূপ যে মহাসর্প ইনি সর্ব্ব সংহারক কাল বা মৃত্যু। ভোগবন্ধন হইতে মুক্ত যিনি হইয়াছেন—সংসারের কোন কিছুতেই আর যাঁহার আসক্তি নাই—যিনি দৃঢ়ভাবে নিশ্চয়

করিয়াছেন সংসার যাহা দেয় তাহাই ক্ষণিক, তাহাই ক্ষণবিধ্বংসি, সমস্তই মায়িক, সমস্তই মিথ্যা, এই যিনি সংসার দেখিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছেন—সব মিথ্যা একমাত্র ভিতরে ডুবিয়া ভগবানকে লইয়া থাকিতে পারিলেই স্বরূপ বিশ্রান্তি—ইহা যিনি স্থির করিয়াছেন তাঁহার প্রাপ্তি হইল কি? স্বরূপে স্থিতিতে কি পাওয়া গেল?

অনন্ত সুখ স্বরূপ ভূমা আনন্দ স্বরূপ সীতাপতির পরম পদই ইহা। সর্ব্বশাস্ত্র একমাত্র এই পরম পদের স্থিতির কথাই সর্ব্বত্র বলিতেছেন। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ—ইহাই জীবের সংসার সাগরের পরপার।

এখানে যাওয়া যাইবে কিরূপে?

প্রথমে পৃথিবীতে থাকিয়া শুদ্ধ সত্ত্ব হও—শুদ্ধ অন্তঃকণ হও, অর্থাৎ কোন কিছুতে রাগ বা অনুরাগ অথবা দ্বেষ রাখিও না—তাহা হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইল। হা গোবিন্দ! আমায় কৃপা কর বলিয়া বলিয়া চিত্তশুদ্ধি করিয়া রামকেই সতত ধ্যান করিবে আর সাধক সর্ব্বদাই রাম চরিত্র সকল পাঠ করিবে। এই হইলেই মৃত্যু সংসার সাগর পার হইয়া সীতাপতির পরম পদে স্থিতি লাভ করিবে। এই রামই সীতা, ইনিই গৌরী ইনিই শঙ্কর, ইনিই দুর্গা, ইনিই কালী ইনিই রাধা ইনিই কৃষ্ণ, ইনিই সূর্য্য, ইনিই বিষ্ণু, ইনিই গণপতি। একমাত্র পরম পদই সব সাজিয়া সংসার রূপে দাঁড়াইয়া আছেন। বাহিরে দেহ, বাহিরে সংসার, বাহিরে মায়া—এই মায়াই পরম পদের দেহ, এই মায়াই ব্রহ্মের শরীর। শরীরটাকে অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরের জ্যোতি, ভিতরের ভর্গরূপী শ্রীভগবানে ডুবিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

আচ্ছা শুদ্ধান্তঃকরণ হইব কিরূপে?

পাপ থাকা পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি হয় না। সেই জন্য পাপক্ষয় করিতে হইবে। স্থূল স্থূল পাপক্ষয় হয় তীর্থসেবায় এবং দানে। নিত্যকর্ম্ম ত করাই চাই। যথাসময়ে সন্ধ্যা বন্দনা, যথাসময়ে নিয়ম করিয়া জপ, সর্ব্বদার জন্য জপ, শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া জপ। ইহাতে হইবে প্রাণায়াম। শেষে হইবে বিচার। শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রাণায়াম ও বিচারে সব ফুটিবে।

তীর্থ সেবাতে ও দানে পাপক্ষয় হয়। কিন্তু তীর্থ সেবা ত সকলে পারে না, দানেও সকলের সামর্থ্য নাই।

আছে। মনে মনেও ইহা পারা যায়।

ভাল করিয়া বল দেখি কি করিতে হইবে?

রাত্রিতে প্রথম প্রহরে আহার করিয়া শয্যাকৃত্য করিয়া নিদ্রা যাও, শেষ রাত্রে যথাসময়ে উঠিতে পারিবে। রাত্রি ৪টায় উঠিয়া প্রথমে শয্যাকৃত্য কর। পরে তীর্থ ঘুরিয়া আইস।

কিরূপ করিব?

শৌচাদি শেষ করিয়া প্রথমেই মনে মনে সেতুবন্ধে চল। সেখানে ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া রামেশ্বর হর দর্শন কর। সঙ্কল্প করিয়া বারাণসীতে আইস। আসিয়া মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন কর। করিয়া যে গঙ্গাজল মণিকর্ণিকা হইতে আনিয়াছ তাহা দ্বারা রামেশ্বরকে স্নান করাও এবং সেই ঘট আবার সেতুবন্ধে নিক্ষেপ কর। ইহাই হইল স্নানের কার্য্য। ইহা মনে মনে কর। তাহার পরে মনে মনে দান। যেখানে যত দুঃখী দেখিয়াছ সকলকে অন্নবস্ত্রাদি মনে মনে দান কর। দরিদ্রকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইয়া বস্ত্র ও অর্থাদি দিয়া সন্তুষ্ট কর। সকলেই মনে মনে ইহা করিতে পারে আর যাঁহার সামর্থ্য আছে তিনি কার্য্যেও যথাশক্তি দান করুন, যথাশক্তি দুঃখীর সাহায্য করুন। তৃতীয় কার্য্য হইতেছে একমাত্র রামই সত্য আর রামই সব সাজিয়াছেন। তীর্থ সেবা তাঁহার আজ্ঞা—দান করা তাঁহারই আজ্ঞা তিনি ভাবিয়া দান কর ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হইবে।

তারপরে প্রাতঃকৃত্য কর। সর্ব্বদা রাম ভাবিয়া—রামের রূপগুণ স্বরূপ ভাবনা কর। শেষে রামচরিত্র স্বাধ্যায় কর—প্রত্যহ কর—লিখিয়া লিখিয়া পড় ইহা প্রত্যহ নিয়ম করিয়া অভ্যাস কর—যাহাতে পারিবে।

শ্রীশ্রীহংসমহারাজের কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী।)

আবার একস্থানে লিখিতেছেন, "আমিষাহারী যদিও নিজে হিংসা করে না কিন্তু হিংসার অনুমোদন করিয়া থাকে" ইত্যাদি। তাই বলিতেছিলাম, সংসারী ব্যক্তি অপেক্ষা এইরূপ সংসারত্যাগী প্রকৃত সাধু মহাত্মা ব্যক্তিগণই মৎস্য মাংসাদির অপকারিতা অর্থাৎ চিত্তের উপর

উহাদের তামসিক ক্রিয়া বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুবাবার এই ভাবটী আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি তিনি সবই খুব মৃদু ও সহজ করিয়া লন। যেরূপ বাক্যে কাহারও হৃদয়ে কোন ব্যথা বা উদ্বেগ জন্মিতে পারে সেরূপ ভাবের কোন বাক্য আমরা এ পর্য্যন্ত সাধুবাবার মুখে কোন দিন শুনি নাই। বরং লোকের মনে যাহাতে আশ্বাস জন্মে সেইরূপ ভাবেই সর্ব্বদা তিনি উপদেশ দান করিয়া থাকেন। একদিন আমাকে আশ্বাস দিয়া তিনি একটী বাক্য বলিয়াছিলেন সেই কথাটী আজ এই প্রসঙ্গে মনে উদয় হইতেছে। আমি বিশেষ কোন দৈহিক কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, সামান্য রৌদ্রের মধ্যে বাহির হইতে হইলেও আমার ছাতার প্রয়োজন হয় ইত্যাদি কারণে আমার সঙ্গীগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে, "আপনার কোন দিন তিতিক্ষা অভ্যাস হইবে না." আমি একদিন বাবার নিকট গিয়া সেই কথা বলায় তিনি মৃদু হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন, "কেন তিতিক্ষা হইবে না? যাহার যে দ্রব্য আছে প্রয়োজন বোধ করিলে তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে যাহা নাই তাহার নিমিত্ত অসুবিধা বোধ করা ঠিক নয়।" তিনি ইহা বলিয়া অল্পদিন হইল ভক্ত প্রদত্ত দেওঘর হইতে আনীত তাঁহার শয্যাস্থিত নূতন র‍্যাপ্ টা দেখাইয়া বলিলেন যে প্রয়োজন বোধ করিলে এখন ঐ র‍্যাপখানি গায়ে দিয়া থাকেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সাধুবাবার একটী মাত্র কম্বল ছিল। শীতকালে পাহাড়ের উপর নিদারুণ শীতে তিনি কেবলমাত্র এটীই ব্যবহার করিতেন। ইনি জীবনে নাকি কোন দিন লেপ ব্যবহার করেন নাই।

সে যাহা হউক, অদ্য আমাদের গাড়ী রিজার্ভ হইয়া যাওয়ার সংবাদ আসিয়াছে, সুতরাং অদ্য রাত্রেই আমাদের জসিডি পরিত্যাগ করিয়া যে যাইতে হইবে তাহা সাধুবাবাকে বলিলাম। ১৩২৮ সালে জসিডি হইতে রাত্রে রওনা হইয়া হাওড়া পৌঁছাইতে পথিমধ্যে কত বিঘ্নের পর বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের কত মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল এবং যেখানে আমাদের রাত্রে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সময় হাওড়া ষ্টেশনে পৌছাইবার কথা ছিল, সেখানে আমরা রাত্রে রওনা হইয়া পরদিন সূর্য্যাস্তগমনের পর পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম সেই কথাগুলি বাবার নিকট বিবৃত করিয়া বলিলাম। সাধুবাবা বসিয়া নীরবে আমার কথাগুলি শুনিয়া এইবার আমাদের নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছাইবার নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা তামাদের বাগানের

কয়েকটী গোলাপফুল তুলিয়া তাঁহাকে দিয়া প্রণাম করায় তাহা তিনি প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া ফুলগুলি স্বহস্তে লইয়া পুনর্ব্বার নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌছাইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার বাসস্থানাভিমুখে রওনা হইলেন।

আমরা জসিডি ত্যাগ করিয়া আসিলেও সেখানকার স্মৃতি আমাদের বড় আনন্দ দান করিতে লাগিল। সাধুবাবার উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীগুলি অনেক সময়ই হৃদয় অধিকার করিয়া রহিত। জসিডি অবস্থানকালে একদিন সাধুবাবাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "এত সব সুন্দর সুকাহিনী বাবা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন?" প্রত্যুত্তরে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, "কত দিবসাবধি কত পাহাড় পর্ব্বত বনজঙ্গলে কত সাধুসন্ন্যাসীর সহিত দিন অতিবাহিত হইয়াছে, সেই সময় তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে এ সকল গল্পগুলি পাইয়াছি।"

দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে একদিন সাধুবাবার নিকট গিয়া একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "যদি কেহ অপর কোন ব্যক্তির বাক্যে ভুল বুঝিয়া অথবা অপরের কার্য্য বা ব্যবহারের বিকৃত অর্থ মনে করিয়া লইয়া মনে অনর্থক ক্লেশ অনুভব করে তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির তাহাতে কোন অপরাধ হয়? সে হয়ত উহাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করে নাই কিম্বা ঐ কার্য্য করে নাই, কিন্তু তাহার স্বীয় বিকৃত বুদ্ধি বশতঃ অযথা হৃদয়ে দুঃখ পোষণ করিতেছে, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির কি কোন অপরাধ হয়?" সাধুবাবা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "না, তাহাতে তাহার কোন অপরাধ হয় না।" যদিও জানি ভগবান্ অন্তর্য্যামী, তিনি প্রত্যেক জীবের মনোভাব অবগত হইয়া তদনুযায়ী বিচারপূর্ব্বক দণ্ড ও পুরস্কার দিয়া থাকেন; বৃথা যদি কেহ স্বমনোকল্পিত কষ্ট পায় তাহাতে অন্যের পাপ হওয়া সম্ভব নয়? তবুও সেই কথাটী সেদিন পরিষ্কার ভাবে সাধুবাবার নিকট শুনিয়া মনের একটী সংশয় নষ্ট হওয়ায় মনটী পরিষ্কার হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। তাই আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি যাঁহাদের হৃদয় সম্পূর্ণ কামনা বাসনা বিরহিত, যাঁহারা একেবারে স্বার্থগন্ধশূন্য, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে হৃদয়ে স্বভাবতঃ যেন এক প্রকার পবিত্র ভাব ও বিমল আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। যেমন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, "যেস্থানে বসিয়া কোন মহাপুরুষ সাধনভজন করিয়া সিদ্ধ হন, সেস্থানে তাহার প্রভাব সুপ্তভাবে থাকিয়া যায়; অপর কোন ব্যক্তি যদি পরে উক্তস্থানে সাধন ভজন নিমিত্ত আসন করিয়া বসেন, তাহা হইলে উক্ত সাধকের চিত্তও সেই স্থান মাহাত্ম্যে বা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ সাধকের শক্তির প্রভাবে অল্পায়াসে স্থির হইয়া আসে"

—সেইরূপ আমিও বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যাঁহাদের চিত্ত সতত আনন্দময় এবং সর্ব্বদা প্রশান্তিপূর্ণ থাকে, তাঁহাদের নিকট গিয়া স্থিরভাবে কিয়ৎক্ষণ সময় বসিলে তাঁহাদের ভাব যেন অপর চিত্তে কিয়ৎপরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

সাধুবাবা একদিন আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন, সৎকার্য্য করিয়া তাহার পুরস্কারের নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে নাই। পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া কর্ম্ম করিয়া গেলে তাহার যে কিরূপ সুফল হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি একদিন একজন প্রভুর দুইটী ভৃত্যের উদাহরণ দিয়া, কথাটী স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পুরস্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া তাগাদা না করিলেও তিনি তাহা দিতে কখনই বিস্মৃত হন না। সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, এক প্রভুর দুইজন ভৃত্য ছিল। একজন ভৃত্য মাস গত হইলেই তাহার প্রভুর নিকট মাহিনার নিমিত্ত অত্যন্ত তাগাদা করিত। আর অপর ভৃত্যটীকে প্রভু মাহিনা দিতে চাহিলে সে বলিত, "উহা যখন আপনার নিকট আছে, তখন উহা আমারই রহিয়াছে। এখন আপনারই নিকট উহা থাকুক, পরে প্রয়োজন হইলে এক সময় লইলেই হইবে।" এই কথা বলিয়া সাধুবাবা বলিতেছিলেন যে, "মাহিনা উভয় ভৃত্যই পাইবে, কর্ম্ম করিয়া কেহই প্রভুর নিকট বঞ্চিত হইবে না, কিন্তু প্রভু এই উভয় ভৃত্যের মধ্যে কাহার প্রতি অধিক সন্তুষ্ট হইবেন?"

সাধুবাবার এই গল্পটীর মর্ম্ম এই যে আমরাও যদি কোন সৎকর্ম্ম করিয়া উহার ফল প্রত্যাশা না করি তাহা হইলে জগৎ পিতা ও তেমনি আমাদের প্রতি অধিক প্রসন্ন হন এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ইচ্ছামুরূপ আমাদের পুরস্কৃত করিয়া থাকেন।

সাধুবাবার কথাগুলি বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই তাঁহার একটি প্রধান উপদেশ যে মায়িক পদার্থের সেবা করিলে, নশ্বর বস্তুতে মোহিত হইয়া থাকিলে সেই নিত্য পদার্থ, অবিনশ্বর বস্তুর কখনই সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সেই হেতু সর্ব্ব সময় বিচারপরায়ণ হইতে হইবে। পরিণত বিচারের সাহায্যেই কি নিত্য, কি অনিত্য জীব বুঝিতে সক্ষম হয়। পুনঃ পুনঃ অবিচার দ্বারা এ মর-জগতের যাবতীয় পদার্থই যে নশ্বর স্বল্পকালস্থায়ী তাহা উপলব্ধি হইবে। ইহলোকের ধন-জন-সম্পদ, মান মর্য্যাদা, ক্ষমতা প্রতিপত্তি ইত্যাদি মধ্যাহ্নকালীন বটবৃক্ষ ছায়ার ন্যায় অচিরস্থায়ী হইলেও এই ভঙ্গুর জীবনের পরপারে যে অনন্ত জীবন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার নিমিত্ত এখন হইতে প্রস্তুত

হইতে আকাঙ্ক্ষা হইলে তাহাতে জীব নিশ্চয়ই সফলকাম হইতে পারে, অনিত্য বস্তুর আপাতঃ মনোরম চাকচিক্যে মুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি সেই শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হইবে কিরূপে? তাহা একেবারেই অসম্ভব। নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা কোন্ পদার্থ নিত্য অবিনশ্বর তাহা জীবের উপলব্ধি ক্রমে হইবে। এই বিচারের দ্বারা সংসারের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের অনিত্যতা যতই হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে তদই এই সকল আপাতঃ মধুর ক্ষণকালস্থায়ী ভঙ্গুর ভোগ্য পদার্থ নিচয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া সেই নিত্য চিরস্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুর প্রতি ক্রমে ক্রমে দিন দিন অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। একদিন শ্রীগুরু মহারাজের মুখে একটী কথা শুনিয়াছিলাম,—একদা এক ধনবান ব্যক্তি গঙ্গাতীরস্থ এক সাধুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক অনেক স্তব স্তুতি করিয়া অবশেষে সেই সাধুকে বলিয়াছিল, "আপনি কি ত্যাগী।" তদুত্তরে সাধু বলিয়াছিলেন, "তুমি কিন্তু আমাপেক্ষাও অধিক ত্যাগী; কারণ আমি যাহাকে লাভের প্রত্যাশায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি, তুমি তাঁহাকেই ত্যাগ করিয়াছ।" বাস্তবিক বিষয়াসক্ত সংসারী জীব কিরূপ উন্মাদ! যাহাকে ভাবিলে সকল ভাবনার অবসান হয়, যাঁহার চিন্তায় চিত্তে নব নব আনন্দের সঞ্চার হয়, যাঁহাতে অনন্যা ভক্তি জন্মিলে বাসনার জ্বালাময় দাবানল হইতে মনুষ্য চির পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে কিছুই আর অপ্রাপ্য থাকে না; সেই পূর্ণতৃপ্তি স্বরূপ শান্তিময়কে সতত হৃদয়ে স্মরণ মনন না করিয়া অনিত্য অলীক ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে বসিয়া আছে। সকল প্রাণীই স্রষ্টাকে বিস্মৃত হইয়া সৃষ্ট পদার্থের আসক্তিতেই বিমোহিত হইয়া থাকিতে অধিক ভাল বাসে এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব একটী কথা বলিতেন ভাল যে, "একটী সামান্য অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হারাইলে, তজ্জন্য সংসারী বদ্ধ জীব কত ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তাহার নিমিত্ত একেবারে কাঁদিয়া অস্থির হয়, কিন্তু যিনি সকলের চেয়ে আপন জন, প্রাণের প্রাণ তাঁর অদর্শন দুঃখে জীব এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে না।" সাধক কুমারনাথ তাঁহার পুস্তকে এক স্থানে লিখিয়াছেন—"জ্ঞানহীন বদ্ধজীব বাসনার দাস যারা, সংসারের মাঝে ঘোর অন্ধকারে মরে, সেই চৈতন্যরূপিণী কেবল মঙ্গলময়ী অমৃতলতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।" এই সকল সাধু মহাত্মার উপদেশ হইতে ইহাই পাইতেছি যে সর্ব্বপ্রকার মায়িক পদার্থের উপর হইতে ক্রমে ক্রমে আসক্তি বিদূরিত করিয়া স্রষ্টার প্রতি যাহাতে একান্ত অনুরাগ জন্মে, তাঁহার প্রতিই যাহাতে ক্রমে ক্রমে

আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার চরণেই যাহাতে অনন্যা ভক্তি জন্মে সেই প্রকার ভাবে আমাদের জীবন গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। সাধুবাবার কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমরা সাত দিনের জন্য রাজা হইয়াছি; ইহার এক মুহূর্ত্ত সময়ও যাহাতে বৃথা ব্যয়িত না হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য॥ আর সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যেই সেই অপরূপ চিন্তামণি রত্নটী বিরাজ করিতেছে, চাই কেবল পরিশ্রম পূর্ব্বক ময়লা মাটী অপসারিত করিয়া রত্নটীর উদ্ধার সাধন করা। সাধুবাবার আর একটি উপদেশ—সেই আনন্দময়কে লাভ করা যাহার চিত্তের একান্ত বাসনা, তিনিই যাহার লক্ষ্য, তাহার বিষাদিত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে থাকিলে চলিবে না। কারণ বিষাদে মনুষ্য ভগবান হইতে "যুদা" হইয়া যায়। এই কারণ সকল সময়ের জন্য আনন্দে থাকিতে হইবে। তাঁহাকে লাভ করাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহার সতত চিত্তের সন্তোষ ও মনের প্রসন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্তই আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

রাজসাহী।

"বদরী-পথে"।

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

১২ই বৈশাখ রবিবার। আমরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়াই বন্দরভেল বা বান্দরচটি ত্যাগ করিলাম। দূর হইতে পথের ছবিটী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, আমি তখনও অতি নিম্নে গঙ্গাগর্ভে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাঅন্তে সকলের পর্ব্বতারোহণ দেখিতেছিলাম। পাহাড়ের গায়ে অল্পপরিসর পথ, যেন তির্য্যগ গতিতে উপবীত আকারে জড়াইয়া আছে। কোথাও কোথাও বেশ প্রশস্ত, চলা ফেরায় কাহারও অসুবিধা নাই। কাপড় ময়লা হইবার ভয়ে এপথে অনেকে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করেন। ইহার অধিকারী না হইলেও

বস্ত্র মলিনতার আশঙ্কায় আমাদের মধ্যেও সকলেই গৈরিক রাখিয়াছিল। পর্ব্বতগাত্রে গৈরিকধারী যাত্রিগণের ধীর আরোহণ সেই স্বল্পালোকে বিচিত্র স্বপ্নের তুলিকায় অন্ধকারের গাত্রে রঞ্জিত উষার প্রথম পদার্পণের ন্যায়, পুলকিত করিয়া চিত্তের মধ্যে পুরাকালের অস্পষ্ট ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছিল। এমনি স্নিগ্ধ সুমিষ্ট প্রাতে তখনকার দিনে কত তপোনিষ্ঠ মহাত্মাগণ জাহ্নবীজলে প্রাতঃস্নাত, পবিত্র গৈরিক ধারণে পূত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় এই সব গিরি কন্দরে তপস্যার্থে গমনাগমন করিতেন তাহারি একটী ক্ষীণ পরিচয় যেন বিদ্যুৎ রেখার ন্যায় চকিতে ছুটিয়া মিলাইয়া গেল। হায়রে! কালের গতি! এখন সেই কত কত ঋষির বংশধরগণই পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যতার মোহে সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া প্রাতঃকালের নিদ্রাভঙ্গের পর বাসিমুখে এককাপ্ "চা" নহিলে নিদ্রার জড়তা কাটাইতে সক্ষম হন না। ইহাই নাকি নবযুগের স্বাস্থ্যরক্ষা।

এবারে কলনাদিনী পতিতপাবনী মা শৈলসুতা স্নিগ্ধ শান্তিরধারা বিলাইতে পতিত উদ্ধারের জন্য আমাদের সঙ্গেই চলিয়াছেন। আমরা প্রায় পথেই চড়াই ভাঙিয়া প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মহাদেব চটি পাইলাম। এস্থানে মহাদেবের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এখানে এত শীঘ্র বিশ্রামের বেলা এখনো হয় নাই, এজন্য এখানে আর অপেক্ষা না করিয়া দেবমন্দির দর্শনে প্রণাম করিয়াই বিদায় লইলাম। রৌদ্র এখন অল্প তেজ বিশিষ্ট, আরো এক মাইল অগ্রসর হইয়াই পাটিচটি পাইলাম। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রের আভাস পাইয়া এখানেই আমরা বিশ্রামার্থ আশ্রয় লইলাম। মধ্যাহ্নের স্নান আহ্নিকাদি ক্রিয়া সারিয়া কুমড়ার ডালনা ও খোসাশুদ্ধ কড়াইয়ের ডাল অন্ন প্রস্তুত হইল, তাহাই নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণে একটু বিশ্রামের পর বেলা আন্দাজ ২টার মধ্যেই আমরা এ চটি ছাড়িলাম। তখন তীব্র কিরণ জাল-বর্ষণে রবি পৃথিবীর বক্ষ হইতে স্তন্যধারার রস আকর্ষণ করিয়া পান করিতে-ছেন। তাঁহার কর জগতকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের কোলের সে যেন অতি দুরন্ত শিশু, জননীর বক্ষের সকল রস প্রবল আকর্ষণে সে আপনার মধ্যে টানিয়া উপভোগ করিতে চায় সেখানে যেন আর কাহারো অধিকার রাখিতে সে প্রস্তুত নহে। সেই ঘনীভূত স্নেহপীযূষই আবার বাষ্পা-কারে জমাট বাঁধিয়া আপন হৃদয়তাপে গলাইয়া সুশীতল ধারায় জননীর বক্ষকে সিঞ্চিত করিয়া দিবে, তখন তাহা সকলের মধ্যে বিতরিত হইবে। প্রায় তিন

মাইল পথ অতিক্রমের পর শ্যামল বা সন্তালু চটি। এখানে আর বিশ্রাম না করিয়াই আরও দুই মাইল অগ্রসরের পর একটী নূতন চটি দেখিলাম। ইহার নাম এখনো ঠিক হয় নাই কেহবা বলিল আম চটি। আমরা সেখানে শ্রান্ত দেহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সামান্য কিছু জলযোগান্তে আরো কিছু অগ্রসরের বাসনা করিলাম। কিন্তু অল্পদূর যাইতেই অপরাহ্নের ম্লান আভাটুকু, ধূসরছায়া সন্ধ্যার আগমনে ত্রস্তপদে আকাশের গায়ে বিলীন হইতে গিয়া ব্যস্ততায় রক্তাঞ্চলখানি গাত্রস্খলিত হওয়ায় লজ্জায় পশ্চিমগগনকে অনেকখানি রাঙাইয়া তুলিল। সন্ধ্যার আগমন সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিল, বিহগকল কাকলীতে সমস্বরে তখন কোলাহল উঠিল, 'ঘরের ঠিকানা' যে সবার দরকার, এ পরের ঘরকে আপন বলে দখল করে কতদিন আর নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে? তাই সবাইকে তখন সজাগ হয়ে বিশ্রামের আবাস খুঁজিতে সচেষ্ট করাবার জন্যই বুঝি পক্ষিকুলের এ জাগিয়ে তোলার স্বর এই আহ্বান! সন্ধ্যার আঁধার, পথে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা কাণ্ডিচটীতে স্থান পেলাম। সে রাত্রি আমাদের সেইখানেই বিশ্রাম হইল। এখানে জলের খুব সুখ, এবং হাসপাতাল ধর্ম্মশালাও আছে। এখানেও একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সাক্ষীগোপাল আছেন, রাত্রের অন্ধকারে আমাদের দেখার সুবিধা তেমন হয় নাই। ১৩ই বৈশাখ সোমবার প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যা সারিয়া বাহির হইতে আমাদের প্রায় ৫টা বাজিয়া গেল। এখান হইতে চারি মাইল গিয়াই ব্যাসঘাট চটি। আজ সারা পথই প্রায় একান্ত ভাবে চলা হইয়াছে, সঙ্গিনী সকল কেহ কেহ অগ্রে কেহ বা পশ্চাতে আছেন, আমি কিন্তু একাকীই চলিতেছিলাম। আজ রাম রাম স্মরণে প্রভাতের স্নিগ্ধতা মাখিয়া চিত্ত বিজন-পথে একাকী গমনে কি যেন একটী সরসতায় ভরিত, আপনার মধ্যে বিশ্রান্তি খুঁজিয়া মগ্ন হইতেছিল। কেমন একটী শান্ত নিস্তব্ধতা, হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া দৃষ্টিকে কোমল রমণীয় ভাবে জগতের সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে-ছিল, এবং যেন কোন অচিন্তনীয় শান্তিপ্রবাহের মধ্যে মগ্ন হইয়া কাহার প্রশান্ত দৃষ্টির তলে ডুবিতে চাহিতেছিল। সে জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ সুষমা যেন অতলস্পর্শ, সেখানে বাক্‌শূন্য মৌনতাই যেন ধীর স্থির; প্রাপ্তি সেখানে সীমাশূন্য। ব্যাকুল অথচ চঞ্চলতাহীন নির্ব্বাক্ আনন্দে মন আপনি আপনিই যেন আত্মস্থ। জগৎ যেন সেই মৌনমহিমায় ব্যক্ত হইয়া আপনাকে গোপন করিতে না পারিয়া অসীমতাকে সীমার মধ্যে এনে প্রকাশ করে জানাতে অধীর হয়েছে। ব্যাকুলতার

মধ্যে কি যেন একটা প্রচ্ছন্ন শান্তির নীরবতা গভীর হয়ে উঠিতেছিল, কথায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। কি জানি একাকী এ ভাবে চলা কেন এত ভাল লাগে, তার সাড়াটুকু যে নীরবতার সাধার মধ্যেই স্পষ্ট হো'তে চায়, কোলাহল দেখলে দূরে সরে যায়। দূরে দূরে শ্যাম নটবরের ব্যাকুল বংশীধ্বনির অনাদি আহ্বান যেন আমার প্রাণের চির নিভৃত পুরে প্রবেশ করে মঞ্জুল তালে নেচে নেচে, যমুনার পরপারে ভেসে আসা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ঢলে পড়া মত বিরহী চিত্তকে মিলন ব্যথায় আকুল স্নেহস্পর্শ করে তুলছিল। হায়! এম্নি দিনেই বুঝি কুলে কুলে ভরা প্লাবনে কালিন্দীর কালজলে সোনার কমল ফুটে গন্ধের আকুলতায় ছেয়ে, বক্ষের মৃদুকম্পনে চক্ষে প্রেমের আরতি সোহাগের দীপ জেলে নিশ্বাস রোধ করে প্রতীক্ষার পলে পলে দৃষ্টিকে অবরোধ করে তুলত! সে যে আসে আসে আসে না, ঐ তার পীতাম্বরের উত্তরীয়ের অংশ টুকু বুঝি আভাসের মত দেখা যায়! ঐ তার চরণের মৃদু অস্পষ্ট মঞ্জীরের আলাপ ধীর গুঞ্জন, স্পষ্ট হোতে গিয়েও আমার নিশ্বাস বাতাসের শব্দে মিলিয়া যাচ্ছে; ঐ ত রাখালিয়া বালকদের করতালিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আহা! নবনীর থালি করে লয়ে, ঐ যে কে গায়—"আমার নীলকান্ত মনি ঘরে আয় বাপ"—"আমার নয়নেয় মনি কোলে আয় বাপ"—আমার ননীচোরা—এ ব্যাথায় কণ্ঠভরে আসে; চাওয়া যায় না। সর্ব্বত্র কার আগমনের চিহ্ন, সকল বস্তুতে সাড়া দেওয়া ফুটে উঠেছে, তবু কেন দেখা পাই না? কে যেন জেগে উঠেছে, একি শিহরণ! আনন্দ বাষ্পবিগলিত তার চাওয়া চেয়ে চেয়ে ছল ছল দুটী এ কার নলিন নয়ন বুকে গাঁথা, চারিদিকের শ্যাম শ্যাম ধীর গম্ভীর ছল ছলতায় শ্যাম শ্যাম জলদের ডাকে অগাধ প্রশান্তির মাঝে ও কার ঝাঁপিয়ে পড়া বিজলী দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে, কে যেন মিলতে গিয়েও মিলতে পারছে না, হায়! এ একান্ত পেয়েও যে পাওয়া হয় না? কান্ত দর্শনের একান্ত যে বড় দুর্ল্লভ। তাই বক্ষের মধ্যে গুমরিয়া নিশ্বাস রোধ হয়ে আসে, বাষ্প বিগলিত হয়ে দৃষ্টিকে অবরোধ করে দেয়। সে ত দূরে নয় আমারি হৃদয়ের মধ্যে "রাধা" "রাধা" কি সুর গো? একি ব্যাকুলতার ডাক তার! কে সে দরদিয়া গো? কি এ ব্যাকুল স্পন্দন তুলে জীবনযাত্রার পথে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে! এমনি করেই তার অভিসারের পথে যাত্রী করবার নিমিত্তে তার নিয়ত আহ্বান ভেসে আসছে, কে কান পাতে? এত গোলের মধ্যে অবকাশ কোথায়? কান পাতলে কিন্তু শোনা যায়। সে

স্বপ্নরাজ্যের স্বপ্ন গীতির ঝঙ্কারে অন্তরের ডাক শুনিয়ে মিষ্ট আহ্বানে ভুলিয়ে অনেক দূর এনে দিয়েছে, সহসা চমক ভেঙে চেয়ে দেখি সম্মুখেই মহর্ষি বেদ-ব্যাসের শূন্য আশ্রমের স্থান। ব্যাসগঙ্গার নদীর উপকূলে পুরাকালের সাক্ষী স্বরূপ একটী ক্ষুদ্র মন্দির, স্থানটীকে ভগবান ব্যাসদেবের স্মৃতিতে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলচে। যিনি নিজ তপস্যার বলে অখিল বেদশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে বেদকে বিভাগ করে দেখিয়ে সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আপনার অসীম ক্ষমতায় জগতের প্রতি তাঁহাব ফুল্লারবিন্দায়ত নয়নের করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপে কত তাপিত হৃদয় সুশীতলের উপায় করিয়া গিয়াছেন, সেই কৃপা বাৎসল্যভরা জগৎতারক মূর্ত্তির উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়া চটিতে স্থান পাইলাম। এই পুণ্যক্ষেত্রের রজে হয়ত তাঁহার পবিত্র চরণধূলি এখনো মিশ্রিত হইয়া আছে, কতদিন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী মহর্ষির কণ্ঠের গভীর বেদধ্বনি শ্রবণে বিমুগ্ধ প্রাণে কলোচ্ছ্বাস গীতি তুলিয়া তান মিশাইয়া ছুটিয়াছিলেন। এখনো সে আনন্দের স্মৃতি গীতি কলরবে মিশিয়া আছে এবং ব্যাসাশ্রমকে পবিত্র স্মৃতিতে ভরাইয়া বিমল জলে পাপ তাপ মলা ধোয়াইয়া তাপিত হৃদয়কে সুশীতল করিতেছেন। আমরা বিশ্রামান্তে পুণ্যতোয়া তীরে স্নান অবগাহন মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ক্রিয়াদি করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে দর্শন পূর্ব্বক বাসায় আসিলাম। শরীর পূর্ব্ব হইতে অসুস্থ বোধ হইতেছিল, চটিতে আসিয়া বেশীক্ষণ বসিতে পারিলাম না শয়ন করিতে হইল। কিন্তু চটির গোলমালে ঘুম হইল না, সামান্য কিছু আহার করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রায় মাইল টাক্ গিয়া সীতারামের মন্দির; বিশ্রামের স্থানও আছে। গঙ্গার তীর হইতে টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে দেখিলাম। আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মণদেব জানকী মাতাকে ও ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাবীরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া কাতর হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইয়া কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষার পরই পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখান হইতে ৩ই মাইল গিয়া ছালৌড়ি চটি, সেখান হইতে আরো প্রায় দুই মাইল গিয়া অমরকোটী বা উমরাসু চটি মিলিল। এখনো বেশ বেলা আছে, রৌদ্রের আভার প্রখরতা কমিয়া আসিলেও যাবার অসুবিধা বোধ হইতেছিল না। কিন্তু অনেকে নিষেধ করিলেন চটি এখান হইতে দূর, সেখানে পৌছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে অন্ধকারে চলা বিপজ্জনক। কাজেই এখানেই ক্ষান্ত হইতে হইল, বিশ্রামের জন্য এখানে আমরা দোতালা মাঠ-

কোটায় চটি পাইয়াছিলাম। চটিতে অনেক লোকের সমাগম হওয়ায় অত্যন্ত গোলযোগ, কোনক্রমে সন্ধ্যামাত্র সারা হইল, বসিবার স্থানের সুবিধা নাই। রাত্রে লুচি এবং কুমড়া ও কাঁচা কলা ভাজা হইল, শরীর এবেলা একটু ভাল বোধ হওয়ায় গরম লুচির পথ্য খাইয়া কম্বল পাতিয়া শয়ন করিলাম। গোবিন্দ তখন বড় সুন্দর উচ্চারণে স্তোত্রপাঠ করিতেছিল,—

"জয় গণেশ জয় গণেশ গুরু গণেশ দেবা।
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতামহা দেবা॥"

তাহাই শুনিতে শুনিতে চিত্তকে একাগ্র করিতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৺বৈদ্যনাথ।

মহাযোগি, যোগমগ্ন মূরতি তোমার।
বিভোর কাহার ধ্যানে, আছ সারাৎসার?
স্তব্ধ প্রকৃতির বুকে পাতি শিলাসন।
ভোলানাথ সব ভুলে ধ্যানেতে মগন।
গাহিছে বন্দনা গীতি বিহগ মণ্ডলী,
সুমধুর নানা স্বরে, করিয়ে কাকলী।
পৃথ্বী ভেদি ব্যোমশিব করিছ বিরাজ।
অপরূপ রূপ তব অপরূপ সাজ॥
সুনিবিড় জটা জাল ওই মেঘগুলি,
উড়িছে পবন সাথে, ক'রে কোলাকুলি।
উষা সাথে আসে রবি, করিতে আরতি।
ভক্তি ভরে সারাদিন, পূজে উমা পতি।
শুধাংশু উদয় হয়, ললাটে তোমার।
গলায় দুলায় সন্ধ্যা, তারা ফুল হার।
গম্ভীর আনন্দময়, ব্যোম দিগম্বর।
কি মহান্ মূর্ত্তি তব, ওহে মহেশ্বর।
বৈদ্যনাথ রূপে তুমি, রাজিছ মন্দিরে।

বিশ্বনাথ রূপ দেখি, তাহার বাহিরে।
বিশ্বব্যাপী সনাতন অনাদি অশেষ।
সহস্র প্রণাম পায়, প্রভু পরমেশ॥

শ্রীমতী উৎপল কুমারী দেবী, (৺কাশীধাম)

জগন্নাথের রথ।

ওত নয় আষাঢ়ের ঝরঝর জলধার
জলদের গুরুগুরু গরজন অনিবার
সুরপুরে দেবকুল করিতেছে কলরব
নাকড়ার ঘননাদে ধরণীরে বলে সব :—
ওই যেরে ছায়াপথ আকাশের ধারে ধারে
পৃথিবীর কোলে এসে মিশিয়াছে পারাবারে
ওপথের বুক ছুঁয়ে ধরণীর সিংহ দোরে
জগৎনাথের রথ আসিতেছে ওই ওরে
কে কোথায় রয়ে গেছে আয় সবে ছুটে আয়
বিশ্বনাথের রথ তোরি দোর দিয়ে যায়
ছুটে আয় আয় সব মায়ে ঝিয়ে ভায়ে বোনে
ও রথের রশি ধরে আয় সবে নিবি টেনে
বিশ্বনাথের রথে ওত নয় দড়া রশি
মুকতির মহাপথে কামনা জয়ের ফাঁসি
যে ওতে দিয়েছে হাত লভিয়াছে নিরবাণ
পৃথিবীর সুখে দুখে অকাতর তার প্রাণ
ঘুচে গেছে মরতের জনন-মরণ ভয়
যাবৎ জগৎ আছে তাহার হবেনা লয়।

শ্রীসরোজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘাটভোগ, খুলনা।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

দুর্গা সপ্তশতী।

উপক্রমণিকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী জগতের কোন্ উপকার জন্য ?

জগতের কোন্ উপকারের জন্য—মানব জীবনের কোন্ জটিল সমস্যার সমাধান জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর উদয়, সর্ব্বপ্রথমেই সেই বিষয়ের কিছু আলোচনা করা উচিত মনে হয়। চণ্ডী, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ—সমস্ত শাস্ত্রই নর নারীর শোকশান্তির জন্য, মানুষের মোহ বিনাশ জন্য। মোহ বিনাশেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবেই।

মোহও আবার অনেক প্রকারের দৃষ্ট হয়। কোথাও সংসার আমায় শত যাতনা দিয়া তাড়াইয়া দিক্ তথাপি আমি সংসারের প্রতি নিষ্ঠুর হইতে পারি না—এই একপ্রকার মোহ; কোথাও আমার স্বভাবজ কর্ম্ম যাহাই হউক না কেন আমি যুদ্ধে অসংখ্য লোকের প্রাণবিনাশরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিব না—বরং ভিক্ষা করিয়া—স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া—পরধর্ম্ম গ্রহণ করিব—এই একপ্রকার মোহ: কোথাও আমি সপ্তম দিনে মরিব—এইপ্রকার মোহ; কোথাও যিনি কাহারও জন্য শোক করেন তিনি আবার উপাস্য হইবেন কিরূপে এই প্রকারের মোহ; কোথাও আবার আপনি আপনি পূর্ণ হইয়া থাকিবার জন্য যে দৃশ্য দর্শন মার্জ্জনা করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয় তাহা নিতান্ত অসম্ভব এই প্রকারের মোহ—ইত্যাদি বহু প্রকারের মোহ—শাস্ত্র দেখাইয়া দিতেছেন—আর মোহই যে শোকের উৎপত্তি স্থান তাহা বুঝাইয়া দিয়া, সর্ব্বশাস্ত্র সেইরূপ উপায় দেখাইয়া দিতেছেন যাহাতে মানুষের মোহ, মানুষের শোক দুঃখ দূর হয়। আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মোহ ও

মোহ নাশের ক্রম যেমন আছে তাহা যথাস্থানে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশ্রীচণ্ডী যিনি আশ্রয় করিতে চান তাঁহার কিরূপ হওয়া উচিত?

মানুষ যদি আপনি আপনি পূর্ণ হইয়া থাকিতে পারিত, তবে মানুষ কাহারও সাহায্য চাহিত না, কাহারও আশ্রয়ে আসিত না। কিন্তু কাহারও সাহায্য না লইয়া, কাহারও আশ্রয়ে না আসিয়া মানুষ কি সংসারে থাকিতে পারে? মানুষ ত কত কাজই করে, কিন্তু কোন্ কার্য্য মানুষ মনের মত করিয়া করিতে পারে? মানুষ ত কত চেষ্টা করে কিন্তু মনের মত করিয়া আপনাকে বা আপনার জনকে গড়িয়া তুলিতে পারে কি? মানুষ যাহা পাইয়াছে তাহাও কি মনের মত করিয়া রক্ষা করিতে পারে? মানুষ এই দেহ পাইয়াছে, চক্ষু পাইয়াছে, কর্ণ পাইয়াছে, মন পাইয়াছে, বুদ্ধি পাইয়াছে, বাক্ পাইয়াছে কাম ক্রোধাদি পাইয়াছে কিন্তু ইহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিতেছে কি? সংসারে স্বামী পাইয়াছে, স্ত্রী পাইয়াছে, পিতা মাতা পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন কতই ত পায়, কিন্তু সকলকে মনের মত পায় কি? মানুষের মনের মধ্যে কি জানি কি আদর্শ যেন থাকে, মানুষ নিজেও সেই মত চলিতে পারে না, সংসারকেও সেই মত চালাইতে পারে না; সমাজকেও আদর্শ পথে লইয়া যাইতে পারে না। তাই মানুষ সদাই অসুখী। আদর্শ পথে মনের মত করিয়া চলিতে মানুষ পদে পদে বাধা পায়, শরীর ঠিক মত চালাইতে পারে না—নানাবিধ রোগ আসিয়া শরীরকে আক্রমণ করে, মনকে ঠিক মত চালাইতে পারে না—নানাবিধ পাপ করিয়া ফেলে; সংসার ঠিক মত চালাইতে পারে না সংসার অশান্তিতে ভরিয়া উঠে, সমাজও সেই কারণে ঘোরতর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মানুষ নিজের মনকে কিছুতেই সুস্থ করিতে পারে না—অপরের মনকে তৃপ্ত করাত বহু দূরের কথা।

মানুষ অজ্ঞানের, মোহের, মায়ার হস্ত হইতে কিছুতেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।

আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ আর কাহারও আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু মানুষকে রক্ষা করিতে পারে কে? এত দুঃখের মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে কে? সেইজন্য একজন সর্ব্বশক্তিমান্, করুণাবরুণালয়, ক্ষমাসার, সর্ব্বব্যাপী প্রেমময়কে মানুষের প্রয়োজন হয়। মানুষ আপনাকে আপনি বুঝিতে যদি চেষ্টা করে তবে তাহাকে বলিতেই হইবে এই করুণামাখা শক্তিজড়িত শক্তিমানের অভাব মানুষ সর্ব্বদাই অনুভব করে।

যে দিক্ দিয়াই মানুষ দেখুক, মানুষকে এই শক্তির, এই শক্তিমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়। পশু হইয়া গেলে, ঈশ্বরের অভাব বোধ না হইতে পারে। কিন্তু মানুষ হইয়া থাকিতে মানুষ যদি চায় তবে চিরদিনই মানুষকে এই সর্ব্বশক্তিমান্, করুণাময়, ক্ষমাসারের আশ্রয়ে আসিতেই হয়। বাল্যকালে শিশু মললুলিত বপু হইয়া যখন বিন্মূত্রামেধ্য মধ্যে পড়িয়া থাকে তখন কত নিরাশ্রয়; যৌবনে বিষধর সদৃশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন দষ্ট গাত্র হয় তখন কত নিরাশ্রয়; আর প্রৌঢ়ে বার্দ্ধক্যে কত নিরাশ্রয়! আহা! ঈশ্বর না হইলে মানুষকে সুস্থ করিতে আর কে পারে? জীবনে ঈশ্বরকে আবশ্যক, মরণেও ঈশ্বরকে আবশ্যক, আবার মরণের পরেও ঈশ্বরকে আবশ্যক।

চণ্ডী, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, অধ্যাত্মরামায়ণ যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণাদি শাস্ত্র বলিতেছেন মানুষ যে শোক পায়, দুঃখ পায় তাহার কারণও মানুষের মোহ, মানুষের অজ্ঞান। এই অজ্ঞান মানুষ অনেক সময়ে বুঝিতেও পারে না, ধরিতেও পারে না—দূর করা ত দূরের কথা। মানুষ যে বড় নিরাশ্রয়—মানুষকে দয়াময় যখন ইহা বুঝাইয়া দেন তখন মানুষকে ব্যাকুল হইয়া বলিতেই হয় "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ"।

আশ্রয় দাতার বা আশ্রয় দাত্রীর কথা।

মানুষের আশ্রয়দাতা বা আশ্রয়দাত্রী যিনি তাঁহার কথা ত প্রথমেই আলোচনা করা উচিত। ইহাঁকে ধরিতে না পারিলে, ইহাঁর কথা ধারণা করিতে না পারিলে, অন্ততঃ ইহাকে বিশ্বাস করিতে না পরিলে, অন্য সমস্তই বৃথা। একটু চেষ্টা করা যাউক।

তোমার কথা কে বলিতে পারে? তা মূর্খ আবার তোমার কথা কি বলিবে? তথাপি তুমি যে অরূপ হইয়াও স্বরূপে আছ, নিরাকার হইয়াও সব আকারে আছ ইহা যিনি বিশ্বাস করিতেও না পারেন তিনি তোমাকে আশ্রয় করিবেন কিরূপে? এই যে জগৎটা দাঁড়াইয়া আছে, ইহা ত তুমিই। এই যে আকাশ, এই যে মহাশূন্য—কোটি কোটি সূর্য্য গ্রহ তারকা ধরিয়া শূন্যে ঝুলিতেছে ইহা তুমিই। জগদাকারধারিণী তুমি—জগৎ তোমার দেহ সত্তা; তাহাও কিন্তু অজ্ঞানীর কাছে।

> যদজ্ঞানাৎ জগদ্ভাতি রজ্জু সর্পস্রগাদিবৎ।
> যজ্‌জ্ঞানাল্লয়মাপ্নোতি নমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্॥

রজ্জুতে সর্প, মালাতে সর্প—ইহা অজ্ঞানেই ভাসিতে দেখা যায়; সেইরূপ যতদিন অজ্ঞান আছে ততদিন লোকে দেখে তুমি জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছ। কিন্তু তোমাকে—তোমার অনুগ্রহে জানিতে পারিলে জগদাদি তোমাতেই লয় হইয়া যায়। এই ভুবনেশ্বরী তুমি, তোমাকে আমরা প্রণিপাত করি। তুমি যে আশ্রয়দাত্রী তাহা তুমিই ত বলিয়াছ—

> তিষ্ঠন্ত্যাং ময়ি কা চিন্তা যুষ্মাকং ভক্তিশালিনাম্।
> সমুদ্ধরামি মদ্ভক্তান্ দুঃখসংসারসাগরাৎ॥

তুমিই বলিতেছ আমি আছি তোমাদের চিন্তা কি? তোমরা যে আমাকে ভক্তি করিয়া থাক। আমার ভক্ত সকলকে আমি দুঃখ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি।

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু সদ্ সদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥

সর্ব্বস্বরূপা তুমি—জগৎস্রষ্টা তোমার স্তব করিতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন হে সর্ব্বস্বরূপে! যাহা কিছু বস্তু, যে কোন স্থানে বা যে কোন কালে বর্ত্তমান আছে বা অতীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে, সে সমুদায় বস্তুর যে শক্তি তাহা যখন তুমিই তখন তোমার স্তব আর কে করিবে? আর তুমি যদি তোমার কথা না বলিতে তবে তোমার কথা কে প্রকাশ করিতে পারিত? তুমিই বলিতেছ—

মদ্ভয়াৎ বাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি।
ইন্দ্রাগ্নি মৃত্যবস্তদ্বৎ সাহং সর্ব্বোত্তমাস্মৃতা॥
মৎপ্রসাদাদ্ভবদ্ভিস্তু জয়োলব্ধোঽস্তি সর্ব্বথা।
যুস্মানহং নর্ত্তয়ামি কাষ্ঠপুত্তলিকোপমান্॥

আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়ে সূর্য্য উদয়াস্তগামী হয়, ইন্দ্র, অগ্নি, যম আমার ভয়েই স্ব স্ব কর্ম্ম করেন। এই আমাকে সর্ব্বোত্তমা জানিও আমার প্রসাদেই তোমরা সর্ব্বপ্রকারে জয় লাভ কর। আমিই তোমাদিগকে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নাচাই। আমার প্রসাদলাভ—আমার আজ্ঞা পালনরূপ কর্ম্মে তোমাদের সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আমার জন্য করিয়া—আমার প্রসাদ তোমরা অনুভব কর, অন্য সমস্তই আমি তোমাদের করিয়া দিব। তোমাদের ভয় কি, চিন্তাই বা কি?

আশ্রয়দাতার কথা—বা আশ্রয়দাত্রীর কথা বলিতে গেলে এত কথাই আইসে যে তাহা ঠিক করিয়া বলা মূর্খের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি চেষ্টা করিতে হইবে ইহাই আশ্চর্য্য। কে তুমি বলিবে কে?

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥

তুমি বৃহৎ, দিব্য, স্বয়ম্প্রভ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কেহ তোমার রূপ চিন্তা করিতে পারে না বলিয়া তুমি অচিন্ত্যরূপ। সূক্ষ্ম আকাশাদি অপেক্ষাও তুমি সূক্ষ্মতর, বিবিধ আদিত্য চন্দ্রমাদি আকারে তুমি দীপ্তি পাইতেছ, দূর হইতেও সুদূরে তুমি, আবার এই দেহেও বর্ত্তমান তুমি। যিনি ইঁহাকে দেখিতে চান তিনি ইহাকে নিজবুদ্ধি রূপ গুহাতে (হৃদ্পদ্মে) নিগূঢ় দেখেন।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

সেখানে সূর্য্য ভাসেননা চন্দ্রতারকাও না; এই বিদ্যুৎ সকলও ভাসেনা; এই অগ্নির আবার কথা কি?

তোমার প্রকাশে সকলের প্রকাশ। তোমার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্মপশ্চাৎ ব্রহ্মদক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্টম্ ॥

এই অমৃত তুমিই অগ্রে, তুমিই পশ্চাতে, তুমিই দক্ষিণে, তুমিই বামে অধে উর্দ্ধে এই ব্রহ্মই নামরূপ মত ভাসিতেছেন। অধিক কি এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ
প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্যধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

তুমি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। এই হেতু ধীমন্ত যাঁহারা তাঁহারা এই লোক হইতে প্রেতত্ব লাভের পর—অর্থাৎ মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ করেন।

তুমি মহামায়া—তুমি নির্গুণা সগুণা সমকালে। তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। ব্রহ্মই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত। যিনি জানেন যে ইনি পরম আকাশ যে পরমপদ তাহার গুহার ভিতর থাকেন তিনি ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম ভোগ করেন।

পুরুষই প্রকৃতি সাজেন আত্মমায়া অবলম্বনে। নতুবা তুমি স্বরূপে—

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥

তুমি আপনি আপনি পূর্ণ থাকিয়াও স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, কারণ তুমি স্বরূপে সর্ব্বমূর্ত্তি বর্জ্জিত। তুমি পুরুষ—তুমি পূর্ণ বা পুরে শয়ান। তুমি বাহিরে, তুমি ভিতরে; তোমার জন্ম নাই। ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন প্রাণ বায়ু তোমাতে নাই; সঙ্কল্পশক্তি সম্পন্ন মনও তোমার নাই, কোন উপাধি তোম্মার নাই বলিয়া তুমি শুভ্র, তুমি শুদ্ধ। সমস্ত কার্য্য কারণ ভাবের বীজভাব তোমাতে লক্ষিত হয় বলিয়া তুমি পর এবং সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া তুমি অপর। সর্ব্ব নামরূপোপাধি লক্ষিত অথচ অব্যক্ত নিরুপাধিক সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও তুমি পর, শ্রেষ্ঠ। নিগুর্ণা থাকিয়াও তুমি সগুণা।

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

তুমি অগ্নি, তুমিই আদিত্য, তুমিই বায়ু এবং তুমিই চন্দ্রমা, তুমিই শুক্র, তুমি ব্রহ্ম,তুমিই জল, তুমিই প্রজাপতি। কি নও তুমি?
আহা! ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ; তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। বিশ্বতো-মুখ তুমি! তুমি মায়া অবলম্বনে যেন জাত হইয়া জরাজীর্ণমত হও, হইয়া বৃদ্ধের মত দণ্ডগ্রহণ করিয়া যাতায়াত কর—ইহাই তোমার বঞ্চনা। কেমন করিয়া তুমি আপনি আপনি পূর্ণ হইয়াও সব সাজ ইহা পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

তোমার তত্ত্ব কে বলিতে পারে? তথাপি তোমার নিগুর্ণ সগুণ আত্মা, অবতার—ভাব কথঞ্চিৎ ধারণা না করিতে পারিলেও,

আশ্রয়দাতা তুমি—আশ্রয়দাত্রী তুমি কেমন করিয়া, ইহা বিশ্বাস করিতেও পারা যায় না। যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মে দান ধ্যানাদি কিছু করা থাকে তাঁহারা সব তুমি সব তুমি বিশ্বাসে দেখেন; যাঁহারা অধিক পুণ্যবান্ তাঁহারা বিশ্বাসের তোমাকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া পাইবার জন্য হৃদয়ে তোমার উপাসনা করেন; আবার যাঁহারা তোমার অনুগ্রহ বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা কর্ম্ম ও উপাসনার পর-অবস্থায় যাইয়া দেখেন তোমাতে আমাতে অভেদ—তুমিই আমি—আমিই তুমি।

আহা!

য আদিনাথো ভগবাননাদি
জ্ঞানাম্বুধিঃ স্বাত্মরতির্মহাত্মা।
শ্রীদেশিকেন্দ্রঃ করুণাম্বুরাশি—
নানাস্বরূপৈশ্চরতীহ লোকে॥

আদিনাথ তুমি, ভগবান্ তুমি, অনাদি তুমি, জ্ঞানের জলধি, আত্ম-রতি মহাত্মা, গুরু মন্ত্র, করুণা-বরুণালয় তুমি—স্বরূপে এক থাকিয়াও বহু উপাধি ধরিয়া নানারূপে ইহলোকে বিচরণ কর তুমিই।

"ত্বং বিশ্বরূপঃ পুরুষো মায়াশক্তি সমন্বিতঃ" মায়াশক্তিবিশিষ্ট বিশ্বরূপ পুরুষ তুমি। মায়ার গুণের আধিক্য ও ন্যূনতা অনুসারে তুমিই নানারূপে, নানামূর্ত্তিতে জগতের প্রতি বস্তু ধরিয়া বিরাজ করিতেছ।

অবিদ্যাবৃতা চিৎশক্তিই একমাত্র বস্তু। চিৎ বা জ্ঞানই সত্যবস্তু; ইহার উপরে অসৎ অবিদ্যার নৃত্য চলিতেছে—এই নৃত্যে জগতের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ—এক কথায় জন্ম স্থিতি ভঙ্গের খেলা চলিতেছে। অবিদ্যার খেলায় যাহা কিছু উঠিতেছে সমস্তই মরু মরীচিকা সমস্তই ভ্রম—তাহার মূলে সচ্চিদানন্দরূপিণী তুমি, তুমি মাত্রই সত্য। তোমার মহিমায়, তোমার প্রভায়, তোমারই উপরে মায়ার খেলা হয়, তোমারই উপরে তোমার জগন্মূর্ত্তি ভাসে; তোমাকেই

আশ্রয় করিয়া মহামায়ার মায়া এই জগৎ বিস্তার করিয়া জীবকে মোহগ্রস্ত করান। কিন্তু তোমাকে যিনি প্রতিবস্তুর মধ্যে—মায়া যবনিকার অন্তরালে স্মরণ করিতে অভ্যাস করেন তাঁহার জন্যই তুমি মোক্ষদায়িনী।

আপনি আপনি পূর্ণ ভাবই বল, প্রণবই বল, সীতারামই বল, রাধাকৃষ্ণই বল, আর হরপার্ব্বতীই বল সর্ব্বত্রই এই শক্তি—জড়িত শক্তিমান ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। শক্তি শিবোন্মুখী হইলে—শক্তি বা প্রকৃতি আর স্ত্রী থাকেন না—পুরুষ হইয়া যান। চৈতন্যের বক্ষে মনের নৃত্য, ইহা ব্যষ্টিভাবে কালীর নৃত্যই বটে। মনকে চৈতন্যের দিকে ফিরানই সাধনা। মনকে পুরুষোন্মুখ করিয়া উপাসনা করিতে পারিলে জীবের দুঃখ যায় আবার শক্তি যখন পুরুষোন্মুখী না হইয়া বাহিরের নানা কল্পনা তুলেন—ইহাতে তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহাতে জগৎটা মোহাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

সকল ভাবের কথাকেই শক্তি ও শক্তিমানে পর্য্যবসিত করিয়া বলা হইতেছে এই জন্য যে, মানুষ মাত্রেই—বিশেষতঃ দ্বিজ যাঁহারা তাঁহারা সকলেই শক্তির উপাসক। কারণ বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসনা সকলকেই করিতে হয়। ভারতে এমন মন্ত্র কোথাও নাই যথায় গায়ত্রী মন্ত্র নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রই গায়ত্রী মন্ত্র। তাই শাস্ত্রেও পাওয়া যায়।

> শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
> উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং বেদ মাতরম্॥

সমস্ত দ্বিজই শাক্ত—ইহাঁরা শৈব ও নহেন, বৈষ্ণব ও নহেন। কারণ সকল দ্বিজকেই বেদ মাতা গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হয়। উপরের শ্লোকের অন্যবিধ পাঠও পাওয়া যায়—

> সর্ব্বে শাক্তা দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
> আদিদেবীমুপাসন্তে গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥

শ্রীশ্রী চণ্ডীর আলোচনা কাহার নিকটে করিতেছি ? ক্ষমা প্রার্থনা

যখন সর্ব্বত্র তুমিই আছ, আর যাহা কিছু মায়া যবনিকা, তাহা তোমাতেই মায়া মায়া ছায়া ছায়া রূপে ভাসিয়াছে তোমাকে ঢাকিতে না পারিলেও একটা বিকট ভ্রান্তিতে—নিদারুণ কল্পনায়—রজ্জুতে সর্প ভাসার মত যেন তোমাকেই আচ্ছাদন করিয়া আছে—তখন কাহার নিকটে এই আলোচনা হইতেছে এ সম্বন্ধে আর কি বলা যাইবে ?

নিজের জন্যই এই আলোচনা করি বা অন্যে যদি শুনেন তাঁহাদের জন্যই করি—এ আলোচনা কিন্তু তোমার নিকটেই। তোমার নিকটে মানুষের কোন কথা প্রলাপ ভিন্ন আর কি ? এই কথা তুমি আমি না বলিতে পারি কিন্তু ভগবান্ অগস্ত্য শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের নিকট রাক্ষস ও বানরগণের জন্ম বিবরণ বলিয়া শেষে বলিয়াছেন—

"ময়া প্রলপিতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞস্য তবাগ্রতঃ"

সর্ব্বজ্ঞ তুমি সকলই জান তুমি—তথাপি তোমার নিকটে আমি যাহা কিছু প্রলাপ বকিলাম তজ্জন্য—

"ক্ষন্তুমর্হসি দেবেশ তবানুগ্রহভাগহম্"

হে দেবেশ ! আমাকে ক্ষমা করিও—আমি তোমার অনুগ্রহের ভিখারী মাত্র। ভগবানকে সাক্ষাতে পাইয়া ভগবান্ অগস্ত্যের মত ঋষি যখন এই কথা বলিয়াছেন তখন আমাদের কথা আর কি হইতে পারে ? তথাপি তুমি মা—আমরা অনুভব করিতে পারি বা না পারি—সাক্ষাতে পাওয়া ত বামনের চন্দ্র ধরিতে যাওয়ার মত হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র—তথাপি বিশ্বাসে যত যতটুকু আনিতে পারি তাহার বলেই বলি—মা জগদম্বা তুমি—আর আমিত জগতের বাহিরে নই—সেই জন্য বলি জগজ্জননি ! জগতের একমাত্র সত্তাই তুমি—সার বস্তুই তুমি—যে যাহা বলে তাহা তোমার নিকটেই বলে—সব শুন তুমি—তবে মা তোমার নিকটে আমাদের এই যে প্রলাপ তজ্জন্য—

"ক্ষন্তুমর্হসি দেবেশি ! তবানুগ্রহভাগহম্"

হে সর্ব্বদেবের ঈশ্বরি ! আমি ক্ষমার পাত্র, তোমার অনুগ্রহের

ভিখারী। মা বলিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারি—নতুবা ত্রিভুবন জননী তুমি আমরা এমন কি করিলাম যে তোমার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারিব—তোমার অনুগ্রহ পাইতে হইলে তোমার আজ্ঞাপালন যে করিতে হয়, সকল কর্ম্ম—কি বৈদিক কি লৌকিক সমস্তকর্ম্ম—তোমার জন্য করিতেছি মনে রাখিতে হয়—হায়! পদে পদে যে তোমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন হইয়া যায়! তথাপি তুমি ভিন্ন তাকাইবার যে আর কেহই নাই! তোমার স্বভাবের দিকে দৃষ্টি করিয়া মহাপুরুষগণের বাক্যে বলিতে হয় "পরং জানে মাতস্তদনুশরণং ক্লেশহরণম্।" মা আমি তোমার আবাহন জানিনা, স্তোত্র জানিনা, ধ্যান জানিনা আর তোমায় পাইনা বলিয়া বিলাপও আমার নাই কিন্তু এই মাত্র জানি যে তোমার শরণ লইলে তুমি সকল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক। সকলোদ্ধারিণি জননি! আমার ত্রুটীর ত শেষ নাই আমি তোমার কুপুত্র তথাপি শুনি "কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি" কুসন্তান অনেক হইয়া থাকে সত্য কিন্তু মাতা কখন কুমাতা হয়েন না। কিছুই ত করিতে পারি নাই অনেক অকার্য্য কুকার্য্য করিয়া শেষ দশায় আসিয়াছি 'ইদানীঞ্চেন্তোতো মহিষগলঘণ্টা ঘনরবাৎ" এখন সর্ব্বদাই চারিদিকে ঘন ঘন মহিষ গলঘণ্টা শ্রবণ করিয়া বড়ই ভয় পাইতেছি তাহা! শুনি "গুণরহিতপুত্রেঽধিকদয়া" গুণরহিত পুত্রের উপরে মাতার দয়া অধিক হয়—তাহা স্মরণ করিয়াই তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—মা প্রসন্ন হও—আমার যে আর অবলম্বন নাই—আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব? আমি রুক্ষবাক্যে তোমার চিন্তা আর কি করিব—তবে এই বলি—

আপৎসুমগ্নঃ স্মরণং তদীয়ং করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি॥

আমি যে বিপদ সাগরে ডুবিতেছি তাও যে আমার বোধ নাই আমার শঠতাও যে আমি ধরিতে পারিনা তবু বলি হে করুণার্ণবেশি! দুর্গে! এখনও বুঝিতে পারি আর না পারি তোমার কৃপায় আমি যে বিপদ সাগর মগ্ন তাহা যেন সর্ব্বদাই আমার স্ফুরণ হয় আর যেন আমিসর্ব্বদা তোমার স্মরণ করিতে পারি ইহাতে আমার শঠতা যেন না

থাকে, শিশু ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইলে যেমন জননীকে স্মরণ করে সেইরূপে আমি যেন তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণায়-কাতর হইয়া তোমাকেই স্মরণ করিতে পারি। পূর্ণ করুণা স্বরূপিণী তুমি—আমার উপরে তোমার করুণা হওয়া আর বিচিত্র কি? কারণ সন্তান পাপ করিয়া পাপ রাশিতে ডুবিয়া পড়িলেও "নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতং" মাতা কখন সন্তানকে উপেক্ষা করে না।

জগদম্বে! এই সমস্ত বলার শেষ নাই—তথাপি বলি

মায়াশ্রিতং সকলমেতদনন্যকত্বাৎ।
মৎকীর্ত্তনং জগতি পাপহরং নিবোধ॥

জগতে যাহা কিছু তোমার উপর ভাসিয়াছে—সমস্তই মায়িক একমাত্র তুমিই সত্য। তুমিই বলিতেছ—আমার গুণ কীর্ত্তন, আমার লীলাকীর্ত্তন, আমার স্বরূপ কীর্ত্তন—ইহাই এই জগতে পাপ হরণ করে জানিও।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ও চণ্ডীগ্রন্থ অভিন্ন।

মহাপুরুষেরা বলেন চণ্ডীই জগজ্জননী—জগদম্বা। জগজ্জননী জগতের যে উপকার করিতেছেন, চিরদিন যে উপকার করিয়া থাকেন, ভবিষ্যতেও যে উপকার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া রাখিয়াছেন, এই চণ্ডীগ্রন্থও সেই উপকার করিয়া আসিয়াছেন, চিরদিনই করিবেন, যদি কেহ সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া, পুড়িয়া, আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় ভাবিয়া, মায়ের কাছে জুড়াইতে ছুটিয়া যায়, আর মা মা করিয়া মায়ের কাছেই মাত্র দুঃখের কথা জানায় এবং পূর্ণবিশ্বাসে চণ্ডী বিধিপূর্ব্বক পাঠ করে।

বলিতেছিলাম জগজ্জননী শ্রীচণ্ডী ও যাহা, চণ্ডীগ্রন্থও তাহাই। চিরদিনই ভারতের নর নারী শ্রীচণ্ডীকে ও চণ্ডীগ্রন্থকে অভিন্ন বলিয়াই জানিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের সনাতন পন্থাই ছিল ইহা। ভারতের শিরায় শিরায়, ভারতের অস্থি মজ্জার পরতে পরতে যে বৈদিক মার্গ প্রবিষ্ট হইয়া আছে সেই বৈদিক ধর্ম্মের শিক্ষাই ইহা। চণ্ডীগ্রন্থ

যেমন শ্রীচণ্ডী সেইরূপ গীতাকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ!"

কেমন করিয়া, ইহা দেখাইতে হইলে, বৈদিক ধর্ম্মের কিছু আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না।

যে বৈদিক ধর্ম্ম অনুসারে ঋষিগণ বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দেখিতেন, আর দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্র কিছুই নাই, সমস্তই সেই মহান্, সমস্তই সেই ভূমা; নামরূপ লইয়া এই যে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে—এই জগতের সকল রূপের ভিতরে, সকল নামের ভিতরে একটি অনাম নামী যাঁহারা দেখিতেন, দেখিতেন সকলরূপে রূপ মিশাইয়া একটি মাত্র অরূপই দাঁড়াইয়া আছেন, প্রতি সাকারে সাকারে এক নিরাকারে স্থিতি যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল, সেই ঋষিগণ এই বৈদিক ধর্ম্মে যে সকলেরই অধিকার আছে তাহাও বলিয়াছেন। । বৈদিক ধর্ম্মে আছে জ্ঞানাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস। শিবমাহাত্ম্য খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে সূতসংহিতা বলিতেছেন—

> উক্তো মুখ্যাধিকারীতি জ্ঞানাভ্যাসে ময়া হরে।
> অন্যে চ ব্রাহ্মণা বিপ্রো রাজানশ্চ তথৈব চ ॥ ১৯
> বৈশ্যাশ্চ তারতম্যেন জ্ঞানাভ্যাসেঽধিকারিণঃ।
> দ্বিজস্ত্রীণামপি শ্রৌত-জ্ঞানাভ্যাসেধিকারিতা ॥ ২০
> অস্তি শূদ্রস্য শুশ্রূষোঃ পুরাণেনৈব বেদনম্।
> বদন্তি কেচিদ্বিদ্বাংসঃ স্ত্রীণাং শূদ্র সমানতাম্। ২১
> অন্যেষামপি সর্ব্বেষাং জ্ঞানাভ্যাসো বিধীয়তে।
> ভাষান্তরেণ কালেন তেষাং সোঽপ্যুপকারকঃ ॥ ২২

ভাবার্থ হইতেছে ব্রাহ্মণগণের, রাজগণের, তারতম্য অনুসারে বৈশ্যগণের দ্বিজস্ত্রীগণের এই শ্রৌত-জ্ঞানাভ্যাসে অধিকার আছে। শূদ্রস্ত্রীগণেরও পুরাণশাস্ত্রে এই সনাতনধর্ম্মে অধিকার আছে। অন্য সকলেই এই জ্ঞানাভ্যাস করিবে। এই কারণে অনেক বেদমন্ত্র ভাষান্তর প্রাপ্ত হইয়া নানাস্থানে বৈদিকমার্গ দেখাইয়া দিতেছেন।

ঋষিগণ নিজে আচরণ করিয়া এই বৈদিকমার্গ প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলিয়াছেন—

স্থাপয়িধ্বমিমং মার্গং প্রযত্নেনাপি হে দ্বিজাঃ।
স্থাপিতে বৈদিকে মার্গে সকলং সুস্থিরং ভবেৎ ॥ ৫৪
যো হি স্থাপয়িতুং শক্তো ন কুর্য্যাৎ মোহতো নরঃ।
তস্য হন্তা ন পাপীয়ান্ ইতি বেদান্তনির্ণয়ঃ ॥ ৫৫
যঃ স্থাপয়িতুমুদ্যুক্তঃ শ্রদ্ধয়ৈবাক্ষমোঽপি সঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সাক্ষাৎজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৬
যঃ স্ববিদ্যাভিমানেন বেদমার্গ প্রবর্ত্তকম্।
ছল জাত্যাদিভির্জীয়াৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৫৭

সূতসংহিতা জ্ঞানযোগখণ্ড ২০ অধ্যায়।

আর্য্য ঋষিগণের প্রচারের বস্তু এই বৈদিকমার্গ। শক্তিসম্পন্ন হইয়াও যিনি মোহবশতঃ বৈদিকমার্গস্থাপনে চেষ্টা না করেন তিনি মহাপাতকী। এইরূপ ব্যক্তিকে যদি কেহ বধ করে সে ব্যক্তির কোন পাপ হয় না, ইহা বেদান্তনিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৈদিক-মার্গ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াও যিনি অক্ষম হয়েন, যিনি সম্পূর্ণ করিতে না পারেন, এইরূপ ব্যক্তিও সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। আর বিদ্যাভিমানী হইয়া যে ব্যক্তি বেদমার্গ প্রবর্ত্তককে ছল জাতি ইত্যাদি বিতণ্ডা দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করেন তিনিও মহাপাতকী হয়েন।

ঋষিগণ বলিতেছেন যিনি এই বৈদিকমার্গে অবস্থান করেন তিনি সর্ব্বত্র রাজার মত পূজাপ্রাপ্ত হয়েন। যাঁহার গৃহ লক্ষ্য করিয়া বৈদিক-মার্গস্থ মহাজন গমন করেন "তস্যক্রীড়ন্তি পিতরো যাস্যামঃ পরমাং গতিম্"—তাঁহার পিতৃলোক এই বলিয়া উল্লসিত হয়েন যে আমরা পরমাগতি প্রাপ্ত হইব। ইহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র সর্ব্ববিধ পাপ পলায়ন করে। আরও বলিতেছেন—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চ তেন।

অপার সচ্চিৎসুখসাগরে সদা
বিলীয়তে যস্য মনঃ প্রচারঃ ॥

যে বৈদিকমার্গ স্থাপয়িতার মনের প্রচার সর্ব্বদা অপার সচ্চিৎ সুখ সাগরে বিলীন, তিনি আপন বংশকে পবিত্র করেন. তাঁহার জননী ঐ পুত্র দ্বারা বিশ্বকে ভরণ করেন। ঐ পুত্রের জননী বলিয়া তিনি কৃতার্থা, তিনি পুণ্যবতী।

এই বৈদিকধর্ম্ম সকল শাস্ত্রেই প্রচারিত—শ্রীচণ্ডীতে এই বেদমার্গ বিশেষভাবে প্রচারিত। যথাস্থানে আমরা ইহা উল্লেখ করিব।

বৈদিকমার্গ কোনটী ইহা অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা সূতসংহিতা হইতে বৈদিকমার্গের সার উপাসনার কথা বলিব; ইহা হইতে বুঝা যাইবে চণ্ডী ও চণ্ডীগ্রন্থ অভিন্ন কিরূপে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে মানুষ নিজের দিকে চাহিতে শিখিয়াছেন, যিনি নিজের কর্ম্মের সমালোচনা করিতে অভ্যস্ত তিনিই জানেন আপনার অহংএর উপরে নির্ভর করিলে মানুষকে পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। পদে পদে মনস্তাপ পাইয়া যখন মানুষ আপনাকে নিরাশ্রয় দেখিতে পায় তখন মানুষ সর্ব্বশক্তিমানের সন্ধান লয়, লইয়া তাঁহার আশ্রয় পাইবার কর্ম্মে মন দেয়।

বলিতেছি নিজের দিকে তাকাইলে মানুষ বড় অসহায় কিন্তু তাঁহার দিকে তাকাইলে? কোথায় তিনি নাই? আহা! যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা; চেতনেত্যভিধীয়তে, যিনি ভূতে ভুতে বিষ্ণুমায়া যিনি জগতে চেতনা নামে কথিতা, আহা! যিনি জীবে জীবে বুদ্ধিরূপা নিদ্রারূপা, ক্ষুধারূপা, শক্তিরূপা, তৃষ্ণারূপা, জাতিরূপা, শান্তিরূপা, শ্রদ্ধারূপা—কোথায় তাঁহার অভাব? জগতের প্রতিবস্তুর কোলে কোলে যিনি, মানুষ তাঁহার কাছে কেন দুঃখপ্রতীকারের জন্য লুটাইয়া লুটাইয়া প্রার্থনা না করে? যিনি আকাশ সাজিয়া, বায়ু হইয়া, জল, অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, ফুল ফল তৃণ পল্লবদল, চন্দ্রসূর্য্য, পর্ব্বত, সাগর, তারা ধারা—যিনি সব সাজিয়া তোমার আমার সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যিনি সব করিতে পারেন, সব দিতে পারেন—তিনি থাকিতেও তোমার অভাব ঘুচিবে

না, তিনি থাকিতেও তোমার আশ্রয় মিলিবে না ? গ্রাম, নগর, নদী, নদীতীরস্থ দেবতা—সকলের মধ্যে থাকিয়া সেই একই যে তোমার সহায় হইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন ? সকলের কাছে তাঁহাকে স্মরিয়া প্রার্থনা কর। এইটী বৈদিকমার্গ। রামায়ণে এই বৈদিকধর্ম্ম প্রচারিত। সকলই তুমি। সেইজন্য রামায়ণে গঙ্গা যমুনার কাছে প্রার্থনা চলিত, হরিৎপর্ণ শোভিত শ্যামবটকে অভিবাদন করা চলিত, অযোধ্যার কাছে প্রার্থনা করা চলিত বিপদে পড়িয়া বলা চলিত—

আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
হংস-সারস-সংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরী নদীম্—
ক্ষিপ্রং রামায় শংসত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
দৈবতানি চ যান্যস্মিন্ বনে বিবিধ পাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যোভর্ত্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্॥

ইহা বিপদে পড়িয়া শুধু হৃদয়ের উচ্ছাস নহে ; এই যে সর্ব্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ—ইহা শুধু মুখের কথা নহে—ইহাই বৈদিক ধর্ম্ম।

কোথায় এমন শাস্ত্র আছে যেখানে এই বৈদিক ধর্ম্মের কথার উল্লেখ নাই ? মায়িক, অরূপ যিনি তাঁর স্বরূপের কথা কোথায় বলা হয় নাই ?

স্থাবরেষু চ সর্ব্বেষু নদেষু চ নদীষু চ।
* * * *
সর্ব্বে দেবাঃ সমুদ্রাশ্চ কালঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ
সূর্য্যোদয়ো দিবারাত্রী যমশ্চৈব তথানিলঃ॥
অগ্নিরিন্দ্রস্তথা মৃত্যুঃ পর্জ্জন্যো বসবস্তথা।
ব্রহ্মা রুদ্রাদয় শ্চৈব যে চান্যে দেব দানবাঃ॥
বিদ্যোদতি জ্বলত্যেষ পাতি চাত্তীতি বিশ্বকৃৎ।
ক্রীড়াং করোত্যব্যয়াত্মা সোঽয়ং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥

কোথাও ইনি বিষ্ণু, কোথাও ইনি রাম, কোথাও শিব, কোথাও কৃষ্ণ, কোথাও ইনি দেবী। ইনিই সেই পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী আত্মা।

"উৎসবের" নিয়মাবলী

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্ত ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

[illegible] শ্রাবণ [illegible]

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২৪শ বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩৩৬ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

জাতির কল্যাণ পথ।

ভগবানকে ভাবনা করিতে পারিলেই জীবের কল্যাণ হয় তদ্ভিন্ন কোন উপায়ে স্থায়ীমঙ্গল হইতে পারেনা—ইহাই ঋষিগণের সিদ্ধান্ত। ভাবনা সকলে করিতে পারেনা। চিত্তশুদ্ধি বিনা ঠিক ঠিক ভাবে ভাবনা হয় না। চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম আবশ্যক। এই কর্ম্ম যদি ঈশ্বর প্রীতি উৎপাদনের জন্য কৃত হয় তবে সমকালে আত্মকর্ম্ম ও জগদ্ধিতকর্ম্ম সম্পাদন হয়। ইহাই কল্যাণ পথ।

সকলে কি বলে জানিয়াছ ত? সকলে বলে সমাজটা কোন্ তালে নাচিতেছে আর তুমি বলিতেছ কি? কে শুনিবে তোমার কথা? পাগল ভিন্ন তোমাকে কেহ কিছু বলে না।

বলুক পাগল—আমি ঋষিগণের আজ্ঞা, শাস্ত্রের আজ্ঞা, ভগবানের আজ্ঞা, যেমন পাইয়াছি, গুরুমুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রে দেখিতেছি সেই মত চলিয়া পাগলামীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে ইচ্ছা করি। আত্মোদ্ধার ও ভারতোদ্ধার সমকালে যাহাতে হয় তাহাই কল্যাণ পথ। আমার মহামান্য বন্ধুগণ যদি আমাকে পাগল বলেন আমি এই পাগলামীর শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াই যাইতে ইচ্ছা করি। যে যাহা করেন তাহাতে বাধাদিতে ইচ্ছা নাই—ইচ্ছা করিয়াই বা

করিব কি? কেহ কি তাহা শুনিবেন? শুনিবেন না। আমি আপনি শুনিব আর যদি কেহ শুনেন তাঁহাকে শুনাইব। ভারতের যাহা ভাল আছে তাহা যতদূর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই বলিয়া যাইব। যিনি আমার মত শুনিবেন তিনি শুনিবেন যিনি না শুনিবেন শুনিবেন না। কি বলিব, বলিতেছি। ২১ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৬। পূর্ব্বে বলিয়াছ এতদিন ধরিয়া কিছুত করিয়াছ এই বয়সে এখন তাহা গুছাইয়া লও। গুছাইয়া লওয়া কিরূপ তাহা একটু ভাল করিয়া বলিবে?

শুনিতে চাও কেন?

চাই—এই কটা দিন সেই সব ভাবনা করিয়া রাখি—ইহাই কর্ত্তব্য। যদি কৃপা হয় শেষের দিনে যদি সে এই ভাবনার কিছুও হৃদয়ে ভাসাইয়া দেয়।

আচ্ছা। শ্রবণ কর। স্বরূপ ভাবনাই শ্রেষ্ঠ ভাবনা। স্বরূপ ভাবনা হয় না কেন জান? স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে মায়া। মায়াই জগৎ বিস্তার করিয়া সকল মিথ্যাকে স্বরূপের গায়ে ভাসাইয়াছেন। এই মিথ্যা সমস্ত লয় হইলে সেই স্বরূপই থাকেন। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ চৈতন্যই আছেন, চিরদিন ছিলেন, চিরদিন থাকিবেন। আর যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্মরণ করা যায়, তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া, তাহাই মিথ্যা। জগতে এমন একটা সময় আছে যখন মিথ্যার লয় হয় আর যাহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি দেখেন মিথ্যা নাই। "না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" অসৎ যাহা—মিথ্যা যাহা—তাহার বিদ্যমানতা নাই—তাহা নাইই। তথাপি যাহা দেখা যায় তাহা অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই বোধও কিন্তু সেই "সত্যপরং" মূলে আছেন বলিয়া। তাঁহার সত্তাতেই মিথ্যা ভাসে, ভাসিয়া আপন সত্তাকে ঢাকিয়া রাখিয়া নিজে সত্যের মত দেখায়। বলিতেছি সাধারণ মানুষও সর্ব্বপ্রথমে মহাপ্রলয়ের চিন্তা করুক। শেষ রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ হাত পা ধুইয়া আসিয়া পুনরায় শয্যায় আসিয়া পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া, শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া ভাবনা কর—মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে আর কিছুই নাই। তুমিই আছ। তুমিই সেব্য আর আমি—আমি পূর্ণের অংশ সাজিয়া ছিলাম এখন আমি সেবক হইলেও আছি। নতুবা দেখিবে কে? তাই সেব্য সেবক বলা হইল মাত্র। কিন্তু মূলে কি তাহাত জানিতেছ? দেখ শ্রুতি কি বলিতেছেন—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি
নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎবিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
ব্রহ্মৈ বেদমমৃতং পুরস্তাত্ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম
দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

বহমান নদী সকল সমুদ্রে মিশিয়া নামরূপ ছাড়িয়া যেমন অস্তমিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ অবিদ্যাকৃত নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষর পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়েন।

সেখানে সূর্য্য ভাসেন না, চন্দ্র তারকারও প্রকাশ নাই, এই বিদ্যুৎ সমূহও ভাসেনা, এই অগ্নির আর কথা কি? (তুমিত সর্ব্বদা আছ সর্ব্বত্রই আছ কিন্তু সর্ব্বত্র ভাসনা—আর) তুমি ভাসিলে সব ভাসে। তাহার ভাসাতে এই সমস্ত ভাসিতেছে।

এই অমৃত ব্রহ্মই—মরণ রহিত আনন্দই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই দক্ষিণে ব্রহ্মই বামে, অধে ঊর্দ্ধে এই ব্রহ্মই নাম রূপ মত ভাসিতেছেন, অধিক কি এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই জগৎ রূপে বিবর্ত্তিত।

সংহার ক্রমে মহাপ্রলয় হইয়া গেল। থাকিলেন শুধু স্বরূপ।

কিছুই নাই বলিয়া লয় বিক্ষেপও নাই। শুধুই তুমি তুমি। সম্মুখে পশ্চাতে আশে পাশে ঊর্দ্ধে অধে শুধু তুমি শুধু তুমি।

পদ্মাসনে বসিয়া ভাবনা কর মহাপ্রলয়। সব লয় হইয়া গিয়াছে। মমতা করিবার কিছুই নাই। অন্য ভাবনা আর উঠিবে কোথা হইতে? দেখনা কেন যেখানে আমার আমার সেখানে হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়ানি। যেখানে

মমতা নাই আমার আমার নাই, সেখানে আহা উহু একটু আধটু হইলেও বিচলিত হওয়া নাই, উদাসীন ভাব। তাই মহাপ্রলয় চিন্তাতে ভাবনা করিয়া লও শুধু তুমি আছ আর কিছুই নাই।

দ্বিতীয় ভাবনা হইবে তোমার সগুণ স্বরূপ। ভাবনা কর নিম্নমুখসহস্রার তলে দ্বাদশ বর্ণ পাপড়ী বিশিষ্ট উর্দ্ধমুখ পদ্ম। তাহার কর্ণিকাতে ত্রিকোণ মধ্যে মণি পীঠ। নিম্নে শুভ্র নাদ, উর্দ্ধে রক্তবর্ণ বিন্দু; মধ্যে মণি পীঠ। ত্রিকোণ মধ্যবর্ত্তী নাদ বিন্দু সহ মণিপীঠ মণ্ডল ভাবনা কর। মণিপীঠের সর্ব্বাঙ্গ মণিময়। মণিপীঠ চিন্ময়। মণিপীঠের উর্দ্ধে ত্রিকোণে "হুতভুক্ শিখা ত্রয়" অগ্নিশিখা ত্রয় দ্বারা মণিপীঠ উদ্ভাসিত। ইহার ভিতরে তোমার ইষ্ঠ, তোমার গুরু, আমার নাথ, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ।

সপ্তাবরণের মধ্যে এই চিত্রকূটে তোমার, আমার, সবার ইষ্ট, সবার গুরু। বিমলাদি সখী প্রথম আবরণে। স্বরলহরী এখানে মূর্ত্তিমতি অষ্টসখী। দ্বিতীয় আবরণে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি মূর্ত্তি ধরিয়া, তৃতীয়ে বেদমাতা গায়ত্রী—সমস্ত শাস্ত্র ও সমস্ত শব্দ মূর্ত্তি ধরিয়া, চতুর্থে শম্ভু ব্রহ্মা গণেশাদি সমস্ত দেবীসহ সমস্ত দেবতা, পঞ্চমে সমস্ত ঋষি, ষষ্ঠে গঙ্গাদি সমস্ত নদী মূর্ত্তি ধরিয়া, আর সপ্তম আবরণে হনুমানাদি, ধ্রুব প্রহ্লাদাদি সমস্ত ভক্ত।

সহস্রারের ভিতরে প্রণবের বিন্দু মধ্যে গুরু ইষ্টের সঙ্গে সমস্তই পাইলে। ইষ্টের চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া অথবা পরমপদ স্বরূপ চিন্ময় ইষ্টচরণে চক্ষুস্থাপন করিয়া যতক্ষণ পার স্থির থাকিয়া যাও।

তাহার পরে ঐখানেই ভাবনা কর।

ব্রহ্মা মুরারি ইত্যাদি শয্যাকৃত্য। পরে পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া অন্য অন্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রাতঃকৃত্যে বসিয়া যাও। ভাল হইবে। ভাল হউক ইহাই প্রার্থনা।

প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া গৃহস্থালি-কর্ম্ম বা সমাজহিতকর কর্ম্ম যাহার যাহা করণীয় তাহা করিয়া যথাসময়ে মধ্যাহ্নকৃত্য। পরে কিছু স্বাধ্যায়ের পরে সমাজ হিতকর কর্ম্ম। পরে সায়ংকৃত্য সারিয়া আবার প্রাতঃকৃত্যের মত ঈশ্বর চিন্তা করিয়া আহারান্তে শয়ন। এইভাবে শেষ কয়টা দিন কাটাইতে চেষ্টা করাই গুছাইয়া লওয়া।

রামপ্রসাদের একটি গান

ভয় কি শ্যামা মাকে দেখে।

ওরে—আদর ক'রে আদরিণী সন্তানে আয় বলে ডাকে॥

মা যে নিত্যপ্রসবিনী, উলঙ্গিনী তাইত থাকে

আর এমন কাপড় কোথায় পাবি

যাতে জগন্ময়ীর অঙ্গ ঢাকে॥

দুরাচারের মুণ্ড নিতে মায়ের হাতে অসি থাকে

পাষণ্ড খণ্ডকারিণী, কেটেও সন্তান বুকে রাখে।

ওমা ভয়ঙ্করা যতই হ'ক না

শোন মন আমার বলি তোকে

ওরে সিংহী দেখে ডরায় নারে

নৃত্য করে তার শাবকে॥

রামপ্রসাদের সকল গানেই নাম থাকে এই গানটীতে তাহা নাই। এমনও হইতে পারে সেই কলিটি হয়ত পাওয়া যায় না।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ ভঞ্জন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু পরিপক্ক সাধকের মধ্যেও কোন বিবাদ দেখা যায় না। রামপ্রসাদের "হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড় মা ত্রিভঙ্গ হয়ে" "কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে"—এইরূপ বহু গীত বিবাদ ভঞ্জনের গীত। গোবিন্দ চৌধুরীর গানেও এইরূপ বিবাদ ভঞ্জনের কথা আছে। বড় বড় সাধকের মধ্যে কালী কৃষ্ণ, কালী সীতা, সীতা রাধা, শিবরাম—ইহাঁদের ভেদ নাই। তত্ত্বের স্ফুরণ যাঁহাদের মধ্যে হইয়া গিয়াছে তাঁহারা দেখেন যিনি চৈতন্য তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই প্রণব, তিনি শিব, তিনিই রাম তিনিই কৃষ্ণ। আর যিনি শক্তি তাঁহারই নাম দুর্গা কালী সীতা রাধা ইত্যাদি। তন্ত্রে দেখা যায় দশ মহাবিদ্যা ও দশ অবতার একই বস্তু।

তোড়লতন্ত্রে—তারা দেবী মীনরূপা বগলা কূর্ম্ম মূর্ত্তিকা।

ধূমাবতী বরাহ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা॥

ভুবনেশ্বরী বামন স্যাৎ মাতঙ্গী রাম মূর্ত্তিকা।

ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥

মহালক্ষ্মীর্ভবেৎ বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তি সমুদ্ভবা॥

আবার নিত্যতন্ত্রে—কৃষ্ণস্তু কালীকা দেবী শ্রীরামস্তারিণী তথা।
ভার্গবঃ ষোড়শী বিদ্যা বামনো ভুবনেশ্বরী॥
মৎস্যস্তু বগলা দেবী বরাহশ্ছিন্ন মস্তিকা।
ধূমাবতী কূর্ম্মরূপা নৃসিংহো ভৈরবী স্বয়ং॥
বুদ্ধরূপা মহালক্ষ্মীর্মাতঙ্গী কল্কিরূপিণী।
এতা দশমহাবিদ্যা অবতারা হরের্দ্দশ॥

দুই তন্ত্রে একরূপ কথা না পাওয়া গেলেও ইহাতে সংশয়ের কথা কিছুই নাই। কারণ কল্প ভেদে শক্তির দশ অবতার পৃথকরূপে বিষ্ণুর অবতার হয়েন। শাক্ত শৈবের বা বৈষ্ণবের বিবাদ তবে কোথা হইতে আসিল? শ্রুতিতেও পাওয়া যায় "যা উমা স্বা স্বয়ং বিষ্ণুর্যো বিষ্ণুঃ স হি চন্দ্রমা"।

ঐ শ্রুতিই বলিতেছেন—

যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্।
যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চ্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্॥
যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনম্।
যে রুদ্রং নাঽভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবং॥

গোবিন্দকে নমস্কার করিলে শঙ্করকে নমস্কার করা হয়। হরিকে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন তিনি শিবকে অর্চ্চনা করেন। যিনি মহাদেবকে দ্বেষ করেন—ছোট বলেন তিনি কৃষ্ণকেও দ্বেষ করেন আর ছোট করেন। যিনি রুদ্রকে জানেননা তিনি কেশবকেও জানেননা। বেদাদি শাস্ত্র, সকল দেবতা সকল দেবী যে ব্রহ্ম, শক্তিমান্, শক্তি, ইহাই দেখাইতেছেন তবে আমার কৃষ্ণ সব চেয়ে বড় আরগুলি সব ছোট, কৃষ্ণটা অবতরী আর গুলি অবতার কৃষ্ণই স্বয়ং অন্যগুলি তাঁহার অংশ এই মত আসিল কোথা হইতে? হৃদয়কে স্বরূপের ভাবনা করাইতে পারিলে হৃদয় যখন শান্ত হইবে, তত্ত্বকথা ধারণা করিতে পারিলে হৃদয় যখন শুদ্ধ হইবে তখন বোধ হইবে চৈতন্যই একমাত্র দেবতা আর সকল অবতারই সেই চৈতন্য এবং সকল শক্তি সেই চৈতন্যেরই শক্তি। আবার শক্তি যখন চেতনোন্মুখী হয়েন তখন শক্তিই চৈতন্য হইয়া যান। তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন "শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতা ইতি

প্রয়োগ সাগরে। বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যায় শক্তি চৈতন্যের ধ্যানে চৈতন্যই হইয়া যান। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই ইহাও বিজ্ঞান দিয়া দেখান যাইতে পারে। তবেই হইল তেত্রিশ কোটী দেবতা কেবল নামরূপেই ভিন্ন কিন্তু স্বরূপে সেই একই ব্রহ্ম! তবে ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ সেই একই। ভজনের পার্থক্য জন্য পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হয় মাত্র কিন্তু বস্তুটী একই। তাঁহাকে ব্রহ্মই বল বা পরমাত্মাই বল বা ভগবানই বল ইনি চৈতন্যই আর সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্য যিনি, তিনি সমকালে নিগু´ণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার।

যাঁহারা ভগবানের এই তত্ত্বে পৌছিতে পারেন নাই, এই সত্য ধারণা করিতে পারেন নাই তাঁহারাই শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদের প্রবর্ত্তক। যাহা হউক আমরা এই গানটী যে বৈষ্ণবের প্রতি শাক্তের বিবাদ ভজনোক্তি তাহাই এখন দেখাই-তেছি। আধুনিক বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও যাঁহারা একটু বিবেচক তাহাদের মুখে শুনা যায় আমরা কৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখি—কালী মূর্ত্তি আমাদের নিকটে বড় ভয়ঙ্করী বোধ হয়। আমরা পুরাতন বিবাদটা প্রশ্নোত্তর ছলেই প্রকট করিতেছি।

বৈষ্ণব—একটা ন্যাংটা স্ত্রীমূর্ত্তি বিকটদশনা, লোল রসনা, রক্তমাখা, রক্তপানে রতা এটা কি উপাসনার যোগ্য? উলঙ্গিনী তাও আবার পতির বুকের উপর—একি বীভৎস ব্যাপার?

শাক্ত—শিবের বক্ষে শক্তির নৃত্য লইয়াই ত এই জগৎ চলিতেছে রে মূর্খ। শিব হইতেছেন স্থিতি আর শক্তি হইতেছেন গতি। স্থিতি না থাকিলে গতি কি হয় বাপু? তোমার সভ্যতার খাতিরে সত্য কি অপলাপ করা যায় হে?

বৈষ্ণব—তোমার স্থিতি গতি তুমি রাখ বাপু! আমি অমন অসভ্য নেংটা অভদ্র ঠাকুরকে ভাল বলিতে পারি না। যাহা দেখিলে ভয় হয় তাহাকে আবার পূজা করা যায় কিরূপে?

শাক্ত—ভয় কি শ্যামা মাকে দেখে।

ওরে আদর ক'রে আদরিণী সন্তানে আয় ব'লে ডাকে।

মাকে আবার সুন্দর কুৎসিৎ কে দেখেরে? মা যেমনই হউন তিনি আদর ক'রে সন্তানকে ডাকেন তখন আদরিণীর আদরে সন্তান কি ভয় পায় রে বাতুল? আর ঐ যে মাকে ন্যাংটা দেখিস্? তুই কিরে? তোর মা যখন তোকে প্রসব করেছিলেন তখন তোর মা একটা সন্তান প্রসব করেই কিন্তু উলঙ্গিনী হইয়া গিয়াছিলেন। একটা সন্তান প্রসব করেই উলঙ্গিনী আর

আমার মা যে নিত্যপ্রসবিনীরে—দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে অনন্ত কোটী জগৎ প্রসব করেন যিনি, তাঁর কাপড় পরার অবসর কোথায় রে? আর বল দেখি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁর অঙ্গ—এই অঙ্গ ঢাকবি কি দিয়ে? এত বড় কাপড় কোথায় পাবিরে যাতে জগন্ময়ীর অঙ্গ ঢাকা যায়? আরও একটা কথা দেখ—একজন স্ত্রীলোক কাপড় পরিতেছেন কিন্তু তার কাপড়ের ভিতর একটা পিপীলিকা ঢুকিয়াছে। আর সেই পিপীলিকার যেন চক্ষু হইল। বল্ দেখি সে ঐ স্ত্রীলোকে কাপড় পরা দেখিবে না উলঙ্গ দেখিবে? মা যে আমার দিক্‌বসনা। দশদিক্ তাঁর বসন। তুই বসনের ভিতর চাপা পড়িয়াছিস্ তোর ত উলঙ্গ দেখাই উচিত। দশ দিকের বাহিরে আসিতে পারিস্ মাকে দেখ্‌বি বিচিত্র বসন পরা মা আমার। কেমন—কাঁদিস্ কেন?

বৈষ্ণব—ভাই ক্ষমা কর ক্ষমা কর তোমার মাকে—আমার মাকেও বল তিনি যেন আমার মত হতভাগ্যকে ক্ষমা করেন। শুনেছি জগদম্বা ক্ষমা সারা—শুনেছি "নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্"।

শাক্ত—আহা ভাল হউক ভাল হউক। ক্ষমা চাহিবার আগেই তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। দেখ ভাই এই চিড়িয়াখানায় একবার যা। একটা বাঘিনী একটা বাচ্চা লইয়া বেশ খেলা করে। আহা যখন শিশুকে আদর করে তখন তাহার চক্ষের দিকে গোপনে তাকাইয়া দেখিস্ দেখ্‌বি কি আদরভরা, দয়ামাখা চক্ষু। কিন্তু মানুষ যখন খাঁচার বাহিরে দাঁড়ায় মানুষের চক্ষে চক্ষু পড়িলে সেই চক্ষু একেবারে দ্বেষভরা হইয়া উঠে। মানুষ যে ভয় লইয়া বিদ্বেষ লইয়া যায় তাই এমন হয়। আবার সেই সময়ে যদি ব্যাঘ্রশিশু মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে তবে দেখিস্ সেই কর্কশ চক্ষুই আবার দয়ামান দীর্ঘ নয়নে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তুই ও যে ভাই মায়ের ছেলে—মায়ের উপর দ্বেষভাব না রাখিয়া আদর করিয়া মায়ের দিকে দেখ্‌বি মা বিকটাকার নয়রে মা ত্রৈলোক্যমোহিনী—মা আমার বড় আদরিণী।

বৈষ্ণব—হইয়াছে ভাই আর বলিতে হইবে না।

আপন মাকে চিন্‌লে না যে।

আপন মাকে চিনলে না যে
বিশ্ব মায়ের কিই বা জানে
বর্ণবোধ যার হয়নি সেকি
বেদ পুরাণের বুঝ্‌বে মানে ?
জনম দিলেন যে মা তোরে
নিজের হৃদয় রক্ত ধারে
আপন বুকের সুধা দিয়ে
বাঁচিয়ে দিলেন প্রাণে প্রাণে।
সেই মায়েকে চিন্‌লে না যে
বিশ্ব মায়ের কিই বা জানে ?
এই মায়েরই পূত কায়া
বিশ্ব মায়ের কায়ার ছায়া
বিশ্ব মায়ের স্নেহের আলো
এই মায়েরই নয়ন কোণে
এই মায়েকে চিন্‌লে না যে
বিশ্বমায়ের কিই বা জানে ?

শ্রীসরোজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘাটভোগ, খুলনা।

চরণ চিন্তা।

পটে যেমন ছবি বসিয়া থাকে, নড়েও না চড়েও না, কথাও কহে না, সেইরূপে কি ভগবান্ আমার হৃদয়ে বসিয়া থাকেন? এক্ষেত্রে চরণচিন্তা ত পটে আঁকা ছবি চিন্তা? ইহাতে ত রস উঠে না।

কিন্তু রসের সহিত চরণ চিন্তা করিতে হইলে হৃদয়কে ভগবানের লীলা ক্ষেত্র করিতে হয়, হৃদয়কে বিশাল করিতে হয়। যিনি হৃদয়কে বৃন্দাবন ভাবনা করিতে পারেন, হৃদয়কে অযোধ্যা করিতে পারেন, হৃদয়কে রক্তবীজের বিনাশ স্থান বিন্ধ্যাচল করিতে পারেন তিনি দেখেন তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের চরণ চিহ্ন কত সুন্দর, কত রসপূর্ণ। ভগবান্ আমার এই হৃদয়কে বিশাল করিয়া লইয়া হৃদয়েই লীলা করেন তাই হৃদয়ে চরণ চিহ্ন পড়ে। বাল্যকাল হইতে ভগবান্ কতস্থানে ঘুরিয়াছেন, কত ফিরিয়াছেন, কত কার্য্য করিয়াছেন সমস্তই আমার হৃদয়ে, কেননা যেখানে চিন্তা করা যায় তাহাই হৃদয়। বাস্তবিক মানুষ যাহা কিছু চিন্তা করে তাহা বাহিরে নহে, হৃদয়েই। হৃদয় ছাড়িয়া মন বাহিরে ত যায় না। বাহিরের যাহা কিছু তাহাই হৃদয়ে আনয়ন করে। কাজেই হৃদয়টাকে ভগবানের লীলা চিন্তা করিয়া যখন তাঁহার লীলা ক্ষেত্র করা যায় তখন হৃদয়ে রস উঠিবেই। এই অবস্থায় একটি লীলা চিন্তা করিয়া হৃদয় চুপ করিয়া যায় না, হৃদয় সমস্ত লীলা ভাবনা করিতে চায় আর আপনা হইতে পরেপরে লীলা স্ফুরণ হইতে থাকে। হৃদয়ে কত ভক্তের সঙ্গে ভগবানের পূজা গ্রহণ চলিতে থাকে কত ভক্তের সঙ্গে ভগবানের আদর চলিতে থাকে। বলনা তোমার হৃদয়ে যদি রাস লীলা চলে, তোমার হৃদয়ে যদি রাধারাণীর অভিসার চলে, যদি বনগমন কালে রাজা রাণীর, প্রজাবর্গের শোকে হাহাকার চলে, যদি অহল্যার হৃদয়ে ভগবানের চরণ স্থাপন চলে তবে তোমার হৃদয়ের অবস্থা কি হয়? যদি তোমার হৃদয়ে মহিষাসুর উৎপীড়নে দেবগণের ক্রোধে তেজোরাশির উত্থান হয় আর সেই পর্ব্বতপ্রমাণ তেজোরাশির মধ্য হইতে মায়ের অপরূপ রূপ ভাসিয়া উঠে, তার পরে মহিষাসুরের যুদ্ধে মায়ের ভয়ঙ্কর নৃত্য যদি হৃদয়ের মধ্যেই চলে বলনা তখন কেমন হয়? ভগবান্ নৃত্য করিতেছেন আর আমি সেই চঞ্চল চরণ দেখিতে দেখিতে সেই মনোহর চরণ চিহ্ন ভাবনা করিতেছি—

ইহাতে কি চরণ চিন্তায় জড়ের চিন্তা হয়? করিয়া দেখনা লীলা চিন্তা কতই করিতে ইচ্ছা হয়। একটু আধটু চিন্তায় "ন তৃপ্যতি মনো মম" আমার মনের তৃপ্তি হয় না—আবার লীলা চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়। এই ভাবে হৃদয়কে রসে ভরিত করিয়া তার পর সেই আনন্দময় মূর্ত্তিকে স্থির ভাবে আবার চিন্তা কর—আর চরণ চিন্তা করিয়া একবার কাতর নয়নে ভগবানের দিকে তাকাও, দেখ কেমন হয়? আর পরীক্ষা করিয়া দেখ মূর্ত্তি ভাবনায়, চরণ চিন্তায় একটি সরস ভাবে হৃদয় ভরিয়া যায় কিনা? ইহা বলিবার কথা নহে করিয়া দেখিবার কথা। ইহাতেও যদি কাহারও না হয় তবে বলা হয়—অদৃষ্ট! আর কি?

মিনতি।

শষ্পের মত নীচু ক'রো সবার পদতলে।
পৃথ্বীর মত সহ্য দিও জীবনে সবস্থলে॥
তরুর মত ক্ষমা দিও সাহস বীরোচিত।
অমল বিমল মধু প্রেমে ক'রো পুলকিত॥
পুষ্পের মত হাসি দিও শিশুর মত চিত্ত।
অলির মত ঝঙ্কার দিও মেতে র'ব নিত্য॥

শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ রায়,
নূরনগর
খুলনা।

যুগধর্ম্ম।

যে বিস্তৃত ভূমি খণ্ডের শিখর দেশে অন্যূন দশসহস্র ক্রোশ উচ্চ গিরিরাজ হিমালয় স্থাপিত ও যাহার পাদদেশ পবিত্র জলরাশি নিরন্তর বিধৌত করিতেছে, সেই বিস্তৃত দেশে যুগযুগান্তর হইতে বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, মহম্মদীয়, খৃষ্টীয় প্রভৃতি নানা প্রকারের ধর্ম্মের প্রচার হইয়া আসিতেছে সত্য কিন্তু, ঐ ভূমিখণ্ড ত্রিংশত কোটি মানবের মধ্যে বিংশতি কোটি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মানবের বাস ভূমি, সে হেতু উহাকে হিন্দুর ভারত বলিলে যদি কোন অপরাধ হয়, ভরসা করি সেই অপরাধ মার্জ্জনীয়।

ব্রহ্মের নিঃশ্বাস হইতে বেদের উদ্ভব। বেদ অপৌরুষেয়। সুতরাং বেদ কেবল মাত্র এই ভারতের নহে। বেদ সর্ব্বজগতের। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানবের হিতার্থে জগৎস্রষ্ঠা বেদের প্রচার করিয়াছেন। বেদের মর্ম্ম দিব্যজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া বেদনিহিত নিত্যসত্য কথা, নিত্য সত্য ধর্ম্ম, ভারতের মহর্ষিগণ কালে কালে, উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন, সাংখ্য দর্শন, পাতঞ্জলদর্শন, বৈশেষিক দর্শন, স্মৃতি শাস্ত্র তন্ত্রাদি গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়াগিয়াছেন। সেই সমস্তমতের মধ্যে অধিকারী ভেদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য থাকিলেও সাধারণতঃ জগৎ সৃষ্টি ও পালন ও মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্বন্ধে একই মত বলিলেও তাদৃশ দোষ হয় না।

কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে দর্শনকারগণের মধ্যে কোন একদর্শনকারের মত অবলম্বনে কোন কথা বলিলে বা লিখিলে, উহা অপর দর্শনকারের মতের বিরোধী বলিয়া ঐ মত অগ্রাহ্য হইতে পারে। সেইজন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা আদি কবি বাল্মীকির গ্রন্থ হইতে দুই একটি মাত্র সার কথার আলোচনা করিলাম। জন্মস্থান হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত যে ভূমিখণ্ডে মহারাজ দশরথপুত্র ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র লীলা দেখাইয়াছিলেন সেই ভূমিখণ্ডকে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের দেশ বলিলাম। উহাই সমগ্র ভারত।

ব্রহ্মকে কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অপরাপর দেবদেবি-গণকে কল্পনাধীন করাও প্রায় তথৈবচ। কিন্তু পিতা মাতাকে উপলব্ধি করা অতি সহজ কর্ম্ম। সেই জন্য যুগযুগান্তর হইতে মহর্ষিগণ পিতাকে দেবতাজ্ঞান

ও মাতাকে দেবীজ্ঞানে আরাধনা করিবার আজ্ঞা দিয়াগিয়াছেন ও ভারতসন্তান গণকে জ্ঞানদানের অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহাদের দেহান্তে তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহের মঙ্গলার্থে শ্রাদ্ধাদি নানাবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্মের আয়োজনের আদেশ দিয়া গিয়াছেন।

যথা—(১) ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই তপের বস্তু। এবম্বিধ পিতার প্রীতি সম্পাদন করিলে সকল দেবতাগণের প্রীতি সম্পাদন করা হয়।

(২) পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ।
অতোহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমগুরু॥

গর্ভধারণ জন্য এবং সন্তানকে পোষণ করার জন্য পিতাপেক্ষা মাতা বড়। সেইজন্য মানবের পক্ষে ত্রিলোকের মধ্যে মাতার ন্যায় গুরু কেহ নাই।

(৩) পিতুর্দ্দশগুণং মাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে।

স্মৃতি।

গৌরবে মাতা পিতা অপেক্ষা দশ গুণ অধিক।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার লীলাক্ষেত্রে উপরোক্ত উপদেশ কি প্রকারে পালন করিয়াছেলন তাহা মানব মাত্রেরই, বিশেষতঃ পথভ্রষ্ট সংসারী পথিকের লক্ষ্য বস্তু হওয়া উচিত। দেবাসুরের মহাযুদ্ধে কৈকেয়ী স্বামী রাজা দশরথের যখন জীবন রক্ষা করেন তৎকালে রাজা দশরথ তাঁহার প্রতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে দুইটি প্রার্থনা পূরণের জন্য প্রতিশ্রুত হন। বহুদিবস পরে রাজার বার্দ্ধক্যে যখন অযোধ্যারাজ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের দিনস্থির হয়, তখন ক্রূরমতি মন্থরার পরামর্শে রাণী কৈকেয়ী, পতিকে তাঁহার অঙ্গীকৃত প্রার্থনা পূরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেন ও সপত্নীপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের নবপঞ্চ বৎসর বনবাস ও স্বগর্ভজাত পুত্র শ্রীভরতকে সিংহাসনারূঢ় করিবার জন্য প্রার্থনা করেন।

নবপঞ্চচ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
চীরাজিনধরো রামো ভবতুতাপসঃ॥
ভরত ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্।
অদ্যৈচব হি পশ্যেয়ং প্রয়াস্তং রাঘবং বনে॥

সিংহাসনারূঢ় হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিমাতা রাণী কৈকেয়ীর মুখ হইতে পিতার আজ্ঞা জ্ঞাত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীরামচন্দ্রের দেশের সকল মানবের সদা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা অতি কর্ত্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের উচ্চারিত বাক্য:—"অহংহি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে।"

"পিত্রর্থে জীবিতং দাস্যে, পিবেয়ং বিষমুল্বণম্।"

পিতার সন্তোষের জন্য আমি জীবন দিতে পারি, পিতার বাক্যে অগ্নিতে পড়িতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি।

উপরোক্ত বাক্য বলিয়া পরে আরও বলিয়াছিলেন:—

"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটা চীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্॥"

বনবাসে সঙ্কল্প করিয়া মাতা কৌশল্যার নিকট বিদায় গ্রহণ কালে, পুত্রে ও মাতায় কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে যে কথোপকথন হয়, অমূল্যগ্রন্থ রামায়ণের সেই অংশ সকল বালক বালিকার অবশ্য পাঠ্য।

মাতা কৌশল্যা পুত্রকে বলেন—"বৎস রাম! পিতা তোমার যেমন গুরু আমি তদপেক্ষা অধিক। পিতা তোমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি তোমাকে বনে যাইতে নিবারণ করিতেছি।

"পিতা গুরুর্যথা রাম তবাহমধিকা ততঃ।
পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহংসুতং॥"

শ্রীরামচন্দ্র ইহার উত্তরে বলেন-"জননি! মনুষ্য জীবন ত ক্ষণস্থায়ী, এখনই আছে, এখনই নাই। বনে গমন না করিলে পিতার সত্যধর্ম্ম পালন করা হয় না। সত্য রক্ষাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম। দশরথ ত কেবল পিতা নহেন, তিনি পরমধার্ম্মিক, এবং দেশের অধীশ্বর। সত্যভঙ্গে তাঁহার নরকবাস হইবে ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না।" তৎপরে যে পিতা তাঁহার বনবাসের কারণ সেই দশরথকে প্রাণপণে শুশ্রূষা করিবার জন্য করযোড়ে মাতা কৌশল্যাকে অনুরোধ করেন, কারণ যে নারী ব্রত, উপবাস, ও অপরাপর নানাগুণে ভূষিতা তিনি যদি স্বামীর শুশ্রূষা না করেন তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না, ইহাই বেদের ও শ্রুতির উপদেশ।"

শুশ্রূষামেব কুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতেরতা।
এষা ধর্ম্ম স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুত স্মৃতঃ॥

পুত্রের পক্ষে পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি প্রদর্শন ও নারীর পক্ষে স্বামীরশুশ্রূষা করা প্রধান ধর্ম্ম তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস উপরে দেওয়া হইল মাত্র, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ও তৎপত্নীকে ভক্তি প্রদর্শনও যে মানবের লক্ষ্য বস্তু হওয়া উচিত শ্রীলক্ষণমাতা—সুমিত্রার পুত্রের প্রতি উপদেশে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বনগমন কালে তিনি পুত্র লক্ষণকে যে সান্ত্বনাবাক্য বলেন তাহা এই শ্রীরামচন্দ্রের দেশের সকল নরনারীর স্মরণে রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন "বৎস লক্ষণ! বনে তুমি রামকে শ্রীদশরথ মনে করিও, সীতাকে মনে করিও যে তিনিই আমি, আর বনকে অযোধ্যা মনে করিয়া, তুমি যথা সুখে চলিয়া যাও"।

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ বৎস যথা সুখম্॥

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের দিবস হইতে কলিযুগের আরম্ভ। এই যুগের আদি হইতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোকবাসিগণের মধ্যে পর্য্যন্ত লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা এবং হিংসাদি অধর্ম্মের চক্র, ক্রমে ক্রমে বিস্তার হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও সকল মানবের মনে, অনৃত, মদ, কাম, রজঃ এবং বৈর এই পঞ্চবিধ প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছে, এবং শৌচ, দয়া, সত্য, নষ্ট হইবার কথা সুতরাং লোকের প্রবৃত্তি সুবর্ণে, দ্যূতে, মদ্যপানে এবং সূন্তে (হিংসাতে) নিবদ্ধ হইবার কথা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা বলিব এই কলিযুগে পুণ্যমেকপাদং, পাপত্রিপাদং, ধর্ম্মশঙ্কুচিতং, স্তপোবিরহিতং, সত্যঞ্চ দূরগতং,ক্ষৌণীমন্দফলাং, শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ লোকাঃ স্ত্রীবশগা, সাধুঃ সীদতি, দুর্জ্জনঃ প্রভবতি, ইত্যাদি হইবার কথা। কাল ধর্ম্মে এই শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিতে ওঁ পিতাঃ স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সংসারে বৃদ্ধ পিতামাতার তিষ্ঠান কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। এবং বালকগণের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নে লিখিত পদ্য পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে।

টাকা আমার কৃষ্ণঠাকুর, বউ আমার সব।
সন্দেশ মিঠাই বৌয়ের সঙ্গে খাইব গবাগব।

মাকে মারব ঝাঁটারবাড়ি, বাপকে দেখাব লাটি।
"বন্দেমাতরং" চেঁচিয়ে বলে, করব ছুটাছুটি ॥
দাদু আমার কৃষ্ণকথা, শুনতে ভালবাসেন।
দৈ আনতে বল্লেই কেবল, নাকিস্থরে কাঁদেন ॥

সর্ব্বদেশেই এই ভাবের উদয় লক্ষিত হইতেছে। আর কি ক্যাসাবাইয়েনকা (casabianca)র ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ বালক সুদূর য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিবে? পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য সজোরে—"বল পিতা বল, এখনও আমার কর্ত্তব্য পালন কি হইল না।" * এই শেষ বাক্য বলিয়া আর কি কোন বীরবালক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবে? কখনই না। য়ুরোপে ও কলিরাজ দেখা দিয়াছেন। যুগধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বত্রই সমান। ইতি

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী
৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬।

---

* The flames rolled on—he would not go
Without his father's word;
That father faint in death below
His voice no longer heard.
He called aloud "Say father say
If yet my task is done!"
He knew not that the chieftain lay
Unconscious of his son.
"Speak father" once again he cried
If I may yet be gone!
But the booming shot replied
And fast the flames rolled on.

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

১৩৩৩ সালে শারদীয়া পূজার পর পুনরায় আমরা জসিডি রওনা হইলাম। ৩রা কার্ত্তিক জসিডিতে পৌঁছিয়া ৪ঠা কার্ত্তিক দেওঘর শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের দর্শন-মানসে তাঁহার রামনিবাস আশ্রমে গিয়াছিলাম। ৫ই কার্ত্তিক প্রাতে আমরা সকলে সাধুবাবার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কৈলাস পাহাড়ে রওনা হইলাম। পাহাড়ে উঠিয়া দেখিলাম সাধুবাবা পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন আননে তেমনি নির্জ্জন বারান্দার কোণটীতে একখানি আসনের উপর একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং ঐ বারান্দাতে যে একখানি মাদুর ছিল, তাহাতে আমাদের বসিতে বলিলেন। এবার দেখিলাম বাবার বারান্দার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া খোলার আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বারান্দাটী আরও বেশ বসিবার উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা সাধুবাবার নিকট বসিয়া তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর বাক্যে ও পাহাড়ের উপর হইতে বহুদূর দৃষ্টি-গোচর হওয়ায় চতুর্দ্দিকের মনোরম দৃশ্য দর্শনে মগ্ন হইতেছিলাম।

আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে জসিডিতে সর্ব্বত্র বহুদূর বিস্তৃত সবুজ ধান্যক্ষেত্রগুলি চক্ষুর বড়ই তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে। আমরা কৈলাসপাহাড়ে থাকিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম সেই বহুদূরব্যাপী হরিদ্বর্ণের শস্যক্ষেত্রগুলির উপর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে বায়ু বহিয়া যাওয়ায় উহার অগ্রভাগ বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড মহুয়া বৃক্ষগুলিও এদিক ওদিকে দেখা যাইতেছে ; মধ্যে মধ্যে এক একটা আম্রবৃক্ষ তাহাদের সুগোল মস্তক লইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কিয়দ্দূরে কুতনিয়া নদীটীর অল্প পরিসর জল ও বালির রেখা বক্রগতিতে বহুদূর অবধি চলিয়া গিয়াছে। বহুদূরব্যাপী মেষ ও মহিষাদি স্বেচ্ছামত বিচরণ ও আহার অন্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। এদিকে পশ্চিমে গভীর সুনীল গগনতলে বহুদূর ব্যাপিয়া দিগিরিয়া পাহাড়ের সুদীর্ঘশ্রেণী উত্তরা-ভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। দিগিরিয়া পাহাড় হইতে অনেকটা দূর হইলেও স্থানে স্থানে এক একটা ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্টিগোচর হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন উহা ঐ মেঘ পাহাড়ের অতি সন্নিকটেই অবস্থিত রহিয়াছে। আমরা সেই মেঘনির্ম্মুক্ত গগনের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত চতুষ্পার্শ্বের সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে

তৃপ্ত হইয়া সাধুবাবার নিকট একটী কাহিনী শুনিতে চাহিলাম। তিনি সেই দিন একজন ব্রাহ্মণের সন্তান লাভার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে গভীর তপস্যার বিষয় যে কাহিনীটি বলিয়া শুনাইয়া ছিলেন, তাহা এইরূপ ঃ—

এক স্থানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় পুত্রসন্তান লাভাকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে পুত্রহীন ব্রাহ্মণ পুত্র কামনায় ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে গভীর প্রার্থনা ও তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা প্রীত হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ প্রজাপতির নিকট পুত্রসন্তান প্রার্থনা করিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার পুত্রসন্তান লাভ হইবে না। ঐ বর ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ঐ এক প্রার্থনা ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই।" ব্রহ্মা সে বর দিতে অসমর্থ জানাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মার নিকট তাহার কোন পুত্রলাভ হইবেনা শ্রবণ করিয়াও ব্রাহ্মণ তপস্যা হইতে বিরত হইলেন না। পুনরায় তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাহার কঠোরতায় এবং ভক্তিতে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণের নিকট আবির্ভূত হইয়া ঐ একই কথা বলিলেন। পুনঃ পুনঃ এত বিফলতাতেও তিনি ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় আশুতোষের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার একনিষ্ঠায় শঙ্কর মহা তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন। কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণকে ঐ একই প্রকার কথা বলিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব যখন বলিলেন, "তোমার প্রতি আমি খুব প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি পুত্র লাভের বর ব্যতীত যাহা প্রার্থনা করিবে,—তাহাই তোমাকে প্রদান করিব," ব্রাহ্মণ তখন করযোড়ে বলিলেন, "আমার পুত্র কামনা ভিন্ন অন্য কোন প্রার্থনীয় নাই। হে আশুতোষ! যদি প্রকৃতই এ দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে 'একটী পুত্র লাভ হউক' এই বর প্রদান করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।" দেবাদিদেব মহাদেব ব্রাহ্মণের ঐকান্তিক অভিলাষ ও অতিশয় ব্যাকুলতা দর্শনে অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "যদিও তোমার পুত্রসন্তান হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা, তথাপি এই সুদীর্ঘ কালাবধি কঠোর তপস্যায় রত থাকায় সেই পুণ্যফলে এবং আমরা সকলেই তোমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হওয়ার নিমিত্ত বর প্রদান করিতেছি। এই বর দ্বারা তুমি একটী পুত্র লাভ করিবে বটে, কিন্তু সে পুত্র বিকলাঙ্গ হইবে। তাহার হস্তপদ

কিছুই থাকিবে না।” ব্রাহ্মণ এতাদৃশ বর লাভ করিয়াও অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। মহাদেবের কৃপায় কিছুদিন পরে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু সে সন্তান একেবারে পঙ্গু, সে সম্পূর্ণ হস্তপদ বিহীন। ব্রাহ্মণ দম্পতি ঐ বিকলাঙ্গ পুত্রেরই যথা সাধ্য স্নেহ ও যত্ন সহকারে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ সন্তান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু হস্তপদ বিহীনতা হেতু সে কিছুই করিতে না পারায় পিতামাতাকেই সর্ব্বদার জন্য তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। এইরূপে বহুদিন গত হইলে পিতামাতা সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তাহারা ক্রমে ক্রমে বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইতেছেন, কিছুদিন পরেই তাহাদিগকে এ সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে,—তখন ঐ বিকলাঙ্গ পুত্রের যে কি দুর্দ্দশা হইবে,—এই চিন্তাতেই তাহারা মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মল মূত্রাদি হইতে স্নানাহার কার্য্যাদি সমস্তই পিতামাতার সম্পন্ন করিতে হইত। উঁহাদের উভয়ের সাহায্য ব্যতীত পুত্রটীর নিজের কিছুই করিবার সামর্থ্য ছিল না। পিতামাতার অভাব হইলেন পুত্রের এসকল কার্য্য কেমন করিয়া চলিবে— এই চিন্তা করিয়া তাহারা অতিশয় বিচলিত হইলেন। পঙ্গু সন্তান পিতামাতার এই দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া সান্ত্বনার জন্য বলিল, “তোমরা আমার জন্য বৃথা কেন চিন্তা করিতেছ? আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। তোমাদের সেবা না পাইলেও আমার দিন ঠিক এক প্রকারে চলিয়া যাইবে।” বহু বৎসরাবধি ক্রমাগত সন্তানের সর্ব্বপ্রকার সেবা ও যত্ন করিয়া অবশেষে তাহার মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া উঁহারা বিরক্ত হইয়া সেই হস্তপদ বিহীন পুত্রকে এক বনের মধ্যে ফেলিয়া আসিলেন। তাহার উঠিবার কিম্বা কিছু করিবার তো শক্তি নাই। সুতরাং সে ঐ বনের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া অনবরত “হরিবল, হরিবল” ধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিয়া ঐ স্থানে এদিক্ সেদিক্ হইতে অনেকগুলি রাখাল বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাকে ঐ প্রকার অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, উঁহাদের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা পঙ্গু বালককে উঠাইয়া লইয়া গিয়া স্নান করাইল এবং একটী বৃক্ষতলে তৃণ দ্বারা বসিবার স্থান প্রস্তুত করিয়া উহাকে বসাইয়া দিল। তাহারা নিজেদের খাবার হইতে সেইদিন সকলে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া উহাকে খাওয়াইয়া দিল। পরে রাখাল বালকগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে পরদিন হইতে প্রত্যেককেই

আপন আপন বাড়ী হইতে সামান্য কিছু খাবার বেশী করিয়া আনিয়া এই পঙ্গু বালককে কিছু কিছু খাওয়াইবে। পরদিন হইতে প্রত্যহ রাখাল বালকগণ যখন গরু চরাইতে বনে আসিত তখন ঐ প্রকার সকলেই বাড়ী হইতে খাবার আনিতে লাগিল ঐ পঙ্গু বালককে খাওয়ান ও উহার অন্যান্য যাহা সেবা প্রয়োজন যথা সাধ্য তাহারা করিতে লাগিল। ঐ পঙ্গু বালক প্রত্যহই হরিনাম করিত, আর তাহার সহিত রাখাল বালকগণ যোগদান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিত। একদিন বালকগণ মহানন্দে একত্রে ঐরূপ হরিধ্বনি করিতেছে এমন সময় সেই স্থানে মহাভক্ত নারদ ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঐরূপ পরমানন্দে বালকগণকে হরিনাম করিতে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। তিনি পঙ্গু বালকের নিকট তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "তোমার প্রতি আমি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" সেই সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকার নির্লোভ বালক বলিল, "আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহার অধিক কিছু তো আপনি দিতে সমর্থ হইবেন না, সুতরাং আপনার নিকট আমি আর কি চাহিব? বালকের এবম্প্রকার ভাব দর্শন করিয়া নারদঋষি খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া বালকের দুরবস্থার বিষয় বর্ণনা করিলেন। ঐরূপ সম্বলহীন নিঃসহায় অবস্থাতেও নির্ব্বিকার চিত্তে পরমানন্দে তাহার হরিনাম কীর্ত্তনের কথা তাঁহাদের নিকট নিবেদন করায় তাঁহারা সেই বনে ঐ পঙ্গু বালকের নিকট আসিলেন এবং নিজেদের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পঙ্গু বালককে যথাভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যেও বালক ঐ একই প্রকার উত্তর দিল। তাঁহারা বালকের উক্ত প্রকার কামনা রহিত ভাব ও নির্লোভ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া মৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন একজন 'উহার পূর্ণাঙ্গ হউক', একজন—'পরম রূপবান্ ও গুণযুক্ত হউক',—ও একজন,—'রাজা হউক'—এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের বর প্রভাবে অচিরাৎ তাহাই হইল। সেই পঙ্গু বালক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া রাজা হইলেন এবং তদীয় রাজ্য মধ্যে এক বৃহৎ অন্নছত্র খুলিয়া দিলেন। আর তিনি চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে যত দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর আসিবে, সকলেই তাঁহার ছত্রে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার প্রাপ্ত হইবে। তিনি রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে এবং আরও বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড

দেউড়ি বসাইয়া প্রত্যেক দরজায় পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। আর স্থানে স্থানে তাঁহার পিতামাতার ছবি টাঙ্গাইয়া দিয়া প্রহরীদের তিনি আদেশ করিলেন যে, এই প্রকার চেহারার কোন ব্যক্তি আসিলে তাহাদের যেন খুব আদর যত্ন করা হয় এবং তাহারা আসিবামাত্র যেন তাহাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হয়।

(ক্রমশঃ)

রাজসাহী—জনৈক ভদ্রমহিলা।

৺মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের জীবনী।

স্বভাব প্রভৃতির স্বরূপবর্ণন কর্ত্তব্য, কিন্তু যিনি বিদ্যার পরা ও অপরা এই দ্বিবিধ রূপেরই সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, নিখিল বেদের জ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে বিশুদ্ধভাবে স্বতই প্রতিভাত হইয়াছে, লৌকিক কোনও গুরুর সকাশ হইতে কোনও সাহায্য না লইয়া যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় দেশীয় দর্শন বিজ্ঞানাদি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি মাসত্রয়ের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, যিনি ছয় মাসের মধ্যে এ, বি, সি, ডি, হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সমস্ত মুখ্য গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এবং অধীত বিষয়গুলি অন্যকে অধ্যাপিত করিয়াছিলেন, যিনি এক রাত্রে সমগ্র ন্যায় দর্শন অধ্যয়ন করিয়া পরদিন প্রাতে একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িককে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন যিনি এক রাত্রে পাতঞ্জল যোগদর্শন অধ্যয়ন করিয়া তৎপরদিন হইতেই তদনুসারে যোগাভ্যাস ও তাহার অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, যিনি দিবসত্রয় মধ্যে সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কুমারবয়স হইতেই খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দুঃসাধ্য এবং সাধারণ মানবদৃষ্টিতে অসাধ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে নিরাময় করিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান লৌকিক বুদ্ধির অগম্য বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে; যে জ্ঞানের ফলস্বরূপে তিনি পরবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, যাহার ফলে তিনি জাগতিক

সর্ব্ববস্তুকে—ব্রহ্মার পদ পর্য্যন্ত তৃণীকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যে জ্ঞানের ফলে তিনি বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক হইতে পারিয়াছেন, জগতীতলস্থ সর্ব্বজীবকে আত্মবৎ ভালবাসিতে পারিয়াছেন তাঁহার **জ্ঞানের** স্বরূপ আমি কি করিয়া বর্ণন করিব? যে অদম্য জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যিনি কোনরূপ ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, কোথাও কোন বিদ্যাচার্য্য কোনও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন শুনিলেই যিনি অতি বাল্যকালেও বহুদূরের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেন, বিদ্যালাভের জন্য যিনি নিত্য পদব্রজে ছয় ক্রোশ পথ লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহার সুকুমার দেহকে অতি নির্দ্দয়ের ন্যায় ক্লিষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, কোন উপাদেয় গ্রন্থের নাম শুনিলে যিনি নিজ যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া তাহার ক্রয়ার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেন; পরিবারে একটী ভ্রাতা এবং একটী পুত্র সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে, স্বয়ং তিন চারি মাস অবধি প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত প্রবল সন্তত ম্যালেরিয়া জ্বর ভোগ করিতেছেন, গৃহে এমন অর্থ নাই যে কিছু ঔষধ বা পথ্যের সংগ্রহ হয়, এরূপ অবস্থায় যিনি প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা গ্রন্থ * ক্রয় করিয়া আনাইয়াছেন, এবং তাহাকেই ঔষধ ও পথ্যরূপে সারা রাত্রি সেবন করিয়াছেন, জ্ঞানের প্রার্থী হইয়া লোকে তাঁহার উপসর্পণ করিলে যিনি শতমুখ হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন, এবং তৎকালে নিজ আহার-নিদ্রার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন,—তাঁহার সে **জ্ঞান-পিপাসা**, সে **বিদ্যা-রতির** রূপ আমি কি করিয়া প্রকটিত করিব? জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, যাঁহাতে এই যোগত্রয়ের পূর্ণ সমাবেশ দেখিয়া জনগণ বিস্মিত হইয়াছেন, যে যোগ বস্তুতঃ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়, ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ে প্রকটিত করিয়া দেয়, যোগৈশ্বর্য্য সকলের বিকাশ করিয়া দেয়, হৃদয়ে বিবেকজ জ্ঞানের আবির্ভাব করিয়া দেয়, কৈবল্য

---

* গ্রন্থখানি যাস্ক প্রণীত 'নিরুক্ত' (তখন ইহা Asiatic Society দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছিল, সংবাদ পাইয়াছিলেন)। বলা বাহুল্য, ভগবান্ তাঁহার ঈদৃশ জ্ঞানপিপাসু ভক্ত পুত্রের পরিবারবর্গকে তজ্জন্য অনাহারে বা বিনা চিকিৎসায় থাকিতে দেন নাই। সেই দিনই গ্রন্থ ক্রয় করিতে পাঠাইবার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার কোন ভক্ত দ্বারা ভগবান্ স্বামীজীকে কিছু টাকা (৪০৲) পাঠাইয়া দেন। পরে দ্রষ্টব্য।

করতলগত করিয়া দেয় ও পরাশান্তির অধিকারী করিয়া দেয়, যিনি সেই যোগে (তাহার অনুষ্ঠান এবং তাহার বিজ্ঞান, এই উভয়তঃ যোগী হইয়াছেন —সে **যোগের স্বরূপ** আমি কিরূপে বিবৃত করিব? ভগবানের নামোচ্চারণ মাত্রে যাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে ও নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে, ভগবানের চরণান্বেষণকেই যিনি শিশুকাল হইতে জীবনের মুখ্যব্রত করিয়াছেন, যিনি সেই পরম বেদ্যকে জানিবার জন্যই সমগ্র জীবন বেদ ও নিখিল বিদ্যার সেবা করিয়াছেন, প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সারাটী জীবন অহর্নিশ যোগাভ্যাস এবং স্বাধ্যায় ও নানাবিধ কঠোর তপস্যার আচরণ করিয়াছেন, একমাত্র ভগবানের চরণের দিকে লক্ষ্য করিয়াই যিনি শক্তিসত্ত্বেও সহস্র প্রকার জাগতিক দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, শিশু পুত্রাদি সহ একক্রমে দিনসত্রয়ব্যাপী উপবাস দুঃখ ভোগ করিয়াও যিনি নিজ চাতকী বৃত্তি পরিত্যাগ করেন নাই, জগতের সকল জীবকেই যিনি শ্রীভগবানের রূপ বলিয়া দেখিতে পারিয়াছেন, সদা তাহাদের সুখে সুখী হইয়াছেন এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত নিজ প্রাণ পণ করিয়াছেন; 'বেদাঃ প্রাণা বাসুদেবস্য' এই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস যাঁহার সহজ, বেদকে যিনি ভগবানের স্বরূপ বলিয়া এবং শাস্ত্রকে তাঁহারই 'মতি' এবং 'বাণী' বলিয়াই জানিয়াছেন, বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ যিনি অনুভবের সহিত ইহা বুঝিয়াছেন অতএব বেদময়—ব্রহ্মময় হইয়াছেন, জন্মকালে, জন্মদেশে কোনরূপ বেদ-চর্চ্চানা থাকিলেও যিনি পূর্ব্বসংস্কারের প্রেরণাবশতঃ বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বেদ যোগ্য পাত্রজ্ঞানে যাঁহার সমক্ষে নিজ রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, মনীষিগণ যাঁহার মুখে বেদব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন বেদের নিন্দা বা অযথা ব্যাখ্যার কথা শ্রবণ করিলে যাঁহার শরীর জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে, এবং সদা শান্ত, রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা অক্ষুব্ধ, সাংসারিক সুখ দুঃখাদি দ্বারা অবিচালিত যাঁহার সৌম্যরূপখানি 'অমুক বেদের এইরূপ নিন্দা করিয়াছে' বা 'এইরূপ অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছে' একমাত্র এবম্প্রকার সংবাদেই বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং সুস্থ বা পীড়িত যে অবস্থাতেই থাকুন, বেদের যথার্থ স্বরূপ বর্ণন ও তাহার যথার্থ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, প্রাণ যাত্রা সহস্রশঃ বাধিত হইলেও বেদ শাস্ত্রে যাঁহার শ্রদ্ধা বিচলিত হয় নাই, বেদোপদিষ্ট বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পালন করিবার নিমিত্ত যিনি সপরিবারে সারাজীবন নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া অতিথিকে সাদরে সেবা করিয়াছেন,

'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ভেষজং ন কার্য্যং' বেদে এই বাক্য দর্শন করিয়া যিনি অনায়াসে বিপুল ধনাগমহেতু চিকিৎসাবৃত্তি একদিনে ত্যাগ করিয়া তদবধি সপরিবারে যাবজ্জীবন অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অতিবাহিত করিয়াছেন এবং 'অনন্যাসক্ত হইয়া যে আমার পর্য্যুপাসনা করে, সেই নিত্যাভিযুক্ত পুরুষের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি,' এই ভগবদ্বাক্য যে পূর্ণ সত্য, তাহা নিজ জীবন দ্বারা, (অবরগণের—অপরিপুষ্ট ভক্তি, ক্ষীণশ্রদ্ধ সাধকগণের কল্যাণার্থ বেদশাস্ত্রে তাঁহাদের শ্রদ্ধা দৃঢ়া করণার্থ) প্রতিপাদন করিয়াছেন, নিজ জীবনে যিনি কখনও বা দৃপ্ত, কখনও বা আর্ত্ত পরমৈকান্তী প্রপন্ন ভক্তের আদর্শ দেখাইয়াছেন, 'বেদ সত্য, যিনি তাঁহার জীবন বেদ দ্বারা নিত্য এই কথা প্রমাণীকৃত করিয়াছেন, বেদ-মন্ত্রের কার্য্যকারিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন আত্ম-পর ভাবের ব্যবহার যাহার জীবনে একদিনের জন্যও দেখি নাই, নিজ পুত্রাদিকে বঞ্চিত করিয়াও যিনি অন্যের সাহায্য ও সেবা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, অসহ্য ব্যাধির যাতনা সহ্য করিয়াও, অন্নাভাবে সপরিবারে অবসন্ন হইয়াও, প্রাণসম পুত্ররত্নকে অকালে কাল-কবলে কবলিত হইতে দেখিয়াও, যাঁহার শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা কখনও বিচলিত হয় নাই, অলৌকিক জ্ঞানও যোগবিভূতির অধিকারী থাকিলেও যিনি সর্ব্বদা একমাত্র ভগবানের কৃপাকেই সে সকলের মূল বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহার যাহা কিছু নিজ সর্ব্বস্ব, সকলই ভগবৎকৃত,ভগবদ্দত্ত বলিয়া জ্ঞান ও বর্ণন করিয়াছেন, যিনি নিজ কর্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণতঃ শ্রীপরমেশ চরণে বিলীন করিয়াছেন, জীবনে অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা যিনি করেন নাই, জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন যিনি ভগবানের সকাশেও কখনও কিছু চাহেন নাই, তাঁহার **ভগবদ্ভক্তি ও বেদভক্তির স্বরূপ** আমি কি করিয়া প্রকাশিত করিব? তাঁহার **বেদ ও শাস্ত্রশ্রদ্ধার** যথার্থ পরিচয় প্রদান করিতে আমি কিরূপে সমর্থ হইব?

(ক্রমশঃ)।

কর্ম্মরহস্য ও ভগবৎ শরণ।

কবি শিহ্লন মিশ্র তাঁহার বৈরাগ্য শতক গ্রন্থ প্রণয়ণ কালে মঙ্গলাচরণ স্থলে গতানুগতিক ভাবে দেবতা বিশেষের বন্দনা করিয়া কর্ম্মপুঞ্জকে বন্দনা করিয়াছেন এবং কৈফিয়ৎ হিসাবে লিখিয়াছেন যে দেবতাগণও যখন কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অলঙ্ঘ্য কর্ম্মসূত্রের উপর যখন তাঁহাদের ও হাত নাই, তখন মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল কারণ কর্ম্মরাশিকেই আমি বন্দনা করিতেছি।

সংসারে জীব দুঃখ ও বেদনায় কাতর হইয়া শ্রীভগবান্‌কে দোষারোগ করিতে থাকে, কিন্তু তিনি বলেন আমি মাত্র কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকি, তুমি কিন্তু কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি বীজ বপন করিয়াছ, আমি মাত্র জলসেক করিয়া তাহাকে ফলপ্রসূ করিতেছি। ইহাতে আমার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই।

'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্' ইহা অনাদি সত্য কথা। সুকৃতির ফলে যেরূপ সুখভোগ হইবে, দুষ্কৃতির ফলে সেইরূপ দুঃখভোগ আসিবেই। এই মানব শরীর পাপপুণ্যের সমষ্টি লইয়াই গঠিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বজন্মের সংস্কারোপযোগী এই ভোগশরীর সৃষ্ট হইয়াছে। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ;—

> শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
> গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥
> শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
> অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥

অর্থাৎ জীব দেহান্তর অবলম্বন কালে পূর্ব্বদেহের ভোগ সংস্কার গুলি সঙ্গে লইয়া অভিনব দেহে প্রবেশ করেন এবং মনরূপে নূতন দেহের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় বিষয় ভোগ আরম্ভ করেন।

মানুষ মনে করে এইভাবে না চলিয়া অন্যভাবে চলিলে আমি কত সুখী হইতাম। কিন্তু সে জানে না তাহার বর্ত্তমান দেহটী পর্য্যন্ত এমনভাবে গঠিত

হইয়াছে যাহাতে তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মগুলি এই দেহে যথাযথ ভাবে ভোগ হইতে পারে। একজন মহাপুরুষকে (দেওঘরের পূজ্যপাদ বালানন্দ ব্রহ্মচারী) বলিতে শুনিতাম,—এ জীবনে যাহা সুখভোগ করিতেছ তাহা সবই 'বাসী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত পুণ্যফল। অতএব পরজন্মে যাহাতে দুঃখ পাইতে না হয় তাহার জন্য সুকৃতি সঞ্চয় কর'।

ভোগাবসানেই মানব রাগ দ্বেষ রহিত হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন জগতের সমস্ত লোক যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে শ্রীভগবান্ তাহাকেও আশ্রয় দিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া আছেন। অভক্তি শুষ্কতা এবং তাপে মানুষ একেবারে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, ভগবানের নাম লইতেও অনিচ্ছা হয়, তখন ও দীন হীন কাঙ্গালের মত তাঁহারই দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়, ইহাই মহাপুরুষ বাণী। শিশুসন্তানকে মা যখন প্রহার করিতে থাকেন, তখনও সে কিন্তু 'মা' 'মা' বলিয়াই চিৎকার করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সব কর্ম্ম করা হইয়াছে তাহা বহু জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ করিতে হয়, কিন্তু ভগবৎ নামের গুণে সহজে মুক্তি হয়। ইহা বস্তুগুণ। মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর একটী শিষ্য অবিরত নাম করিয়াও এইরূপ তাপ এবং শুষ্কতার দরুণ, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্বীয় গুরুদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন ভয়ানক গ্রীষ্মকাল। উক্ত মহাত্মা এইরূপ উত্তরদান করেন,—'দেখ, দারুণ নিদাঘে বৃক্ষলতা সমস্ত যেন পুড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু এই নিদাঘের ফলেই বর্ষা আসিবে এবং তখন এইসব তরুলতা পত্র পুষ্পে আবার কেমন সুশোভিত হইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে এইরূপ গ্রীষ্মের কি প্রয়োজনীয়তা ছিল। সাধক জীবনও ঠিক সেইরূপ। ইহারই পরই এমন শান্তিলাভ করিবে যাহাতে বুঝিতে পারিবে এইরূপ যন্ত্রণার কি প্রয়োজন ছিল।'

একজন বিলাসী রাজা একজন মহাপুরুষকে শীতকালে অনাবৃত দেখিয়া দুঃখের সহিত তাঁহার ত্যাগের উল্লেখ করিতেছিলেন। সাধু বলিলেন,—মহারাজ, আমি এমন কি ত্যাগ করিয়াছি? ত্যাগী আপনি, কেননা সামান্য সুখের জন্য আপনি 'শ্রেষ্ঠধন' (ঈশ্বর) ত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান লাভার্থে সামান্য একটু ত্যাগ করিলেও ভগবান্ তাহাকে সহস্র গুণে পুরস্কৃত করেন। তাঁহার জন্য যিনি জাগতিক সমস্ত ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন তাঁহাকে শ্রীভগবান্ কত শ্রেষ্ঠপদ দান করেন তাহা আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবনে দেখিতে পাই। ভগবান্ বুদ্ধ ঈপ্সিত ধন লাভের জন্য যে অলৌকিক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন,

তাহার প্রতি বিশ্বের সমস্ত মানব ভক্তি অর্ঘ্য দান করিতেছে এবং আজও জগতের এক তৃতীয়াংশ লোক সেই পথ অবলম্বনে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। জগতের দুঃখ দেখিয়া মহামানব শাক্যসিংহের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। বিরাট রাজৈশ্বর্য্য ধূলিমুষ্টির ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্নেহের কুসুম-বন্ধন এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পর দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী গয়ার নিকটবর্ত্তী এক মহারণ্যে তিনি যে কঠোর রোমহর্ষণকর তপস্যায় নিযুক্ত হন তাহা জগদ্বাসীর বিস্ময়কর। আহার নিদ্রা ইত্যাদি দেহ ধারণের সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য তুচ্ছ করিয়া অহোরাত্র তিনি যে সাধন সমরে নিযুক্ত হন তাহা আজও স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। এই ভয়াবহ তপস্যার ফলে তাঁহার দেহ মাত্র কএকখানা শুষ্ক অস্থিতে পর্য্যবসিত হয়। তৎকালে তাঁহার পেটে হাত দিলে পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত স্পর্শ হইত। কিন্তু এত তীব্র সাধনেও তিনি যাহা চান তাহা পাইলেন না। কেননা ভগবানই বলিতেছেন,—

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান॥

* * * *

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥

ভগবান্ বুদ্ধ আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন তিনি বুঝিলেন, দেহকে এইরূপ নিপীড়িত করিয়া ধর্ম্মলাভ হইবে না। তিনি আহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। সুজাতা প্রদত্ত পরমান্ন অতি পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া সুস্থ হইলেন এবং পুনরায় এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থির হইয়া আসনে বসিলেন,—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাম্।
নৈবাসনাৎ কায়মিতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাউক, ত্বক, অস্থি, মাংস বিনাশপ্রাপ্ত

হউক, কিন্তু সেই বহুকল্প দুর্ল্লভ 'বোধিসত্ত্ব জ্ঞান' লাভ না করিয়া এই আসন হইতে একটুও টলিব না।

অতঃপর শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার ভিতর প্রবেশ করেন। কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা! এই যে আলস্য অনিচ্ছা সর্ব্বদা মানুষকে শুভপথে বাধা দিতেছে; আজ নববর্ষের প্রারম্ভে, ভগবান্ বুদ্ধের এই অলৌকিক প্রতিজ্ঞার স্মৃতি বুকে লইয়া যদি প্রত্যেক মানুষই আলস্য ও অনিচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিমান করে তাহা হইলে তাহাদের সাধন পথ কত সরস হয়।

শ্রীভবেশ চন্দ্র শর্ম্মা মুন্সী।
রেঙ্গুন।

সাধন ধর্ম্মরক্ষার উপায়।

(দেশ কাল পাত্র অনুসারে)

প্রসিদ্ধ সাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব লিখিত।

আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল অধিকাংশই বৈদিকমন্ত্রের অধিকৃত, কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি? যে দেশের লম্বা লম্বা উপাধিধারী অধ্যাপক গুরু পুরোহিতগণ বর্ণমালায় অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্তস্থ ও বর্গীয় দুটা "ব"র পৃথক উচ্চারণ করিতে বিভু দেখেন, অন্তস্থ ও বর্গীয় ভেদে দুটা "য জ," দন্ত্য ও মূর্দ্ধন্য ভেদে দুটা "ন" "ণ" এর পৃথক্ উচ্চারণ যাঁহাদিগের অশ্রুতপূর্ব্ব, সংস্কৃত ভাষায় তিনটী "শ ষ স" যাঁহাদিগের পক্ষে বিষম সমস্যা—বিশেষ, কবর্গের অন্তর্গত "খ" আর কএ ষএ "ক্ষ," এই দুইটি যাহাদিগের মক্ষিকা ও দুঃখিত বলিতে একই স্বর উদ্গীরণ করে, অনুস্বার বিসর্গের উচ্চারণ আছে, ইহা যাঁহাদিগের অতীন্দ্রিয়, ছন্দঃ যতি নাদ মাত্রা সে সকল ত বলিবারই নহে, বর্ণমালায় এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সেই সকল ষড়দর্শনবেত্তা গুরুপুরোহিত অধ্যাপকের মুখে সেই সকল বিশুদ্ধ উচ্চারিত

মন্ত্র, তাহারই আবার নকল লইয়া তোমার আমার শ্রাদ্ধ তর্পণ যাগ যজ্ঞ। ইহা-তেই একবার বুঝিয়া লও মন্ত্রের শক্তি। তারপর ক্রিয়াশক্তির দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে তাহার উপাদান বস্তুগুলি বিচার করিতে গেলে ত কম্বল কত ক্ষণ টিকিবে তাহাই বুঝিতে পারিনা। পত্র পুষ্প কুশ সমিধ ফল জল যাহা বলিবে তাহার একটিও যথাশাস্ত্র হইবার উপায় নাই, ঘৃত তৈল তণ্ডুল লবণ দুগ্ধ গুড়, ইহার কোন্‌টি আজ বিশুদ্ধ আছে? চোখে দেখিয়াও চোখে দেখিনা, কাণে শুনিয়াও কাণে শুনিনা, ধর্ম্মের চোখে ধূলা দিয়া আপন বাহবা বজায় রাখি। আর "মুখে বলি—"দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি, পন্থা বাতেন শুধ্যতি. রজসা শুধ্যতে নারী" আর "বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি" শেষ কথা "সর্ব্বমদৃষ্টং শুচি"। আমরাও বলি,—যেমন অদৃষ্ট, তাহাতে সর্ব্বমদৃষ্টংই শুচি। দোহাই ধর্ম্মের একবার বুকে হাত দিয়া বল দেখি. মনঃপ্রাণ কি তাহাতে শান্ত হয়? সে সকল নরকের কপাট খুলিয়া দিলে লোকের একেবারে বমি উঠিবে, ক্রিয়াকর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস একেবারে জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে, তাই "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" এই বলিয়াই আমরা সে সকল কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত যে, সত্য সত্য কিছু হইতেছেও না, হইবেও না, হইবারও নহে। হইবার হইলে এ কলিযুগ সৃষ্টি হইত না। যাঁহার ইচ্ছায় যুগের আবির্ভাব, তাঁহারই ইচ্ছায় উহা না হইবারই কথা। তবে যাঁহার যতটুকু হয়,তাঁহার ততটুকুই শুভাদৃষ্ট। তাই বলিয়া সে অদৃষ্ট উপার্জ্জনে একেবারে হতাশ না হইয়া সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সে চেষ্টা কে করিবে? কখন করিবে? পরমায়ুঃ প্রায়ই চল্লিশ হইতে উর্দ্ধসংখ্যা আশী বৎসর, উপার্জ্জন প্রায়ই ২০।২৫ হইতে উর্দ্ধসংখ্যা একশত টাকা। কর্ম্মফলে পরিবারের সংখ্যাপ্রতি সংসারে ১০।১৫টী। শুধু বাড়ীর কর্ত্তাটীর ধর্ম্মরক্ষা নহে আবালবৃদ্ধবনিতার ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইবে। সে ধর্ম্মের দিন যদি আবার রবিবারে পড়ে, তবেই রক্ষা, নতুবা ত শ্রাদ্ধ শান্তি যাগ যজ্ঞ কলেজে আর আপিসে। তাই বড় দুঃখে বলিতে হয়—"বল্‌মা আমি দাঁড়াই কোথা?" আমরাও বলি—সে রক্ষা বলি-বার সাধ্য আর কাহারও নাই, এখন মা যদি দয়া করিয়া বলেন রক্ষা, তবেই রক্ষা।

এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে পৌছাইয়া দেওয়া যেমন রেলগাড়ীর স্বাভা-বিক ধর্ম্মঃ তদ্রূপ সংসার-রাজ্য হইতে ব্রহ্ম-রাজ্যে পৌছাইয়া দেওয়াও ধর্ম্মের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু ট্রেণ প্যাসেঞ্জার ও স্পেশ্যাল ট্রেণ ভেদে যেমন দুই ভাগে

বিভক্ত, সংসারে ধর্ম্মও তদ্রূপ সংসারধর্ম্ম ও সাধনধর্ম্ম ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। রেলওয়ের গাড়ী হইলেও উহাদিগের উভয়ের গতি একরূপ নহে, প্যাসেঞ্জার ট্রেণ, সকল ষ্টেশনেই এক একবার থামিতে বাধ্য; কারণ সকল ষ্টেশনের যাত্রীই উহাতে আরূঢ়, তদ্রূপ সংসারধর্ম্ম, সংসারের সকল ক্রিয়াকর্ম্মেই এক একবার যোগ দিতে বাধ্য। কারণ, কাহারও অন্নপ্রাশন, কাহারও উপনয়ন, কাহারও বিবাহ, কাহারও শ্রাদ্ধ, এক সংসারে এই সকল ষ্টেশনের যাত্রীই অধিষ্ঠিত, কিন্তু স্পেশ্যাল ট্রেণ কাহারও সেরূপ দায়িত্ব বহন করে না; কারণ, তাহার আরোহী কেবল তিনিই হইয়াছেন, যিনি একাই উহার একেশ্বর হইয়া টিকিট করিয়াছেন, তদ্রূপ সাধনধর্ম্ম ও এ সংসারে কাহারও কোন সাংসারিক নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা করেন না, কারণ, সে ধর্ম্মে যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—"নিন্দন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে ত্যজন্তু স্ত্রীসুতাদয়ঃ। জনা হসন্তু মাং দৃষ্টা রাজানো দণ্ডয়ন্তু বা। সেবে সেবে পুনঃ সেবে ত্বামেব পরদেবতে। ত্বৎকর্ম্ম নৈব মুঞ্চামি মনোবাক্ কায়কর্ম্মভিঃ॥" স্ত্রীপুত্র গৃহসংসার, লোকধর্ম্ম, সমাজমর্য্যাদা, যায় যাক্ সব যাক্, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হই তাহাও স্বীকার, কিন্তু রাজরাজেশ্বরি! তোমার সেবা করিব করিব, আবার বলিতেছি করিব। কি মনঃ, কি বাক্য, কি কায়, কি কর্ম্ম, ইহার কিছুরই দ্বারা তোমার আরাধনা ভিন্ন আর কিছু করিবনা।" এইরূপে যিনি সকল ছাড়িয়া একা এক গাড়িতে উঠিয়াছেন' তিনি ইহার কোন্ ষ্টেশনে কাহার অপেক্ষায় গাড়ী থামাইবেন? স্পেশ্যাল ট্রেণের পথের মধ্যে শত সহস্র ষ্টেশন থাকুক না কেন, শত সহস্র প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যাতায়াত করুক না কেন, তাহার পৌছিবার পূর্ব্বেই সকল ষ্টেশনে টেলিগ্রাফে খবর আসিতেছে।

ক্রমশঃ

অহল্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়।

এই অহল্যার বিবাহ হইয়াছিল সে কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্বী মহর্ষি গৌতমের সহিত; যাহার নাম শুনিলে দেবতা, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি সকলেরই হৃদয় ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। ইনি বাস করিতেন দেব-দানব-দুর্দ্ধর্ষ তপোবল সমন্বিত ঋষির তপোবনে, ঋষিসমাজের মধ্যে। এ তপোবন কেমন?

শান্ত-দ্বিজ-মৃগাচ্ছন্নং দ্রুমরত্ন-সুশোভিতম্।
ক্রৌঞ্চ-হংসগণাকীর্ণ—প্রসন্ন জল নিম্নগম্॥
স্বাধ্যায়-ঘোষ-সংঘুষ্টং তপস্বীবর-সেবিতম্।
রম্যমগ্নিগৃহৈর্জুষ্টং শতশোহথ সহস্রশঃ॥

এই তপোবন তপস্বিগণের তপস্যা প্রভাবে সংযত প্রকৃতি শান্ত-স্বভাব পক্ষীও পশু সমূহে পরিপূর্ণ, ইহা সুস্বাদু ফলভার নম্র বৃক্ষাবলী দ্বারা সুসমৃদ্ধ, ইহা হংস কারণ্ডব বক সারস প্রভৃতি নানাবিধ কলকণ্ঠ ও বিচিত্র পক্ষ জলচর পক্ষি-শোভিতা প্রসন্ন সলিলা নদীর তীরবর্ত্তী, বহু শত ব্রহ্মচারী ও ছাত্র সমূহের কণ্ঠনিঃসৃত বেদধ্বনিনাদিত, শত সহস্র রমণীয় অগ্নিশালা দ্বারা সমলঙ্কৃত ও পরম তপস্বী মুনিগণের আশ্রয়ভূত। এই স্থান ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে এত পবিত্র ও স্বচ্ছন্দস্থ ছিল যে, এখানে কাহারও রোগ হইত না, ভয় হইত না, বা কোন সন্দেহ হইত না; কাহারও আলস্য আসিত না, বা মনঃক্লেশও উপস্থিত হইত না। শোক, মোহ, ভ্রান্তি বা বিপরীত বুদ্ধিও এখানে মানুষকে আক্রমণ করিতে পারিত না। জ্ঞান এখানে পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল বলিয়া অভ্যস্ত পুণ্যধর্ম্মা আশ্রমবাসিগণ সকলেই বিধি ও নিষেধের অতীত ছিলেন।

ন যত্র রোগো ন ভয়ং ন শঙ্কা,
ন যত্র জাড্যং ন চ তাপ সঞ্চয়।
ন যত্র শোকো ন বিধিনিষেধো,
ন যত্র মোহো ন চ বৈ প্রমাদ॥

দেবী অহল্যা এমনি আশ্রমে সুর নর বন্দনীয় পরমভাগবত পতির সহিত দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন—

স চাত্র তপ আতিষ্ঠদহল্যা সহিতঃপুরা।
বর্ষ পূগান্য নেকানি রাজপুত্র মহা যশঃ॥

(আদিকাণ্ড ৪—সর্গ)

এই আশ্রমেই "যশস্বিনী মহাভাগা তপসা দ্যোতিত প্রভা" দেবী অহল্যার গর্ভে মহাতপা শতানন্দ প্রমুখ সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন!

সেই সত্যযুগে, এইরূপ পবিত্র আশ্রমে, পরম তপস্বী ঋষিসংঘের প্রভাব বেষ্টনান্তর্ব্বর্ত্তিনী, ব্রহ্মার মানস পুত্রী, দেব-দানব পূজিত মহর্ষি গৌতমের শ্রদ্ধা সৎকারপাত্রী, সংসম্মানবতী, তপঃ প্রবৃদ্ধা অহল্যার মস্তকের উপর, ইন্দ্র, দেবরাজ হইয়াও, যে বীভৎস কলঙ্ক ও কঠোর দণ্ডের ভার চাপাইয়াছিলেন, তাহা কি নিতান্তই পাশব কাম-তন্ত্রতামূলক? ইহাতে ভাবিবার কি কিছুই নাই? গড্ডলিকা প্রবাহ ছাড়িয়া সত্যানুসন্ধিৎসু দ্রষ্টার নির্ম্মল হৃদয় লইয়া বিচার করিতে হইলে ইহার ভিতর ভাবিয়া দেখিবার বহু কথাই পাওয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজং হিত্বা যাতি রসাতলং" বলা হইয়াছে "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" ইঁহার উপাসনাই—ইঁহার কাছে প্রার্থনাই বৈদিকমার্গ। ইঁহার উপাসনাই সূতসংহিতায় বিশেষভাবে বিঘোষিত হইয়াছে। সূত সংহিতা বলিতেছেন—

আকাশাদীনি ভূতানি যানি তানি মনীষিভিঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যানি মহাত্মভিঃ॥ ২৭
মেরুমন্দারপূর্ব্বাশ্চ পর্ব্বতা বিবিধা দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যা বেদবিত্তমাঃ॥ ২৮
নদীনদাদয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষ্যাদি বিনির্ম্মিতাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যাঃ পুরুষোত্তমৈঃ॥ ২৯
বাপীকূপ তড়াগাদ্যা অপি বেদপরায়ণাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া, নিত্যমুপাস্যাঃ পুরুষাধিকৈঃ॥ ৩০
বনানি যানি লোকে তু বিবিধানি মহত্তমাঃ।
তানি ব্রহ্মতয়া নিত্যমুপাস্যানি তপোধনৈঃ॥৩১
সমুদ্রাশ্চ সদা বিপ্রাঃ সমুদ্রান্তর্গতা অপি।
সঙ্গমা অপি সদ্ব্রহ্ম ধ্যাতব্যা এব কেবলম্॥ ৩২
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব দিবারাত্রং তথৈব চ।
অনাগতাদয়ঃ কালা উপাস্যা ব্রহ্মরূপতঃ॥ ৩৩
অণ্ডজং জরায়ুজং চৈব স্বেদজং চোদ্ভিজ্জং তথা।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যা মোহবর্জ্জিতৈঃ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা অপি চ সঙ্করাঃ
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যা এব সূরিভিঃ॥ ৩৫
আশ্রমা ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাস্তদাচারা অপি·দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যাঃ পরমাস্তিকৈঃ॥৩৬
মহাপাতক পূর্ব্বাণি পাপানি সুবহূনি চ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যানি মহত্তমৈঃ॥ ৩৭

ধর্ম্মসংজ্ঞাশ্চ যে বিপ্রা উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
তেপি ব্রহ্মতয়া নিত্যমুপাস্যাঃ পণ্ডিতোত্তমৈঃ ॥ ৩৮
সুখং দুখং তয়োর্ভোগঃ সাধনং তস্য সুব্রতাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বমুপাস্যং সত্যবাদিভিঃ ॥৩৯
বিধয়শ্চ নিষেধাশ্চ বিদ্যাবিদ্যে তথৈব চ।
ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বমুপাস্যং বেদবেদিভিঃ ॥ ৪০
অবন্ধ্যাশ্চ তথা বন্ধ্যা বাদাশ্চ বিবিধা অপি।
ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বমুপাস্যং বাক্যবেদিভিঃ ॥ ৪১
যদ্‌যদস্তিতয়া ভাতি যদ্‌যন্নাস্তিতয়াঽপি চ।
তদ্‌তদ্‌ব্রহ্মতয়া নিত্যমুপাস্যং ব্রহ্মবিত্তমৈঃ ॥ ৪২

এই যে উপরে বলা হইল তাহাতে জগতে এমন বস্তু কি রহিল যাহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে ঋষিগণ নিষেধ করিলেন ?

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী, এই পঞ্চমহাভূত, মেরুমন্দার প্রভৃতি পর্ব্বত, নদী নদ প্রভৃতি, বাপীকূপতড়াগাদি, বিবিধ বন সকল, সমুদ্র সকল, সমুদ্রের মধ্যে যাহা আছে, সঙ্গম সকল, দিক্‌বিদিক্, দিনরাত্রি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর জাতি, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সমস্ত, সদাচার, মহাপাতক, বহুবিধ পাপ সকল, সুখ দুঃখ, সুখদুঃখের ভোগ সকল, বিধি নিষেধ, বিদ্যা অবিদ্যা, বন্ধ্যা পুত্রবতী, বাদজল্প বিতণ্ডা, অস্তি ভাতি বলিতে যাহা যাহা বুঝায়, আবার নাস্তি বলিতে যাহা বুঝায় সমস্তই ব্রহ্ম—এই ভাবিয়া উপাসনার বস্তু লইয়া সর্ব্বদা থাকিবার ব্যবস্থা শাস্ত্র করিয়াছেন।

জগতে কোন্ বস্তু ব্রহ্ম নয় ? তবে চণ্ডীগ্রন্থকে চণ্ডী বা ব্রহ্মময়ী বলা হইবে না কেন ? "সব তুমি" "সব তুমি" বলিয়া মনে মনে সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া, আত্মা বলিয়া, ইষ্ট বলিয়া যিনি ভাবনা করিতে বিস্মৃত হন না, তাঁহার মন কি কোন কিছুতে বিচলিত হইতে পারে ? সুখ আসিলেও তুমি আসিয়াছ, দুঃখ আসিলেও তুমি আসিয়াছ, ইহা যিনি অভ্যাস করিয়াছেন তিনি পরমবস্তু ভিন্ন আর কোথায় আকৃষ্ট হইবেন ?

ইহার জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—জগতে গতিশীল যাহা কিছু আছে সকলকেই ব্রহ্মভাবে, ইষ্ট ভাবে উপাসনা করিবে। তাহা হইলেই তোমার সকল বস্তুর রমণীয়তা আর থাকিবে না—সমস্তই ত্যাগ হইয়া যাইবে; থাকিবেন ব্রহ্ম,, থাকিবেন আত্মা। সব তুমি, সব তুমির সাধনা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুর ত্যাগের জন্য, ভোগের জন্য নহে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" মনে রাখিয়া যিনি, যাঁহার উপরে মায়িক সমস্ত ভাসিয়াছে, সমস্ত মায়িক আবরণ অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে ভরিত হইয়া থাকিতে অভ্যাস করেন—যিনি সকল বস্তু ছাড়িয়া—সকল বস্তুর ভিতরে বাহিরে যে ব্রহ্ম বিরাজ করেন তাঁর উপাসনা করেন এই প্রকার উপাসনাকে ধ্যানযজ্ঞ বলা হয়। ইহা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। এই ধ্যানযজ্ঞের অভ্যাস না করেন যিনি, তিনি মায়া দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করেন। অন্য কোন উপায়ে সংসার মুক্তি হয় না।

সব তুমি, সব তুমি এই সত্য বুঝিয়া যাঁহারা সর্ব্বদা তোমার স্মরণ চেষ্টা না করেন তাঁহারা—

"পায়সান্নং পরিত্যজ্য ভক্ষয়ন্তি মহাবিষম্"

তাঁহারা জ্ঞানানন্দস্বরূপ পায়সান্ন পরিত্যাগ করিয়া আপাতমধুর ঈশ্বরশূন্য সংসাররূপ মহাবিষ ভক্ষণ করেন—আর প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও শেষে সংসার বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

করনা এই ধ্যানযজ্ঞ অভ্যাস! সব তুমি ইহা অতি সত্য। ভিতরে বাহিরে তুমি—ইহা অপেক্ষা সত্য আর নাই। করনা এই সত্যের সর্ব্বদা প্রয়োগ। মন যখন নানাভাবে নৃত্য করে তখন বলনা মনই তুমি; সঙ্কল্পবিকল্প তুমি, আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও তুমি, চিত্ত তুমি. অহং তুমি, রূপ তুমি, রস তুমি, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ তুমি, সুখ আসিতেছে ইহাও তুমি, দুঃখ আসিতেছে ইহাও তুমি, প্রবল গ্রীষ্মও তুমি, প্রবল শীত তাহাও তুমি, জয়ও তুমি, পরাজয়ও তুমি, লাভও তুমি, অলাভও তুমি, সুন্দর তুমি, কুৎসিৎ তুমি, চন্দ্র সূর্য্য, বায়ু অগ্নি সবই তুমি,

জীবনও তুমি, আবার এই মৃত্যু—যাহার চিহ্ন সর্ব্বদা তোমাতে এবং অন্য সকলে, সকল জীব জন্তুতে ফুটিতেছে তাহাও তুমি, আলস্য তুমি, উদ্যম তুমি, ইচ্ছা তুমি, অনিচ্ছাও তুমি—বল দেখি এইভাবে তুমি তুমি যখন প্রয়োগ করিতে পার তখন সব ছাড়িয়া এই সর্ব্বব্যাপী তুমি লইয়াই থাকিতে পার কি না—সুখ, দুঃখ, মৃত্যু, আধি, ব্যাধি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আলস্য, উদ্যম, সবই তখন অগ্রাহ্যের বস্তু হইয়া যায় কি না, আর সকলের ভিতরে যে তুমি, মন তাহাকে ভাবিয়া, তাহাকে লইয়া, শক্তি শিবোন্মুখী হইয়া চৈতন্যরূপী তুমিতে ডুবিয়া যায় কি না ? এই কারণে সুতসংহিতা বলিতেছেন ধ্যানযজ্ঞ বিনা যদি কেহ কিঞ্চিৎ মুক্তি সিদ্ধির উপায়ও করে, তাহা কর্ণত্যাগ করিয়া কেবল চক্ষু দ্বারা শব্দ গ্রহণের মত ; এই বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া যদি কেহ এই বিশ্ব সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াস করেন, এই ভাবে স্মরণ অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নাম না করিয়া, এই ভাব লইয়া প্রতিশ্বাসে নাম না লইয়া, যিনি সংসার ভাবনার সঙ্গে, মনের অসম্বন্ধ প্রলাপের সঙ্গে, চিড়িয়ার বুলি মত নাম করেন তিনি—

"স নভো ভক্ষণেনৈব ক্ষুন্নিবৃত্তিং করিষ্যতি"

এইরূপ ব্যক্তি আকাশ ভক্ষণে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে মাত্র। এই ধ্যান যজ্ঞের পরেই সূতসংহিতা বৈদিকমার্গে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন—

জ্ঞানযজ্ঞোড়ুপেনৈব ব্রাহ্মণো বাহন্ত্যজোঽপিবা।
সংসার-সাগরং তীর্ত্বা মুক্তিপারং হি গচ্ছতি ॥

ব্রাহ্মণই বল, অন্ত্যজই বল সকলেই ইহাতে অধিকারী। বল এই বৈদিকমার্গে অনুদারতা কোথায় ?

যে বৈদিকমার্গের কথা শাস্ত্র এত করিয়া বলিতেছেন, এমন শাস্ত্র দেখা যায় না যেখানে বৈদিকমার্গের কথা নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চণ্ডীশাস্ত্রে এই বৈদিকমার্গের কথা বিশেষরূপে আছে। "যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু" ইত্যাদি স্তবে সমস্তই যে তুমি তাহাইত বলা হইয়াছে—কোন

কিছুই এখানে বাদ পড়ে নাই। সাক্ষাৎ শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন— আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী আমা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ উঠিয়াছে, শূন্য আমি অশূন্য আমি। আনন্দা আমি, নানন্দা আমি; বিজ্ঞান আমি, অবিজ্ঞান আমি; ব্রহ্মা আমি অব্রহ্মা আমি। পঞ্চভূত আমি অপঞ্চভূত আমি, জানার বিষয় আমি, অজানার বিষয় আমি, অজা আমি অনজা আমি; অধঃ উর্দ্ধ, তীর্য্যক্ আমি। ইহা স্মরণ করাই—সর্ব্বদা করাই বৈদিকমার্গের ধ্যান যোগ। চণ্ডী-জগজ্জননী-চিচ্ছক্তি এবং চণ্ডী গ্রন্থ যে অভিন্ন তাহা শব্দতত্ত্ব ধরিয়াও প্রমাণ করা যায়। চণ্ডী গ্রন্থে কতকগুলি শব্দ ভিন্ন আর কি আছে? চিচ্ছক্তির লীলা সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া এই সাধু শব্দই বেদ। ওঙ্কার স্বরভূষিত শক্তির প্রথম স্ফুরণই আদিসৃষ্টি। ওঙ্কারাদ্ ব্যাহৃতির্ভবতি। ব্যাহৃত্যা গায়ত্রী ভবতি। গায়ত্র্যাঃ সাবিত্রী ভবতি। সর্ব্বত্র্যাঃ সরস্বতী ভবতি। সরস্বত্যা বেদাভবন্তি। বেদেভ্যো ব্রহ্মা ভবতি। ব্রহ্মণো লোকা ভবন্তি” শব্দ হইতেই জগৎ সুতরাং জগদাকাররূপিণী জগদম্বাকে শব্দরূপী চণ্ডী গ্রন্থ বলা যাইবে না কেন? শব্দতত্ত্ব ব্যাখ্যার স্থান ইহা নহে বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিলাম না। নাম যেমন শব্দ, শব্দ যেমন শক্তি সেইরূপ রূপ ও লীলা অভিন্ন। রামমূর্ত্তির প্রতি অঙ্গে যেমন রামায়ণ লীলা জড়িত, সেইরূপ চণ্ডীর বিভিন্ন মূর্ত্তিতে চণ্ডীলীলা বিজড়িত। মায়ের চরণ দেখ, হস্ত দেখ, যতস্থানে যতভাবে ইহাদের কার্য্য হইয়াছে সবই ইহাদের সহিত জড়িত। তবে ইহাও এখানে বলিতে হইবে “চক্ষুষ্মন্তোঽনুপশ্যন্তি নেতরেঽতদ্বিদো জনাঃ” মায়ের কৃপায় ভিতরের চক্ষু যাঁহাদের খুলিয়াছে তাঁহারাই ইহা দেখেন অতত্ত্বজ্ঞ ইতরজনে ইহা দেখে না।

নিরাকার না সাকার, না নরনারীর মত আকার বিশিষ্ট?

এমন একটী সময়ের কথা প্রায় জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায় যখন জগতের কোন কিছুই থাকে না; আকাশ থাকে না,

বায়ু, অগ্নি, জল, স্থল, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা, মানুষ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ কিছুই থাকে না—কি থাকে বলাও যায় না—এক মহাশূন্য-মহাব্যোম-তাহাও বলিবার লোক থাকে না—বলিতেছি তখন জগৎ বলিয়া কোন কিছুই থাকে না। ইহাই মহাপ্রলয়।

যখন জগৎ থাকে না তখন কি ব্রহ্মও থাকেন না? তখন কি শক্তিমান্ থাকেন না তখন কি শক্তি থাকেন না? সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম যে কোন সময়ে থাকেন না তাহা কেহই বলেন না। যিনি নিত্য, যিনি জ্ঞান স্বরূপ, যিনি আনন্দ স্বরূপ তাঁহার অভাব কখনও হয় না।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ২।১৬ গীতা। অনিত্য যাহা তাহার সত্তা নাই—তাহার বিদ্যমানতা নাই আর সৎ যাহা, নিত্য যাহা তাহার অবিদ্যমানতা কখনও হয় না। তবে জগৎ লয় হইয়া গেলেও, জগৎ যাঁহার সত্তা অবলম্বন করিয়া ভাসে তিনি থাকেন। ইনি নির্গুণ ব্রহ্ম। কোন্ স্থানে থাকেন, কোন্ কালে থাকেন তাহাও বলা যায় না কারণ স্থান কালও তখন থাকে না। কোথাও নাই—তথাপি আমি আছি, পূর্ণ হইয়া আছি, সর্ব্ব বলিয়া কোন কিছুই নাই। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর আমি, আমি আপনি আপনি পূর্ণ হইয়াই আছি। ইহাই স্বরূপ স্থিতি। ইহাই নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবে স্থিতি। ইনি নিরাকার, নিরবয়ব। নির্গুণ ব্রহ্মও কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্। সেখানে শক্তি, চৈতন্যোন্মুখী বলিয়া—শক্তি ও চৈতন্য অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। আবার সর্ব্বশক্তিমানের প্রভার ঝলক যখন আপনা হইতেই উঠে, শক্তি তখন একভাবে অস্পন্দস্বরূপিণী অন্যভাবে স্পন্দরূপিণী। অস্পন্দ স্বরূপিণী যিনি তিনি ও সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম একই। এই অস্পন্দস্বরূপিণীই যখন সগুণ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে জীবকে ব্রহ্মপথে লইয়া যান তখন এই মোক্ষদায়িনীই মহামায়া। আবার যে শক্তি—শক্তিমানের বক্ষে নাচিতে নাচিতে প্রবৃত্তিমার্গে বহিঃপ্রবাহিনী তিনি মোহোৎপাদনকারিণী। সর্ব্ব-শক্তিমান্ ব্রহ্মের প্রভাবেই জগৎ তাঁহাতেই ভাসে মাত্র। শ্রীভাগবতের „ধাম্নাস্বেন

সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি” এই নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য বস্তু--ইনিই ধ্যানের বিষয়। স্বরূপে ইনিই সত্যস্বরূপ, অন্য সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই মায়িক বলিয়া মিথ্যা। সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও মূলে এই সত্যং পরং আছেন বলিয়া এই ত্রিসর্গ সত্য মত প্রতীত হয়। যেমন সূর্য্যপ্রভা-বোত্থিত মরীচিকাতে জল ভ্রম হয়, কাচে জলভ্রম হয় বা রজত ভ্রম হয়, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সেইরূপে ব্রহ্মেই এই জগৎ ভ্রম হয়। ব্রহ্মকে ভ্রম জগৎরূপে প্রতীত হইলেও পরমব্রহ্ম আপন তেজপ্রভাবে মায়ার সমস্ত ইন্দ্রজাল নিরস্ত করিয়া আপন মহিমায় আপনি—আপনিরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান। ইনিই নির্গুণব্রহ্ম।

মায়াদ্বারা—ব্রহ্মের আত্মমায়া দ্বারা—স্পন্দস্বরূপিণী শক্তি দ্বারা—যখন ব্রহ্মেই এই জগৎ ভাসে তখন মহামায়াই জগদাকাররূপিণী। এই জগৎ তাঁহার আকার হইলেও তখনও তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই। তাই বলা হয় “ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা” ৯।৪ গীতা—আমিই অব্যক্তমূর্ত্তিতে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছি। ইনি সগুণ ব্রহ্ম—জগদা-কার হইলেও অর্থাৎ জগৎ উপাধির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও ইনি অব্যক্তমূর্ত্তি—ইহাঁর হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট কোন মূর্ত্তি নাই। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যেমন বলা হয় তিনি নির্ব্বিকল্প, নিরীহ—ইচ্ছাশূন্য সচ্চিদাত্মক সেইরূপ সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়—

বিনাঘ্রাণে সদা ঘ্রাণী বিনা নেত্রঞ্চ বীক্ষিতঃ।
কর্ণহীনং শ্রুতং সর্ব্বং গিরাহীনঞ্চ ভাষিতং॥
করঃ হীনং কৃতং সর্ব্বং কর্ম্মাণিকং শুভাশুভং।
পদহীন চলাসর্ব্বং কুশলাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ॥
স্বরূপো রূপহীনঞ্চ সমর্থঃ সর্ব্ব কর্ম্মণা॥

ভৃগুসংহিতা—বেদসাগর যোগ।

শ্রুতিও যেখানে বলিতেছেন যিনি “অনেজদেকং” রূপে নির্গুণ সেইখানেই বলিতেছেন “মনসো জবীয়ঃ” ইহাই তাঁহার সগুণ ভাব। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মা চলন রহিত, এক, অদ্বিতীয়—ইনি আবার মন

অপেক্ষাও অধিক বেগবান্। আবার বলিতেছেন "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" একস্থানে থাকিয়াও দূরে ভ্রমণ করেন; শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। মহামায়ার এই নির্গুণ-সগুণ ভাবেও অব্যক্তমূর্ত্তি আছে কিন্তু মনুষ্যের মত আকার বিশিষ্টা তিনি তখনও নহেন।

সমষ্টিভাবে যিনি জগদাকাররূপিণী তিনিই আবার ব্যষ্টিভাবে "সুর মানুষতির্য্যগাদীন দেহান্ বিভর্ষি" ব্যষ্টিভাবে ইনি দেবতা মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—স্থাবর জঙ্গম সকল দেহে দেহ—অথচ তিনি "ন চ দেহ গুণৈর্বিলিপ্তঃ" কোন দেহগুণে তিনি লিপ্ত নহেন কারণ "ত্বত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া"—কারণ অখিল মোহকারী মায়া তোমা হইতে ভীত হইয়া তোমা হইতে সরিয়া থাকেন। আত্মা সম্বন্ধে ও বলা হয় "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" জগৎ সৃজন করিয়া জগতের সর্ব্বদেহে দেহীবৎ অনুপ্রবিষ্ট তুমিই। এখানেও তোমার নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই।

দেখা গেল সমকালে তুমি নির্গুণ সগুণ আত্মা হইয়াও তোমাকে দিয়া মানুষের সকল অভাব দূর হয় না বলিয়াই নিরাকারের নরাকার রূপ, নারী আকাররূপ আবশ্যক হয়। তোমার—সর্ব্বশক্তিমত্তা, তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব মানুষের বুদ্ধিকে, মানুষের বিচারকে তৃপ্ত করিলেও মানুষের হৃদয়কে তৃপ্ত করিবার জন্য যেন আরও কিছু আবশ্যক হয়। মানুষের হৃদয় তোমার রূপ দেখিতে চায়, তোমার গুণে মন ভরিত করিতে চায়, মানুষ তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে চায়, মানুষ তোমাকে স্পর্শ করিতে চায়, তোমার কথা শুনিয়া বিভোর হইতে চায়। তুমি সর্ব্বত্র আছ, তোমার সমস্ত শক্তি আছে, তুমি ক্ষমাসার, তুমি করুণাবরুণালয়, মানুষ ইহা বিশ্বাস করিয়া লইতে পারে কিন্তু শুধু বিশ্বাসের ধর্ম্মে বুদ্ধির তৃপ্তি হইলেও হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। কবিগণ হৃদয় লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন। যিনি অতি উত্তম কবি তাঁহাতে বিচার ও হৃদয়ের একটা পূর্ণতা থাকে। সকল কবির মধ্যে ইহা না থাকিলেও হৃদয়ের ভাব যাঁহার মধ্যে অধিক থাকে লোকে সেই কবির উপর আকৃষ্ট হয়। কবি বলিবেন—তোমার সব কিছু

বিশ্বাস করি সত্য কিন্তু তোমার "হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে। পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥" হৃদয়ের ভাবে জগতের কাছে খ্যাতি লাভ করিয়াও বিচারের দোষে বড় বড় কবিরাও নিরাকার বলিয়া চিৎকার করেন কিন্তু তাঁহাদের নিরাকার থাকিয়া যায় বচনে, নিরাকার থাকিয়া যায় সম্প্রদায় রক্ষার জন্য—আর কার্য্যে আসিয়া যায় সাকার সাবয়ব। অসত্য কথা কেহই ভালবাসে না—কিন্তু সম্প্রদায় রক্ষা বড় বালাই। ইহাঁরা প্রাণে প্রাণে অবতারের আবশ্যকতা বুঝিলেও ইহাঁদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ইহাঁদিগকে অসত্য ছাড়িতে দেয় না পাছে সম্প্রদায়টা লোপ পাইয়া যায়। যাঁহাদের কিন্তু সত্যনিষ্ঠা অত্যন্ত অধিক তাঁহারা যখন বুঝিতে পারেন অবতার না মানিলে সত্যের অপলাপ করা হয় তাঁহারা তখনই নিরাকারদল ত্যাগ করিয়া অবতার লইয়া সত্যপথে ফিরিয়া আইসেন* আর দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ হৃদয়বান্ হৃদয়বতী হইলেও নিরাকার-কুসংস্কার ছাড়িতে পারেন না—নিরাকারের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেও—নিরাকারকে চরণ দিয়াও ইহাঁরা অবতার মানেন না। অবতারবাদকে শতপ্রকারে গালি পাড়িয়াও ইহাঁরা হৃদয়ের সত্য কথা উপেক্ষা করিতে পারেন না। ইহাঁরা কবিতায় লেখেন "অসীমের মাঝে সসীম" হইয়া না আসিলে হৃদয় কিছুতেই জুড়ায় না।

মানুষের দিক দিয়া দেখিলে যেমন অবতারের আবশ্যকতা স্পষ্ট অনুভূত হয় সেইরূপ আবার ঈশ্বরের দিক দিয়া দেখিলেও ঈশ্বরের মূর্ত্তি গ্রহণ নিতান্ত স্বাভাবিক।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি ভিন্ন যেমন জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হয় না সেইরূপ শক্তি ভিন্ন মূর্ত্তিগ্রহণও হয় না।

শক্তির দুই ভাগ—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য। ঐশ্বর্য্য না থাকিলে মাধুর্য্য মনকে আকৃষ্ট করে না, নয়নে পড়িলেও হৃদয় নাড়িতে পরে না; আবার মাধুর্য্য না থাকিলে ঐশ্বর্য্য ক্ষণকালের জন্য বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ক্রমে পুরাতন হইয়া যায়। জগতের যে দিকে দেখ সর্ব্বশক্তিমানের ঐশ্বর্য্যের অভাব কোথাও নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, ধারা, সাগর পর্ব্বত,

আকাশ বায়ু সমস্ত ঐশ্বর্য্য চিরদিন থাকে তথাপি কত লোকের কাছে জগতটা পুরাতন হইয়া যায়।

ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যও আছে কিন্তু মানুষ যতদিন প্রেমময় বলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিতে না পারে ততদিন তাহার যেন কিছুতেই শান্তি হয় না। নিরাকার ঈশ্বর নরাকারে ধরা দিয়া প্রেমের অনুভব না করাইয়া দিলে সেই মহতোমহীয়ান্, সেই অণোরণীয়ান্ সর্ব্বেশ্বরকে মানুষ প্রেমময়, করুণাময়, ক্ষমাসার বলিয়া কল্পনায় বুঝিলেও মানুষের হয় না; এইজন্য সেই সর্ব্বব্যাপী অসীম নিরাকার ঈশ্বরই নরাকার মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষের সকল অভিলাষ পূর্ণ করেন। শাস্ত্রও এই কথাই বলিতেছেন—বলিতেছেন "ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ"।

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন—

মনসো বিষয়ো দেব রূপং তে নিগুর্ণং পরং।
কথং দৃশ্যং ভবেদ্দেব দৃশ্যাভাবে জপেৎ কথম্॥

তুমি নিগুর্ণ পরব্রহ্ম সত্য কিন্তু মন তোমার বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই তোমাকে রূপ ধারণ করিতে হয়—তুমি যদি চক্ষুরাদির অবিষয়ই হইয়া থাক তবে তোমাকে দর্শন না করিয়া মানুষ তোমার নাম জপ করিবে কিরূপে? তুমি জ্ঞানস্বরূপ ইহা না হয় মানুষ কোনরূপে বুঝিল কিন্তু তুমি যে আনন্দস্বরূপ ইহা তোমার সেবা না করিয়া, তোমার প্রসন্নতা উপলব্ধি না করিয়া মানুষ বুঝিবে কিরূপে? তাই ব্রহ্মা তোমার স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

নানাশাস্ত্রৈর্ব্বেদকদম্বৈঃ প্রতিপাদ্যং
নিত্যানন্দং নির্ব্বিষয়জ্ঞানমনাদিম্।
মৎসেবার্থং মানুষভাবং প্রতিপন্নং
বন্দে রামং মরকতবর্ণং মথুরেশম্॥

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রেই নিরাকারের নরাকার মূর্ত্তি, নার্য্যাকার মূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়।

আর একটি কথা। মানুষ তোমার সহিত কথা কহিতে চায়। তুমি সর্ব্বত্র আছ বলিয়া সেই নিরাকারের সঙ্গে একতরফা কথা কহিয়া সে সুখ কোথায় যাহা তোমার মধুর মানুষ মূর্ত্তির সঙ্গে, তোমার ঐ মাতৃমূর্ত্তির সঙ্গে, তোমার ঐ প্রেমময়ী মূর্ত্তির সঙ্গে কথা কওয়ায় হয়? মানুষের সাড়া পাওয়ায় যেমন আনন্দ, তেমন আনন্দ কি তোমার কল্পনার সাড়ায় হয়? তুমি এই জন্য পিতা সাজিয়া, মাতা সাজিয়া, স্বামী সাজিয়া, আচার্য্য সাজিয়া—এমন কি অতিথি সাজিয়া কতরূপেই হৃদয়কে দ্রব করিয়া দিয়া থাক। শ্রুতি তাই মানুষকে বলিতেছেন "পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব, আচার্য্যদেবোভব, অতিথি দেবোভব" পিতাকে মাতাকে আচার্য্যকে অতিথিকে—সকলকে তুমি বলিয়া দেখিবার জন্যইত সংসারে আসা। ইহা যাহার হয় না তাহার সংসারে বিষ উঠিবেই।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই মাধুর্য্যের অবতার কথা আমরা শেষ করিতেছি।

ভগবান্ মাতার গর্ভ হইতে আসিলেন। "আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মা সনাতনঃ"। কিন্তু সে মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

নীলোৎপল দলশ্যামঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥
জলজারুণ নেত্রান্তঃ স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতঃ।
করুণারসসম্পূর্ণ বিশালোৎপললোচনঃ॥

রূপের কত বর্ণনা আছে। মাতা রূপ দেখিয়া বিস্ময়ে আকুল হইয়াছেন, নমস্কার করিতেছেন, হর্ষাশ্রুনয়নে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া স্তব করিতেছেন, স্তুতি আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে। কতই স্তব করিলেন নির্গুণ সগুণ আত্মা তুমিই। কতই প্রার্থনা হইল—শেষে বলিলেন—

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নেতদ্রূপমলৌকিকম্।
দর্শয়স্ব মহানন্দ বালভাবং সুকোমলম্॥
ললিতালিঙ্গনালাপৈস্তরিষ্যাম্যুৎকটং তমঃ॥

তোমার ভক্ত যখন তোমায় পরীক্ষা করে আর তুমি সেই পরীক্ষা হাসিতে হাসিতে দিয়া থাক তখন তোমার মধুর ভাবে প্রাণভরিয়া যায়।

আহা ! কোথায় এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক আর কোথায় বা এই শত অপরাধে অপরাধী ভক্ত !—তথাপি তুমি নিতান্ত বশম্বদের মত ভক্ত যাহা করিতে বলে তাহাই কর। ভক্তের রথের সারথি হইয়া অশ্বের গায়ের ধূল ঝাড় তুমি ! যাঁহাকে কিছু দিয়াই বাঁধা যায় না তাহাকে তাঁহার ভক্ত দড়ী দিয়া বাঁধিবে। যাঁহার ঐশ্বর্য্যে জগৎভরা তিনি মাধুর্য্যে বাঁধন লইলেন—প্রথমে দুই অঙ্গুলী অবশিষ্ট রহিল, বাঁধা গেল না, শেষে যখন ভক্ত আর পারিলাম না বলিয়া নিরাশ্রয় হইল তখন বাঁধা পড়িলেন। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য ইহাই।

কত আর বলা যাইবে ? স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহার ঐশ্বর্য্যের শেষ না পাইয়া বলিতেছেন—

আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিত
স্তন্নাধ্যগচ্ছম্ যত আত্মসম্ভবঃ”

অর্থাৎ ব্রহ্মা যাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন আমি বেদময়, আমি তপোময়, তপস্যার আধার প্রজাপতি গণের আদৃত পতি—নিপুণ যোগাবলম্বনে সমাহিত চিত্ত হইয়াও যাঁহা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না—

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং পতিং বিদু
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়ামোহিতবুদ্ধয় স্ত্বিদং
বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষমহে॥ ২।৬।৩৫ ভাগবত

আমি ব্রহ্মা, নারদ, তোমরা ও বামদেব, শ্রীরুদ্র—আমরাই যখন তাঁহাকে জানিলাম না—তখন আর কোন্ দেবতা তোমাকে জানিবে ? মানুষের আবার কথা কি তোমার মায়া নির্ম্মিত এই বিশ্বকে, মায়া মোহিত বুদ্ধি আমরা, আমরা আমাদের বুদ্ধির অনুরূপ মাত্রই যখন দেখি, প্রপঞ্চের একদেশ মাত্রই যখন প্রত্যক্ষ করি সম্পূর্ণ পারিনা, তখন কে তোমার তত্ত্ব জানিবে ?

পৃথ্বীরূপে দয়ারূপে তেজোরূপে নমো নমঃ।
প্রাণরূপে মহারূপে ভূতরূপে নমোঽস্তুতে ॥
বিশ্বমূর্ত্তে দয়ামূর্ত্তে ধর্ম্মমূর্ত্তে নমোনমঃ।
দেবমূর্ত্তে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তে জ্ঞানমূর্ত্তে নমোঽস্তুতে ॥

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দেখিয়া শত বার নমোনমঃ করিয়াও তেমনটি কি হয়, যেমনটি হয় তোমার মাধুর্য্যে ? আমরা আর কিছু না বলিয়া করিব ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য জড়িত একটি গীত দিয়া এই অংশ শেষ করিতেছি।

ধন্য মানি মেনকাকে
ত্রিজগজ্জননী যা'কে
মা জে'নে মা ব'লে ডাকে।
ত্রিভুবন যার কোলে দোলে
রাণী তারে করে কোলে
চরাচর যা'র চরণ চুমে।
(রাণী) তার শিরে চুম্বে সোহাগে ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার
চরণ ধূলা চায়।
(রাণী) মেয়ে বলে আশীষ ছলে
দেয় চরণ তা'র মাথায়,
সুধাতুল্য প্রসাদ যাহার
সুখে জগৎ করে আহার
রাণী আহার যোগায় তাহার
নিজ উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় তাকে ॥
যার চরণে প্রণাম ক'রে সিদ্ধ সর্ব্ব কাম,
(সেই) নিখিলের নমস্যা করেন রাণীরে প্রণাম ;
স্থাবর, জঙ্গম, যা'র অধীনে,
রাণী দেয় তায় পুতুল কিনে ;
স্নেহাত্মিকা ভক্তি বিনে,
এমন ক'রে কে পায় মাকে ॥

যাঁরে ছে'ড়ে তিলার্দ্ধ না বাঁচে জীব কুল,
মা ছে'ড়ে সে যাবে ব'লে কাঁদিয়া আকুল,
যা'র নামে ভবের মায়া কাটে,
সে বিকিয়ে গেল মায়ের হাটে,
ভেবে দেখ্‌লে আজব বটে
মা বা কে মেয়ে বা কে ॥
যা'র চরণে জ্ঞানের রাণী বাণী লন দীক্ষা,
মেনকা সন্তান জ্ঞানে তারে দেয় শিক্ষা,
যে মা ত্রিভুবনের ভূষণ,
রাণী তারে দেয় আভরণ
কান্ত কয়, যায় যেমন সাধন,
তার তেমনি সিদ্ধি মি'লে থাকে ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের ফল।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১৩টি অধ্যায়ের এক এক অধ্যায়কে এক এক মাহাত্ম্য বলে। সম্পূর্ণ পুস্তক পাঠ করাকে রূপ বা আবৃত্তি বলে।

বারাহতন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠের ফল বলা হইয়াছে। চণ্ডীর ১ রূপ পাঠে কার্য্যসিদ্ধি হয়, ৩ রূপ পাঠে উপসর্গ শান্তি হয়, ৫ রূপ পাঠে গ্রহশান্তি হয়, ৭ রূপ পাঠে উপসর্গ শান্তি হয়, ৯ রূপ পাঠে অন্যবিধ শান্তি হয়, ১১ রূপ পাঠে ঐশ্বর্য্য হয়, ১২ রূপ পাঠে অভীষ্ট সিদ্ধি ও দৈবহানি হয়, ১৪ রূপ পাঠে শত্রু বশ ও স্ত্রী বশ হয়, ১৫ রূপ পাঠে লক্ষ্মীলাভ হয়, ১৬ রূপ পাঠে পুত্র পৌত্র ধনধ্যান্যাদি হয়, ১৭ রূপ পাঠে রাজভয় নিবারণ হয়, ১৮ রূপ পাঠে শত্রু দমন হয়, ২০ রূপ পাঠে মহাব্রণ শান্তি হয়, এবং ২৫ রূপ পাঠে বন্ধন মোচন হয়। অসাধ্য রোগ, আয়ুক্ষয়, ধনক্ষয় ও ত্রিবিধ উৎপাৎ উপস্থিত হইলে ১০০ রূপ পাঠ আবশ্যক। ১০৮ রূপ পাঠে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং সহস্ররূপ পাঠে ইহকালে সর্ব্বপ্রকার সুখ ভুক্তি এবং অন্তে মুক্তি লাভ হয়। আমরা বরাহ তন্ত্রের বচনও এইখানে তুলিয়া দিলাম।

চণ্ডীপাঠ ফলং দেবি শৃনুষ্ব গদতো মম।
একবৃত্ত্যাদি পাঠানাং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ ১
সঙ্কল্প্যপূর্ব্বং সম্পূজ্য ন্যস্যাঙ্গেষু মনুন্ সকৃৎ।
পশ্চাৎ বলি প্রদানাদ্ধি সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২
উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ।
গ্রহোপশান্ত্যৈ কর্ত্তব্যং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে ॥ ৩
মহাভয়ে সমুৎপন্নে সপ্তাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
নবাবৃত্ত্যাস্তবেচ্ছান্তির্বাজপেয়ংফলং লভেৎ ॥ ৪
রাজবশ্যায় ভূত্যৈ চ রুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ!
অর্কাবৃত্তাৎ কাম্যসিদ্ধৈর্বৈরহানিশ্চ জায়তে ॥ ৫
মন্বাবৃত্তাদ্ রিপুর্বশ্যস্তথা স্ত্রীবশ্যতামিয়াৎ।
সৌখ্যং পঞ্চাদশাবৃত্তাচ্ছ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬
কলাবৃত্তাৎ পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ।
রাজ্ঞাং ভীতি বিনাশায় বৈরস্যোচ্চাটনায় চ ॥ ৭
কুর্য্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে।
মহাব্রণ বিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ ॥ ৮
পঞ্চবিংশাবর্ত্তনাচ্চ ভবেদ্বন্ধ বিমোক্ষণম্।
সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে দুশ্চিকিৎস্যাময়ে তথা ॥ ৯
জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আয়ুষো নাশ আগতে।
বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ ধননাশে তথা ক্ষয়ে ॥ ১০
তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে।
কুর্য্যাৎ যত্নাৎ শতাবৃত্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুভং ॥ ১১
বিপদস্তস্যনশ্যন্তি ততো যাতি পরাং গতিম্।
ধিয়োবৃদ্ধিঃ শতাবৃত্ত্যা রাজ্যবৃদ্ধিস্তথাপরা ॥ ১২
মনসা চিন্তিতং দেবি সিদ্ধেদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ।
শতাশ্বমেধযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সুব্রতে ॥ ১৩
সহস্রাবর্ত্তনাল্লক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা।
ভুক্ত্বা মনোরথান্ কামান্ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুষু দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ।
স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ ॥ ১৫
অথবা বহুনোক্তেন কিমন্যেন বরাননে।
চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তপাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৬

চণ্ডীপাঠের ফল প্রাপ্তির জন্য বিশেষ বিধিও বর্ণিত হইয়াছে। ভৃগু সংহিতাতেও এই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা ইহার মধ্যে কতক গুলি সিদ্ধির কথা মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

চণ্ডীর প্রতি শ্লোকের আদি ও অন্তে প্রণব জপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। প্রতিশ্লোকের আদিতে অনুলোম ক্রমে স প্রণব ব্যাহৃতি ত্রয় এবং অন্তে বিলোম ক্রমে ব্যাহৃতিত্রয় ও প্রণব দিয়া শতবার পাঠে অতিশীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। প্রতি শ্লোকের আদিতে "জাতবেদসে" এই ঋক্ দিয়া প্রতিশ্লোক পাঠে সর্ব্ব কাম সিদ্ধি হয়। প্রতি শ্লোকের আদিতে ও অন্তে "ত্র্যম্বক" মন্ত্র দিয়া শত পাঠে অপমৃত্যু নিবারণ। "শূলেন পাহি নো দেবী" দিয়া প্রতিশ্লোক পাঠেও অপমৃত্যু নিবারণ হয়। কেবল লক্ষ অযুত সহস্র বা শত পাঠেও অপমৃত্যু বারণ হয়। "শরণাগত দীনার্ত্ত" দিয়া প্রতিশ্লোক পাঠে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। প্রতি শ্লোক "করোতু সা নঃ শুভ" এই অর্দ্ধ মন্ত্র পাঠেও সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। অভীষ্ট বর প্রাপ্তি জন্য "এবং দেব্যা বরং লব্ধা" শ্লোক দিয়া প্রতিশ্লোক পাঠ করিতে হয়। সর্ব্বাপত্তি বারণ জন্য প্রতি শ্লোক "দুর্গে স্মৃতেতি" পাঠ করিতে হয়।

"সর্ব্বাবাধেতি" দিয়া লক্ষজপে প্রতিশ্লোক পাঠে শ্লোকোক্ত ফল প্রাপ্তি।

"ইত্থং যদা যদা বাধেতি" দিয়া শ্লোক পাঠে মহামারী শান্তি।

"ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমিতি" মন্ত্র দিয়া প্রতিশ্লোক লক্ষ জপে স্বরাজ্য লাভ।

"হিনস্তি দৈত্য তেজাংসি" ইহা দিয়া সদীপ বলিদানে ঘণ্টাবাদনে প্রতি শ্লোক পাঠে কাল গ্রহ শান্তি। * * *

"কাংসোহস্মী" এই ঋক্ দিয়া প্রতি শ্লোক পাঠে লক্ষ্মী প্রাপ্তি।

"অনৃণা অস্মিন্" এই ঋক্ দিয়া প্রতিশ্লোক পাঠে ঋণ পরিহার।

"রোগানশেষানিতি" শ্লোক দিয়া প্রতি শ্লোক পাঠে সকল রোগ নাশ। শুধু এই শ্লোক জপেও ইহা হয়।

"ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরেতি" শ্লোক দিয়া প্রতি শ্লোক পাঠে অথবা পৃথক্ জপেও বিদ্যাপ্রাপ্তি বাক্ বিকার নাশ। ইত্যাদি।

চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মার্কণ্ডের পুরাণে ৮১ অধ্যায় হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত ১৩টি অধ্যায়ে দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। চণ্ডীপাঠের ক্রমের কথা আমরা পরে বলিব। এক্ষণে এই ১৩টি অধ্যায়ে যাহা আছে তাহাই লিখিত হইতেছে। এখানে দেবীর তিনটি চরিত্র বর্ণিত।

প্রথম চরিত্রে প্রথম মাহাত্ম্যে—

চতুর্দ্দশ মনুর দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের অধিকার কালে দ্বিতীয় মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র চৈত্র বংশ সম্ভূত সুরথ রাজা সমুদয় ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তিনি বনগমন করেন। মেধা মুনির আশ্রমে তাঁহার অবস্থান, সংসার হইতে বিতাড়িত সমাধি বৈশ্যের সহিত সাক্ষাৎকার। মেধামুনির নিকটে মোহোৎপত্তি (১) কাহার দ্বারা হয়, (২) তিনি কিরূপে মূর্ত্তিধারণ করেন, (৩) কোন্ কর্ম্ম করেন, (৪) তাঁহার স্বভাব কি (৫) তাঁহার স্বরূপ কি এবং (৬) কোথা হইতে তাঁহার উদ্ভব—রাজার এই ছয়টি প্রশ্ন। ঋষি কর্ত্তৃক মোহ নাশের জন্য চণ্ডী চরিত্র বর্ণন। মধুকৈটভের উৎপত্তি। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবী স্তুতি। তাহাতে যোগ নিদ্রারূপিণী কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি দেবীর বিষ্ণু শরীর হইতে প্রাদুর্ভাব। বিষ্ণুর সহিত মধুকৈটভের যুদ্ধ—মধুকৈটভ বধ।

মধ্যম চরিত্রে ২য় অধ্যায়ে।

শত বৎসর ধরিয়া দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাগণ পরাজিত ও মহিষাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকার। দেবতাগণের বিড়ম্বনা

নিবারণ জন্য ব্রহ্মা সহ দেবগণের বিষ্ণুসদনে গমন। মহিষাসুরের উপদ্রব শ্রবণে মধুসূদন, শম্ভু ও অন্যান্য দেবগণের ক্রোধ। দেবগণের তেজ হইতে দেবীর আবির্ভাব। দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীকে স্ব স্ব অস্ত্র প্রদান। দেবগণ-সম্মানিতা দেবীর মুহুর্ম্মুহু অট্টহাস—সেই শব্দের প্রতিশব্দে "চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে"। অসুরগণের সহিত ত্রিলোক সংক্ষুব্ধ দেখিয়া "আঃ কিমেতৎ" শব্দ করিয়া মহিষাসুরের ক্রোধ ও সহস্রভুজা দেবীর কান্তিতে ত্রিভুবন উজ্জ্বলীকৃত দর্শন। মহিষাসুরের সেনাধ্যক্ষ চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল, পরিবারিত, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি অসুরগণের সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধে আগমন। দেবীর সহিত অসুরগণের মহাযুদ্ধ—মহিষাসুর সৈন্যবধ।

মধ্যম চরিত্রে তৃতীয় মাহাত্ম্য

মহিষাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ ও মহিষাসুর বধ।

মধ্যম চরিত্রে চতুর্থ মাহাত্ম্য

শক্রাদি সুরগণের দেবীর স্তুতি এবং দেবগণের দেবী অর্চ্চনা; দেবী কর্ত্তৃক বরদান।

উত্তম চরিত্রে পঞ্চম মাহাত্ম্য

শুম্ভ নিশুম্ভের উপদ্রব, দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তুতি, গৌরী দেহ সমুদ্ভূতা কৃষ্ণাপার্ব্বতী কালিকার আবির্ভাব, দেবীর সুমনোহর অম্বিকারূপ ধারণ, শুম্ভ নিশুম্ভ ভৃত্য চণ্ডমুণ্ডের আগমন—দেবী নিকটে শুম্ভনিশুম্ভের ঐশ্বর্য্যবর্ণন এবং শুম্ভনিশুম্ভের নিকটে দেবীর সংবাদ দান, দেবীর নিকটে সুগ্রীব দূত প্রেরণ ও কথোপকথন।

উত্তম চরিত্রে ষষ্ঠ মাহাত্ম্য

ধূম্রলোচন বধ।

উত্তম চরিত্রে সপ্তম মাহাত্ম্য

চণ্ডমুণ্ড বধ।

উত্তম চরিত্রে অষ্টম মাহাত্ম্য

রক্তবীজ বধ।

উত্তম চরিত্রে নবম মাহাত্ম্যে

নিশুম্ভ বধ।

উত্তম চরিত্রে দশম মাহাত্ম্যে

শুম্ভ বধ।

উত্তম চরিত্রে একাদশ মাহাত্ম্যে

নারায়ণী স্তুতি, দেবীর বরদান ও ভবিষ্যৎ আবির্ভাব কথন।

উত্তম চরিত্রে দ্বাদশ মাহাত্ম্যে

ভগবতী বাক্যে চণ্ডী পাঠের ফলকীর্ত্তন।

উত্তম চরিত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে

সুরথ-সমাধির দেবী আরাধনা, বরপ্রাপ্তি, চণ্ডী মাহাত্ম্য সমাপ্তি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিভিন্ন নাম।

দুর্গাসপ্তশতী, ষট্‌সংবাদকথা, দেবী মাহাত্ম্য, চণ্ডী ইত্যাদি চণ্ডী-গ্রন্থের নাম।

দুর্গাসপ্তশতী

গীতা যেমন সাতশত শ্লোকে আবদ্ধ চণ্ডীতেও সেইরূপ সাত শত শ্লোকে শ্রীদুর্গার লীলা কীর্ত্তিত বলিয়া ইহারা নাম দুর্গা সপ্তশতী।

ষট্ সংবাদ কথা

ছয় জন প্রশ্নকর্ত্তা সম্বন্ধে দেবী মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত বলিয়া ইহাকে ষট্‌সংবাদ বলা হয়।

মেধাস্তু কথামাস সুরথায় সমাধয়ে।
সা কথা কথিতা পশ্চান্মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ॥
তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণো জৈমিনিংপ্রতি।
এষা ষট্‌সংবাদ কথা সপ্তশত্যাঃ পুরাতনী॥

এই দেবী মাহাত্ম্য (১) মেধামুনি সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যকে প্রথম বলেন।

(২) দ্বিতীয়বারে মার্কণ্ডেয় মুনি ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে বলেন।

(৩) পিতাদ্রোণমুনির শাপে পক্ষিযোনি প্রাপ্ত—অথচ জাতিস্মর বিন্ধ্যাচলবাসী পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ—মনুষ্যের বাক্য উচ্চারণে সমর্থ চারিজন মুনিপুত্র, ব্যাস ভগবানের শিষ্য জৈমিনিকে ইহা বলেন।

মেধা ও সুরথ-সমাধি; মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকি ভাগুরি এবং জৈমিনি ও পক্ষিচতুষ্টয় ইহাই ষট্‌সংবাদ কথা।

দেবী মাহাত্ম্য

এই গ্রন্থে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত বলিয়া গ্রন্থের নাম দেবী মাহাত্ম্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীচণ্ডীগ্রন্থের এক এক অধ্যায়কে এক এক মাহাত্ম্য বলা হয়।

চণ্ডী

চণ্ডীগ্রন্থের নামও চণ্ডী। গ্রন্থের প্রথমোঽধ্যায়ের প্রথমেই "ওঁনমশ্চণ্ডিকায়ৈ" ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ ভাস্কর রায় দীক্ষিত প্রদত্ত চণ্ডীশব্দের অপূর্ব্ব বিবরণের কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইবে এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

এক্ষণে আমরা চণ্ডীতে সকল মানবজীবনের জটিল প্রশ্ন ও তৎ সমাধান বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। এই আলোচনায় চণ্ডীর উদ্দেশ্য ও সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে একই তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে।

চণ্ডীতে মানব জীবনের জটিল প্রশ্ন, তৎসমাধান এবং সর্ব্বশাস্ত্রের একই উদ্দেশ্য।

জগতের সমস্ত ক্ষণবিধ্বংসী বস্তু যে চিরস্থায়ী শান্ত বস্তুর উপরে দাঁড়াইয়া আছে সেই চিরস্থায়ী বস্তুকে যাহা দেখাইয়া দিতেছেন তাহাই শাস্ত্র: শাস্ত্রগ্রন্থ ক্ষণস্থায়ী বস্তু অবলম্বনে রচিত হয় নাই। আধুনিক যে সমস্ত গ্রন্থকার নষ্টবুদ্ধি মানুষের ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য পুস্তক লেখেন আর যাঁহারা প্রচার করেন সাহিত্যও ক্ষণস্থায়ী তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্তবুদ্ধি। চণ্ডী, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, অধ্যাত্মরামায়ণ,

যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ—এই সমস্ত শাস্ত্র মানব জীবনের অত্যন্ত জটিল, নিতান্ত কঠিন সমস্যার সমাধান লইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই এই সমস্ত শাস্ত্র চিরদিন থাকিবে—কারণ মানুষ যতদিন থাকিবে ততদিন জীবনের কঠিন সমস্যাও থাকিবে এবং তৎসমাধানার্থ শাস্ত্রেরও প্রয়োজন হইবে। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে মানব জীবনের কোন্ সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে এক্ষণে আমরা চণ্ডী কোন্ সমস্যা সমাধানের জন্য উঠিয়াছেন তাহাই দেখাইতেছি।

ভারতের এখনও কত লোক নিত্য চণ্ডী পাঠ করেন। চণ্ডী ভাবনা কিরূপে করিতে হয়—চণ্ডী ভাবনায় মানুষ কোন্ বস্তু লাভ করিতে পারে এখানে তাহাই আলোচ্য। গীতা বলিতেছেন বিষয় চিন্তা করিয়া মানুষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস ইত্যাদি" হইতে "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"—গীতার এই সমস্ত শ্লোক মৃত্যুর পথ দেখাইতেছেন। কিন্তু অমরত্বের পথে চলিতে হইলে তীর্থ ভাবনা, মন্ত্র ভাবনা, শাস্ত্র ভাবনা, ও তত্ত্ব ভাবনা যিনি ক্রম অনুসারে করিতে পারেন তিনিই স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হন। অন্যত্র তত্ত্ব ভাবনা, শাস্ত্র ভাবনা ও তীর্থভাবনার কথা কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, এখানে শাস্ত্র ভাবনায় চণ্ডীর প্রশ্ন ও তৎ সমাধানের কতক আলোচনা করিতেছি।

চণ্ডীর "কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ" কি করি আমার মন আমার পুত্রাদি সম্বন্ধে যে নিষ্ঠুরভাব ধারণ করিতেছে না"—সমাধি বৈশ্যের এই উক্তিই জীবনের কঠিন সমস্যা।

যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতি স্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দিতেষ্বেব মে মনঃ॥

যাহারা ধন লোভে পিতার স্নেহ, পতির প্রেম, স্বজন প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, আমার মন তাহাদের উপরেই অনুরক্ত। বন্ধু আমার প্রতি বিগুণ, তথাপি চিত্ত প্রেমবশে সেই স্নেহহীন বন্ধুদিগের প্রতিই ধাবিত। আজ স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু

আত্মীয় সকলে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছে তথাপি তাহাদের জন্য আমার কত দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে, তাহাদের জন্য কতই দুশ্চিন্তা উঠিতেছে ; কি করি সেই স্নেহহীন স্বজনের প্রতি আমার মনের স্নেহ যে কিছুতেই কমিতেছে না।

বলনা—সংসারের প্রতি তোমার মন নিষ্ঠুর হয় কি ? সংসার তোমাকে দেখিতে পারে না—সংসার তোমার উপর নিরন্তর কঠিন ব্যবহার করে তথাপি তুমি সংসারের কথাই সর্ব্বদা কও কি না ? কেন কও জান ? তুমি মোহাচ্ছন্ন বলিয়াই এইরূপ দুষ্টবুদ্ধির কাজ কর। অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য বিষয়ে যে মোহ আসিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য যেমন গীতার উদয়, সেইরূপ সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের মোহ দূর করিবার জন্য এই চণ্ডী।

সংসারের উপব নিষ্ঠুর ব্যবহার করা কি মনুষ্যত্ব ? আজ বহু লোকের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠে। আজকালকার জগৎ এতই মোহাচ্ছন্ন যে ইহা সংসারের স্বরূপ দেখিতেই চায়না—দেখাইয়া দিলেও বুঝিতেও পারে না—উত্তর করে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন নিবুর্দ্ধিতা বশতঃ অধর্ম্ম করিলেই কি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে ? আজ সভ্য ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা ভোগের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে আর অনুকরণজীবী মানুষও এই ভোগের ধর্ম্ম ভারতে আনিতেছে। ভারত কিন্তু ভোগ ভূমি নহে—ভারত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষভূমি। ভারতও ভোগের কথা বলিতেছেন, সে ভোগ অন্য প্রকার। ভারত যে ভোগ শিক্ষা দিতেছেন সে ভোগের শেষ ফল পরমানন্দ প্রাপ্তি বা সংসার মুক্তি আর ইয়ুরোপ আমেরিকা যে ভোগ শিক্ষা দিতেছে তাহার ফল ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও পরমদুঃখপ্রাপ্তি বা মৃত্যু। ঈশ্বরকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া ইন্দ্রিয় দিয়া সুখ ভোগ করিতে যাওয়া অপেক্ষা মূঢ় বুদ্ধির কার্য্য আর নাই। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য যখন তুমি কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হও তখন যেন ভোগ তোমার নিকট স্বয়ং আগমন করে তাহা ঈশ্বরের প্রসাদ বলিয়া ভোগ করায় তোমার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না ; আর ঐ যে লোকে বলে আমার মন

সংসারের উপরে নিষ্ঠুর হইতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক হইলেও মোহ মাত্র। আর্য্য ঋষিগণ শিক্ষা দিতেছেন---হস্তপদ দিয়া সংসারের ব্যবহারিক কার্য্য কর কিন্তু হৃদয়টা সংসারকে দিওনা। হৃদয়টি রাখ পবিত্র—এইটী দাও শ্রীভগবানকে। ইহা যদি না পার তবে ধ্বংসের পথে ছুটিবেই। ভারত শিক্ষা দিতেছেন—"বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব। অন্তঃশুদ্ধ স্বভাবস্তং লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ" বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া সকলের জন্য কর্ম্ম করিলেও তুমি তোমার স্বরূপটি যখন জানিতে পারিবে, যখন জানিবে তুমি ভিতরে শুদ্ধ স্বভাব—তুমি ভিতরে এমনই একটী বস্তু যাহাতে কোন প্রকার দুঃখ নাই, কোন প্রকার অভাব নাই, তোমার আধিব্যাধি, ক্ষুধা, পিপাসা, জনম, মরণ—কিছুই নাই তুমি পূর্ণ—ইহার জন্য ভারত সাধনাটি দেখাইয়া দিতেছেন—এই সাধনা দ্বারা আপনাকে অন্তঃশুদ্ধস্বভাব জানিয়া যখন তুমি জগতের জন্য কর্ম্ম করিবে তখন তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

> ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা।
> প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

ভারতের শিক্ষা কত সুন্দর! শাস্ত্র বলিতেছেন—

অন্তর্যুক্তো বহিঃসর্ব্বমনুকুর্ব্বংশ্চচার সঃ" "ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থ সিদ্ধয়ে"—ভিতরে আপনার স্বরূপটি জানিয়া বাহিরের সমস্ত কার্য্য কর। এমন কি ক্রোধ, মোহ এবং কামকেও ব্যবহার সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ কর। কিন্তু ভারতের অমর পথ কখন দেখিয়াছ কি, সেই পথে চলিবার অনুষ্ঠান কখন করিয়াছ কি? তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে "অকরণাৎ মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ" একেবারে জড় ভাবে থাকা অপেক্ষা—কিছু না করা অপেক্ষা—কিছু করা ভাল। ভগবান্ মঙ্গলময় তিনি অমঙ্গলের ভিতর দিয়াও মঙ্গল করেন। এই যে আজ ব্যভিচারের সমস্ত পথ খুলিতে তোমরা ছুটিয়াছ ইহার ফলে কল্যাণ পথের আর এক স্রোত প্রবাহিত হইবে তাহাতে ঋষিগণের পথ যাঁহারা

অবলম্বন করিয়া আছেন তাঁহারা বহু ক্লেশে পড়িবেন, পড়িয়া ভগবানকে ক্লেশ নিবারণের জন্য কাতরতার ভাবে আহ্বান করিবেন, ইহাই অমঙ্গলের ভিতরে মঙ্গল। তাহার পরে আসিবেন ভগবান স্বয়ং। ইহার কিন্তু অনেক বিলম্ব এখনও আছে। ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসরের মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার মাত্র হইয়াছে—এখনও অনেক বাকী। যাঁহারা ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথে চলিবেন তাঁহাদের জন্য গীতা উপদেশ করিতেছেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরমধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ॥

সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা দোষযুক্ত স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ট। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধন হওয়াও শ্রেয়ঃ কিন্তু পরধর্ম্ম অতি ভয়ানক।

এখন আমরা চণ্ডির কথা বলিব।

যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সমাধি বৈশ্য দুঃখে দুঃখে জীবন কাটাইতেছিলেন সেই মোহে আক্রান্ত হইয়া সুরথ রাজাও নিতান্ত বিমনায়মান।

আমরা প্রথমে চণ্ডীতে যে দুইটি মনুষ্যচরিত্র আছে তাহার কথা একটু বিশেষ ভাবে বলিতেছি। চণ্ডীতে দেখা যায় সমাধি বৈশ্যের যে মোহ আসিয়াছিল সুরথ রাজারও সেই মোহ। সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলে একাধিপত্য করিতেন এই সুরথ রাজা। তিনি প্রজাগণকে ঔরস পুত্রবৎ পালন করিতেন। এই সময়ে কোলাবিধ্বংসী ভূপতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজা ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রাজা পরাস্ত হইলেন। রাজা নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এখানেও প্রধান শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তৎপরে রাজার বলবান্ অমাত্যেরা রাজার সৈন্য ও সঞ্চিত ধনাদি আত্মসাৎ করিল। সব গেল রাজা তখন মৃগয়া ব্যাপদেশে "একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্" একাকী অশ্বারোহণে নিবিড়বনে গমন করিলেন। বনমধ্যে ভগবান্ মেধা মুনির আশ্রম। আশ্রমের চারি-ধারে হিংস্রজন্তু—ইহারা কিন্তু শান্ত। মুনি রাজাকে সমাদর করিলেন। রাজা মুনির আশ্রমে বাস করিতেন আর ইতস্ততঃ বনমধ্যে বিচরণ

দেখুন নূতন গ্রন্থ :—

অনুরাগ।

শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ মাত্র।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য, ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুন্দর ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে।

বঙ্গবাসী, বসুমতি, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১।০ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল
বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই।

শ্রীভরত।

শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১০ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। সুন্দর বাঁধাই ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

"নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি।"

উত্তম বাঁধাই—মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) প্রণীত।

মন যখন কিছুই করিতে চায় না তখন এই পুস্তকের কোন একটি প্রবন্ধ পড়িলেই মনের জড়তা দূর হইবেই।

দেহতত্ত্ব

দেহী সকলেই অথচ দেহের আভ্যন্তরিক খবর কয় জনে রাখেন? আশ্চর্য্য যে, আমরা জগতের কত তত্ত্ব নিত্য আহরণ করিতেছি, অথচ যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল করিয়া থাকি, সেই দশেন্দ্রিয়ময় শরীর সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। দেহের অধীশ্বর হইয়াও আমরা দেহ সম্বন্ধে এত অজ্ঞান যে, সামান্য সর্দ্দি কাসি বা আভ্যন্তরিক কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলেই, ভয়ে অস্থির হইয়া দুই বেলা ডাক্তারের নিকট ছুটাছুটি করি।

শরীর সম্বন্ধে সকল রহস্য যদি অল্প কথায় সরল ভাষায় জানিতে চান, যদি দেহ যন্ত্রের অত্যদ্ভুত গঠন ও পরিচালন-কৌশল সম্বন্ধে একটি নিখুঁৎ উজ্জ্বল ধারণা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্‌-বি সম্পাদিত "দেহ তত্ত্ব" ক্রয় করিয়া পড়ুন এবং বাড়ীর সকলকে পড়িতে দেন।

ইহার মধ্যে—কঙ্কাল কথা, পেশী-প্রসঙ্গ, হৃদ্‌-যন্ত্র ও রক্তাধার সমূহ, মস্তিষ্ক ও গ্রীবা, নাড়ী-তন্ত্র মস্তিষ্ক, সহস্রার পদ্ম, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির সংস্থান এবং উহাদের বিশিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি—শত শত চিত্র দ্বারা গল্পচ্ছলে ঠাকুরমার কথন নিপুণতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা মহাভারতের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ, উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ইহা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের এবং গ্রাম্য চিকিৎসকবৃন্দ-বান্ধবের, নিত্য সহচর হউক।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে—(৪১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা মূল্য মাত্র ২৷৶০ আনা, ডাঃ মাঃ পৃথক।

শিশু-পালন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত, ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আকারে, বহু চিত্র সম্বলিত হইয়া সুন্দর কার্ডবোর্ডে বাঁধাই, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা; মূল্য নাম মাত্র এক টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

১। “উৎসবের” বার্ষিক মূল্য সহরে মফস্বলে সর্ব্বত্রই ডাকমাঃ সমেত ৩ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্ত ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে “উৎসব” প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে “উৎসব” “না পাওয়ার সংবাদ” না দিলে বিনামূল্যে “উৎসব” দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। “উৎসব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই-কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। “উৎসবের” জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

[illegible]] ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল। [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মুল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষ্মণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে. সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৪শ বর্ষ। { ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল। { ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ভারতের প্রাণ।

একনিষ্ঠাই ছিল ভারতের প্রাণ। যতদিন ভারত ভারত ছিল ততদিন ভারত সকলের মধ্যে এককেই দেখিত—একের মধ্যে সকলকেই দেখিত। ভারত তখন দেখিত এই জগৎটা সেই একেরই মন্দির। এখন সে দিন নাই। যেমন নদীর জলধারা বহু মুখে যখন প্রধাবিত হয়, আর জলরাশি বহু মুখে ছুটে বলিয়া নদী ক্রমে ক্ষীণ হইয়া শুকাইয়া যাইতে থাকে; নদী তখন আর সমুদ্রে মিশিতে পারে না। সেইরূপ যে বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা এককেই দেখিত একেরই উপাসনা করিত, সর্ব্বত্র একেরই প্রয়োগ করিত সে বৈদিক ধর্ম্ম আজ বিকৃত হইয়াছে, একে সর্ব্বত্র দেখিতে ভুলিয়াছে; যাহারাও মুখে একের কথা কয় তাহারও কার্য্যে বহুরই সেবা করিতেছে; এইজন্য ভারতের দুঃখ ঘুচিতেছে না।

আমরা বহুদিন ধরিয়া সেই একে ফিরিতে হইবে কিরূপে তাহাই বলিয়া আসিতেছি; চিরদিনই বলিব।

যে অখণ্ড চৈতন্যের উপরে সমস্ত কর্ম্মরাশি লইয়া মন ভাসিয়াছে সেই মন একে ফিরিবে কিরূপে? মনকে চালাইতেছে, মনের পুরাতন কর্ম্ম সংস্কার। কিন্তু এই অনাদি-সঞ্চিত-কর্ম্ম-সংস্কার যাঁহার উপর দাঁড়াইয়া, যাঁহার বলে

বলীয়ান হইয়া বাহিরে ছুটিতেছে তিনি হইলেন চৈতন্য। কর্ম্মরাশির আধার এই মন কে, বা প্রাণকে এক দেখান, শক্তিকে শিবোন্মুখী করা ইহাই মানুষের নূতন কর্ম্ম। এই পুরাতন কর্ম্মের সঙ্গে নূতন কর্ম্মের যে সংগ্রাম তাহাকেই বলে জীবন সংগ্রাম। এই সংগ্রামে নূতন কর্ম্মকে যিনি যত প্রবল করিতে পারেন তিনিই ততই উন্নতি লাভ করেন।

বহুর উপাসনা কর ক্ষতি নাই কিন্তু বহুকে সেই একই বলিয়াই উপাসনা কর ঠিক হইল আর এক হইতে পৃথক দেখিলে উপাসনা প্রাণহীন হইয়া গেল।

এই এক যিনি তিনিই সর্ব্বব্যাপী চেতন; তিনিই আত্মা। ইষ্টবল, বহু দেব-দেবী বল—সবাই সেই একই। যদি নামের সাধনা কর তবে জানিও নাম সেই একেরই নাম, নাম সেই আত্মারই নাম। ধরা দিবার জন্য নামই ইষ্ট মূর্ত্তি। যখন স্মরণ করিতে পারিবে, এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই সেই একেরই নাম রূপ—যখন ইহা সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করিবে তখন জানিবে ভারতবাসী, ভারতবাসীই আছেন নতুবা ভারতে জন্মিয়াও ভারতবাসী ভারতবাসী নহে।

সর্ব্বত্র এককে দেখার সাধনা যখন সম্পূর্ণরূপে ভারত হইতে বিতাড়িত হইবে তখন জানিও ভারত মরিয়াছে। ভারতের আচার, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের কর্ম্ম, ভারতের উপাসনা, ভারতের জ্ঞান, ভারতের শাস্ত্র, ভারতের ঋষি—এই সমস্ত ফেলিয়া দিয়া ভারতবাসী থাকা যায় না। সকল দেশেই দুই দশজন ভাল লোক থাকিতে পারেন কিন্তু আপামর সাধারণের জন্য ভারতের যে ব্যবস্থা তাহা কুত্রাপি নাই। জগতের সকল জাতির ধর্ম্মের সঙ্গে, কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানের সঙ্গে ভারতের কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান মিলাইয়া দেখ সকলের উপরে দেখিবে ভারতের ধর্ম্ম বা বেদের ধর্ম্ম।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

একের সাধনা—মিলাইয়া লওয়া।

তোমার সাধন ভজন যা কিছু, তাহা সেই একেরই সাধনা। এই যে জল লইয়া সাধনা—সেই একই, জল হইয়া কোথাও অদৃশ্যভাবে রহিয়াছেন, কোথাও জলময় হইয়া রহিয়াছেন, কোথাও সমস্ত জলের আধার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, কোথাও বা ক্ষুদ্র আধারে ক্ষুদ্র জলরূপে রহিয়াছেন।

জলরূপী তুমি—কোন্‌রূপী তুমি নও? প্রণবরূপীও তুমি, মন্ত্ররূপীও তুমি, গায়ত্রীরূপীও তুমি, সূর্য্যরূপীও তুমি—এক তুমিই সবরূপে রূপ মিশাইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গলরূপে বিরাজ করিতেছ।

করনা প্রার্থনা? প্রার্থনা কর আত্মারূপী তাঁহাকে—যে একই তোমার নিজের মধ্যে আত্মরূপে ধরা দিয়াছেন। প্রার্থনা কর তাঁহাকে যিনি আত্মা সাজিয়াও যখন ধরিতে পারিলে না দেখিলেন, যখন তাঁহাকে ক্ষমাসার, দয়ার আধার, প্রেমময়, আপনার হতেও আপনার বলিয়া ধরিতে পারিলে না বুঝিলেন, তখন করুণা করিয়া, ইষ্টমূর্ত্তি ধরিয়া, শতভাবে প্রেমের পরিচয়,দিয়া ধরা দিলেন। যিনি তোমার কর্ম্মের জন্য—তোমার কর্ম্মক্ষয় জন্য তোমাকে সংসারে আনিয়া, পিতা রূপে, মাতা রূপে, আচার্য্যরূপে, অতিথিরূপে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে কতই প্রেমের পরিচয় দিলেন—তথাপি তুমি তাঁহাকে ভজিতে পারিলে না বলিয়া গুরুরূপ, মন্ত্ররূপে, ইষ্টরূপে দীক্ষার ভিতর দিয়া আবার আসিয়া উদয় হইলেন—করনা প্রার্থনা এই সর্ব্বময়ের নিকটে? আকাশ, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, অগ্নি, জল, পশুপক্ষী —সবার আবরণটি ঘুচাইয়া দেখ সত্য সত্য অনুভব করিতে না পার—সৎসঙ্গে, শাস্ত্র সঙ্গে, গুরু সঙ্গে শুনিয়া বিশ্বাস কর—করিয়া তোমার সকল দুঃখ, সকল পীড়া, সকল অসুবিধা—আত্মার দিকে চাহিয়া, আত্মারূপী—সেই আবরণ ঢাকা যাহা যাহা দেখিতেছ তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে অভ্যাস কর— আহা! "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—এই সর্ব্বকর্ম্মার্পণে তুমি মহাভয় হইতে, এই ঘোর সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবেই। ইহাই ঋষিদিগের প্রচারিত বৈদিক ধর্ম্ম। কোন বস্তু এখানে—যিনি দেখিতে জানেন—যিনি শাস্ত্র,গুরু, সৎসঙ্গে শুনিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন তিনিই বলিবেন—কোন বস্তুই এখানে জড় নহে, কাহারও কাছে প্রার্থনা নিরর্থক হয় না—সকলের মধ্যে

যিনি—সকল প্রার্থনাই সেইখানে পৌঁছে—বল তবে তোমার এত পীড়াই বা কেন—এত অসহিষ্ণুতাই বা কেন—এত অহং বোধই বা কেন? তোমার কর্ম্ম-ক্ষয় করার জন্য সেই কৌশল করিয়া তোমাকে কোলে লইবার উপায় করিয়া দিতেছে—অসৎ কর্ম্ম করিয়াছ তুমি—ভোগ না করিলে কর্ম্মক্ষয় হয় না বলিয়া সবই সে আনিয়া দিতেছে—তুমি একটু ধৈর্য্যধর, ধরিয়া তার কার্য্য বুঝিয়া নিজের দুষ্কর্ম্ম স্মরিয়া, সব সহ্য করিতে অভ্যাস কর—যাহা অমঙ্গল ভাবিতেছ তাহাই যে মঙ্গল তাহা তুমি অনুভব করিয়া সুস্থ হইয়া সব সহ্য করিতে পারিবে। যে তাহাকে স্মরিয়া সব সহ্য করে সে প্রহ্লাদের মত তারই হইয়া চিরদিন থাকে। তার কি আর কোন ভয় থাকে? করনা এই প্রার্থনা, এই অভ্যাস।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।
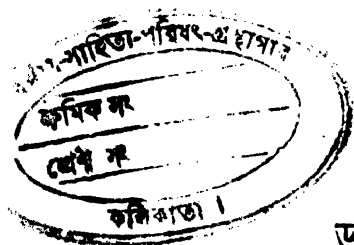
ডাকের সাড়া।

মানুষ ত তোমায় ডাকে। তাদের অনেক অভাব তাই ডাকে। তারা বড় অপূর্ণ, তাই পূর্ণ হইবার জন্য ডাকে। কিন্তু তুমি মানুষকে ডাক কি? তোমার ত কোন কিছুই দরকার নাই, কোন কিছু অপাওয়া নাই তবে তুমি কিসের জন্য ডাকিবে? পূর্ণ ত হইয়াই আছ তবে ডাকিবে আবার কেন? সত্যই। তুমি বলিয়াছ—

> সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
> যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯

আমি সকলের কাছেই সমান—(ভক্তকে ভালবাসি অভক্তকে বাসিনা এমন নয়) আমার শত্রুও নাই—মিত্রও নাই—প্রিয়ও নাই, অপ্রিয়ও নাই। কিন্তু যে আমাকে চায় আর আমার জন্য আমার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করে, এক কথায়—আমার জন্য প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হয়, এমন যে

আমার ভক্ত—এইরূপ ভক্তের ভজনায় আমি থাকি কিরূপে? আমি সেইরূপ ভক্তকে হৃদয়ে ধরি আবার তাদের হৃদয়েও ধরা দিয়া থাকি। তাদের ভক্তিতে তাদের হৃদয়ে যাই, তাহাদিগকেও হৃদয়ে ধরি। আমি ত কিছুই চাই না সত্য কিন্তু যে আমাকে অত্যন্ত চাহিয়া চাহিয়া আমার মধ্যে তার ইচ্ছা জাগায়—তার ডাকে আমিও তাকে চাই—বড় বেশী করিয়া চাই।

তবেই হইল শুধু মানুষ তোমাকে ডাকে—ইহাই নয় তুমিও মানুষকে ডাক। ভক্ত ত তোমাকে চায় কিন্তু তুমিও ভক্তকে চাও। তোমার কিছুই দরকার নাই—তবুও তোমার স্বরূপ একটুকু চাপা দিয়া তুমি দেখাও, তোমারও দরকার আছে, তুমিও চাও, সেইজন্য তুমি ডাক। যদি তাহা না হইত তবে ব্রজে বাঁশি বাজাইয়া কাহাদিগকে ডাকিতে? কে আসিলে বড় আনন্দে রাসলীলা করিয়াছিলে? আনন্দময় তুমি—ভিতরে পূর্ণতাটি চাপা দিয়া তুমি ব্যাকুল হও—তোমার ভক্তের জন্য, ভক্ত তোমাকে বড় সুখ দেয়। ভক্ত নিজের সুখ চায় না—এটা কাম কিন্তু কৃষ্ণকে সুখ দেওয়াই যে প্রেম সে তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে। অনুরাগ যেখানে সেখানে আত্মসুখ বিসর্জ্জন। সে যে আমায় পাইলে বড় সুখী হয়, আমায় পবিত্র দেখিলে তার বড় সুখ—তাই অনুরাগী সাধন ভজন করিয়া পবিত্র হয়, তাই সাধন ভজন করিয়া নিজের সুখ বিসর্জ্জন দেয়, সকল কষ্ট, সকল যাতনা, সকল অসুবিধা, প্রাণপণে দূর করিয়া দিয়া তাহাকে সুখ দিবার জন্য পবিত্র হয়। যখন সাধন ভজন করিয়া পবিত্র হয় তখন দেখে তাহার প্রিয় বড় ব্যাকুল হইয়া তাহাকেই ডাকিতেছে।

মানুষ একান্তেও থাকে আবার লোকসঙ্গেও থাকে। একান্তেও কি তোমার ডাকের সাড়া পায়? আবার লোকসঙ্গেও কি পায়? পায় বৈ কি?

পূর্ব্বে বলিলাম যে যত পবিত্র সে তত ডাকের সাড়া অনুভব করে। পবিত্রতার তারতম্য অনুসারে একনিষ্ঠার, একাগ্রতার, তারতম্য ঘটে, তাহাতে ডাকের সাড়ারও তারতম্য ঘটে। ঐ যে গাছের ডালে ঘুঘু পাখী কাহাকে ডাকিতেছে বা কাহাকে শুনাইতে ডাকিতেছে—ঐ বৃক্ষে আরও কত পাখী ত শব্দ করিতেছে, তুমি মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর, দেখিবে বহুদূরের বৃক্ষশাখে বসিয়া আর একজন ঘুঘু পাখীর ডাকের সাড়া দিতেছে। যাহারা একাগ্র হইতে পারে না তাহারা অপর পাখীর কোলাহলে ডাক শুনিতে পায় না। যাঁহারা অতি পবিত্র হইয়াছেন তাঁহারা ডাকের সাড়া শুনিতে শুনিতে এত

তন্ময় হইয়া যান, যে আনন্দে ডুবিয়া গিয়া তাঁহার কোলেই ঘুমাইয়া পড়েন; তখন আর বাহিরের জগৎ বলিয়া তাঁহাদের কাছে কিছুই থাকে না। যেমন মানুষ নিদ্রা যাইবার সময় সব অঙ্গকে স্থির রাখে, রাখিয়া কখন যে কোন্ রাজ্যে গিয়া তাঁহাতে ডুবিয়া যায় তাহা ধরিতেও পারে না—এ অবস্থা কিন্তু সকল মানুষের জন্য সেই, প্রকৃতি সাজিয়া, করিয়া দেয়, মানুষকে আর কোন চেষ্টা করিতে হয় না—মানুষের এই অবস্থা মানুষের অজ্ঞাতসারেই হয়—মানুষ এখানে অজ্ঞানেই থাকে কিন্তু মানুষ যখন সাধনা দ্বারা, এই অবস্থা লাভ করিতে পারে, তখন সে হাসিতে হাসিতে আপনার রমণীয় দর্শনের কোলে যাইয়া জুড়াইয়া যায়—চিরতরে দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ করে। এই সাধনার সঙ্কেত মাত্র এখানে করা হইল। ঐ যে পূজার সময় পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, পৃথ্বি—লোকধাত্রি—জননি! তুমি যেমন স্থিরা, আমার সর্ব্ব অঙ্গকে তুমি সেইরূপ স্থির করিয়া রাখ—যেন কোন অঙ্গের চলন না থাকে; নিদ্রার সময়ে সর্ব্বশরীরকে স্থির রাখার মত, জাগ্রতে স্থির আসনে, সর্ব্ব অঙ্গকে স্থির রাখিবার প্রার্থনা পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা ইত্যাদি। এই করিয়া হৃদয়ের মধ্যে যিনি ইষ্টরূপে আছেন—শ্রীমহাবীর যাহাকে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সকলের সমক্ষে—তাঁহার সমক্ষেও দেখাইয়াছিলেন—সেইরূপ যাঁহার যাহা ইষ্ট—যিনি সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হইয়াও আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তিতে সকলের হৃদয়ে আছেন—তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে—ধ্যান করিতে করিতে জপ কর, করিয়া ঘুমাইয়া পড়িবার সঙ্কেত ইহা। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধকের ইহা হইবেই। যাহাদের ইহা না হয়—একান্ত সাধনায় তাঁহারা সাড়া পান নাদের শব্দে। স্থির হইয়া গেলে নাদ বা তাঁহার ডাকের সাড়া পাওয়া যায়। আবার যখন বাহিরের কোলাহল কাণের ভিতরে প্রবেশ করে তখন আর সে ডাক শুনা যায় না। বাহিরের ডাক শুন বলিয়াই শুনা যায় না। বাহিরের সব শুনা, সব দেখা, বাদ কর, দেখিবে ভিতরে সে সর্ব্বদা ডাকিতেছে। ইষ্ট হইয়া অবতার হইয়া সে আসে এই জন্য। অবতারের বিশেষত্বইত ইহা। অবতার হইয়া যখন আসেন তখন আমাতে তাঁহার প্রয়োজন হয় পূর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছে। নাদানুসন্ধানও যাহাদের হয় না তাঁহারাও ডাকিতে ডাকিতে একটু স্থির হইতে পারিলে আকাশে নক্ষত্র উঠার মত কত ভাব উঠে আবার কত লীলারও স্ফুরণ হয় দেখিতে পান।

এখন বাহিরে একবার দেখ দেখি সে কত ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছে।

যে হৃদয় শুদ্ধ করিতে পারে নাই—যাহার হৃদয় রাগ দ্বেষে ভরা, যাহার হৃদয় অভিমানে ভরা—যে নিজত্ব ছাড়ে না সে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও বুঝিতে পারে না—সে কেমন করিয়া আত্মগোপন করিয়া সকলের সঙ্গে মিশিয়া তাহাকেই ডাকিতেছে।

নিত্যকর্ম্ম করিয়া একটু পবিত্র হইয়া ঐ বাগানে চল দেখিবে পাখীগুলি কি আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া, তোমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া, অপূর্ব্ব শব্দ করিতেছে, অপূর্ব্বভাবে গ্রীবা নাড়িয়া নড়িয়া কত ডাকিতেছে—পাখী নিজেও বুঝেনা তাহার ভিতরে আর কে, আর কাহাকে ডাকিতেছে। যিনি একটু পবিত্র হইয়াছেন তিনি এইখানে পাইতেছেন তাঁহারই ডাকের সাড়া। ঐ যে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে আর পুষ্পবৃক্ষ শির দোলাইয়া কি যেন কি করিতেছে—যাহার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে তিনিই দেখিতেছেন—সাধককে পবিত্র দেখিয়া, সে, আনন্দ যেন চাপা দিতে পারিতেছে না, সে যেন ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতেছে; পুষ্পবৃক্ষ তাহা জানেনা লোকে কল্পনা করিয়া ভাব আনিয়া বলে"পেয়ে বুঝি কাহার কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে"কিন্তু এ কল্পনা অপেক্ষা সাধকের দর্শনে তোমার হাসির দর্শন বড় মধুর। আহা! শুদ্ধান্তঃ-করণ সাধক সর্ব্বত্র দেখেন—সকলের মধ্যে সেই প্রবেশ করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। এ সাধক সকলের কাছে প্রার্থনা করে—অথবা সকলের মধ্যে তাহাকে স্মরিয়া প্রার্থনা করে—আমায় তুমি লইয়া চল আমি আপনি আপনাকে এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারি না। এইভাবে ডাকের সাড়া পাইয়া—সকলের মধ্যেই সে ইহা দেখিয়া বাহিরের আবরণ—বাহিরের ভ্রুকুটি—বাহিরের উপদ্রব—সম্পূর্ণ মায়িক জানিয়া অবজ্ঞা করিয়া—তাঁহাকে দেখিয়া—তাঁহার কাছে যিনি সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে অভ্যাস করেন, বলনা তাঁহার কি আর কোন দুঃখ থাকে? তবে একবারও তাঁহাকে স্মরণ করাটী ভুল হইবে না—তখন ক্রমে ক্রমে স্ফুরণ হইবে এক পরিপূর্ণ চৈতন্যই সর্ব্বত্র ভাসিতেছেন, বাহিরের আবরণটা মায়ার আবরণ, ভ্রমের আচ্ছাদন মাত্র। ইতি

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

স্থায়ী হইবে ত ?

এই যে যা প্রকাশ করিতেছ, এই যে যাহা চিত্তের মধ্যে ভাসাইতেছ, এই যে চিত্তকে যে আকারে আকারিত করিতেছ, তাহা স্থায়ী হইবে ত ?

কি ?

এতকাল ধরিয়া পটের ছবিতেই তোমাকে ভজিতাম। কতদিন সন্দেহ করিয়াছি, কত দিন রস পাই না বলিয়া দুঃখ করিয়াছি, তথাপি তোমার ছবি ধরিয়াই তোমার স্বরূপ, তোমার বিশ্বরূপ, তোমার আত্মারূপ, তোমার অবতার রূপ, তোমার গুণ, তোমার লীলা, ছবি ধরিয়াই ভাবনা করিয়াছি। কিন্তু আজ কি দেখাইলে ? দেখিলাম আমি যাহা দেখি তাহাই আমার হৃদয়স্থিত তোমার স্বগণপরিবৃত মূর্ত্তি, হৃদয় হইতে বাহির হইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া, যাহা দেখি তাহা আবৃত করিয়াই দাঁড়ায়। সূর্য্যে দেখি তুমি, চন্দ্রে, তারকায়, গঙ্গায়, আকাশে, পুষ্পে, লতায়, পাতায়, মানুষে, পশুতে, পক্ষীতে, বায়ুতে, মেঘে, জলে স্থলে সর্ব্বত্র এক তুমিই আছ। বলিতেছি ইহা স্থায়ী হইবে ত ? আর কোন কিছু না দেখিয়া, আমি,সর্ব্ব বস্তুই যে তুমি, তাহা দেখিবত ? এক অখণ্ড সৎচিৎ আনন্দই তুমি, তুমি ভিন্ন অন্য যাহা কিছু, সবই মিথ্যা। আহা ! মূর্ত্তি যাহা এতকাল ধরিয়া ভাবিতাম তাহা তুমি সচ্চিদানন্দ, তুমিই করুণা করিয়া মানুষের জন্য এই মূর্ত্তিতে লীলা করিয়া থাক, এখন আবার ভিতর হইতে তুমি উঠিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া সকলকেই আচ্ছাদন কর, তুমি ভিন্ন আমাকে কিছুই দেখিতে দাও না। আহা ! সবই যে তুমি। সবটা মায়িক হইয়া গেলেই হৃদিস্থ আত্মাই—মূর্ত্তি ধরিয়া ইষ্ট মূর্ত্তিতে তুমিই—সর্ব্বত্র দাঁড়াও। বলিতেছি ইহা স্থায়ী হইবে ত ?

কেন স্থায়ী হইবে না ? ইহাই ত সত্য। একবার যাহা দেখিলে তাহাই নিরন্তর স্মরণ কর, নিরন্তর ভাবনা কর, ইহাই ত সাধনা। বিনা সাধনায় সিদ্ধিতে স্থিতি কোথায় তাই বল ? যাহা করিতেছ তাহাই করিয়া চল, তোমার কার্য্য তুমি কর—আর সমস্ত আমিই করিয়া দিব। আজ যেমন দেখাইলাম সেইরূপ সর্ব্বদাই দেখিবে। অন্য সব মিথ্যা, আমি মাত্র সত্য—এই সত্য মিথ্যার বিচার সর্ব্বদা রাখ তোমাকে আমি সর্ব্বদা কাছে রাখিব।

এখনও না হয় পুরুষার্থ প্রয়োগের শক্তি আছে। কিন্তু সেই সময়ে—যখন

আর পুরুষার্থের সামর্থ্য থাকিবেনা, কোন কিছুই ভাবিতে পারিবনা—যখন সব অবশ হইয়া যাইবে তখন কি হইবে?

আমি তোমার হইয়া সব করিয়া দিব। কতবারই বলিয়াছি "মরণে মৎ স্মৃতিং লভেৎ"। মরণ মূর্চ্ছায় আমি তোমায় ত্যাগ করিবনা। আমি তোমাতে আমার স্মৃতি জাগাইয়া তোমার হাতে ধরিয়া দুস্তর ভব সংসার পার করিয়া দিব। যাহারা বৈরাগ্যপূত হৃদয়ে আমার উপাসনা করে তাহাদের জন্যই বলিয়াছি "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ" ইতি—

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

সাগরতীরে অন্ধ-বালক।

ক্ষেপার ঝুলি

ক্ষেপা। একজন অন্ধ যদি মধ্যাহ্নকালে সাগর তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করে "কৈ সূর্য্য, কোথায় সমুদ্র, সমুদ্র শব্দ মিথ্যা, যাহারা সমুদ্র ও সূর্য্য আছে বলে তাহারা মিথ্যাবাদী" তুমি কি তাহার কথা শুনিয়া স্বীকার করিবে সূর্য্য এবং সমুদ্র নাই।

চেলা। আজ্ঞে না।

ক্ষেপা। তবে শিক্ষিতাভিমানী অন্ধ যদি বলে ব্রাহ্মণ নাই, জাতিভেদ কিছু নয়? সে কথার মূল্য কোথায়, ওহে বাপু ওটা অন্ধ শুধু অন্ধ নয় আবার উন্মাদ নচেৎ বেদ পুরাণ সংহিতাদি শাস্ত্রে ঋষিরূপে শ্রীভগবান্ যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগেই আপনার প্রভাব দেখাইয়া আসিতেছে তাহাকে কিছু নয় বলিতে স্পর্দ্ধা করে। যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে ধারণ করত আপনাকে ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া কৃতার্থ হইত আজ তাহাদের বংশধর গোচারণ ও হলকর্ষণ ত্যাগ করিয়া চিৎকার করিতেছে ব্রাহ্মণ নাই জাতিভেদ কিছু নয় বাহবা কলি! পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা ইহারা বুদ্ধিমান হইয়া

সংসারে আগুন জ্বালিয়াছে; এ দাবানলে নিজেরাই দগ্ধ হইবে রাম রাম সীতারাম। ইহারই নাম কলি কৌতুক। অনেক দুর্ভাগ্য আছে সেইজন্য এই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং বেদ ব্রাহ্মণ শ্রীভগবান ও ঋষিগণের নিন্দা শ্রবণ করিতে হইতেছে।

চেলা। দেখুন ঠাকুর সেদিন এক প্রকাশ্য সভায় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ যোগী ত্যাগীর সম্মুখে এক হীনবর্ণকে বলিতে শুনিয়াছি—"ব্রাহ্মণ এখন নাই সব চণ্ডাল" "বর্ণাশ্রম কিছু নয়" "তোমরা কেহ কিছুই বোঝনা" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্ষেপা। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ সজ্জন পূর্ণ সভাস্থ সকলকে অবুদ্ধিমান্ বলিয়া আপনার মুখে আপনাকে বুদ্ধিমান ঘোষণা করে কে সে আত্মহত্যাকারী উন্মাদ?

বিদ্যা বিনয় দান করে, কে সে বিনয়বিহীন অবিদ্বান্?

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে মিথ্যা ও ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল বলিতে স্পর্দ্ধা করে, কে সে ভগবদ্দ্বেষী ধৃষ্ট?

চেলা। অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে যে জাতি সাবালক হয়না সেই জাতীয় একজন নাবালক।

ক্ষেপা। যখন সেই ধৃষ্ট "ব্রাহ্মণ নাই এখন সব চণ্ডাল" একথা বলিল তখন কোনও মহাত্মা কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে কিছু বলিলেন না?

চেলা। আজ্ঞে না।

ক্ষেপা। তুমিও নীরবে চলিয়া আসিয়াছ?

চেলা। আজ্ঞে হাঁ।

ক্ষেপা। ভাল কর নাই, সেই ধৃষ্টকে কিছু বলা উচিৎ ছিল তাহাতে তাহার বেদ ব্রাহ্মণ নিন্দারূপ পাপের কিছু ক্ষয় হইত সে নিতান্ত কৃপাপাত্র। তোমায় বার বার নিষেধ করিয়াছি দুর্জ্জন সঙ্গ করিওনা। দেবব্রাহ্মণ শাস্ত্রের যে নিন্দা শ্রবণ করে সেও পাপভাগী হয়।

চেলা। আর যে নিন্দা করে?

ক্ষেপা। তার কিরূপ শাস্তি হয় তাহা তুমিই দেখিতে পাইবে। সে ধৃষ্ট, বেদব্রাহ্মণের অবমাননা রূপ যে দুষ্কর্ম্ম-বীজ বপন করিল তাহার ফল সে ইহজন্মেই পাইবে। এবার যদি কোনস্থানে বেদ ও ব্রাহ্মণের নিন্দা শ্রবণ কর তাহা হইলে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিও অদ্ধ বালক রসনা সংযত

কর্ এখনও ব্রাহ্মণ আছেন এখনও সতী আছেন নচেৎ সংসার থাকিত না। সংসারের স্থিতিই ব্রাহ্মণ স্থিতির প্রমাণ। তুই অন্ধ বলিয়া দেখিতে পাইতেছিস্ না। চতুর্দ্দশ ভুবনের দ্বারা গঠিত এতবড় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তুই একমাত্র বুদ্ধিমান নহিস্ এখনও অনেক ব্রাহ্মণ অনেক বুদ্ধিমান আছেন যাঁহাদের পদরেণু স্পর্শে তুইত তুই তোর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে ; তোর গৃহকোণ আসমুদ্র হিমাচল নয়, তুই কি দেখেছিস্ কি শুনেছিস্ কি জানিস্ বাতুল, চুপ করে থাক্। পার যদি তাহার কেশ মুষ্টি ধারণ করিয়া কোন ব্রাহ্মণের পাদমূলে আনিয়া ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণের পাদোদক দ্বারা তাহার চক্ষু দুইটা ধৌত করিয়া দিও তাহা হইলে সে অন্ধ বালক চক্ষুষ্মান হইয়া ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইবে আর সে যে এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে কত ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। রাম রাম সীতারাম।

চেলা। ঠাকুর আপনি বসিয়া বসিয়া রামনাম করেন কোন সংবাদ রাখেন না দিন দিন বেদব্রাহ্মণদ্বেষী দলই প্রবল হইতেছে ; সব যায়।

ক্ষেপা। আরে পাগল এ সনাতন ধর্ম্ম কি খেলার জিনিস, সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই তবে এ কলিযুগ, এ যুগে অধর্ম্ম প্রবল হইবে এ কথা ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, হীনবর্ণ গণ ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিবে ইহাও শাস্ত্রে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ভয় লোভগ্রস্ত হইবে ইহাও শাস্ত্র বলিয়াছেন। তবে ইহা খুব সত্য এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন এখনও সতী আছেন।

থাকিতে পারে ব্রাহ্মণের দোষ তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীভগবান্ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন ইহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের শাপে শ্রীভগবানকে নরদেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের গতিরোধ করায় বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয়কে ঘৃণিত দেহ ধারণ করিয়া বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের অভিশাপে লক্ষ্মীকে রাক্ষসীগর্ভে যাইতে হইয়াছিল ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের অবমাননায় সাগর বংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল ইহাঁরাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণকে পরিহাস করিয়া যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ইহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ সমুদ্রপান করিয়াছিলেন ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ। ঐ বিন্ধ্যাগিরি এখনও যে ব্রাহ্মণের পদে নতশির হইয়া আছে ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন ইঁহারাই সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের শাপে নহুষকে সর্পদেহ ধারণ করিতেহইয়াছিল ইহাঁরাও সেই ব্রাহ্মণ।

রাজানৃগ যে ব্রাহ্মণের অভিশাপে কৃকলাস হইয়াছেলন ইহাঁরাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ ভাগীরথীকে পান করিয়াছিলেন ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যে ব্রাহ্মণ একমাত্র দণ্ড গ্রহণ করত বিশ্বমিত্রের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন; যে ব্রাহ্মণ পর হিতার্থে নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ বেদবিভাগ করিয়াছিলেন; এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ মহাভারত উপপুরাণাদি শাস্ত্র সকল জগৎকে দান করিয়াছিলেন এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

যেব্রাহ্মণ সংহিতা তন্ত্র এবং বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় মীমাংসা বৈশেষিকাদি শাস্ত্র সকল জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ বিজন অরণ্যে ব্রহ্মধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিতেন ইহাঁরাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ সম্পদকে উপেক্ষা করিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য সাধন লব্ধ সত্য সকল জগতকে দান করিতেন ইহাঁরাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া চারিধামে চারিমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন ইহাঁরাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ কলিপীড়িত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নবযৌবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া জনে জনে হরিনাম দান করিয়া ছিলেন এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

এখনও এই কলিযুগে যে ব্রাহ্মণ লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপহাস পদদলিত করিয়া আজন্ম জীবের কল্যাণের জন্য শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ চিরদিনই ব্রাহ্মণ আজ তপস্যাহীন বলিয়া শক্তিহীন মত দেখাইতেছে। যেদিন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পথ ধরিয়া আবার তপস্যা করিবেন আবার স্বাধ্যায়, সন্ধ্যাও গায়ত্রী জপকে জীবনের ব্রত করিয়া ফেলিবেন সেই দিন এ অবস্থা আর থাকিবেনা।

অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আছেন ব্রাহ্মণ, ছিলেন ব্রাহ্মণ, থাকিবেন ব্রাহ্মণ, রাম রাম।

এই সনাতন ধর্ম্মের উপর দিয়া কত প্লাবন্ গিয়াছে একহাতে কোরাণ একহাতে কৃপাণ লইয়া মুসলমান আক্রমণ করিয়াছে তথাপি মূলচ্ছেদ করিতে পারে নাই কেহ কখনও পারিবেনা।

যুগমাহাত্ম্যে সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ লোক অল্প হইলেও, সনাতনধর্ম্ম ধ্বংশ করিবার শক্তি কাহারও নাই, সহস্র সহস্র মেষ যদি দলবদ্ধ হয় তাহা হইলে কি সিংহকে সংহার করিতে পারে? না তাহা পারে না।

সহস্র সহস্র বিধর্ম্মী যদি প্রাণপণে চেষ্টাকরে তাহা হইলেও ইহার কিছু করিতে পরিবে না কখনই পারিবে না। এ সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক কে জান? সেই চক্রধারী ঠাকুরটী। তাঁহার সুদর্শন চক্র এই সনাতন ধর্ম্মকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। ঐ শুন তাঁর অভয় বাণী।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ওরে তোর এত সহায় তথাপি তোর ভয়

মাভৈঃ মাভৈঃ।

তুই যে তাঁহার ঐ চাহিয়া দেখ উলঙ্গ খর কৃপাণ করে ধারণ করত কে আসিতেছে ঐ শ্রবণ কর অপূর্ব্ব সঙ্গীত।

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।
প্রণাম কর উচ্চকণ্ঠে বল জয় জগদীশ হরে।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পুরাণতীর্থ।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এদিকে সেবার দেশে খুব দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ঐ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর অবস্থা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় তাঁহারা একদিন শুনিতে পাইলেন যে এক রাজা অতীব দয়ালু, তাঁহার অন্নছত্রে দিবারাত্র কত সাধুসজ্জন ব্যক্তি হইতে দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমাদর ও আহার পাইতেছে। উঁহারা অন্নাভাবে একদিন আসিয়া ঐ রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজার লোকজন উঁহাদিগকে দেখিয়া খুব আদর যত্ন করিল ও রাজার নিকট খবর পাঠাইয়া তাঁহাদের রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা উঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পিতামাতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদের চরণে প্রণত হইলেন। রাজাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ও তাঁহার বহুপ্রকার আদর অভ্যর্থনা, সেবা যত্নাদিদর্শনে তাঁহারা যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। অতঃপর রাজা নিজকে তাঁহাদেরই সন্তান বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং সমস্ত ঘটনা তাঁহাদের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন;—এবং ইহাও বলিলেন যে তাঁহারা তাহাকে জঙ্গলে পরিত্যাগ করা হেতুই আজ তাঁহার এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সকল কথা শ্রবণ করিয়া উভয়ে মহোল্লাসে স্বীয় পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

সাধুবাবার এই গল্পের মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ যে, 'আমাদের চিত্তকেও ঐরূপ সম্পূর্ণ নির্লোভ এবং অন্তঃকরণকে সর্ব্ববিধ কামনারহিত করিয়া সতত সর্ব্বাবস্থায়

ব্যাকুল অন্তঃকরণে ভগবন্নাম লওয়া ও অনন্যচিত্তে স্মরণ মনন করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই আশ্রয় লইতে হইবে।' এইরূপে সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে, শরণাগত রক্ষক নিশ্চয়ই তাহার ভার গ্রহণ না করিয়া পারেন না। নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি—তিনি যাহার উপর প্রসন্ন হন, তাহার অবশ্যই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দৈন্যের নিবৃত্তি ও অন্তঃকরণের সকল অভাব মোচন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণদম্পতীর অন্তর বৃথা দুশ্চিন্তায় ব্যথিত হইয়াছিল। কারণ—যাঁহার পরম শিবময় হস্ত স্থাবর জঙ্গম পরিব্যাপ্ত, যাঁহার শিবময়ী ইচ্ছায় নিখিলবিশ্ব নিয়মিত হইতেছে,—তাঁহার কৃপা ও মঙ্গলে সন্দিহান হইয়া অযথা চিন্তায় কাতর হওয়া নিতান্ত মূর্খতার পরিচায়ক। তিনিই সর্ব্ব প্রাণীর একমাত্র আশ্রয়দাতা ও পরিপালক। তাঁহাকে, যে সকল ভুলিয়া স্মরণ করিতে পারে,—তাহার ইহকাল ও পরকালে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলই হইয়া থাকে এবং তাহার কিছুরই অভাব হয় না। সকল অভাবই একমাত্র সেই কল্পতরুর কৃপায় পূর্ণ হইয়া থাকে।

'আমাদের এক সঙ্গিনীর হরিনাম করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না'—এই কথা সাধুবাবাকে বলায় তিনি যাহা বলিলেন ও যেরূপভাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে এইরূপ বুঝাইল যে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাখীদের যেমন আকাশে উড়িতে উড়িতে যখন পাখা লাগিয়া যায়, তখন বিশ্রামের জন্য এক স্থানে বসিবার ইচ্ছা হয়—তেমনি মানবও সংসারক্ষেত্রে অনবরত যুদ্ধ করিতে করিতে যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর তাহার যুদ্ধের শক্তি থাকে না। তখন বিশ্রামের জন্য সেই সন্তাপহারী শান্তিময়ের কথা স্মরণ হয় ও চিত্ত স্বভাবতঃ সেই সর্ব্বদুঃখহারীর রাতুল চরণে আশ্রয়গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের প্রাণ চিরবিশ্রামের জন্য লালায়িত না হয়, তাহার সুপ্তবোধ জাগ্রত হইয়া না উঠে—ততক্ষণই সংসারসুখ উত্তম বোধ হয় ও উহাতেই বুঝি তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ হইবে—এই মনে করিয়া তাহাতেই জীব মজিয়া ডুবিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিতে পারে।

সাধুবাবার সহিত সেইদিন আরও অনেক কথা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—'জীবের বাসনা কামনার জন্যই পুনঃ পুনঃ এসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই কামনা বাসনার উচ্ছেদ হইলেই আর এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না। এরূপ অশেষ দুঃখকষ্টও ভোগ করিতে হইবে না। অবিরত মনে মনে বিচার দ্বারা জাগতিক সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগই যে অনিত্য, অতি

ক্ষণস্থায়ী, উহা যতই জীবের উপলব্ধি হইবে ততই তাহার সাংসারিক সুখভোগে আসক্তি দূর হইবে এবং চিত্ত ততই বিষয়াদির আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মার দিকে ধাবিত হইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন "কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা।" অর্থাৎ তিনি তো নিয়তই তাঁহার দিকে জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কেবল জীবের অন্যদিকে আসক্তি থাকায় সে আকর্ষণ অনুভব করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। বহির্জগত হইতে মনকে ঘুরাইয়া অন্তর্মুখী করিতে পারিলেই তখন তাঁহার কৃপা অনুভব হইবে। জীব বিষয়ানন্দরূপ তৃষ্ণার মরীচিকায় এতই মুগ্ধ যে কিছুতেই তাহার মনকে ঘুরাইয়া অন্তর্মুখী করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু বাসনা চালিত হইয়া অবিরত আঘাত পাইতে পাইতে সে বুঝিতে পারে যে বিষয়ানন্দ বাস্তবিকই মরীচিকা সদৃশ ও উহার অনুসরণে পরিণামে অশেষ দুঃখ কষ্টই আনয়ন করিয়া থাকে। আবার এদিকে উহা যেমন অতি স্বল্পকালস্থায়ী তেমনি উহাতে মানবের তৃষ্ণা পরিপূরণ হওয়া দুরস্থান (?) ক্রমে আরও তৃষ্ণা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। মানব যখন এই কথাটী বেশ দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় যে বিষয় তৃষ্ণা ও আমিত্বই এ সংসারে যাবতীয় দুঃখের এবং পৃথিবীতে পুনরাগমনের মূল কারণ, তখন সে উহা ত্যাগ পূর্ব্বক এই রূপ রস আদিতে ধাবিত বহির্মুখ চিত্তকে ঘুরাইয়া পরমাত্মার দিকে অর্থাৎ অন্তর্মুখী করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হয়। কোন আঘাতে কিম্বা কোন কারণে একবার সুপ্ত চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিলে তখন সে অবিরত অধ্যবসায় দ্বারা পরমাত্মায় রত হইবার নিমিত্ত সাধনে লাগিয়া যায়। তাহাতে জীবের ক্রমে ক্রমে তৃষ্ণা ও আমিত্বের যতই ক্ষয় হইতে থাকে ততই চিত্তকে আত্মধ্যানে নিযুক্ত করত তাহাতেই মগ্ন থাকিতে পারগ হয়। এইরূপে যতই চিত্ত ক্রমে ক্রমে অন্তর্মুখী হইতে থাকিবে ততই সে মহাশান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে।

সাধুবাবার উত্তর দিকের বারান্দায় একখানি চৌকীর উপর কম্বল বিছান ও কিছু কিছু গৈরিক বস্ত্রাদি দেখিয়া বাবার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কয়েক মাস হইল এইস্থানে একজন সাধু আসিয়া ইঁহার নিকট বাস করিতেছেন। পাহাড়ের উপর সাধুবাবার একখানি মাত্র থাকিবার উপযুক্ত গৃহ, রাত্রিতে একগৃহে একাধিক লোকের বাস ইঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সেইজন্য আগন্তুক সাধুটী আসিয়া পর্য্যন্ত কয়েক মাস হইল এই বারান্দাতেই রাত্রি বাস করিতেছেন। সাধুবাবার নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলাম এই সাধুটীও

বেশ উচ্চবস্থার। সম্মুখে শীতকাল আসিতেছে, এরূপ চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত বারান্দায় 'কতদিন তিনি থাকিবেন,' বিশেষতঃ শীতকালে এস্থানে বিলক্ষণ ব্যাঘ্র ভীতিও আছে, এ কথা সাধুবাবাবাকে বলায় তিনি বলিলেন, "তাহাতো আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।" এই সাধুটীর নাম জিজ্ঞাসা করায় বাবা ঐ একই উত্তর দিলেন। একত্র কয়েক মাস হইল উভয়ে বাস করিতেছেন, অথচ 'এখানে তিনি কতদিন থাকিবেন,' কিম্বা 'নামটী যে কি' তাহা পর্য্যন্ত কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নাই শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বাহিরের পরিচয় তাঁহাদের নিকট কত নিস্প্রয়োজন। ইহাদের এ সম্বন্ধে কৌতূহলও আদৌ নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের নিকট আশ্রমে গিয়া কোন সময় গৈরিক পরিহিত কোন নূতন সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া যদি শ্রীগুরুদেবের নিকট তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে তিনি বলেন, "মা! এইটী চিড়িয়াখানা, কত স্থান হইতে কত চিড়িয়া আসা যাওয়া করিয়া থাকে, কে তাহার সন্ধান লইয়া থাকে।" সে যাহা হউক আমরা ওখানে থাকিতেই আগন্তুক সাধুটী স্নান করিয়া আসিয়া বারান্দায় অপর কোণায় যে একখানি মৃগ চর্ম্ম বিস্তৃত ছিল তাহার উপর উপবেশন করিলেন। সেদিন তাঁহার নিকট হইতে কোন উপদেশ শুনিবার সুযোগ হইল না। বেলা অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সাধুবাবাদ্বয়কে প্রণাম পূর্ব্বক আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

কোন ভদ্রমহিলা।

রাজসাহী।

"কলির ধর্ম্ম"

কলির ধর্ম্ম বলিতে আজকাল লোকে সাধারণতঃ বুঝে মিথ্যা কথা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অন্যের সর্ব্বনাশ করা ইত্যাদি গর্হিত কর্ম্ম এবং দাম্ভিকতা বা হাম বড়া ভাব আর সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ উপকারকের অপকার করা এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কুৎসা রটনা করা। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই একরকম

হইয়া উঠিয়াছে কিন্তুআমার আলোচ্য বিষয় এই যে, কোন্ ধর্ম্মানুশীলনে মানুষ এই সকল দোষ-দূষিত-কলিযুগে শুদ্ধচিত্ত হইয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম সন্নিধানে অগ্রসর হইবার অধিকারী হয়? "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" হইলেও তিনি "উর্দ্ধ-লিঙ্গং" তাঁহার উর্দ্ধেস্থান সকল জাতি সর্ব্বসময়ে সর্ব্বাবস্থায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সচরাচর লোকে আমি বলিতে নিজের বক্ষঃস্থলে এবং ঈশ্বর বলিতে উচ্চে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। সংসার-বৃক্ষ উর্দ্ধমূল! সেই উর্দ্ধস্থিত ভগবান সন্নিধানে যাইতে হইলে দুইটী পক্ষের আবশ্যক! তাই "সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং" ও "দানমেকং কলৌযুগে" এ দুটী মহাবাক্যের সার সত্য ও দান দুটী বিরাট পক্ষ। ইহা ব্যতিরেকে উপরে উঠিবার উপায়ান্তর নাই। শাস্ত্রে ধর্ম্মের চারিপাদ বলে। সত্যযুগে ধর্ম্মের তপঃ শৌচং দয়া সত্যং রূপ চারিটী পাদ ছিল। এক এক যুগে এক একটি করে ভগ্ন হয়ে কলিতে শেষে একপাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা পরীক্ষিত দিগ্বিজয় কালে বৃষরূপ ধর্ম্মকে শূদ্রবেশি কলির প্রহারে ভগ্ন ত্রিপাদ দেখিয়া গাভীরূপধারিণী ধরিত্রীর কথায় জানিলেন সত্যযুগে ধর্ম্মের চারিপাদ ছিল তাহার ত্রিপাদ ভগ্ন হইয়া মাত্র ১ পাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পর প্রশ্নে অবগত হইলেন "তপঃ শৌচং দয়াসত্যং ইতি পাদাঃ কৃতেকৃতাঃ অধর্ম্মাংশৈস্ত্রয়োভগ্নাস্ময়সঙ্গমদৈস্তব।"

বিষয় বা সংশয় উপস্থিত হওয়ায় ত্রেতায় তপঃ রূপ পদ ভগ্ন হলেন, দ্বাপরে সঙ্গদোষে দ্বিতীয় পাদ ভগ্ন হলেন; কলিতে মদে বা অহংকারে তৃতীয় পাদও গেলেন। মাত্র অবশিষ্ঠ রহিলেন সত্য। রাজা উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থা না করিলে অপর পাদখানিও যেতেন যাহা হউক শুধু যে প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরাণ ভাগবতে এই কথা বলে গেছেন তাহা নহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক তন্ত্রশাস্ত্র মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে সেই কথাই বলে গেছেন। ঐ তন্ত্রে ৪র্থ উল্লাসে ৮১-৮২ শ্লোকে "কৃতে ধর্ম্ম চতুস্পাদস্ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ দ্বিপাদ দ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌযুগে। তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খঞ্জং দয়াপিচ। সত্যপাদে কৃতেলোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে। তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।" আবার প্রধান স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতায় বলে গেছেন "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ মাব্রুয়াৎ সত্যম প্রিয়ং প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" সেই সংহিতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৬ শ্লোকে "সত্য পূতাং বদেৎ বাচং" বলা হইয়াছে। পুনরায় মনু চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াছেন "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। এতাৎ

সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বণ্যো ব্রবীন্মনুঃ" এ সামাসিক ধর্ম্ম যে শুধু হিন্দুদের তাহা নহে। এ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সমস্ত জাতিরই সাধারণ ধর্ম্ম। অনেকে হয়ত মুসলমান বা খৃষ্টানের পক্ষে শৌচ শব্দ প্রযোজ্য নহে মনে করিতে পারেন কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মুসলমানদের নেমাজের পূর্ব্বে হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা আছে। খৃষ্টানদেরও তাই। cleanliness is next to godliness এ ইংরাজদের কথা। পুরাণ তন্ত্রস্মৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই সত্যকে বড় বলে গেছেন যোগশাস্ত্রেও ঐ এক কথা। ভগবান পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে "অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" বলিয়া উল্লেখ করে গিয়েছেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্য দয়ার্জবং ইত্যাদি দশবিধ "যম" বলিয়াছেন। শ্রীভগবান গীতায় "অহিংসা সত্যমক্রোধঃ" দৈবী সম্পদের মধ্যে ধরে গিয়েছেন। কি আশ্চর্য্য! সকলেরই সেই এক কথার শ্লোকের প্রারম্ভঃ! "অহিংসা সত্য" শ্লোকের আদ্যশব্দ দ্বয়! পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, যোগশাস্ত্র সর্ব্ব শাস্ত্র মতে সত্য প্রধান ধর্ম্ম। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" ইত্যাদি সাধন মার্গোপযোগী সোপান হইলেও সত্য তুল্য নহে একথা স্থির সিদ্ধান্ত। এক্ষণে দেখাযাক সত্য সম্বন্ধে শ্রুতিতে কি বলেছেন। শ্রুতিতে সত্যকে প্রধান ধর্ম্ম ছুরস্তাং সত্যকে ব্রহ্ম বলে গিয়াছেন।

মুণ্ডকে "সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততোদেবযানঃ।৩।৬ শ্বেতাশ্বতর "সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি" ১।১৪

ব্রহ্মোপনিষৎ ... ... ৩ শ্লোক।

যজুর্ব্বেদীয়া তৈত্তরীয়—সত্যংবদ সত্যান্ন প্রমদিতব্যং উপদেশ দিয়া।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যখন বললেন তখন চরমে গেলেন ষষ্ঠোঽনুবাক আরো ঐ কথাই সমর্থন করে বল্লেন "তৎসত্যমিত্যা চক্ষতে" অর্থাৎ সত্যকেই ব্রহ্মবলে। এ সত্যই ব্রহ্ম আমরা সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগে রুদ্রোপস্থানে পাই "ওঁ ঋতংসত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং "ইত্যাদি পুনরায় সপ্তব্যাহৃতিতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ এই ছয়টি লোকের উপর সত্যলোক অর্থাৎ ব্রহ্মের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন "তেজো মধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুত" শুক্লযজুর্বেদীয়া ঈশোপনিষং সত্যই যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহা স্পষ্টাক্ষরে পঞ্চদশ শ্লোকে বলেগেছেন যথা—হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।' সত্য যদি ব্রহ্ম হলেন কাজেই সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং" ব্রহ্মছাড়া কিছুই নাই—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" যখন হোলো

তখন "সত্যং পরং ধীমহি" এই মূল মন্ত্র সার করে সত্য পথে অগ্রসর হওয়াই প্রধান ধর্ম্ম। কারণ সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব। ন চ পাবন তমং কিঞ্চিৎ সত্যাদধ্যগমং ক্বচিৎ মহাভারত মোক্ষ পর্ব্বে হংস রূপ প্রজাপতি দেবতাদের বলে ছিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৪র্থ উল্লাসে ৭৩—৭৭ শ্লোকে পরিষ্কার করে বলেগেছেন যে সত্য আশ্রয় করে যে কর্ম্ম করিবে তাহাই সফল হইবে। শ্রুতি কথিত "সত্যমেব জায়তে নানৃতং" সত্যেন বিততো পন্থা দেবযানঃ" এই সূত্রের উপর যেন উপরোক্ত মহাভারতের ও তন্ত্রের শ্লোকগুলি গ্রথিত।

মহানির্ব্বাণের শ্লোকগুলি অতি সুন্দর বিধায় পাঠকদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম।

প্রকটেঽত্র কলৌদেবী সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়োভবেৎ॥
সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহিসুব্রতে॥ ৭৪
নহিসত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎপরং।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনামর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥ ৭৫
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্য হীনং তপো ব্যর্থ মূষরে বপনং যথা॥ ৭৬
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্য মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা সত্যাৎ পরতরোনহি॥ ৭৭

সত্য সম্বন্ধে এমন সুন্দর উপদেশাত্মক বাক্য আর কোথাও আছে কি? এখানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে উক্ত হয়েছে "সত্য রূপং পরং ব্রহ্ম" যাহা বেদে "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং" বলে রুদ্রোপস্থানে বলা হইয়াছে। বেদে তন্ত্রে একই কথা। সত্য আশ্রয় করলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মেলে এত শাস্ত্রে নানাস্থানে নানাভাবে বলে গেছেন তাহা বেশ উপলব্ধি হয় কিন্তু মোক্ষও মেলে ধরে নিতে হবে আপ্ত বাক্য বলে। সত্য অবলম্বনে পাপ সকল কি রকম উন্মূলিত হয় তাহার একটা সত্য ঘটনামূলক দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রসিদ্ধ ভাটপাড়া (২৪ পঃ) হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে একজন পরম নিষ্ঠাবান্ গুটিকাসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ

তাঁহার সিদ্ধাই বলে ভাটপাড়ায় ৺গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন এবং স্নান পূজান্তে বাটী ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহার সিদ্ধাই লোকমুখে প্রচার হইয়া পড়িল ক্রমে তখনকার একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু তাঁর শিষ্যত্ব লাভের আশায় তাঁহাকে ছলে তাহার বাটীতে লইয়া যায়। ডাকাতের বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল যে গুটিকাসিদ্ধ গুরুর কাছে দীক্ষা লইলে সে অনায়াসে দূরদেশে ডাকাতি করে বাটী ফিরিতে পারিবে। যে উদ্দেশ্যেই হউক সে সিদ্ধ পুরুষকে বাটী লইয়া গিয়া বলে যে সে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবে। সিদ্ধ পুরুষ প্রথম দীক্ষা দিতে অসম্মত হন পরে সে আত্মপরিচয় দিয়া ভয় দেখায় তিনি দয়াবশতঃ দুরাচারকে তারণের জন্যই হউক বা ভীতি প্রযুক্তই হউক রাজী হন এবং তদনুসারে ডাকাতকে সপ্ত পাতক সংহন্ত্রী গঙ্গায় স্নান করিয়া সব পাপ ধৌত করিয়া আসিতে বলেন সে তাহাই করে। তৎপরে তিনি দীক্ষা দিয়া বলেন "তোমায় ডাকাতি ছাড়তে হবে" সে বলে তাহা পারিবেনা তাহা হলে রোজগার বন্ধ হবে সে খাইবে কি? তখন সাধক বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিলেন "গুরুর কথা মানতে হয় জান" সে উত্তর দিল 'হাঁ" তাহাতে গুরু বলিলেন আমার একটী কথা রাখতে হবে" ডাকাত বলিল "ডাকাতি করা ছাড়া আর যে কোন কথা বলিবেন তাহা মান্য করিব" গুরু বলিলেন আচ্ছা তুমি আমার কথায় মিথ্যা কথা ত্যাগ কর" সে "যে আজ্ঞে" বলে প্রণাম করিল। ডাকাত বুঝিল না যে গুরু তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। সাধকের কার্য্য সিদ্ধ হইল। রাত্রে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে চৌকিদারের সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাৎ! "কোথায় হে সর্দ্দার এত রাত্রে?" সর্দ্দারের উত্তর নাই। দারোগাসাহেব থানায় ধরিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসিলেন "তুই ওখানে ডাকাতি করেছিস" ডাকাত চুপ। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাহার ডাকাতি করা বন্ধ হলো সঙ্গে সঙ্গে নরহত্যা, পরপীড়ন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ প্রভৃতি বিবিধ পাপ বন্ধ হইল অবশেষে সেই বিখ্যাত গোরে ডাকাত অল্পকাল মধ্যে সাধু হইয়া দাঁড়াইল। অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ।) এ জগতে দেখা যায় ঘোর দুরাচার যদি সাধনপথে অগ্রসর হয় তাহার সাধনা বড় তীব্র হয়। তারাই "অত্যুৎকট পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে" এই বচনের স্বার্থকতা সম্পাদন করে। মেধামারার সাধন বড় ধীরে ধীরে। এই দৃষ্টান্তে বেশ বুঝা গেল সত্য প্রতিষ্ঠায় কিরূপে ধর্ম্মাচারণ হয়। তারপরে যোগ হিসাবে সত্য প্রতিষ্ঠায় কি ফল হয় তাহা পতঞ্জলি দেব তাঁহার সূত্রে ধরে গেছেন

"সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া ফলা শ্রয়ত্বং" সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার ফল লাভ হয় অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধ হয়। এত প্রত্যক্ষ। সত্য ত্রেতা দ্বাপরকালে মুনিঋষিদের ও দেবতাদের অভিশম্পাতের বিষয় কে না জানে? তাঁদের কথা ফলিত কেন? বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন বলে। কথা না ফলিলে কথা মিথ্যা হয়। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে। যখন শৃঙ্গীকে তাঁর পিতা বলিলেন "কি করেছিস্ ধার্ম্মিক প্রজাপালক রাজাকে অভিসম্পাত করেছিস্? "শাপ ফিরিয়ে নে" তখন শৃঙ্গী রোদন করিতে করিতে পিতাকে বল্‌লেন বাবা আমি কি করে কথা প্রত্যাখ্যান করবো? আমি যে জীবনে কখন মিথ্যা কথা কহি নাই। তখন শমীক প্রমাদ গণিলেন। সপ্তম দিবসাবসানে পরীক্ষিত রাজা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং অব্যর্থ ঋষিবাক্য সাফল্য লাভ করিল। এদিকে মহারাজা পরীক্ষিতেরও সত্যের দিকে কি রকম দৃষ্টি দেখুন। রাজাত গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিতেছেন গৃহের মধ্যে চতুর্দ্দিকে বড় বড় ঋষিবেষ্টিত হয়ে। তক্ষকের সাধ্য নাই সেখানে গমন করে। সপ্তম দিবস অবসান হয় হয়। রাজা দুঃখিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন দিন ত গেল তক্ষক ত দেখা দিল না ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হয় যে? জয়োল্লাসে নয়! ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হয় শাস্ত্র মিথ্যা হয় এই আশঙ্কায় ম্রিয়মান হয়ে বল্‌লেন। তখন সম্মুখস্থ একটী ফল লইয়া বলিলেন এই ফলে যদি তক্ষক থাকিয়া আমায় দংশন করে, বলিয়া ফলটি নিজ মস্তকে স্পর্শ করিলেন। তক্ষকও সেই ফলের ভিতর কীটের আকারে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই অবকাশে সে স্বরূপ ধরিয়া রাজাকে দংশন করিল। রাজার ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় বলে শুধু মনস্তাপ নহে ঋষিবাক্য সত্য করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। ব্যাসদেব ভাগবতের প্রথমেই সত্যের মাহাত্ম্য ধর্ম্মরূপ বৃষের মুখ দিয়ে "কলিতে সত্যই বিদ্যমান" অবতারণা করে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের বৃত্তান্তে সেই বিষয় বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া উপসংহার করিলেন। বেশি দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। মিথ্যাবাদীরা সত্য কথনের আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যাঁহারা সত্যবাদী তাঁহারা নিজেই উপলব্ধি করেন।

যদিও কলিতে সাংসারিক লোকের একেবারে নির্জ্জলা সত্য একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে তবে মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে যে সব বিষয়ে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া ধরেন নাই সেগুলা বাদ দিয়া অন্য বিষয়ে সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিলে তাহার সত্য পালন হইল বলিয়া ধরা যায়। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য যে সংজ্ঞা (definitiou) করিয়াছেন "সত্যং ভূত হিতং প্রোক্তংন যথার্থাভি-

ভাষণম্" তাহা বড়ই প্রশস্ত (elastic) প্রাণিগণের হিতকর বলে সব কর্ম্মই মিথ্যা আসিয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। মিথ্যাবাদীরা ভূতহিত কথাটী মনকে প্রতারিত করিবার একটা স্তোকবাক্য মনে করেন। মহাভারত মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়ে ৩১০ অধ্যায়ে ভগবান সনৎকুমার বলিয়াছিলেন "সত্য তুল্য তপস্যা নাই এবং সত্যের সমান শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই। সত্য বাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য কিন্তু যেস্থলে সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয় সেস্থলে সত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। আমার মতে (সনৎকুমার মতে) যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল লাভ হয় তাহাই সত্য বাক্য"। এও সেই যোগি যাজ্ঞবল্ক্যেরই উক্তির সমর্থন মাত্র। তবে মহাভারতে আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে যেগুলি রেয়াইত করিয়াছেন অর্থাৎ দোষাবহ নহে বলা হইয়াছে তাহা কতক অনিবার্য্য বলিয়াই বলা হইয়াছে। পাঁচটী বিষয়ে সীমাবদ্ধ করাতে যাজ্ঞবল্ক্যের সূত্রের মত ভয়ের কারণ হয় নাই। আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ১৫৬ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিতেছেন (১) ক্রীড়া (২) বিবাহ (৩) গুরুতর কার্য্যসাধন (৪) আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ যে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা যায় তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হয় না (৫) স্ত্রীর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন "বৎস সত্যবাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে স্থলে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয় সেইস্থলে সত্যকথা না কহিয়া মিথ্যা কথা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পরধন অপহরণ অভিলাষে দস্যুগণ সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে মৌনাবলম্বন করিবে যদি মৌনাবলম্বনে সন্দেহ হবে তবে মিথ্যাকথা বলিবে" এইখানেই ভীষ্ম বলিতেছেন বিবাহ ও প্রাণসংশয়কালে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থরক্ষা ধর্ম্মবুদ্ধি ও সিদ্ধলাভের নিমিত্ত, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে" ভীষ্মদেব ক্রীড়া বিবাহ ও স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যাকথা দোষাবহ নহে বলিয়াছেন। এগুলি সম্বন্ধে আজকালের বাজারে মতদ্বৈধ থাকিলেও আমাদের শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে।

মিথ্যাকথা যেমন দোষের মিথ্যাচার, মিথ্যা ব্যবহার কপটতাও তাদৃশ দোষাবহ ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসাস্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃস

উচ্যতে" ॥ অর্থাৎ যে প্রকৃত সাধু নহে অথচ হরিনামের তিলকাদি ধারণ করিয়া বসিয়া থাকে লোককে দেখায় যে সে সাধু সেই মিথ্যাচার। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। যে বাহেন্দ্রিয় সংযম করিয়াছে অথচ মনকে দমন করিতে পারে নাই কিন্তু মনকে বশে আনবার চেষ্টা করিতেছে তাহাকে মিথ্যাচার বলা ভগবানের অভিপ্রায় নয়। ভণ্ডকেই মিথ্যাচার বলে। সকাম সাধকের প্রথম প্রথম মন সম্পূর্ণ বশ হয় না ক্রমে অভ্যাসাৎ সিদ্ধি। অন্তঃ শাক্তাঃ বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ নানাবেশধরা কৌলা বিচরন্তি মহীতলে। এও মিথ্যাচার। কুলতন্ত্রে যে উক্তি আছে কুলধর্ম্মের রক্ষার জন্য মিথ্যাবাক্য নিন্দিত নহে কিন্তু কলির প্রবলতা হইলে এ উপদেশ প্রশস্ত নহে। কারণ কলিতে একমাত্র সত্য অবস্থিত। মিথ্যা ব্যতিরেকে গোপন সম্ভব হয় না তাই কলির প্রবলতা হইলে প্রকাশ্যভাবে কুলসাধন করিবে। এ মহাদেবের উক্তি বটে। কিন্তু তাই বলে খাটির বোতল বগলে করে দিনের বেলা রাস্তা দিয়ে যাওয়া বা মাতলাম করা তন্ত্রের অনুমোদিত নহে। কুলসাধনের প্রকৃত মর্ম্ম অন্য প্রকার।

মিথ্যা ব্যবহার—rolled goldর চস্‌মা বা গিল্‌টির গহনা ব্যবহার করা দোষের, কারণ ইহাতে লোককে ধোকা দিয়া বুঝান হইতেছে যে, আমার গহনাগুলি বা চস্‌মা স্বর্ণের। এ মুখে মিথ্যাকথা বলা হইল না বটে কিন্তু মিথ্যা ব্যবহার। ইহাও সময়ে সময়ে মিথ্যাকথা আনিতে পারে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে এ চস্‌মা কিসের তখন মিথ্যাকথা যে ইহা স্বর্ণের এ কথা বলাই সম্ভব কারণ যাহারা এটা পিতলের কি rolled gold বলিবার সৎসাহস আছে সে ওরকম কৃত্রিম জিনিষ ব্যবহার করিবে কেন? তবে rolled gold german silver ধাতু বিশেষ ভাবিয়া ব্যবহার করা দোষের হয় না। কেশে কলপ বা খেজাব দেওয়া এ প্রকার মিথ্যা ব্যবহার সংজ্ঞে ময়লা হয় না বলিয়া পরাও দোষের নহে তবে মূলে যেন প্রতারণা ভাব না থাকে। তবে দন্ত সম্বন্ধে একটা কথা আছে। যদি ভোজনের সুবিধার জন্য কিম্বা গীতা চণ্ডী প্রভৃতি পাঠের সময় শব্দ অস্পষ্ট বা ভুল হয় এই উদ্দেশ্যে কৃত্রিম দন্ত করা হইয়া থাকে তাহাতে মিথ্যা ব্যবহারটা দোষের হয় না। কপটতা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত অনাবশ্যকবোধে দিলাম না। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ বন্দোপাধ্যায়।
২নং ক্রবেশ্বর লেন, ৺কাশীধাম।

জন্মাষ্টমী ১৩৩৬।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

একটা উপবাস না হয় করিলেই—একটা রাত্রিজাগরণ না হয় হইলই। কত কি লইয়া ত কত রাত্রিত জাগিয়াই কাটাইয়াছ, কত রোগে পড়িয়া কত উপবাস ত করিয়াছ। মনে কি করিয়াছ এই রাত্রিজাগরণ এই উপবাসই শেষ—তাহা নহে কত উপবাসতো আরও করিতে হইবে, কত রাত্রিজাগরণ যে আরও করিতে হইবে তাহা কি জানা আছে? কিন্তু যে উপবাস, যে জাগরণ হইয়া গিয়াছে, অথবা আরও হইবে তাহাত শ্রীভগবানের জন্য হয় নাই, শ্রীভগবানের জন্যও হইবে না—তবে একটা উপবাস একটা জাগরণ যদি শ্রীভগবানের জন্য কর তাতে কি তোমার অমঙ্গল হইতে পারে? করিয়াই দেখ—ভগবানের জন্য করিয়া দেখ তাঁহার আজ্ঞা পালন জন্য চেষ্টা করিতেছি বলিয়া করিয়াই দেখ—দেখ চিত্তের অবস্থা কি হয়? দেখ পবিত্রতা অনুভব করিতে পার কিনা? দেখ উপবাস ও রাত্রিজাগরণের পরে —অল্প আহার করিয়া শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দিলে—তাহার পর শ্রীভগবানকে ডাকা সরস হয় কিনা? উপবাস যে ভারি তপস্যা—জাগরণ আরও বেশী।

উপবাস ত করিবে, জাগরণও ত করিবে—কিন্তু দিবাভাগেই বা কি লইয়া থাকিবে আর রাত্রিজাগরণই বা কি লইয়া কি করিবে? সেই কথাই এই জন্মাষ্টমীর দিনে একটু আলোচনা করিতেছি।

জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিনে প্রাতঃস্নান ও নিত্যকর্ম্ম করিয়া সংযম করিবে। সংযমের দিনে তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ। উপবাসের দিনেও তৈল মর্দ্দন নিষেধ। সংযমের দিনে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবে এবং রাত্রে দুগ্ধ ফল ইত্যাদি খাইয়া থাকিবে। আতপতণ্ডুল, সৈন্ধব লবণ, গব্য দুগ্ধ (সর তোলা না হয়) গব্যঘৃত, আম্র, কদলী, ইক্ষুচিনি (গুড় নহে), তেঁতুল, কাঁচা মুগ, মটর— এই সমস্ত ব্যবহার করা যায়।

সংযমের দিনে ভাগবত দশমস্কন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। পাঠান্তে লীলাগুলি মনে মনে ভাবনা করা উচিত।

উপবাসের দিন গঙ্গাস্নান, নিত্যকর্ম, পূজা, হোম, মন্ত্র জপাদি করা কর্ত্তব্য। অর্দ্ধরাত্রে যথাবিধি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া কৃষ্ণের ধ্যান, অর্ঘ্যাদি, পূজা ইত্যাদি করিবে। কিন্তু থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখিয়া জন্মাষ্টমী করা অপেক্ষা পাপকর্ম্ম আর নাই। একান্তে থাকিয়া পূজা করা ও ভাবনা করাই প্রয়োজন।

পূজার যেরূপ বিধি তাহাই কর্ত্তব্য। আমরা এখানে ভাবনার কথা একটু উল্লেখ করিব। আর একটি কথাও এখানে বলা আবশ্যক মনে করি। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন বলিয়া "করিষ্যে বচনং তব" তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব—এইভাবে কর্ম্ম করাকেই কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম বলা হয়। ভগবানের স্মরণই মুখ্য কার্য্য। জন্মাষ্টমীতে যেমন উপবাস ও জাগরণাদি করিতে হয় সেইরূপ দুইটী মহাষ্টমী, শিবচতুর্দ্দশী, রামনবমী এই সমস্ত পর্ব্বও পালন করা উচিত। কি জানি কোন সূত্রে শ্রীভগবানের কৃপা অনুভবে আসিবে কে বলিতে পারে? তোমার আমার কর্ত্তব্য যতদূর পারা যায় আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করা।

কিন্তু কবে—দ্বাপর যুগের কোন্ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ভগবান্ জন্মিয়াছিলেন? কবে জন্মাষ্টমী আরম্ভ হইয়াছিল? বলিবার উপায় নাই। কারণ সৃষ্টি ত অনন্ত—চিরদিন ধরিয়া জন্মাষ্টমী হইতেছে—আবার দ্বাপর আসিবে আবার জন্মাষ্টমী হইবে। প্রতিবারেই কি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি জন্মিবে? এক কংসই কি বরাবর আসিতেছে? না তা নহে। কংসের মত স্বভাব যার সেই কংস। এইভাবে বহু কংস আসিয়াছে বহু কংসাদির বিনাশ জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে হইয়াছিল—চিরদিন আসিতে হইবে। দাশরথী রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রবণ কর মহাশয়, আশ্চর্য্য এক বিষয়

তখন পুণ্যবান্ সমুদয়, এক পাপী কংস মথুরাতে ছিল

তার ভার না পেরে ধর্‌তে পৃথিবী যান নালিশ কর্‌তে

ভার সহ্য কোনরূপে না হল ॥

এখন বাঙ্গলাটা কর্‌লে অংশ দশ হাজার জুটছে কংস

পৃথিবীটা ঐক্য কর্‌লে লক্ষ হ'তে পারে।

কিরূপে ভার ধরেন পৃথ্বী পৃথ্বীর বুঝি হ'লো পিত্তি

লোপাপত্তি হয়েছে একবারে ॥

এই কলিযুগ। এখনও কংস আসিবে না। আসিবে কংসের চেলা। তারই উৎপাত চারিদিকে দেখা যাইতেছে। কিন্তু যিনি কংসের বংশকে বিনাশ করিবেন তাঁহার আগমনের এখনও বহু বিলম্ব আছে। এখনকার সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। অপেক্ষা করা সর্বোৎকৃষ্ট তপস্যা। আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করা আর "হা গোবিন্দ আমায় কৃপা কর" বলিয়া অপেক্ষা করা, আর সব সহ্য করা—ইহাই ভগবানের কৃপা প্রার্থীর কর্ত্তব্য।

কংসানুচরের মত বহু ব্যভিচারীর উপদ্রব সহ্য করিতে হইতেছে। কখন কখন ধৈর্য্যচ্যুতিও হইতেছে। ইহা না হইয়া বিশেষ চেষ্টার সহিত সব সহ্য করিতে না পারিলে ভগবানের করুণার অনুভব করা যাইবে না। সুস্থ মনে সব সহ্য করিয়া কর্ম্মক্ষয় করা ভারি তপস্যা। যাঁহারা ঈশ্বর চিন্তা করিতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত তাঁহারাই ভগবৎ কৃপা অনুভবের যোগ্য পাত্র। আমরা জন্মাষ্টমীর স্মারক এই তিথিতে ঈশ্বর ভাবনার কথা কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

পাপের বোঝা পূর্ণ না হইলে মানুষের প্রাণ কাঁদে না। যখন মানুষ আর সহ্য করিতে পারে না তখন একান্তে তাহার দিকে তাকাইয়া কাঁদে। সমষ্টি ভাবে ইহা যখন হয় তখন পৃথিবী সৃষ্টির ব্যভিচার অসহনীয় দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে নালিশ করিতে যান। ব্যষ্টিভাবেও যখন ইহা হয় তখন মানুষের হৃদয়ে কৃষ্ণের উদয়ের সময়। আমরা ব্যষ্টি ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া সমষ্টির নালিশের কথা আলোচনা করিতেছি।

কংস বড় অত্যাচার করিতেছে। কলির কংসগণের কোন সাধনা নাই কিন্তু দ্বাপরের কংসাদির সাধনা ছিল তাই তাহারা অত বড় হইয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ দুঃসহ কংস তপস্যা করিয়া মহাদেবের বরে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

"শূলপাণিবরোন্মত্তঃ কংসরাজো দুরাসদঃ"

কংসের অত্যাচার পৃথিবী সহ্য করিতে আর পারেন না।

"বসুধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন মুষ্টিনা"

পদাঘাতে মুষ্ট্যাঘাতে এই দুঃসহ কংস পৃথিবীকে তাড়না করিতে লাগিল। আর তাহার অনুচরগণ সকল নরনারীকে আচারভ্রষ্ট, আহার ভ্রষ্ট, উপাসনা ভ্রষ্ট, এক কথায় ধর্ম্মভ্রষ্ট ও ঈশ্বরভ্রষ্ট করিয়া তুলিল। মানুষ আর বেদ মানে না, বৈদিক কর্ম্ম ত করেই না, বেদের কর্ম্ম সময়ের উপযোগী নয় বলিয়া মানেই না—

বলে যে তখনকার কালের জন্য একালের জন্য নহে; ইহারা ঈশ্বরের আবশ্যকতা মানেনা—ঈশ্বরের দিকে ফিরিবার জন্য যে চেষ্টা, যে চেষ্টাকে পুরুষকার বলে সে পুরুষকার না মানিয়া—যমের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য উদ্দাম চেষ্টাকে পুরুষকার বলে; ইহারা দেবতা মানে না, ব্রাহ্মণ মানেনা, ব্রাহ্মণের নাম শুনিলে সহ্য করিতে পারে না, প্রায় লোকই ব্রাহ্মণদ্বেষী, ইহারা শাস্ত্র মানে না, ইহারা নিজের ইচ্ছামত একটা একটু মাটির মুর্ত্তি গড়িয়া—সকল জাতি মিলিয়া—অতি পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুতুল পূজা করে. ইহারা; ইহারা জাতি পাঁতি মানে না; স্ত্রীলোকে সতীধর্ম্মকে বলে কুসংস্কার; সাবিত্রী মৃতপতিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন—ইহাকে বলে "হেংলামি" করিয়া ফিরে দাও সার ফিরে দাও সার বলিয়া যে সাবিত্রী হেংলামি করিয়াছিল সে কি আবার আদর্শ হইতে পারে?—ইহারা ইহাই বলে—ইহারা শুদ্ধাশুদ্ধ মানে না, মেধ্যামেধ্য বিচার করে না। ইহারা সর্ব্বদা হুজুগ লইয়াই থাকে; কোন কিছু একটা নূতন ডিগ্‌বাজী করিতে পারিলেই হয়—যাহা করিতেছে তাহাতে মানুষের দুঃখ দূর হইতেছে কিনা, দুঃখ দূর হইতে পারে কিনা; লোকের শান্তি হইতেছে কিনা—সে দিকে দৃষ্টি করিবার সামর্থ্যও ইহারা রাখে না। ইহাদের অপবিত্রতার বিস্তারে পৃথিবী আর পাপভার সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘূর্ণিতলোচনে দেবদেব উমাকান্ত বৃষধ্বজের নিকটে কংসের তাড়নার কথা নালিশ করিলেন; বিবর্ণা, সাবমানিতা পৃথ্বীকে কাঁদিতে দেখিয়া দেবতা "কোপেন স্ফুরিতাধরঃ"। উমার সহিত মহাদেব তখন দেবতাবৃন্দকে ও পৃথ্বীকে সঙ্গে লইয়া পালন কর্ত্তার নিকটে পৃথ্বীর দুঃখ জানাইলেন এবং কংসের বিনাশ জন্য তাঁহাকে পৃথিবীতে অবতরণ করিতে হইবে বলিলেন।

সমষ্টিতে যেমন অবতরণের প্রয়োজন হয়, ব্যষ্টি জীবহৃদয়েও যখন ভিতরের বাহিরের ব্যভিচার, অত্যাচার, পীড়ন দুঃসহ হইয়া উঠে তখন মানুষ খুবই ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবানকে নিরন্তর ডাকিতে থাকে। তখনই ভগবান্ জাগ্রত হইয়া মানুষের হৃদয়ে আসিয়া কার্য্য করিতে থাকেন।

এই ভাদ্র মাসে অসিতেপক্ষে অষ্টমীতিথিতে রোহিণী তারকাযুক্তা ঘন-ঘোরিতা রজনীতে ভগবান্ মর্ত্তে আসিয়াছিলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, চারিদিক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আর বৃষ্টি হইতেছে।

বসুদেব ও দেবকী তখন কংস কারাগারে। ইহাদের দুঃখ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে—শ্রীভগবান্ এই কালে এই পাত্রে এইস্থানে আসিয়া উদয় হইয়াছিলেন।

উপবাসে পবিত্র হইয়া রাত্রি জাগরণে পূজা করিয়া রাত্রি দুইপ্রহরে স্থির হইয়া ভগবানের আগমন জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে শ্রীভগবানের জন্ম-ভাবনা করিতে হয়। সেই জন্মতিথির স্মারক বলিয়া এই তিথিতে এই ভক্ত ভগবানের করুণা অনুভবে আসিবেই—যদি শুদ্ধহৃদয়ের বিশ্বাসে কাতরপ্রাণে এই ভাবনাটি করিতে পারা যায়।

জগন্ময়ী মহামায়া দক্ষপ্রজাপতিকে যেমন বর দিয়া বলিয়াছিলেন

"এষ দত্তস্তব বরঃ প্রতি সর্গং প্রজাপতে।
অহং তব সুতাভূত্বা ভবিষ্যামি হরপ্রিয়া॥

অর্থাৎ হে প্রজাপতে! আমি প্রতিসৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের প্রেয়সী হইব—সেইরূপ প্রতি সৃষ্টিতে একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে। সেইজন্য সেই সেই তিথিতে ঈশ্বর ভাবনা সাক্ষাৎ ফলপ্রদ।

মার্জ্জন মন্ত্র।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

(মার্জ্জনমন্ত্র—'যোবঃ শিবতমোরস............উশতীরিব মাতরঃ')

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, শিবতম রস কি?

আচার্য্য] বৎস, এখানে রস শব্দের অর্থ জল, কিন্তু ইহা যতদিন পরিচ্ছিন্ন রূপে পরিচিত হয়, ততদিন ইহাতে ত্রিবিধ দুঃখ লাগিয়া থাকে। সুতরাং ততদিন ইহা পিপাসার্ত্তের নিকট আপাততঃ শিব (কল্যাণকর) রূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ অশিব, অন্ততঃ অলৌকিক দৃষ্টিশালিনী শ্রুতির বিবেক দৃষ্টিতে অমঙ্গলকর ভিন্ন নহে। কিন্তু যখন অধিকারী জীব অধিযজ্ঞ—

সাধনাকালে মুক্তপুরুষের বিরাট দেহে অঙ্গীভূত করিয়া ইহাকে দর্শন করেন, তখন অশিব জল শিব-রূপে পরিণত হন। যাহা এতদিন ভোগ্যরূপে ভাবিত হইয়াছিল, উপস্থিতি অনুপস্থিতি উৎকর্ষ অনুৎকর্ষ দ্বারা যাহা এতদিন সুখ দুঃখ উৎপাদন করিত, আজ তাহাই উপাস্য দেবতা বিরাট পুরুষের অঙ্গে মিলিত হইয়া উপাস্যরূপে পরিণত। অমঙ্গলকর ভোগ—মূর্ত্তি মঙ্গলময় উপাস্য-মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত, অশিব শিবরূপে পরিবর্ত্তিত। দিনের পর দিন সাধনা চলিতে লাগিল। সন্তানের সাধনায় প্রসন্ন হইয়া বিরাট পুরুষ যখন স্বীয় স্থূল আবরণ উন্মোচন করিলেন, জ্যোতির্ময় হিরণ্যগর্ভমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন, তখন সাধক দেখিলেন যাহা এতদিন জলরূপে বিরাট দেহে অঙ্গীভূত দেখিয়াছিলাম, তাহা আজি হিরণ্যগর্ভের প্রাণরূপে বিরাজমান, ইহা রূপে, গুণে শক্তিতে সর্ব্বতোভাবে স্থূল জল মূর্ত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তখন বুঝিলাম পূর্ব্ব-দৃষ্ট রস অপেক্ষা ইহার স্বরূপ শিবতর। এইরূপে আরও অগ্রসর হইলাম, আমার উপাস্য আমাকে আরও অন্তরঙ্গ করিয়া লইলেন, তাঁহার আত্মপ্রকাশক বরেণ্য ভর্গ মিলিত হইয়া আমার অজ্ঞাতসারে কিরূপে তিনি ঈশ্বর মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছিলেন তাহা দেখাইলেন, তখন দেখিলাম, সেখানে অনেক নাই, অনেক থাকিতে পারে না বাহিরের বহু রস সমস্তই সেখানে এক রস হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম—ইহা পূর্ব্ব দৃষ্ট সকল রসের সার, এই রস শিবতম। সেই শিবতম একরস স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা হইল, কিন্তু স্থিতিলাভ করিতে পারিলাম না। সাধন-শক্তি বর্জ্জিত আমি আমাকে সাধন-ফলে প্রলুব্ধ করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব আমাকে যে শোভন দৃশ্য দেখাইতেছিলেন, যখন আর তাহা দেখাইলেন না, সে সুখের স্বপ্ন যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আপন অবস্থায় অধঃপতিত হইয়াছ, তথাপি সুখময়ী স্মৃতি আমার যায় নাই। জগজ্জননী সাবিত্রীর শিবতম স্বরূপ দর্শনের লোভ কছুতেই সন্তান ছাড়িতে পারে না—তাই প্রার্থনা করা হইতেছে—যোবঃ শিবতমোরস স্তস্য ভাজয়তে হনঃ। এই প্রার্থনা করিয়াই উপমা দেওয়া হইয়াছে—উশতীরিব মাতরঃ। সন্তান হিতৈষিণী জননীগণের ন্যায়। সন্তান হিতৈষিণী জননী যেমন স্বীয় দেহের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য তুচ্ছ মনে করিয়া নিজ দেহের শিবতম রস বা স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা সন্তানদেহের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যই অভিলাষ করেন, সেইরূপ। শিবতম রসরূপিণি, আমি তোমারই সন্তান, এই মানব দেহেও তুমিই মানবী জননী হইয়া আমাকে প্রসব করিয়াছ। মানবী রূপেও তুমিই সংস্রাব বিগলিত

সুধা যাহা মাতৃস্তন মুখে প্রবাহিত হয়, সেই শিবতম রস দ্বারা এই দেহ পরিপুষ্ট করিয়াছ। কিন্তু আমি স্বীয় দুষ্কৃতির আবরণে আবৃতদৃষ্টি তোমাকে দেবী বলিয়া চিনিতে পারি নাই—মানবী বলিয়াই বুঝিয়াছি। তাই মানবী জননীর স্নেহরস—স্তনরস আমার পরিচিত, উহাও যে সহস্রার লুক্কায়িত তোমারই অমৃতময় শিবতম রস তাহা আমার অবিদিত। অজ্ঞানের অপরাধ লইও না—আমি আমার পরিচিত বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তোমার শিবতম রসের সহিত পরিচিত হইতে যাইতেছি, তাই বলিতেছি—উশতীরিব মাতরঃ।

৺ভার্গব যোগত্রয়ানন্দ জীবনী।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

যিনি সমগ্র জীবন চাতকীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ব্যয়িত করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখে নিপতিত হইয়াও যিনি একমাত্র ভগবচ্চরণ ব্যতীত অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হয়েন নাই বা স্বয়ং অর্থার্জ্জনাদির নিমিত্ত চেষ্টিত হয়েন নাই ; অর্থাভাবে অবসন্ন হইয়াছেন, তাঁহা দ্বারাই বহুশঃ উপকৃত ধনী ব্যক্তি সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তথাপি যিনি তাঁহার নিকট নিজ অভাব ব্যক্ত করেন নাই, দুই দিন অভুক্ত আছেন, নিত্য নিয়মিত রূপে সমাগত ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছেন, তথাপি যিনি নিজ অবস্থার কথা তাহাদিগকে জ্ঞাপন করেন নাই ; সারাটী দিন আহার হয় নাই, অপরাহ্ণে সমাগত বহু ভক্তজনদিগকে শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, সন্ধ্যাকালে কঠিন রোগাক্রান্ত পুরুষের চিকিৎসার্থ ডাকিতে আসিবামাত্র তাহাকে দেখিতে গিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাকে সারা রাত্রি পরিদর্শন করিয়াছেন, তথাপি দিবারাত্রি যে আহার হয় নাই, এ কথা একবারও যিনি কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই, এবং 'ভগবানের যখন ইচ্ছা হইবে, যখন তিনি আহার্য্য প্রেরণ করিবেন, তখনই আহার করিব,' এইভাব লইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিয়াছেন,—তাঁহার

ভগবদ্বিশ্রুতার ছবি আমি কি করিয়া চিত্রিত করিব? যশোলাভের প্রকৃষ্ট উপকরণ স্বরূপ সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা, চিকিৎসায় ধন্বন্তরি সম সুনিপুণতা এবং দুর্লভ যোগবিভূতির প্রাচুর্য্য থাকিলেও যিনি সদা আত্ম-গোপনের নিমিত্ত সচেষ্ট থাকিয়াছেন, প্রতিষ্ঠাকে যিনি চিরদিন যথার্থই শূকরী বিষ্ঠা সম জ্ঞান পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছেন, আর্ত্তের দুঃখ দেখিয়া অধীর হইয়া পড়েন বলিয়াই যাঁহার যোগবিভূতির কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, জিজ্ঞাসিত হইলে জ্ঞানপিপাসুর তৃষ্ণা অবশ্য নিবার্য্য, কেবল এই নিমিত্ত অথবা কদাচিৎ অপৃষ্ট হইয়াও 'আহা, অজ্ঞান বশতঃ মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া মহা দুঃখ প্রাপ্ত হইবে, ইহাকে সন্মার্গ প্রদর্শন কর্ত্তব্য' এইরূপ করুণা বশতঃই যিনি নিজ অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন মাত্র; বাল্যকালে পরীক্ষাদানার্থ পরীক্ষা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিতে লিখিতে যিনি 'পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত গ্রন্থ সকল ত অধ্যয়ন করিয়াছি, তৎপ্রতিপাদিত বিষয় সকলের জ্ঞান ত সমধিগত হইয়াছে, তবে আর পরীক্ষা দিয়া কি হইবে, উপাধি প্রভৃতিতে আমার কি প্রয়োজন?' ইত্যাকার বিচার পূর্ব্বক যিনি পরীক্ষা মন্দির ত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া আসিয়াছেন; রাজগণ এবং সমৃদ্ধিশালী ধনিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রার্থিত হইয়াও যিনি কদাচ ধনীর প্রসাদ লাভার্থ কোথাও গমন করেন নাই, নিজ কুটীর পরিত্যাগ করেন নাই, প্রতিগ্রহকে যিনি চিরদিন হৃদয়ে সুতপ্ত লৌহশলাকার-বেধসম জ্ঞান করিয়াছেন, এবং অবস্থার আপীড়নে অযাচিতভাবে সমাগত সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও যিনি তাহা ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কবে সে ঋণ পরিশোধ করিবেন সদা এইরূপ চিন্তায় সমাকুল থাকিয়া-ছেন; যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রাণ পাইয়াছেন, সংসারত্রাণকর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এতাদৃশ শিষ্যগণের ধনও যিনি অনিচ্ছার সহিতই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাও ঋণ বলিয়া মনে করিয়াছেন—তাঁহার **বৈরাগ্যের** প্রতিকৃতি আমি কি করিয়া অঙ্কিত করিব?' জীবন্মুক্ত ও সিদ্ধমন্ত্র মহাপুরুষ-গণের সকল লক্ষণই যাঁহাতে লক্ষিত হইয়াছে, যাঁহার জীবনে প্রেক্ষাবান্ পুরুষ মাত্রেই প্রায় নিত্যই একটী না একটী চমৎকারকর ঘটনা লক্ষ্য করিয়া-ছেন, সাধারণের দৃষ্টিতে যাহা হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছে এবং অতএব তদ্বিষয়ে চেষ্টা নিরর্থক এবং অকর্ত্তব্য এইরূপ জ্ঞানে যাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যিনি সে সকল

(ঘটনা)কেও সম্ভব করিয়া দেখাইয়াছেন ও সকলকে বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ করিয়াছেন, যাঁহার বচন চিরদিনই অমোঘ হইতে দেখা গিয়াছে, রাজা হউন ধনী হউন, বা অন্যপ্রকারে বলবান্ হউন, কাহারও নিগ্রহকে যিনি বিন্দুমাত্রও ভয় করেন নাই, যাহা করিতে হইবে বা প্রাপ্ত হইতে হইবে তাহা কখনও যাঁহার অকৃত বা অনাসবাদিত থাকে নাই, যাঁহার নিকট হইতে রোগী নৈরুজ্য লাভ করিয়াছে, পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, ধনার্থী ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, জ্ঞানার্থী জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাঁহার **সঙ্কল্প শক্তি** ও **ব্রাহ্মণ্য-তেজের** ইয়ত্তাবধারণ আমার পক্ষে সম্ভব হইবে কিরূপে? যাঁহার নিকট জ্ঞানী, ভক্ত, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ—সকল প্রকার ও সকল অবস্থার লোক আসিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহার জ্ঞানপ্রদীপ্ত,ব্রহ্মবর্চ্চঃ:—পরিবৃত সদাশান্ত, প্রেমময় মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই নিরতিশয় প্রীতিসাগরে মগ্ন হইয়াছেন এবং কেহ 'আহা! ঠিক যেন শ্রীশঙ্করকেই দর্শন করিলাম'; কেহ, 'আহা! যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রকেই নয়নগোচর করিলাম' এইরূপ বলিয়াছেন, যিনি নিরক্ষর সামান্য মানবগণের সহিতও এরূপভাবে বার্ত্তালাপ ও ব্যবহার করিয়াছেন যে, যাহাতে তিনি যেন কেবল তাহাদেরই, তাহারা হৃদয়ে এইরূপ ভাব পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, জ্ঞানী যাঁহার নিকটে আসিয়া যে পরিমাণে উপকৃত ও আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছেন কোন নিরক্ষর ও ভক্ত তৎপরিমাণেই সুখানুভব করিয়াছেন, কৃতার্থ হইয়াছেন, কোন সাম্প্রদায়িক ভাব যাঁহাকে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই, 'শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার বিরোধের অতি সুন্দর ও অবিসম্বাদিত ভাবে মীমাংসা করিয়া দিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ' এইরূপ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া নানা সম্প্রদায়ের লোক যাহার উপসর্পণ করিয়াছেন এবং প্রার্থিত সমন্বয় লাভ পূর্ব্বক পরম কৃতার্থ হইয়া সাধুবাদ করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, শোকসন্তপ্ত জনগণ যাঁহার নিকট আসিবামাত্র তাঁহাদের প্রিয়জনবিরহজনিত দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছেন, বিপন্নগণ যাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাদের সমস্ত বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন; এবং তৎকালের নিমিত্ত আমাদিগকে পরম সম্পদের অধিকারী মনে করিয়াছেন; যাঁহার লোকব্যবহার সদা অতি মধুর ও সুবিবেচিত দৃষ্ট হইয়াছে, কোন পুরুষ বা প্রাণী যাহার নিকট হইতে কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয়েন নাই; কেহ তাঁহার একটু সামান্য উপকার করিলে বা তাঁহার সহিত একটু হাঁসিয়া কথা কহিলে যিনি বিগলিত হইয়া গিয়াছেন,

এবং আপনাকে তাহার নিকট চিরঋণী জ্ঞান করিয়াছেন তাঁহার সর্ব্বজনরঞ্জন, বিশ্বতৃপ্তিকর **স্বভাবের** অপরিমেয় মধুরতা ও বিচিত্রতার বিষয় আমি কিরূপে যথাযথভাবে বর্ণন করিব ?

অতএব এ কার্য্য আমা দ্বারা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব, ইহা মনে করিয়া আমি নিরস্ত হইতাম, কিন্তু নানা কারণে, এ ইচ্ছা আমার হৃদয়কে একেবারে ত্যাগ করিত না। কিছুদিন আরও এইভাবে বিগত হইল।

(ক্রমশঃ)

দুর্গা ও দুর্গার্চনতত্ত্ব।

তৃতীয় খণ্ড।

দুর্গে! মা তোমাকে কিরূপে পূজা করিব ?

বক্তা—শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় ও রমা।

রমা—পূজাতত্ত্ব বিষয়ক সাধারণ কথা শুনিয়াছি, আশাতীত ফল পাইয়াছি, কৃতার্থ হইবার পথ নয়নে পতিত হইয়াছে। শিবপূজা কাহাকে বলে, কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে হয়, অপাত্র হইলেও, সম্বন্ধপ্রগল্‌ভতা বশতঃ অথবা স্বভাবতঃ করুণার্দ্রহৃদয় বলিয়া আমাকে আপনি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনার চেষ্টা পূর্ণভাবে ফলবতী না হইলেও, এতদ্দারা আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। যে জ্ঞান ছিল না, যাদৃশ আনন্দ ইতঃপূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই, সে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাদৃশ আনন্দ অনুভব করিয়াছি, 'লোকত্রয়ে পূজার সমান পুণ্য কর্ম্ম নাই', 'পূজা' ও 'যোগ' এক পদার্থ, 'পূজা' ও 'ধর্ম্ম', 'পূজা' ও 'কর্ত্তব্যনীতি' এক সামগ্রী, মানুষ বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, পূজা করিবার চেষ্টা করে, অজ্ঞানবশতঃ, মন্দ-প্রারব্ধ নিবন্ধন পূজা করিতে যাইয়া মানুষ পাপ করিয়া থাকে, পাপ করিবার জন্য

মানুষ পাপ করে না, পূজা বিনা উন্নতি হয় না, সুখ হয় না, -আশা হইয়াছে, কোন না কোন দিন এই সকল সত্যের প্রকৃতরূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইব। 'দুর্গা ও দুর্গার্চনতত্ত্ব' সম্বন্ধে আপনি আপিং জেঠাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, আমি যথাশক্তি সেই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছি, আপনার 'দুর্গা ও দুর্গার্চনতত্ত্ব' বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ক'রে, 'দুর্গে মা তুমি কে ?' এবং 'দুর্গে মা! তোমাকে কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিব ? আমার মনে বিশেষতঃ এই দুইটী প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। 'শিবরাত্রি' ও 'শিবপূজা' সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার বহু সংশয় নিরস্ত হইয়াছে, তবে আমি আপনার অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। তা'ই 'দুর্গে! মা তুমি কে ?' আমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। 'দুর্গে! মা তুমি কে', আপনি পুনঃ পুনঃ আমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনার অনুগ্রহে আমি এখন কিঞ্চিন্মাত্রায় বুঝিতে পারিয়াছি, মা দুর্গা বিশ্বজননী, মা দুর্গা সর্ব্ববেদময়ী, মা দুর্গা প্রণব-স্বরূপিণী, মা দুর্গা চৈতন্যাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি, মা দুর্গা শিবাভিন্না শিবা, মা দুর্গা ও সর্ব্ববিদ্যাময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, সর্ব্বাধারকার্য্যকারণময়ী সীতাদেবী অভিন্ন পদার্থ, মা দুর্গা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমানা, মা দুর্গাই সদাকারা, মা দুর্গাই চিন্ময়ী, মা দুর্গাই পরমানন্দময়ী। আপনি বলিয়াছেন ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে পারিলেই প্রকৃত জ্ঞান হয় না, আপনি বলিয়াছেন, যাবৎ কোন বিষয়ের ঠিক অনুভব না হয়, তাবৎ তৎপদার্থ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানোদয় হইয়াছে বলা যায় না। মা দুর্গা যে, ব্রহ্মস্বরূপিণী, মা দুর্গা যে, শিব-শিবাত্মিকা, মা দুর্গা যে, বিশ্বজনক ও বিশ্বজননীর মিলিতমূর্ত্তি, যথার্থভাবে তাহা অনুভব করিতে হইলে, যথার্থভাবে মা দুর্গার পূজা করিতে হইবে, সমাধিনেত্রের উন্মীলনপূর্ব্বক মা দুর্গাকে ভাল ক'রে দেখিতে হইবে, মা দুর্গা যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শিব-শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, পূজা বা যোগদ্বারা তাহা অনুভব করিতে হইবে। দাদা! এই নিমিত্ত 'দুর্গে! মা তোমাকে কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিব', আমার তাহা জানিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! পূজা করিতে হইলে 'আত্মশুদ্ধি', 'স্থানশুদ্ধি', 'দ্রব্যশুদ্ধি', 'মন্ত্রশুদ্ধি' ও 'দেবশুদ্ধি' এই পঞ্চশুদ্ধি অবশ্য কর্ত্তব্য, পঞ্চশুদ্ধি বিনা পূজা হয় না, পূর্ব্বে এইকথা শুনিয়াছি, আত্মশুদ্ধ্যাদি পঞ্চশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজা হয় না কেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে না পারিলেও, কিঞ্চিন্মাত্রায়

বুঝিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, মল-শোধনই পূজার প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। মল-শোধনই যে, পূজার প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, আপনার কৃপায় তাহা একটু অনুভব করিতে পারিয়াছি, এবং তাহা অনুভব করিয়া বড় আনন্দ পাইয়াছি, আশা হইয়াছে, 'মল-শোধনই পূজার প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম', পূর্ণভাবে এই উপাদেয় উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। পূজ্য নির্ম্মল, অপাপবিদ্ধ, পূজ্য মহান্, এই নিমিত্ত পূজ্য অনুরাগের পাত্র, বিশুদ্ধ ভালবাসার সামগ্রী। আত্মাই বস্তুতঃ স্বভাবতঃ নির্ম্মল, আত্মাই বস্তুতঃ স্বভাবতঃ অপাপবিদ্ধ, স্বভাবতঃ মহান্, তা'ই আত্মাই সকলের স্বভাবতঃ প্রিয়, অনুরাগ বা ভালবাসার সামগ্রী। আত্মা স্বভাবতঃ নির্ম্মল, আত্মা স্বভাবতঃ অপাপবিদ্ধ, স্বভাবতঃ মহান্ হইলেও, আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আত্মার নির্ম্মলত্ব, আত্মার অপাপবিদ্ধত্ব, আত্মার মহত্ত্ব, অনুভব করিতে পারি না। তাহা পারি না কেন ? তাহা না পারিবার কারণ হইতেছে, আত্মা স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও, মহান্ হইলেও, আত্মার স্বরূপাবস্থিতি আমরা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি না, আত্মার স্বভাব সর্ব্বদা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, অনেক সময়ে আমরা আত্মার মলিনীভূত অবস্থাকেই, পরিচ্ছিন্ন রূপকেই দেখিয়া থাকি। যাঁহার আত্মবোধ যে মাত্রায় বিশুদ্ধ, তিনি সেই মাত্রায় মহান্ হইয়া থাকেন, সেই মাত্রায় বিবিধ সদ্গুণভূষিত হন, বহুজনের প্রিয় হন, পূজ্য হন। যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে, এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখিতে পান, তিনি সকলকে আত্মভাবে ভালবাসিয়া থাকেন, কেহই তাঁহার দ্বেষ্যরূপে বিবেচিত হয় না, অতএব তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বজনীন প্রেমের উদয় হয়। আপনার কৃপায় উপলব্ধি হইয়াছে, আমির আমি আছেন, 'আমি' ('অহম্') বলিতে আমরা যাঁহাকে বুঝিয়া থাকি, তাঁহার অন্তর্বর্ত্তী, তাঁহার অন্তর্যামী আছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'নীহার-প্রাবৃত—'নীহার সদৃশ অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন, যে কোন উপায়ে হোক্, উদরপূরণ, ইন্দ্রিয়সেবা, ঐহিক সুখ-ভোগ যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাঁহারা কখন পরমেশ্বরের—অহংপ্রত্যয়গম্য জীবাত্মার অন্তর্ব্বর্ত্তী—অন্তর্যামী পরমাত্মাকে—আত্মার আত্মাকে জানিতে পারে না ('ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥ ঋগ্বেদ-সংহিতা, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিত)। আত্মার আত্মা বা পরমাত্মাই—পরমেশ্বরই সকলের পরানুরাগের বিষয়, পরমপ্রেমাস্পদ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরই পূজ্যতম। যাহা স্বভাবকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, যাহা স্বভাবের

স্বভাবে প্রকাশিত হইবার পথের অবরোধক, তাহা 'মল'। অতএব আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজা হইতে পারে না। 'আত্মন্' শব্দ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির বাচক-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ অনেকে দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। যে সকল ক্রিয়া দ্বারা দেহাদির স্বরূপ দর্শন হয়, সেই সকল ক্রিয়া দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে। স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গাদি ন্যাস ইত্যাদি দ্বারা আত্মশুদ্ধি, আত্মার স্বরূপোপলব্ধি হইয়া থাকে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, ইহারা আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায়, যম-নিয়মাদি অষ্ট যোগাঙ্গের সাধন ব্যতিরেকে আত্মশুদ্ধি হয় না, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির মল অপনোদিত হয় না। আপনি বলিয়াছেন, 'পূজা' ও 'যোগ' এক সামগ্রী, কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রতি শুভকর্ম্ম মাত্রেই পূজা। শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদে এবং যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের যোগ-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, "হৃদয়কে রাগদ্বেষাদি দোষ বিরহিত করা, বাক্যকে অনৃতাদি দোষ বা মলবিমুক্ত করা এবং শরীর দ্বারা হিংসাদিরহিত, আত্মপরের হিতসাধক কর্ম্ম করা, প্রকৃত ঈশ্বর-পূজন" ("রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিনা। হিংসাদিরহিতং কর্ম্ম যত্তদীশ্বর পূজনম্॥")। শ্রীজাবাল দর্শনোপনিষৎ ও যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরপূজনের যে স্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে কায়মল, বাঙ্‌মল ও মনোমলের শোধনই যে ঈশ্বরপূজন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। পূজা ও যোগ যে, এক পদার্থ, পূজা ও ধর্ম্ম ও পূজা ও কর্ত্তব্যনীতি যে ভিন্ন সামগ্রী নহে, আপনার অনুগ্রহে তাহার একটু আভাস পাইয়াছি। আপনি বুঝাইয়াছেন, রূপ-রসাদি আপাত-প্রতীয়মান বিভিন্ন ভাবসমূহের দেশ-কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, নিরুপাধিক, পূর্ণ পরসম্বিৎ বা পরব্রহ্মের সহিত যে সঙ্গতি, যে একীকরণ, তাহার নাম প্রকৃত পূজা'। প্রকৃত পূজার এই লক্ষণের যথার্থ অর্থ কি, তাহা আপনি বুঝাইয়া দিয়াছেন, আপনি বলিয়াছেন, 'সর্ব্বভাবপ্রপূরক, সর্ব্বভাবময় ভগবানে বিশেষ বিশেষ ভাবকে মিশাইয়া দেওয়াই, আমার 'আমার' বলিবার কিছুই নাই, সর্ব্বময়, সর্ব্বাধিকারীরই সব, ইহা জানিয়া পূর্ণভাবে আমি তাঁহার এই ভাবকে হৃদয়ে দৃঢ় ও পূর্ণভাবে আসন দিয়া তাঁহাতে বিলীন হওয়াই প্রকৃত পূজা, প্রকৃত পূজা কাহাকে বলে, তাহার একটু আভাস পাইয়াছি, প্রাণ জুড়াইয়াছে, হৃদয়ে শান্তির উদয় হইয়াছে, উপলব্ধি হইয়াছে, বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহের

মধ্যে সামান্য ভাবের আবিষ্কার হইতে বিজ্ঞানের উদয় হয় ("Science arises from the discovery of identity amidst diversity.") যিনি এই কথা বলিয়াছেন, তিনি কখন যথোক্তলক্ষণ পূজাকে বিজ্ঞানপ্রসূতি বলিতে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না, চিত্তের একাগ্রতাকে (Concentration) যিনি জাগতিক ও পারমার্থিক উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, চিত্তের একাগ্রতাকে যিনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির (Success) হেতু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং অন্যকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,করিতেছেন * তিনি কখন যথোক্ত লক্ষণ পূজাকে সাংসারিক ও পারমার্থিক উন্নতির কারণরূপে সমাদর করিতে বিমুখ হইবেন না। যিনি কর্ত্তব্যনীতিকে সর্ব্বোপরি আদর করেন, ঈশ্বর পূজন, ঈশ্বরপ্রণিধান, ঈশ্বরভক্তিকে যিনি নিরর্থক বলিয়া উপেক্ষা করেন, একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে, তিনিও বস্তুতঃ যথোক্তলক্ষণ পূজাকে অবগণিত করিতে, অসভ্যোচিত অনর্থক কর্ম্ম বলিতে পারিবেন না, যে চিত্ত রাগদ্বেষাদি মলযুক্ত, যাঁহার বাক্ মিথ্যাদি দোষ দূষিত, যিনি হিংসাদিকর্ম্ম-নিরত, যাঁহার হৃদয় সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্গুণভূষিত নহে, যাঁহার আত্মবোধ সংকীর্ণ, তিনি যে সাধুচরিত্র, সুশীল, সমাজের হিতসাধনে তৎপর হইতে পারেন না তাহা বলা বাহুল্য। মহতের সঙ্গ না করিলে হৃদয়ের লক্ষ্য কদাচ মহৎ হইতে পারে না।

বক্তা—মহতের সঙ্গ মানুষের হৃদয়কে উন্নমিত করে সত্য কিন্তু কি ভাবে মহতের সঙ্গ করিলে, মানুষ মহান্ হয়, তাহা জানিবার চেষ্টা করিও। মহতের সঙ্গ দুর্ল্লভ, মহতের কাছে গেলেই, মহতের সঙ্গ করা হয় না, যথার্থভাবে মহতের সঙ্গ করিতে হইলে, হৃদয়কে বিগলিতাভিমান করিতে হইবে, চিত্তলগ্ন

---

* "Concentration without is illustrated when the individual does work upon Nature such as learning a trade, a profession, a sience, an art or carrying on a business and to which he devotes his whole attention."—*Concentration.*

"We have seen that the 'Three-fold key of attainment' is composed of (i) Insistent desire, (ii) Confident Expectation and (iii) Persistent will."—*The Psychology of Success.* *P. 82.*

পূর্ব্ব সংস্কার সমূহকে বিধৌত করিতে হইবে, রঞ্জিত মুকুরে যেমন কোন বস্তুর যথার্থ প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেইরূপ অভিমান রাহুগ্রস্থ চিত্তে সাধুর সঙ্গের প্রতিবিম্ব যথাযথভাবে পতিত হয় না, বিগলিতাভিমান না হইয়া মহতের সঙ্গ করিলে, মহতের সঙ্গ হয় না, নিজ সঙ্গই হইয়া থাকে। যাহা বলিতেছিলে বল।

জিজ্ঞাসু নন্দ—যাঁহার হৃদয় মহৎ নহে, বিশাল নহে, তিনি কি যথার্থভাবে কর্ত্তব্যনীতিপরায়ণ হইতে পারেন? যিনি সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বকার্য্যের কারণ, করুণা, ক্ষমা, জ্ঞান, বাৎসল্য প্রভৃতি কল্যাণ গুণগ্রামের আধারকে পূজা করেন না, তাঁহার প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তিনি কি অন্য কাহাকেও বিশুদ্ধভাবে ভালবাসিতে পারেন? সে অকৃতজ্ঞ, পাপমলীমস হৃদয়ে কি প্রকৃত প্রেমের উদয় হইতে পারে? আপনার অনুগ্রহে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, 'ত্রিলোকে পূজার সমান পুণ্য কর্ম্ম নাই,' এই কথা অনবদ্য, এই কথা সারতম, এই কথা সত্যের সত্য। আপনি বলিয়াছেন, 'যিনি যাঁহার প্রিয়, যাঁহাকে যিনি আত্মীয় মনে করেন, ভালবাসেন, না চাহিলেও তাঁহাকে তিনি কিছু না কিছু (যাহা তাঁহার বুদ্ধিতে ভাল) দিয়া থাকেন। প্রিয়জনকে কিছু দিতে পারিলে, আনন্দ হয়, আত্মতৃপ্তি হয়। তাহা হয় কেন? যাহার হৃদয় সংকীর্ণ, যে, অত্যন্ত কৃপণ, সে যে পুত্রাদিকেও স্বেচ্ছায় কিছু দিতে পারে না, সে যে আত্মাকেও কিছু দিতে চায় না, তাহার কারণ কি? আমি আপনাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, আপনি আমাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি, করিতেছি, করিব, তাদৃশ উত্তর আমাকে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছে তদ্দ্বারা আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি বলিয়াছেন,'আত্মাই যে সকলের প্রিয়তম, আত্মার জন্যই যে, অন্যে ভালবাসা হয়,আত্মীয়ভাব বশতই যে অন্যের সুখবর্দ্ধনের ইচ্ছা হয়,অন্যকে ধনাদি দিবার প্রবৃত্তি হয়,তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহাদের আত্মজ্ঞান সংকীর্ণ যাহারা ধনাদিকেই আত্মা বলিয়া জানে তাহারা স্বেচ্ছায় অন্যকে কিছু দিতে পারে না। যাঁহারা ভগবান্‌কে আত্মার আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, ভগবান্‌কে সুতরাং প্রিয়তম বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বভাবময় ভগবান্ বা পরমাত্মা ছাড়া যাঁহারা অন্য কাহাকেও—অনাত্মীয়ভাবে প্রতীয়মান কোন পদার্থকেও ভালবাসিতে পারেন না, ভগবান্ বা পরমাত্মা ভিন্ন যাঁহাদের নয়নে অন্য কোন পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না, তাঁহারা ভগবান্ বা পরমাত্মার জন্য তাঁহাকে ভাল বাসেন, সুখ-প্রাপ্তির সাধন বোধে তাঁহাকে

ভালবাসেন না, ভগবান্ বা পরমাত্মাই তাঁহাদের আনন্দ, তাঁহাদের ঈপ্সিততম, ভগবান্ বা পরমাত্মা তাঁহাদের দৃষ্টিতে সুখ প্রাপ্তির হেতুভূত বা সাধনরূপে পতিত হন না, ধনাদি পাইবার আশায় তাঁহারা ভগবানের সেবা বা পূজা করেন না,—ভগবান্কে ভালবাসেন না। যাঁহারা ধনাদি পাইবার আশায় কাহাকেও ভালবাসেন, কাহারও সেবা করেন, তাঁহারা সেব্যকে ঠিক ভালবাসেন না, তাঁহারা সেব্যের জন্য সেব্যের সেবা করেন না, তাঁহারা ধনাদি পাইবার নিমিত্ত সেব্যের সেবা করিয়া থাকেন। 'পরমাত্মাই সব, সকলই তাঁহার', এই জ্ঞানের বিকাশ হইলে, প্রকৃত পূজা হয়।

বক্তা—যাহারা কৃপণ, যাহারা ধনাদিকেই আত্মবোধে ভালবাসে, তাহারাও যে (শুদ্ধভাবে না হইলেও), আত্মার পূজা করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কৃপণেরা স্বয়ং কিছু ভোগ না করিয়া, পরের জন্য সর্ব্বস্ব দান করে। আহা! দুর্ভাগ্য কৃপণ যদি আত্মাকে জানিয়া, প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক পরমাত্মাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারিত, তাহা হইলে কৃতার্থ হইত। রমা! এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে, তাহা বল, শুনি।

রমা—এই সকল কথা শুনিয়া, আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে।

বক্তা—তুমি এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিতেছ?

রমা—যাহা বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতেই আমার পরমানন্দ হইতেছে। আমার বেশী কথা বুঝিবার শক্তি নাই, আমার বেশী কথা বুঝিবার প্রয়োজনই বা কি দাদা!

বক্তা—তুমি কি বুঝিয়াছ রমা?

রমা—আমি বুঝিয়াছি, সীতারাম বা গৌরীশঙ্করই সব, সীতারাম বা গৌরী-শঙ্করেরই সব, যিনি সব, যাঁহার সব, তাঁহাকে সব দেওয়া, আমার বলিয়া যাহা কিছু আছে মনে করি, বস্তুতঃ সে সবই তাঁহার, আমার 'আমার' বলিবার কিছুই নাই, আমিই তাঁহার, আমার 'আমার' বলিয়া যাহা কিছু আছে, পূর্ব্বে মনে হইত, আপনার কৃপায় এখন বেশ বুঝিয়াছি, যে সকলই তাঁহার এতদিন অজ্ঞান বশতঃ সেই সকলকে আমার বলিয়া ভাবিয়াছি, চুরি করিয়াছি। অস্তেয় ধর্ম্ম পালন করি নাই, তাই সীতারাম বা গৌরীশঙ্করের সর্ব্বাশ্রয় চরণবিচ্যুত হইয়া, কারাগারে বাস করিতেছি। দুর্গে! বিশ্বজননি! জ্ঞানহীন করুণাযোগ্যা রমার ও স্নেহময়ী গর্ভধারিণি! মাগো! এইবার আমাকে কিরূপে তোমাকে যথার্থভাবে পূজা করিব, তাহা শিখাইয়া দেও, কিরূপে আমি

তোমাতে আমার ক্ষুদ্রতম আমিত্বকে বিলীন করিব, জ্বালাযন্ত্রণাময়, সংসার মরুভূমি হইতে তোমার চির শান্তিময়, যোগিজনবাঞ্ছিত, ভক্ত কাঙ্ক্ষিত, জ্ঞানীদিগের ঈপ্সিততম, চরণে মিশাইয়া দিব, তাহা বলিয়া দেও, তোমার রমাকে মাগো! পূর্ণভাবে তোমার করিয়া লও, মাগো! আমি অপরাধের আলয়, আমি অকিঞ্চন, তুমি অগতির গতি, তুমি আমার উপায়ভূত হও। দাদা! এই সকল কথা শুনিয়া, আমার এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, আমি যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমার মা দুর্গার স্বরূপ জানিয়া, মা দুর্গা বোধে সকলকে ভাল বাসিতে পারি। আমার এখন একান্ত প্রার্থনা, কিরূপে সকল পদার্থকে মা দুর্গা ব'লে বিশ্বাস করিতে পারিব, সকল পদার্থকে শিব-শক্ত্যাত্মক বলিয়া ভাবিতে পারিব, সকল পদার্থকেই মা দুর্গা জানিয়া সকলের চরণে পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ করিতে পারিব, আমাকে আপনি সেই পূজা শিখাইয়া দিন। ইহা ছাড়া আমি আর কিছু জানিতে চাই না, আর কিছু বুঝিবার শক্তিও আমার নাই। যাহা কাণে শুনি, যাহা মুখে বলি যেন তাহা কাজে করিতে পারি।

রমা—কিরূপে মা দুর্গার পূজা করিবে, মা দুর্গার পূজা বিষয়ক উপদেশসমূহকে কিরূপে ব্যবহারে আনিবে।

বক্তা—'যাহা মুখে বলি, যাহা কাণে শুনি, তাহা যেন কাজে করিতে পারি,' রমা! এইরূপ প্রার্থনা কিরূপ হিতকরী, ইহার গর্ভে কত রত্ন আছে, তাহা একবার ভাল ক'রে ভাবিয়া দেখ। আমরা অনেক উচ্চ কথা বলি, শাস্ত্র বা শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষের মুখ হইতে শুনিয়া, আমরা আবশ্যক হইলে অন্যকে অনেক ভাল ভাল কথা শুনাইয়া থাকি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন যাহা বলি, স্বয়ং পূর্ণভাবে তাহা করি? কয়জনের পূর্ণভাবে তাহা করিবার যথার্থ চেষ্টা হইয়া থাকে? বহু কথা কাণে শ্রবণ করি, শ্রবণকালে হয় ত তাহাদের মধ্যে অনেক কথা ভাল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আমরা যাহা যাহা শুনি, তাহাদিগকে কি ব্যবহারে আনিবার যত্ন করি? শুনিয়াছি, স্বাধ্যায়

করিলে, ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয়, সিদ্ধ ও ঋষিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দর্শন চিত্তবিভ্রম নহে, কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে, কারণ ইষ্টদেবতা বা ঋষি ও সিদ্ধগণ তোমার কার্য্য করিয়া দেন, তোমার অভাব মোচন করেন, কত মুমূর্ষু এইরূপ দর্শন লাভপূর্ব্বক পুনর্জীবন পাইয়াছেন, কত অল্পজ্ঞ বহুজ্ঞ হইয়াছেন, কত দরিদ্রের দারিদ্র্যদহনের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কত অপুত্রক পুত্র পাইয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাক্, যাঁহারা স্বাধ্যায় দ্বারা এইরূপ সিদ্ধি হয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্বাধ্যায় করিবার জন্য উৎসাহী হয়েন? যাঁহারা বিজ্ঞান (Science) পড়েন, বিজ্ঞান পড়ান, বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া মানুষ ঐহিক জীবনকে কথঞ্চিৎ বাধারহিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন যথার্থভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন? বিজ্ঞানাধ্যয়ন ব্যবহারে অনিবার চেষ্টা করেন? বিজ্ঞান পড়িয়া ঋষিদিগকে বিজ্ঞানবিহীন বলিয়া উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য বহু-ব্যক্তির হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক তথ্য আবিষ্কার করিবার শক্তি, পার্থিব জীবনকে কিঞ্চিন্মাত্রায় বাধারহিত করিবার যোগ্যতা অল্পজনেরই হইয়া থাকে। শাস্ত্রপাঠপূর্ব্বক অবগত হইয়াছেন, 'ত্রিলোকে পূজার সমান দ্বিতীয় পুণ্যকর্ম্ম নাই', শাস্ত্রপাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছেন, মা দুর্গার বা ভগবানের কোন রূপের যথাবিধি পূজা করিলে মানুষের কোন অভীষ্ট অসিদ্ধ থাকে না, শাস্ত্র পাঠপূর্ব্বক পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, ভাবনার উপচয় দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতিবৎ সর্ব্বকার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারেন, যিনি যথার্থভাবে নিরন্তর ঈশ্বরের ধ্যান করেন, তাঁহার সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তিমত্তার বিকাশ হয়। ভাবিয়া দেখ, কয়জন ইহা জানিয়াও যথার্থভাবে ঈশ্বরপূজন করিবার অভিলাষী হ'ন? কয়জন নিরন্তর ঈশ্বরের ভাবনা করেন?

রমা—দাদা! আপনি যাহা যাহা বলিলেন ক্ষুদ্রমতি হইলেও, আমার মনে হইতেছে, ইহারা সত্য কথা। কিন্তু জানিবার ইচ্ছা হয়, যাহা মুখে বলি, কাণে শুনি, তাহা কাজে করিবার ইচ্ছা হয় না কেন?

বক্তা—স্বল্পভাষী, সারভাষা, তথ্যবহুল গম্ভীরাত্মক উপদেশ দাতা শাস্ত্র এবং শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বজন্মের অশুভ কর্ম্ম বা দুরদৃষ্টই তাহার কারণ, আড়ম্বরশূন্য এই স্বল্পাত্মক উত্তরই পাওয়া যায়।

"দুর্গে! মা কিরূপে তোমার পূজা করিব?" রমার এই প্রশ্নের উত্তর।

বক্তা—রমা! তুমি মা দুর্গাকে কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিবে, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, আমি তা'ই 'দুর্গে! মা কিরূপে তোমার পূজা করিব', মা'কে বার বার তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, যাহা বুঝিয়াছি, তোমাকে সংক্ষেপে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব। রমা তুমি ত বহুবার শুনিয়াছ, যে যাঁহাকে ভালবাসে, সে তাঁহাকে, তিনি না চাহিলেও, তাঁহার কোন অভাব না থাকিলেও তাহার যাহা প্রিয়, তাহার বুদ্ধিতে যাহা উপাদেয়, সে তাঁহাকে তাহা দিয়া সন্তুষ্ট হয়। আচ্ছা, বল শুনি, প্রিয়জনকে প্রিয় সামগ্রী দিবার স্বতঃপ্রবৃত্তি হয় কেন, মা সন্তানকে ভাল জিনিস খাওয়াইয়া যাদৃশ তৃপ্তিলাভ করেন, স্বয়ং খাইয়া তাদৃশ তৃপ্ত হ'ন না, ইহার কারণ কি?

রমা—মা যে, স্বসুখে নিরভিলাষ হইয়া সন্তানকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন, তাহার কারণ, সন্তানকে মা, আত্মা বা আত্মীয় বলিয়া জানেন।

বক্তা—মা সন্তানকে আত্মা বা আত্মীয় বলিয়া জানেন, তা'ই স্বসুখে নিরভিলাষ হইয়া মা সন্তানকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন, তোমার এই কথা সত্য, সন্দেহ নাই, তবে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সন্তানের প্রতি আত্মজ্ঞান যদি মা'র স্বসুখে নিরভিলাষ হইয়া সন্তানকে সুখী করিবার কারণ হয়, তবে মা স্বয়ং সুখী হইবার চেষ্টা না করিয়া সন্তানকে সুখী করিবার চেষ্টা করিবেন কেন? মা'র নিজ আত্মাও ত মা'র আত্মা। শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, অন্য সর্ব্বপদার্থ হইতে প্রিয়তর; আত্মা যদি পুত্র হইতে প্রিয়তর হন, তবে মা স্বসুখে নিরভিলাষ হইয়া পুত্রকে সুখী করিতে পারেন কি?

রমা—আমি আপনার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মা যে নিজ সুখে নিরভিলাষ হইয়া সন্তানকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; মানুষের কথা কি, পশু-পক্ষীরাও দেখিয়াছি আপনি না খাইয়া সন্তানকে খাওয়ায়।

বক্তা—আত্মাই যে পরম প্রেমাস্পদ, আত্মাই যে, প্রিয়তম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মা নিজ সুখে নিরভিলাষ হইয়া সন্তানকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন, এই কথা সত্য নহে, সন্তান মা'র আত্মা হইতে অভিন্ন, সন্তানকে মা

আত্মা বলিয়াই জানেন, অতএব মা আত্মসুখে নিরভিলাষ হইয়া সন্তানকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন না, মা প্রকৃতপক্ষে আত্মাকেই সুখী করিবার চেষ্টা করেন, মা যদি সন্তানকে আত্মা বলিয়া না ভাবিতেন, তাহা হইলে, তিনি কখনও সন্তানের সুখে সুখিনী হইতেন না। গর্ভধারিণী মাত্রেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্বসুখে নিরভিলাষ হইয়া সন্তানকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন না। একটু ভাবিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে আসন্ন চেতন পশু-পক্ষীদিগের অপত্য স্নেহে যেমন অবুদ্ধিপূর্ব্বক ভাব লক্ষিত হয়, মানুষের অপত্যস্নেহে তেমন সার্ব্বত্রিক অবুদ্ধিপূর্ব্বক ভাব দৃষ্ট হয় না। পশু-পক্ষীরা সন্তানের সকাশ হইতে কিছু পাইবার আশা না করিয়া যেমন সন্তানদিগকে লালন-পালন করে, সন্তানদিগকে সুখী করিবার চেষ্টা করে, মানুষ মাত্রেই সর্ব্বত্র সেইরূপ নিঃস্বার্থভাবে সন্তানগণকে ভালবাসে না।

রমা—আমি আপনার এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। মানুষ যে, সন্তানগণের সকাশ হইতে কিছু পাইবার আশা করে, তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু সকল মা যে, সন্তানদিগের নিকট হইতে কিছু পাইবার আশায় বুদ্ধিপূর্ব্বক সন্তানকে ভালবাসেন, সন্তানের সুখের জন্য স্বয়ং বিবিধ বাধা সহ্য করেন, কোন মাতৃহৃদয়েই যে অপত্য স্নেহ স্বভাবতঃ প্রবর্ত্তিত হয় না; আমি তাহা মনে করি না। সকল মাই কি, সন্তান বড় হ'লে, আমায় উপকার করিবে, এই প্রকার বিচারপূর্ব্বক সন্তানকে ভালবাসিয়া থাকেন? মা'র অপত্যস্নেহের প্রথম প্রবৃত্তি কি, অবুদ্ধিপূর্ব্বক নহে? সহজ নহে?

বক্তা—তোমার প্রশ্ন অতি সুন্দর, ইহা বিচারশীলের উচিত প্রশ্ন। চুম্বক যেমন লৌহকে স্বভাবতঃ আকর্ষণ করে, লৌহও সেইরূপ চুম্বকের সহিত স্বভাবতঃ মিলিত হইবার জন্য সতত সচেষ্ট। আমি কেন ইহা করিব, তাহা বিচার না করিয়া কর্ম্ম করিবার দৃষ্টান্ত আমাদের নয়নে পতিত হয়, সন্দেহ নাই। চুম্বক যে, লৌহকে আকর্ষণ করে, লৌহকে আকর্ষণ করিলে, লৌহের সহিত মিলিত হইতে পারিলে, আমার যে লাভ হইবে, ইহা জানিয়া, চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে না। 'চুম্বক যে, লৌহের মত অন্য কোন বস্তুকে আকর্ষণ করে না, তাহার কারণ কি?' 'ইহা চুম্বকের স্বভাব,' উক্ত প্রশ্নের ইহাই উত্তর। ইতঃপর জিজ্ঞাসা হইবে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্বভাব যে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, তাহা কি নিষ্কারণ? উত্তর—বিনা কারণে কিছুই হয় না; অতএব তাহা নিষ্কারণ নহে। মা যে সন্তানকে ভালবাসেন, স্বাভাবিক প্রেরণাই তাহার

মূল কারণ।' এই স্বাভাবিক প্রেরণাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সনাতন বেদের প্রেরণা ব'লয়া বুঝিবে। সকলেই স্ব স্ব প্রতিভানুসারে কর্ম্ম করে। রমা! তুমি এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আপাততঃ বুঝিতে পারিবে না, অতএব তোমার এই সকল কথা আপাততঃ ভাল লাগিবে না। এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া, তোমার যেমন ইহারা নীরস কথা বলয়া বোধ হইতেছে, সকলেরই প্রথমে সেইরূপ হইয়া থাকে, তাহার পর অভ্যাস করিতে করিতে, পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে যাহারা প্রথমে নীরস মনে হয়, তাহারাই সরস হইয়া থাকে, তাহারাই কিছুদিনের অভ্যাসবশতঃ ভাল লাগে। যাহার সহিত যাহার নূতন পরিচয় হয়, তাহাকে সে প্রথমে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসিতে পারে না, তৎপরে সঙ্গ করিতে করিতে সে প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রাণীর আহার, প্রীতি, দ্বেষ প্রভৃতি যে, অনাদি প্রতিভা বা সংস্কারবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, তাহা তুমি দর্শন ও পরীক্ষা করিলে, জানিতে পারিবে। চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করে, প্রতিভা বা পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কারই তাহার কারণ। জন্মান্তরের ও বর্ত্তমান জন্মের পৃথক্, পৃথক্রূপ কর্ম্ম ও তৎসংস্কারনিবন্ধন পৃথক্ পৃথক্রূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে। তোমার যে, কোন পদার্থে স্বভাবতঃ প্রীতি ও বিদ্বেষ হয়, প্রতিভা বা পূর্ব্ব-সংস্কারই তাহার কারণ। বেদ বা শব্দই প্রতিভার মূল কারণ। এইস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া রাখিতেছি, রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, বেদ শিবের হৃদয়ে নিত্য সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকেন। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বেদ উমা বা দুর্গার হৃদয়ে নিত্য সংস্কাররূপে অবস্থান করেন, দেবীভাগবতে মা বলিয়াছেন, 'আমার পরা শক্তিই বেদ'। বেদের উপদেশ—অনাদিনিধন বাক্ বা শব্দ-ব্রহ্মই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হেতু। অতএব আপাততঃ শুনিয়া রাখ, মা যে সন্তানকে ভালবাসেন, তাহা বেদ বা দুর্গাদেবীর প্রেরণা, তাহা শ্রীরাম-বনিতার—সর্ব্ববেদময়ী, দুর্গা হইতে অভিন্না সীতাদেবীর প্রেরণা, চুম্বক যে, লৌহকে আকর্ষণ করে, তাহা বেদ বা মা দুর্গার প্রেরণা, পরমাণু সকল যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহা বেদ বা মা দুর্গার প্রেরণা সকল বস্তুই সকল বস্তুকে চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ মা'র প্রেরণায় আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ, পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতি বা পরিচ্ছিন্ন স্বভাবনিবন্ধন সকলেই তাহা বুঝিতে পারে না, পরিচ্ছিন্ন বা মলিন স্বভাববশতঃ সকলেই যে, মা'র সন্তান, সকলেই তাহা জানিতে সমর্থ হয়

না। মা যে, সন্তানকে ভালবাসেন, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার পূর্ব্বক নহে, মা'র অপত্য স্নেহের প্রথম প্রবৃত্তি—অবুদ্ধিপূর্ব্বক বা বেদ বা অনাদি প্রতিভা মূলক। আসন্ন চেতন মৃগ—পক্ষীরা স্বভাবের প্রেরণায় সন্তানদিগকে ভালবাসে, মানুষও স্বভাবের প্রেরণায় সন্তানগণকে ভালবাসিয়া থাকে, বর্ত্তমান জন্মের অপিচ জন্মান্তরের সংস্কার ভেদবশতঃ সকল বস্তু সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে পারেনা। পশ্বাদি ইতর জীবগণ যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা বিচারপূর্ব্বক নহে, মানুষ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিচারমূলক বা বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মও করিয়া থাকে, ইহা করিলে এই ফল প্রাপ্তি হইবে, ইহা কর্ত্তব্য এইরূপ বিচার পূর্ব্বক কর্ম্ম করে, তাই মানুষের কর্ম্ম সর্ব্বত্র পশ্বাদি ইতর প্রাণীদগের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। আত্মাকেই সকলে ভালবাসে, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় হইতেছে, যাহা সদা কারা, যাহা চিণ্ময়ী, যাহা পরমানন্দময়ী সকলেই সেই মা দুর্গাকেই ভালবাসে, মা দুর্গার অপরিচ্ছিন্ন প্রেম, অনন্তজ্ঞান, অনন্তসত্তা, পরমানন্দ, পরিচ্ছিন্নভাবে জীবাত্মাতে বিদ্যমান থাকে, তাই বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক, লোকে আত্মাকেই ভালবাসে, জীবের যে, অন্যের প্রতি ভালবাসা হয়, আকর্ষণ হয়, অন্যের প্রতি আত্মবোধই তাহার একমাত্র হেতু। অতএব বুঝুক না বুঝুক সকলেই আত্মার আত্মাকে হর-গৌরী, সীতা-রাম বা রাধা শ্যামকে ভালবাসে, তাঁহার উপাসনা করিবার নিমিত্ত সদা স্বভাবতঃ ব্যস্ত হয়। আমার আত্মার আত্মা অপরিচ্ছিন্না, আমার আত্মার আত্মা অনন্ত, অনন্তা মা দুর্গার প্রেরণায় মানুষের যখন এই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন সে অন্যকে আত্মবৎ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না, তখন তাহার সর্ব্বভূতে আত্মবৎ প্রীতি হয়, সে তাহাকে সুখী করিবার জন্য যত ব্যস্ত হয়, নিজ পরিচ্ছিন্ন আত্মাকে সুখী করিবার নিমিত্ত তত ব্যস্ত হয় না।

রমা—তাহার কারণ কি? নিজ আত্মাও ত আত্মা।

বক্তা—নিজ আত্মা আত্মা বটে, কিন্তু নিজ আত্মাই আত্মা নহে, পুত্রাদিও আত্মা,এইরূপ জ্ঞানেরবিকাশ হইলে,মানুষ নিজ পরিচ্ছিন্ন আত্মাকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত আত্মাকে, প্রসারিত আত্মাকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে, যাঁহার আত্মজ্ঞান যে পরিমাণে বিস্তারিত হয়, পরে যে মাত্রায় যাঁহার আত্মীয় বলে বোধ হয়, তিনি সেই পরিমাণে আপনা হইতে (আত্মার সংকীর্ণ ভাব হইতে) অন্যকে (আত্মার বিস্তৃত ভাবকে) ভালবাসিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেম সেই মাত্রায় নিঃস্বার্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

আগমনী।

এস অসুরদলনি রাণি গো, করাল ত্রিশূল করে।
এস মা জননি, দুঃখ-হারিণি বাঙালার ঘরে ঘরে॥
দ্বারে দ্বারে শোভে মঙ্গল ঘট,
পুষ্প-মালিকা সহকার, বট
জননি তোমার আবাহন গান উঠে দশদিশি ভরে।
দশহাতে তব আনো মা, অভয়—
নাশো রোগ জ্বালা শোক সংশয়,
মানব মনের হীনতার বোঝা, দাও মা ধ্বংস করে।
আনো মা বীর্য্য, আনো মা সিদ্ধি
আনো মা বিদ্যা, আনো মা ঋদ্ধি
চক্ষে আনো মা শান্তির ধারা বিলাও ধরণী পরে॥

শ্রীসরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ই আগষ্ট ১৯২৯।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীচণ্ডী।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের মূর্ত্তিতে যেমন রামায়ণ প্রতিফলিত সেইরূপ শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমায় শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রতিবিম্বিত। চণ্ডীর স্তোত্র সকল যেমন মন্ত্রোদ্ধার গর্ভিত সেইরূপ শব্দময়ী চণ্ডী দুর্গাপ্রতিমা গর্ভিত। তবে সকলে ইহা দেখিতে পায় না কেন? উত্তরে বলা হয় "চক্ষুষ্মন্তোহনুপশ্যন্তি নেতরেঽতদ্বিদোজনাঃ" চক্ষু-ভিতরের তৃতীয় চক্ষু—যাঁহাদের খুলিয়াছে, তাঁহারাই ইহা দেখিতে পান অন্যে ইহা জানিতে পারে না। কিন্তু যে ছয়টী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন শ্রীশ্রীচণ্ডী, তাহাতেও—যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের ভিতরের চক্ষু খুলিবার কুঞ্জী বা চাবীটি পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

এই পূজার দিনে চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া কাতরপ্রাণে মায়ের কাছে এই ছয়টী প্রশ্ন কর আর জগদম্বার অনুগ্রহ প্রাপ্তিজন্য চণ্ডীগ্রন্থ বিধিপূর্ব্বক পাঠ কর

জগজ্জননী কিছু না কিছু অপূর্ব্বতা আনিয়া দিবেনই। জগজ্জননী যে তোমারও গর্ভধারিণী। যে দেবী কবচ মাতার গাত্র (কবচং দেবতা গাত্রং সেই কবচের ৬,৭ মন্ত্রে "বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ" ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদ-শুভং রণসঙ্কটে। নাপদং তস্য পশ্যামি শোকদুঃখভয়ং নহি"॥ ইহার দুর্গা-প্রদীপ টীকায় মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠশূরী বলিয়াছেন "তেষাং চ ভক্তিরহিতেন স্মরণমাত্রেণাপি তজ্জন্যং ভয়াদিকং ন ভবতীত্যাহ ন তেষামিতি—অর্থাৎ তোমার যদি ভক্তিও না থাকে তথাপি জগদম্বার স্মরণমাত্রেই ঐ স্মরণ প্রভাবেই তোমার সমস্ত শোক দুঃখ ভয়, মাই বিনাশ করিয়া দিবেন তুমি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষাকর আপনিই বুঝিবে।

এই ছয়টী প্রশ্ন কি যাহা এই চণ্ডীমণ্ডপে মায়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে হইবে? চণ্ডীতেই এই প্রশ্নগুলি করা হইয়াছে?

মা জগজ্জননি। মা জগদম্ব! মা আমাদের মন সংসারে এত আবদ্ধ কেন? চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি সংসারে কোন কিছুই থাকিতেছে না—কত আসিল, কত গেল সকলই যাইবে ইহাও বুঝিতেছি তথাপি কোন কিছু গেলে এত দুঃখ কেন? আবার যাহাদের লইয়া এখনও সংসারে আছি তাহারাই কি আমার উপর সদ্ব্যবহার করিতেছে? আহা! যে সকল ধনলুব্ধ পুত্রকন্যা স্ত্রী ধনহেতু আমায় সংসার হইতে তাড়াইয়া দিতেছে তাহাদের প্রতি আমার মন কি জন্য স্নেহবদ্ধ হইতেছে? কি করিব, আমার মন সংসারের প্রতি তথাপি নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না।

কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ॥
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতি স্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দি তেম্বেব মে মনঃ॥
*　　*　　*　　*
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেম্বপি বন্ধুষু।
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে॥
করোমি কিং যন্ন মন স্তেম্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্।

যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম, মিত্রপ্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আমায় তাড়াইয়া দিতেছে তাহাদের প্রতিও আমার মন নিতান্ত আসক্ত। স্নেহহীন পুত্র কন্যা স্ত্রী বন্ধু ইহাদের উপরে এখনও আমার চিত্ত যে এত প্রীতিশালী ইহা কেন? একি মা? তাহাদের জন্য আমার দীর্ঘ নিশ্বাস চিত্ত-বৈকল্য কেন?

আমার প্রতি অতিনিষ্ঠুর স্বজন দিতে আমার মন কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না। আমি কি করি?

তারপরে আমার এই দেহ? হাজারও উপায় করি এ দেহ ত থাকিবেই না। তবে আমি ইহারও জন্য এত লালায়িত কেন? আমি মন হইতে এই সব অস্থায়ী বস্তুর ভাবনা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না সেইজন্য আমার এই দুঃখ। "দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা" আমি আমার চিত্তকে আয়ত্ব করিতে পারি না বলিয়াই ত আমি নিরন্তর দুঃখ পাইতেছি। আমি সংসারে শত শত দোষ দেখিতেছি "দৃষ্ট দোষেঽপি বিষয়ে মমত্বা কৃষ্ট মানসৌ" তথাপি আমার মন এই সংসারে এই দেহে আমি আমি আমার আমার করিয়া আকৃষ্ট হইতেছে।

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ॥

* * * *

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

শুনি—মহামায়া তুমি—তোমার প্রভাবে মমতারূপ আবর্ত্ত বিশিষ্ট মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হইয়া আমার সংসারে স্থিতি। শুনি "মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ—জগৎপতি শ্রীহরির যোগনিদ্রা তুমিই নাকি এই জগতকে সংমোহিত কর? মহামায়া তুমি—তুমিই নাকি জ্ঞানিগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক বিবেক হইতে আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত কর? মা আরও শুনি

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী॥

বিদ্যারূপা তুমিই আবার নাকি মানুষের সংসার মোহচ্ছেদনের হেতু? শুনি তুমি প্রসন্ন হইলে মানুষের সমস্ত পুরুষার্থ সাধন তুমিই করিয়া দাও। মা তাই তোমার নিকটে কাতরে জানাইতেছি।

(১) কে তুমি মহামায়া?
(২) কি প্রকারে তুমি উৎপন্ন হও?
(৩) তোমার কর্ম্মই বা কি?
(৪) তোমার স্বভাব কি?

(৫) তোমার স্বরূপ কি ?

(৬) কোথা হইতে তোমার উদ্ভব হয় ?

চণ্ডীগ্রন্থে এই ছটির প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে আর দেখান হইয়াছে সংসারের প্রতি—দেহের প্রতি—নিষ্ঠুর হইতে পারি না—এই যে মোহ ইহা মানুষের থাকিতে পারে না, যখন মানুষ চণ্ডীপাঠে মায়ের লীলায় প্রাণকে ডুবিত করিয়া ফেলিতে পারে।

বলিতেছিলাম শব্দময়ী চণ্ডীর মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা এই চণ্ডীমণ্ডপে। লোকে জানেনা বলিয়াই মনে করে যে দুর্গার সঙ্গে এই যে লক্ষ্মী সরস্বতী—ইহাঁরা দুর্গার কন্যা। না তাহা নহে। এই মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী ও মহাকালীর চরিত্র বর্ণনা যেমন চণ্ডীতে সেইরূপ এই মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালীর প্রতিমূর্ত্তি এই প্রতিমাতে। দুর্গার এই তিন মূর্ত্তি। দুর্গা নয় (৯) মূর্ত্তিতে উপাস্যা বলিয়া ইহাঁকে নবদুর্গাও বলে। তারপর মহিষাসুর বধের মূর্ত্তিটি বিশেষরূপে মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত করিয়া শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ, রক্তবীজ চামুণ্ডাদি বধ বৃত্তান্ত এই চালচিত্রে অঙ্কিত করা হয়।

ভারতবাসী এখনও চণ্ডীপাঠ করে, দুর্গাপূজা করে, তথাপি ভারতবাসীর এত দুঃখ আছে কেন ? বিশ্বাসহীনতার জন্যই জাতির দুঃখ দূর হইতেছে না। বুঝি দুঃখের জন্য প্রাণ যথার্থভাবে কাতর হয় না—বুঝি লোকের প্রার্থনা—প্রাণ গলিয়া বাহির হয় না—বুঝি ইহা বচনমাত্রে আসিয়া শূন্যে মিশাইয়া যায়—মায়ের কাছে পোঁছে না। নতুবা "কো বা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেনুঃ" স্মৃতং সন্ কামধেনুঃ তত্তুল্যঃ সর্ব্বমনোরথপূরকত্বাৎ ইত্যাদি—স্মরণ মাত্রেই কামধেনুর মত সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ হয় যেখানে সেখানে যদি "নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্ত জননীংস্মরন্তি"—সেখানে যদি বালক যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মা মা করিয়া মাকে স্মরণ করিয়া করিয়া কাঁদে, যদি লোকে শঠতা ছাড়িয়া মাকে ভাবনা করে, মাকে স্মরণ করে, তবে কি তাহার দুঃখ দূর হয় না ? সমস্ত জাতি কখন এইরূপ করিতে পারে না, তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, যে সকল নর-নারী বিশ্বাস করিয়া কাতর প্রাণে অকপটে ডাকিতে পারেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত দুঃখ থাকিতেই পারে না।

জগদাত্মিকা, জগদাকারধারিণী, পরচিন্ময়ী তুমি এই সব সত্য, কিন্তু তোমার এই রূপের ধ্যান ত হয় না; প্রার্থনা হইতে পারে বটে কিন্তু প্রার্থনার পরে দেখিবার বাসনা প্রবল হওয়াও ত স্বাভাবিক। শাস্ত্রও বলিতেছেন—

মনসো বিষয়ো দেব রূপং তে নির্গুণং পরম্।
কথং দৃশ্যং ভবেদ্দেব দৃশ্যাভাবে জপেৎ কথম্॥

তোমার শ্রেষ্ঠ নির্গুণ স্বরূপ শ্রবণ মননিদিধ্যাসনাদি সংস্কার বিশিষ্ট মনের বিষয়। এই রূপ দৃশ্য হইবে কিরূপে? চক্ষু ইহা দেখিবে কিরূপে? যখন দেখাই হইল না তখন ইহার ভজনা হইবে কিরূপে? ইহাকে সেবা করা যাইবে কিরূপে? চক্ষু তোমাকে দেখিতে চায়, কায়মনোবাক্যে আমরা তোমার সেবা করিতে চাই। তাই তোমার ধ্যানের মূর্ত্তি আমাদের প্রয়োজন হয়। এক সময়ে তোমার সন্তানগণ প্রাণের জ্বালায় নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছিল, তোমার জন্য প্রাণ বাহির করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তুমি না হইলে তাহাদের রক্ষা আর কেহ করিতে পারে না বুঝিয়াছিল, তাই তুমি মূর্ত্তি ধরিয়া উদয় হইয়া তাঁহাদের দুঃখ দূর করিয়াছিলে, আর আমরা? শত দুঃখরূপে তুমি আমাদিগকে ডাকিতেছ, তথাপি তোমার জন্য আমাদের প্রাণ উৎকণ্ঠাস্ফুটিত হয় না, যাহাদের কথঞ্চিৎ বিশ্বাসও এখনও আছে তাহারা তোমাকে ধ্যান করিতে চায়,তাই শাস্ত্রপ্রকাশিত তোমার এইরূপ তাহারা ধ্যান করিয়া তোমার পূজা করে। ধ্যান করিতে না পারিলে তোমাকে দেখা যাইবে কিরূপে? যখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে তখনই ধ্যান হইবে। চিত্তে আর কিছুই যখন না থাকে তখনই না ধ্যান হয়? চিত্তে শুধু তুমি আছ আর কিছুই নাই—ইহা যখন হইবে তখনই ধ্যান হইবে। ধ্যান হইলেই দেখা যাইবে চিত্ত তোমাতে লয় হইয়া গিয়াছে—তুমিই আছ আর কিছুই নাই।

বাহিরে এই যে জগতটা দেখা যাইতেছে এইটা তোমার মোহোৎপাদনের মূর্ত্তি। কিন্তু ইহার প্রতিবস্তুর ভিতরে মোক্ষদায়িনী তুমি। সেই মোক্ষদায়িনী তোমারই ধ্যানের মূর্ত্তি এই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ইহা তোমারই মূর্ত্তি। সঙ্গে সঙ্গে তোমার লীলাও তোমার প্রতি অঙ্গে, তোমার চালচিত্রে আকার ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মূর্ত্তি দেখিয়া, এই মূর্ত্তির শব্দময়ী স্বরলহরী শ্রীচণ্ডীতে পড়িয়া পড়িয়া ধ্যান ও পাঠে তোমাকে হৃদয়ে পাইবার জন্য এই পূজা।

করিবে এই পূজা? কর তবেই জাতির দুঃখ দূর হইবে তোমার ক্ষমতার অতীত হইলেও মা তোমাকে, তুমি যাহা চাইবে, তাহাই দিয়া দিবেন। মা যে স্মৃতকামধেনু—এমন দয়াময়ী আর যে কেহ নাই। গীতার বীজ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং"। তুমি যদি তোমার স্বরূপ দেখ, সকলের স্বরূপ দেখ,

তখন দেখিবে, শোক করিবার কিছুই নাই, আর স্বরূপ না দেখিয়া ভ্রান্তিরূপে ডুবিলেই যাহার জন্য শোক হইতে পারে না, তাহার জন্য শোক হইয়া যায়, ইহাই গীতার যেমন বীজ কিন্তু তুমি ত আপনার বলে ইহা ছাড়িতে পার না, এই অজ্ঞান দূর করিতে পার না, এই স্বরূপে পৌঁছিতে পার না, তাই কৃপা করিয়া শ্রীভগবান্ গীতার শক্তি দেখাইয়া দিতেছেন বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" সকলের আত্মা আমি, সর্ব্বভূতের হৃদয়ে ঈশ্বর আমি; তোমারও হৃদয়ে রাজাধিরাজ আমি, তুমি শুধু আমাকেই আশ্রয় কর, আমারই শরণ লও আমি ছাড়া আর কিছুই নাই এইটি স্থির বিশ্বাস কর মন হইতে সব তাড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর দুর্গা দুর্গা কর তোমার জন্মজন্মান্তরের দুষ্কৃতি তোমার পুঞ্জীকৃত পাপরাশ এই যে পরিপচ্যমান্ হইয়া তোমার দুঃখরূপে, দেখা দিতেছে "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব শোক করিও না। গীতাতেও যে কথা চণ্ডীতেও তাই।

মা তুমি মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয় বিনাশিনী। মায়াশক্তিরূপা তুমি এত বল আর কাহার আছে? তোমার মত জগৎ রক্ষা করিতে এত উৎসাহ আর কার? মৃত্যুরূপ মহাভয় নাশ জন্য তোমার মত জ্ঞানদায়িনী আর কে? তাই বলা হইয়াছে

বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ।
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণ সঙ্কটে।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোক-দুঃখ-ভয়ঙ্করীম্॥

তাই ত বলিতেছি চণ্ডীপাঠ করিয়া, জগজ্জননীর পূজা করিয়া, এস একটু মায়ের স্তব করিয়া জীবন সার্থক করি।

মা তুমি সকলের আরাধ্য দেবতা—তুমি জগন্ময়ী—মহামায়া বিষ্ণুমায়া। তুমি জগজ্জননী যোগনিদ্রা। তুমিই পরব্রহ্ম পরমাত্মার অবয়বরূপিনী সনাতনী নিদ্রা। তুমি বিদ্যা—আত্মপ্রকাশিকা তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী তুমি; আবার অবিদ্যাও তুমি; অজ্ঞানরূপিণী হইয়া আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখ তুমি; এই দুইরূপে তুমি কাহাকেও সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ আবার যথার্থ প্রাণে কাতর হইয়া যে মুক্তি চায় তাহাকে মুক্তি দিতেছ। সকলে শক্তি তুমি, সকলে

পবিত্রতা বিধানকর্ত্রী তুমিই। তুমিই জ্যোতিঃস্বরূপে সংসারের প্রকাশিকা! আবার তমোরূপে জগৎকে আবরণ করিয়া রাখ তুমিই—অর্থাৎ দিবার প্রকাশ, রাত্রির অন্ধকার তুমিই। জগৎকে রক্ষা কর তুমি, আবার জগতের নাশও কর তুমি। তুমিই পিতৃলোকের আনন্দদায়িনী স্বধা; এই যে সর্ব্বজীবের আধারভূতা বিশালমুর্ত্তি পৃথিবী—এই পৃথিবী ধরিয়া রাখিয়াছ তুমি; জগতের মঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপ মুর্ত্তি ধরিয়া তুমিই। ভবসাগর পার করিয়া দিবার তরণীরূপিণী তুমিই। তুমিই ঈশ্বরী—তুমি মানুষকে অনুগ্রহ করিবার শক্তি। তুমিই যোগ নিদ্রা, মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা। জগতের প্রবৃত্তিরূপিণী তুমি বলিয়া তুমি বিশ্ব-বিমোহিনী আর নিবৃত্তিরূপিণী বলিয়া তুমি জগজ্জননী জগদম্বা, আনন্দরূপিণী মোক্ষদায়িনী। মা আর কি বলিব মঙ্গলময়ি! তুমি যে অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল করিতেছ তাহাই আমাদিগের অনুভবে আনিয়া দাও—এই জাতিটার শান্তি আনয়ন কর। মা প্রসন্ন হও তোমার প্রসন্নতাতে আমাদিগের সকল বিষয়ে মঙ্গল হইবে।

দুর্গাপূজার দিনে ত দুর্গাপূজা করিলে কিন্তু সম্বৎসর আর এক পূজার অভ্যাস রাখিতে হইবে। যাহাতে হৃদয়টা রাগদ্বেষে কলুষিত না হয়; যাহাতে মিথ্যাটা বাক্যকে কলঙ্কিত না করে এবং তোমার কর্ম্মে যাহাতে কাহারও হিংসা না হয় এইরূপ অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শাস্ত্রের নিম্নলিখিত উপদেশ মত চরিত্র গঠন করিতে পারিলে সকল পূজাই পূর্ণ ফলদান করিবেই।

রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং রাগদুষ্টানৃতাদিনা।
হিংসাদি রহিতং কর্ম্ম যত্তদীশ্বর পূজনম্ ॥

জাবালদর্শনোপনিষদ্।

হৃদয়কে রাগদ্বেষ বিরহিত কর, বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া দুষ্ট করিও না আর কর্ম্মের দ্বারা কোন প্রকার হিংসা করিও না ইহাই ঈশ্বর পূজন।

আগমনী।

১
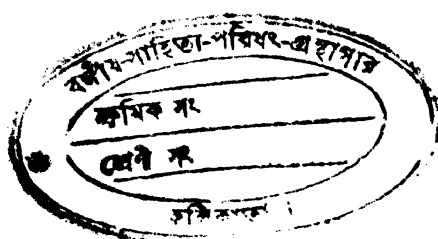
দিতে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি মহামায়া পদতলে,
শরত-প্রভাতে আজি জাগ সব ভগ্নীদলে।
মৃদুল সমীর সনে গুরু গুরু গরজনে
সুনীল গগনে ওই, হের শুভ্র মেঘ দলে,
চলেছে মায়েরে যেন হেরিবারে কুতুহলে।

২

পরাজিয়া সাহানায় বিহগেরা কল তানে
গায় আগমনি-গাথা বিহ্বল করিয়া প্রাণে।
উষার সুহাসে, মরি উমাশশী বোধ করি,
লভিতে চরণে স্থান, শেফালিকা দুলে দুলে,
পড়িছে ঝরিয়া দেখ, প্রভাতের তরু মুলে।

৩

আরাধিতে যোগমায়া, আঁখি মুদে শতদল,
ছিল বুঝি এতদিন, বরষায় ক'রে ছল।
এবে আশা পূর্ণ তার আনন্দ ধরে না আর
মেলিয়া হৃদয় দল খুঁজিতেছে চারি ধার,
কোথা সাধনের ধন, রাঙ্গা পাদ-পদ্ম যার।

৪

অনুরাগে রাঙ্গা হয়ে ফুটিতেছে জবাদলে,
জানে সে লভিবে স্থান ঈশানীর পদ তলে।
হয়ে মহা আনন্দিতা দুলিছে অপরাজিতা,
করবী তুলিয়া মাথা, দেখিতেছে চারিদিক,
আসিবেন দশভুজা, সময় হয়েছে ঠিক।

৫

সুমিষ্ট ফলের রাশি নিয়ে দেখ অগণন—
ফলভরে অবনত, দাঁড়াইয়া তরুগণ।
অন্তরের প্রেমরসে ফলে ফলে ভরেছে সে
হইবে সফল তাহা, লাগিলে যে ভোগে মার,
সারা বরষের আশা, আজি কি পুরিবে তার?

৬

সুদীর্ঘ বরষা শেষে কলনাদি-তটিনীর,
আবিল সলিল রাশি, এবে অনাবিল স্থির।
ধুয়াইতে রাঙ্গাপদ, প্রস্ফুটিত কোকনদ,
নির্ম্মল হয়েছে সবে, পূজিতে নির্ম্মলা মায়,
কুলু কুলু নাদে নদী, আগমনী গেয়ে যায়।

৭

নবদুর্গা পূজিবারে নব দূর্ব্বাদল সাজে,
ধুইয়া কর্দ্দম ধূলি বিল্বপত্র বৃক্ষে রাজে।
মরি কিবা শোভাময় শরতের মায়া ময়
জগন্মাতা পূজিবারে, প্রকৃতির আয়োজন,
পরম পবিত্র সত্ব, কিসুন্দর! কি মোহন!

৮

শারদীয়া মহাপূজা, তুলনা মেলেনা তার,
আছে সবে অপেক্ষায় আশাপথ চেয়ে মার।
অমনি পবিত্র হয়ে নির্ম্মল হৃদয় লয়ে
আমরাও এস বোন, পূজিবারে অভয়ায়,
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ, আনি সর্ব্বমঙ্গলায়।

শ্রীমতী উৎপল কুমারী দেবী।

৺কাশীধাম।

———

এস মা আমার !

এস মা করুণাময়ি ! এস আজ বর্ষণ-লঘু—নির্ম্মেঘ সুনীল গগন মণ্ডলের দিগন্ত-প্রসারী বক্ষপুট সুবর্ণ-ময়ূখে অনুরঞ্জিত করে—সোণার আলোক-স্যন্দনে উঠে - বাংলার এই জীর্ণ পর্ণকুটিরে। দেখ মা ! আজ কুসুম-রাজীর গোলাপ-কপোলে এক অভিনব রঙিন-মাধুরীর অপূর্ব্ব-মূর্চ্ছণ জেগে উঠেছে। অমল রূপের পশরা নিয়ে কুমুদ—কহ্লার-কেতকী -শেফালি অপূর্ব্ব প্রস্ফুটন-মাধুর্য্যে ভরপুর। অতুল সৌন্দর্য্যের ডালি নিয়ে কানন, কান্তার, পর্ব্বত, প্রান্তর, সরিৎ, সায়র, পল্বল সবই শুধু তোমার অভ্যর্থনার—সম্বর্দ্ধনায় উন্মুখ। আজ আত্ম-ভোলা প্রণয়-বিবশ ভৃঙ্গ-চয় সুরভি-সম্ভার আহরণে উদ্‌ব্যস্ত। আজ সমীরণের প্রাণময় সোহাগ-স্পর্শে মৃততরু সঞ্জীবিত—নব কিসলয়-দলে সুশোভিত। আজি বিহঙ্গ-নিচয়ের ললিত-কাকলী লহরীত হয়ে সুদূর নীলিমায় মিশে যাচ্ছে।

এস মা ! এস আজ এই নিঃস্ব বাংলার পর্ণ-কুটীরে। আজতোমার অভয় —রাতুল চরণ-স্পর্শে বিশ্বভুবন পূত—শুদ্ধ—পবিত্র হোক। আজ মা তোমার শুভ আগমনে ব্যথিতের বক্ষতল সুশীতল হোক্ ; তাপিতের মর্ম্মভেদী—জ্বালাময়—তপ্তদীর্ঘশ্বাস সুদূর অনন্তে লীন হয়ে যাক্ ; বিষণ্ণের নির্ব্বাণোন্মুখ—ম্লান হাসি নিভে গিয়ে অতুল আনন্দের—অসীম উল্লাসের অঝোর-ধারা সৃষ্টি করুক। আর তা'দের কলুষ-কালিমায় প্রলেপিত বদন-মণ্ডল আজ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুষমায় ভরে উঠুক্।

এস মা বিশ্বরাণি ! দেখ আজ নিঃস্ব—রিক্ত—অসহায়—জীবন্মৃত বাঙালীর—তোমার সন্তান-মণ্ডলীর কিছু নাই। আজ সবাই অন্তঃসার শূন্য, নিস্তেজ—জড়পিণ্ড। আজ তাদের বুকে বল নাই, হৃদয়ে আশা নাই, প্রাণে শান্তি নাই, মনে স্ফুর্ত্তি নাই। যাদের অন্তরের নির্জ্জনতম প্রদেশে ভাবের ফল্গুধারা—মন্দাকিনী-স্রোত লীলায়িত হয়ে বয়ে যায় ; যাদের প্রতিভা—মনীষা গর্ব্বোন্নত বক্ষে—গৌরবোজ্জ্বল শিরে সারা বিশ্ববাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে ; তা'রা আজ কতটা ধ্বংসের পথে - উৎসন্নের দ্বারে অগ্রসর হয়েছে।

মা ! আজ তোমার আদরের—প্রাণের সন্তানের এমন অবস্থা—এমন দুর্দ্দশা—এমন শোচনীয় পরিণাম কেন ? আজ কি সন্তান তোমার অমৃত—

অভয়—আবাহন-মন্ত্র বিস্মৃতির অতল-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছে? আজ কি তোমার চির-পবিত্র—চির-বিশুদ্ধ—পরমপূত অর্চ্চন-মণ্ডপ কলুষিত—অপবিত্র করেছে? আজ কি সকলে মহাকালের অগ্নি-বিজ্ঞানের গভীর আরাবে ভীত ত্রস্ত হ'য়ে সার্ব্বজনীন-ভাব মুছে ফেলেছে? সে জন্যই কি তাদের এমন দুরবস্থা; এমন দুর্দ্দশা মা? বল বল! কোন্ মহাপাতকে তারা আজ তোমার পূজা—আরাধনা অর্চ্চনায় বঞ্চিত?

মাগো! যে জাতির জাতীয়তা নাই, যা'র পরানিষ্ট সাধনের কূট উপায়—তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলে সংসারে খ্যাত, যা'র শূন্যগর্ভ আস্ফালন মহানাদর্শ—উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত, যা'র অন্তঃসারশূন্য মৌখিক ও লৌকিক আড়ম্বরের নাম অধ্যবসায়, যা'র স্বপরিবার—তত্ত্বাবধানে অসমর্থতা সত্ত্বেও "বন্দেমাতরম্," "বন্দেমাতরম্" করে ঋষভ-নিনাদের নাম দেশ-হিতৈষিতা, যার শত শত প্রকার কূট-কৌশল ও চাতুরী-জালের নাম প্রতিভা, যা'র কায়িক ও মানসিক যত্নের মুখ্য উদ্দেশ্য বিলাস-বৃত্তির চরিতার্থ-সাধন, যা'র গর্ব্বোদ্ধত শির দেব-সমীপে আনত করতে কুণ্ঠা এসে মসীময় হৃদয়কে গাঢ়তর তমসায় আচ্ছন্ন করে; তার —সে অধঃপতিত জাতির কি মা কখন উন্নতি—কল্যাণ হবে না? কবে হবে মা?

মা আমার! "বারেকের তরে ক্ষমহ তনয়ে"। তুমি ব্যতীত কে তাদের রক্ষা করবে মা? করুণাময়ী তুমি। তোমার সন্তান-মণ্ডলীকে আজ প্রবুদ্ধ—উদ্বোধিত—অনুপ্রাণিত কর। সকলে এক মনে, একপ্রাণে, একতানে বিভোর—তন্ময় হয়ে বন্দনাগীতি আরম্ভ করুক্;—

"ত্বংহি দুর্গা দশ-প্রহরণ ধারিণী
কমলা কমল-দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দেমাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥"

আজ হ'তে তা'রা মা তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির কোলে কোলে চিন্ময়ী মূর্ত্তির ধ্যানে—ভাবে মগ্ন হ'য়ে মহাপূজায় রত হোক্।

"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান—
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥"

আশীর্ব্বাদ কর জননি! প্রত্যেক সন্তানের বুকে আজ অতুলশক্তি, হৃদয়ে নবীন উৎসাহ, মনে অসীম উল্লাস, চিত্তে গভীর ভাবের এমন তীব্র প্রবাহ বহায়ে দাও, যেন এই শ্রীহীন—সৌন্দর্য্যহীন—সুষমাহীন পল্লী-হৃদয়ে আনন্দের উৎস-ধারা উদ্দাম গতিতে ছুটে যায়। যেন সকলে মানুষের মত মানুষ হ'য়ে—আত্মহারা পাগল-পারা হয়ে' তোমার প্রাণদ নামামৃত পান করে সঞ্জীবিত হয়।

তাই তোমাকে আকুল হয়ে ডাক্‌ছি মা! এস! আজ ভেদ বুদ্ধি, অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থপরতা তিরোহিত করে ঋদ্ধির—মুক্তির—প্রজ্ঞার আলোক প্রদান কর। মুহূর্ত্তের মধ্যে শত শত বাধা বিঘ্ন—প্রতিঘাত—ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে—রুদ্র-বিষাণের গভীর-মন্দ্রে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত করে, কর্ত্তব্যের পথে বীর-বিক্রমে অগ্রসর হই।

ওঁ শান্তি। শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ রায়,

নূরনগর, (খুলনা।)

আবাহন।

এস মা অভয়া! এস মহামায়া!

ত্রিদিব-জগত-রাণি!

শারদা-ভবানি! পরম-কল্যাণি!

এস মা জননি বাণি!

শারদ-মধু-নীলিমার কোলে

সুষমা উঠিল ফুটি।

গভীর সরমে শেফালির রাশি

সুধীরে পড়িল লুটি॥

বিহঙ্গম আদি তুলিল পঞ্চমে

আবাহন-গীতি, মরি!

বহিল মৃদুল-মেদুর-পবন

নিখিল ভুবন ভরি।

এস মা তোমার পরশে ধরণী

টুটুক্ আঁধার-ঘোর।

কলুষ-কালিমা মলিনতা আর

মুছুক্ নয়ন-লোর॥

ফুটুক্ নয়ন দেখুক্ আবার

দেখুক ঐ বিশ্ববাসী।

মায়ের আমার অমল-বিভা

মধুর-মোহন হাসি।

তুলুক্ আবার ললিত রাগিনী

নীরব হৃদয়-বীণ্।

আবেশ মূর্চ্ছনে হয়ে যাক সবে
রাতুল চরণ-লীন্॥
এস মা শিবানি! এস শিবরাণি!
এস কৃপা প্রকাশিয়ে।
ব্যথিতের ব্যথা এসমা দূরিতে
প্রবোধ শান্তি নিয়ে॥

শ্রীপূর্ণেন্দু নাথ রায়,
নূরনগর, খুল্না।

৺দুর্গাপূজার প্রার্থনা।

এসো মা, এসো মা, উমা, এসো গো, মা, শিবরাণি।
অশুভ নাশিতে শিবে, এসো গো. এসো কল্যাণি॥
বামে লয়ে বীণাপাণী, দক্ষিণেতে ধনরাণী।
ভবেরি অভাব নাশিতে, এসো, গো, মা, কাত্যায়নি॥
বামে লয়ে সেনাপতি, সমরে অজেয় অতি।
দক্ষে লয়ে গণপতি, মনোরথে আয় শিবানি॥
সারাটী বরষ ভোরে, আছি বহু আশা কোরে
মা তুমি আসিলে পরে শান্ত হবে, সর্ব্বপ্রাণী॥
আসুরি ভাব নাশিবে শিবে, সৌম্যভাবে ভরিয়ে দিবে
মিলন হবে সদাশিবে এসো মঙ্গলদায়িনি॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ হোয়ে, সদা থাকে দ্বন্দ্ব ল'য়ে,
মা তুমি এসো অভয়ে দুর্গা দুর্গতিনাশিনি॥

ভুলাইয়ে ত্রিপুরারি, দশভুজা মূর্ত্তি ধরি
দশদিক আকর্ষিতে এসো গো সিংহবাহিনি॥
বহির্ম্মুখি-রিপুদলে, ফিরায়ে দেমা কৌশলে,
স্বদেশী যেন স্বদলে, একতা লভে জননি॥
শ্মশান কোরে রিপুগণে, বারেক দাঁড়া হৃদ্ আসনে।
প্রাণাঞ্জলি দিই চরণে, নিবেদিয়ে তোমায় আমি॥
আমি নিয়ে যত নেটা, মিটিয়ে দিয়ে জোটে বেটা।
যেমন কোরে পড়ে আছে, মা, লভিয়ে চরণ দুখানি॥
বিয়োগ বেদনা যত দহিতেছে অবিরত
জয় যোগরাণি মাতঃ যোগানন্দ দে জননি।
স্বয়ম্ভু লইয়ে শিবে আর কতকাল নিদ্রা যাবে
জাগাও জীবে, আপনি জেগে, ওমা চৈতন্যদায়িনী॥
অচৈতন্যা তব কন্যা, দীনাহীনা, অন্নপূর্ণা
নিবেদি চরণে মাতঃ, রিপু ভয় নিবারিণী
বিদায় দিয়ে রিপুগণে, লয়ে চল মা সিন্ধুপানে
কৃপাবিন্দু পরশনে, শান্তি দে বিন্দুবাসিনি॥
এহৃদি নির্ম্মল করি, স্থাপিব কৈলাসপুরী
মা মা বলে কাঁদব না আর হেরবো তোরে দীনযামিনী॥

মাধুর্য্যে প্রার্থনা।

কেমন পষাণ পরাণ তোমার
এখনও গেলেনা আনিতে উমারে।
হাসিমাখা তার চাঁদ মুখখানি
না হেরিয়া মোর হৃদয় বিদরে॥
যুগ বলে গণি বরষ বিরহ
জ্বলে পুড়ে মরি আমি অহরহ
পাষাণ বলিয়া তুমি সব সহ
ভুলিয়া থাকিতে পারগো তাহারে।

শুনেছি জামাই দেখেনা উমারে
পঞ্চমুখে সদা রাম রাম করে
নারদ কথায় সঁপিয়া ভাঙ্গড়ে
দিয়াছি ফেলিয়া অকুলে বাছারে ॥

যাও যাও তুমি বিলম্ব করোনা
সহিছে জননি কতই যাতনা
অবোধ মানস প্রবোধ মানে না
উমা এনে দাও তুমিগো আমারে ॥

ঐযে উমাশশি হরীন্দ্র বাহনে
লক্ষ্মী সরস্বতী গজেন্দ্রবয়ানে
সাথে লয়ে মোর কার্ত্তিকেয় ধনে
হাসিতে হাসিতে আসিছে এ পুরে ॥

আয় মা বুকেতে ওমা উমারাণি
কেমনে ভুলিয়া ছিলিগো জননি
সারাটি বরষ দিবস রজনী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভেবেছি তোমারে ॥

যেদিকে চেয়েছি সব উমা মাখা
ভুলিব কেমনে উমা প্রাণে আঁকা
জুড়াল জীবন পেয়ে তোর দেখা
আয় মা লুকায়ে রাখিগো অন্তরে।

ওমা গিরিরাণি তোর ভালবাসা
এক কণা পেলে পুরে মোর আশা
তোমার উমারে হৃদে দিয়া বাসা,
তরে যাই আমি এভবসাগরে ॥

৺ব্রজনাথজীউর বাটী
জুমুরদহ।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ।
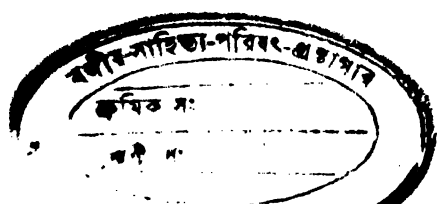
সাধন ধর্ম্ম রক্ষার উপায়।

সিদ্ধসাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রেলওয়ের সকল কর্ম্মচারীই তাহার অবিরাম গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য ভয়ে শশব্যস্ত ও সাবধান সতর্ক হইতেছে। যে গাড়ী যে দিক দিয়া আসুক্ না কেন, সবাই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে, সকল ষ্টেশনের কর্ম্মচারিবর্গই আরোহীর সৌভাগ্যে ধন্যবাদ দিয়া জয়কীর্ত্তন করিতেছেন, আর সম্মুখে আসিয়া বিজয়পতাকা উড়াইয়া বলিতেছেন—পথ নিষ্কণ্টক, স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাও। এইরূপে—সাধনধর্ম্মের মধ্যে যত কেন নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মকাণ্ড থাকুক্ না, আর সেই সকল কর্ম্মকাণ্ডের পাশে যত কেন সংসার ধর্ম্ম যাতায়াত করুক না, সাধনধর্ম্মে আরোহণ করিয়া সাধক যখন যাত্রা করেন, তাহার পূর্ব্বেই সংসার ধর্ম্মের সকল কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যেই নিত্য জ্ঞানপ্রেমভক্তির এই টেলিগ্রাফ ছুটিয়া আসিতেছে যে—"সর্ব্বযজ্ঞ তপোদানে মামেবহি সমর্চ্চয়েৎ। অহং সর্ব্বময়ী যস্মাৎ সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদা", "সকল যজ্ঞে, সকল তপস্যায় একমাত্র আমারই অর্চ্চনা করিবে; যে হেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞময়ী এবং সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রদা!" সাধনধর্ম্মের আজ্ঞা শিরে ধরিয়া সংসার ধর্ম্মের সমস্ত বিধিপদ্ধতি অমনি তাহার একাগ্রগতি অব্যাহত রাখিবার জন্য ভয়ে শশব্যস্ত ও সাবধান সতর্ক হইতেছে। যে সংসার-ধর্ম্ম যে দিক দিয়া আসুক না কেন সবাই সাধন ধর্ম্মের জন্য অপেক্ষা করিয়া সভয়ে তাহার পথ ছাড়িয়া দিতেছে, সংসার ধর্ম্মের যত কিছু বিধিনিষেধ সবাই সসম্ভ্রমে বলিতেছে, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কঃ নিষেধঃ" সাধকের সৌভাগ্যে ধন্যবাদ দিয়া সিদ্ধপুরুষগণ জয়কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন—ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দ—লহরীম্।" এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডে কতিপয় ধন্য পুরুষই চিদানন্দ স্বরূপিণি—তোমার আরাধনার অধিকারী হইয়া থাকেন! তীর্থসকল সম্মুখে আসিয়া বিজয়পতাকা উড়াইয়া বলিতেছেন—

"অলং গঙ্গয়াপুষ্করৈর্ব্বা প্রয়াগৈঃ
অলং কাশিকাবাস-সন্ন্যাস-পুণ্যৈঃ।
নবীন-স্ফুরন্নীরদ-শ্যামকায়া
সমায়াতি চেতো যদীশান-জায়া॥"

"গঙ্গায় প্রয়োজন নাই, পুষ্করে প্রয়োজন নাই, প্রয়াগেও প্রয়োজন নাই, কি কাশীবাস, কি সন্ন্যাস,ইহার কোন পুণ্যেরই অপেক্ষা নাই, একবার যদি হৃদয়ে সেই নবনীরদ-শ্যামকায়া ঈশান-জায়ার উদয় হয়।" সাধক!" অভয়ার রাজ্যে চলিলে, পথের ভয় তোমার নাই, যাও বীরেন্দ্র। নির্ব্বিঘ্নে বিঘ্নহর জননীর কোলে গিয়া কৃতার্থ হও॥

স্পেশাল ট্রেণ চলিবার সময়ে সকল ষ্টেশনে প্যাশেঞ্জার ট্রেনের আরোহিগণ যেমন স্বপ্নের ন্যায় বিদ্যুতের ন্যায়, ঝড়ের ন্যায় কি একটা ভাবিয়া হা করিয়া চাহিয়া থাকে, গাড়ীর বেগে ষ্টেশনের ঘরগুলি পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে, আর তাহারা মধ্যে মধ্যে ভাবিতেছে, বুঝিবা কি হয়? একান্ত প্রাণে সাধক যখন একাগ্রধ্যানে সাধনধর্ম্মের স্বাধীন যানে আরোহণ করেন, সংসারধর্ম্মের আরোহী সাধারণ জনসমাজও তখন সাধন ধর্ম্মের সর্ব্বলোকাভিভাবিনী অসীম শক্তির অব্যাহত গতি দেখিয়া, কি একটা অসম্ভব কাণ্ড ভাবিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে; কিন্তু সাধনের গুরুগম্ভীর তীব্রবেগে সংসারের বাসনা কষায় সকল যখন থর থর কাঁপিতে থাকে, সাধনধর্ম্মের মহিমা দেখিয়া সাধারণ জনসমাজ যখন সে দৈববেগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার অভিমুখে পতনোম্মুখ হয়, তখনই সংসার ধর্ম্মের সম্প্রদায় সভয়ে ভাবিয়া ব্যাকুল হয়, বুঝি বা এইবার কি হয়? সংসারধর্ম্মের গৃহভিত্তি এইবারে বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে?

সাধনধর্ম্ম কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে যান না, তিনি তাঁহার আপন পথে আপনি চলিয়া যান, তথাপি ষ্টেশনে পেশেঞ্জার-গাড়ীর যাত্রীর ন্যায় সাধারণ সমাজের যাহা কিছু হৃদকম্প, তাহা কেবল তাহার নিজ হৃদয়েরই দুর্ব্বলতার পরিচয়। অথবা সমাজের দুর্ব্বলতা নহে, সাধনধর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তিই ঐরূপ লোকাভিভাবিনী। এই সময়ে সমাজের অনেক ভাবভঙ্গী বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য সাধকের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কাহাকেও সাধনরাজ্যের অভিমুখে একটু অগ্রসর হইতে দেখিলেই সাধারণ সাংসারিক জনসামাজ নানাকারণে নানা উপায়ে নানা প্রকারে তাঁহার গন্তব্য পথের বিঘ্ন বাধা ঘটাইতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

তৃষ্ণা তরঙ্গাকুলিতং আশা-মকরমালিনম্।
কদা সংসার জলধিং তীর্ত্বা স্যামহমজ্বরঃ ॥ ২৭

এই যে সংসার সমুদ্রে পড়িয়াছি ইহা সর্ব্বদা তৃষ্ণা তরঙ্গে আকুল; তাহার উপর আশা-মকর সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কবে সংসার সাগর পার হইয়া আমি বিগত জ্বর হইব? কবে আমার সমস্ত শোক যাইবে? কবে সমদর্শী ও বিচক্ষণ হইয়া মুমুক্ষুর উপশম পাইব? সংসার জ্বর বড় তাপ দিতেছে—কবে জ্বর ছাড়িবে? হে চিত্ত! কতদিনে তুমি গতব্যথ হইয়া দীপলেখার ন্যায় স্থির হইবে? কবে আমার অনাদিসঞ্চিতকর্ম্মসংস্কাররূপ মেঘজালের অপসারণে স্বপ্রকাশ আত্মালোকে বুদ্ধি তুমি সর্ব্বদা উদ্ভাসিত থাকিবে? ইন্দ্রিয় সকল যে বিষয় সুখে আকর্ষিত হইয়া ছুটিয়া যায় ইহাদের এই বিষয়াভি-মুখাকর্ষণই হইতেছে দুশ্চেষ্টা। এই দুশ্চেষ্টা দ্বারা আমার ইন্দ্রিয়-গণের দেহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। গরুড় যেমন অবহেলে সমুদ্র পার হইয়া যায় সেইরূপ নিরন্তর দুশ্চেষ্টা দাবদাহে দগ্ধ ইন্দ্রিয়গণ কবে দুঃখ সমুদ্র পার হইবে? এই দেহটাই আমি—পশু, পুত্র, ধনাদির বিয়োগে আমি কাঁদি, আমি মোহাক্রান্ত হই—আমার এই অহিতজনক ব্যর্থভ্রম কবে শরৎকালের খণ্ড খণ্ড শুভ্রমেঘের ন্যায় লয় হইয়া যাইবে? স্বর্গের পারিজাতবনের উদ্যানে ভ্রমণ করিতে আমার যে বুদ্ধি সুখানুভব করিত—সেই বুদ্ধিকে কবে আমি তৃণতুল্য বোধ করিব আর যাহা প্রকৃত আত্মপদ কবে আমি তাহা পাইব?

হে মন! কবে তুমি সংসারবিরাগী জনগণকথিত নির্ম্মলজ্ঞান-দৃষ্টি অবলম্বন করিবে তাহাই বল? আমি দুঃখরূপ অজগরের ভক্ষ্য হইয়া—হা তাত! হা মাতঃ হা পুত্র ইত্যাদি বাক্যে যেন আর রোদন না করি। হে বুদ্ধে! তুমি আমার ভগিনী—আমার এই জীবভাব আর তুমি, আমরা একই অবিদ্যাজননীর উদরে জন্মিয়াছি—বুদ্ধে তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। এস এস ভগিনি—আমরা আমাদের উভয়ের দুঃখ মুক্তির জন্য বশিষ্ঠদেবের বাক্য সকল বিচার করি। হে মতে! শাস্ত্রসজ্জনপ্রসাদে তুমি আমা হইতেই জাত। কাজেই

তুমি আমার কন্যা তথাপি আমি প্রীতিসহকারে তোমার চরণে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সংসার দুঃখচ্ছেদরূপ সম্পদ লাভের জন্য সুস্থির হও। তুমি বশিষ্ঠদেব কথিত বৈরাগ্য, মুমুক্ষু; উৎপত্তি, স্থিতি প্রকরণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল যথাবৎ স্মরণ কর—

কৃতমতি শতশো-বিচারিতং যৎ
যদি তদুপৈতি ন মানসস্য বুদ্ধিঃ
ভবতি তদফলং শরৎঘনাভং
সততমতোমতিরেব কার্য্যসারঃ ॥

নৈপুণ্য সহকারে শতবার বিচার করিয়াও যদি মতি সুপ্রসন্না না হয় তবে সে বিচার ফল শরদ্ঘনবৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়—স্থায়ী হয় না। অতএব মতির প্রসন্নতাই বিচার কার্য্যের মুখ্য ফল।

তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিবে, পরে মনন করিয়া করিয়া ঐ বিচার দৃঢ় করিবে। মোক্ষের তীব্র ইচ্ছা জন্মিলেই তোমার কার্য্য হইবে। তখন মতি সর্ব্বদা লব্ধব্য লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য প্রসন্ন হইয়া যাইবে।

—

উপশম প্রকরণ ৩-৪ সর্গঃ।

তস্যৈবং প্রায়য়া তত্র ততয়োদারচিন্তয়া।
সা ব্যতীয়ায় রজনী পদ্মস্যেবার্ককাংক্ষিণঃ ॥১

রামচন্দ্রের এবম্প্রকার বিস্তৃতউদারচিন্তায়—সূর্য্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষায় পদ্মের মত রজনী অতিবাহিত হইল। ক্রমে দিকসকল কপিশবর্ণ ধারণ করিল—পূর্ব্বদিক দেখিতে দেখিতে অরুণবর্ণ হইল

এবং আকাশমণ্ডল বিরলতারক হইল। সূর্য্যের সহিত রামও শয্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতাদিগের স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে গমন করিলেন। গুরুদেবকে সমাধিস্থ দেখিয়া রামচন্দ্র বিনত-কন্ধর হইয়া দূর হইতে প্রণাম করিলেন এবং প্রাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হস্তী, অশ্ব, রথ ও রাজগণে আশ্রম পরিপূর্ণ হইল। বশিষ্ঠদেব সমাধি হইতে বিরত হইলেন এবং সমাগত সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পরে বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মুনিগণসহ রথারোহণে রাজভবনে গমন করিলেন। তদনন্তর যূথপরিবৃত রাজহংসের পদ্মিনীর নিকটে গমন করার ন্যায় তিনি দাশরথী সভায় প্রবেশ করিলেন—রাজা তিন পদ অগ্রসর হইয়া গুরুদেবের সহিত মুনিগণকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, পণ্ডিত, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, অমাত্য, প্রজা, ভৃত্যাদি সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন। সকলে বশিষ্ঠদেবের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিতেছেন আর "সভাকলকলে শান্তে মৌনসংস্থেষু বন্দিষু"—আর সভার কলকলধ্বনি শান্ত হইল এবং বন্দিগণ মৌনাবলম্বন করিল। তখন সভ্যগণ কুশল জিজ্ঞাসায় বিরত হইলেন। পুরস্ত্রীসকল পুষ্পদাম সমাকীর্ণ শয্যায় উপবেশন করিয়া বাতায়নপথে সভার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চামরধারিণীগণ মৌন। ইত্যবসরে বশিষ্ঠদেব কথা কহিতে উদ্যম করিলেন। সেই সভায় সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চতুঃপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। চন্দনামোদমিশ্র অগুরু-তগর ধূমে এবং কুসুমদামের উদ্দামগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল। রাজা দশরথ মেঘগম্ভীর বাক্যে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে বলিতে লাগিলেন—ভগবন্ পূর্ব্বদিনের বাক্সন্দর্ভোচ্চারণ জন্য শ্রম হইতে আপনার আর ত কোন ক্লেশ নাই? আপনি যে অমৃতবর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে আমরা সমাশ্বাসিত হইয়াছি। চন্দ্রকিরণ অপেক্ষা আপনার বাক্য সুশীতল; ইহা অন্তঃশীতলতা প্রদান করে ও অজ্ঞানান্ধকার নাশ করে। যুক্তি লক্ষণা জ্যোতির্লতা, আত্মরত্ন অবলোকনের দীপস্বরূপ। এই সুজনবৃক্ষ আমাদের নিত্য বন্দনীয়। চন্দ্রকিরণের মত সজ্জনের উক্তি মানুষের

দূরীহিত-মানসদোষ, চুর্ব্বিহিত-শারীরদোষ এবং অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়দোষ বিনাশ করে। হে মহর্ষে! শরৎকাল আসিলে মেঘমালা যেমন অল্পে অল্পে সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ আপনার বাক্য আমাদের সংসারতৃষ্ণা ও সংসারশৃঙ্খল অল্পে অল্পে ক্ষীণ করিতেছে। পারদ-সিদ্ধ যোগীদিগের কৃত ঔষধের অঞ্জনে যেমন জন্মান্ধগণও চক্ষুষ্মান হইয়া সুবর্ণান্বেষণে সমর্থ হয় সেইরূপ আপনার বাক্যে নিষ্পাপ হইয়া আমরা আত্মাকে দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের অন্তরাকাশে চিরপ্ররূঢ় সংসার বাসনা নামক মিহিকা—কুজ্মটিকা আপনার উক্তি-শারদোদয়ে ধীরে ধীরে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইতেছে। আপনি আমাদিগকে যে আনন্দ দিতেছেন অসংখ্য মন্দার কুসুমের মঞ্জরী অথবা অমৃতসাগরের তরঙ্গও সে আনন্দ দিতে পারে না। পরে রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন রাম! যেদিন, ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষের সপর্য্যায়-পূজায় অতিবাহিত হয় সেই দিনই প্রকৃত আলোকময় নতুবা সকল দিনই অন্ধকারময়। রাম তুমি এখন মহর্ষিকে প্রকৃত বিষয় জিজ্ঞাসা কর।

ভগবান্ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের সম্মুখেই ছিলেন। বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন রাম! আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ তোমার স্মরণ আছে ত? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদে জগতের উৎপত্তি বিচিত্র—ইহার তোমার মনে আছেত?

বিরাটব্রহ্ম মায়াদ্বারা নটের মত জগৎবেশে বিচিত্রভাবে নানা সাজে সজ্জিত হইয়া এই ত্রিভুবন রঙ্গমঞ্চে রঙ্গ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বাতীত অর্থাৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চের স্বরূপই তিনি—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম মন অহংকার এই সপ্তাবরণ—এই মায়া যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া—মিথ্যা দ্বারা আবৃত হইয়া—বহুরূপে তিনি ভাসিলেও মিথ্যা জগৎ মিথ্যাই, তিনিই মাত্র সত্য, এইজন্য তিনি সৎ অসৎ, স্থূল সূক্ষ্ম—বিভাগানুসারে এই সমস্ত যাহা বলিয়াছি তাহা তোমার স্মরণে আছেত? এই বিশ্ব সেই বিশ্বেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ভাসিয়াছে—যেমন দর্পণে দৃশ্যমান নগরী ভাসে—ইহাত বুঝিয়াছ? সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমন স্থির জলে প্রকাশ পায় সেইরূপ স্থির শান্ত সত্ত্বগুণে ব্রহ্মের

প্রকাশ, আবার চঞ্চল রজগুণে ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব বহুরূপে প্রকাশ এবং তমোগুণে প্রতিবিম্ব অন্ধকারে আচ্ছন্ন—অজ্ঞানের সমন্তাৎপ্রসারিত-রূপ জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞানবলে ক্ষণস্থায়ী হইলেও অজ্ঞানীর নিকটে ঐরূপ অনন্ত,অপরিসীম ; এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা তুমি মনে রাখিয়াছ ত ? মানুষ মন ব্যতীত আর কিছুই নহে ইহা ভুলিয়া যাও নাইত ? আমি যে সমস্ত বিচারের কথা বলিয়াছি তাহা কল্যরাত্রে উত্তমরূপে মনন করিয়া হৃদয়ে রাখিয়াছত ?

ভূয়োভূয়ঃ পরামৃষ্টং হৃদয়ে সুনিযোজিতম্ ।
প্রয়োজনং ফলত্যাচ্চৈর্ন হেলাহত সংস্থিতেঃ॥ ২২

পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া (পরামৃষ্ট—বিবেচিত, বিচারিত) হৃদয়ে বিনিবেশিত হইলে তবে শাস্ত্রবাক্য উচ্চপ্রয়োজন-ফল প্রদান করে কিন্তু অনাদরে—ইহাতে কি হইবে এই অবজ্ঞার সহিত—উপদিষ্ট অর্থ ধারণ যে পুরুষাধম করে তাহার কি ফল লাভ হইবে ?

রাম উত্তর করিলেন ভগবন্ আপনার কৃপায় আমি আপনার বাক্যের প্রভাব অনুভব করিতেছি। আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই আপনার বাক্যের মর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি আপনার বাক্যসূর্য্য, আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীকরণে সমর্থ। আপনার পবিত্র উপদেশ আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। আপনার প্রসাদে শরৎকালে মেঘ সকল আকাশ হইতে সরিয়া গেলে আকাশ যেমন স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সংসার মেঘাবরণ আপনার বাক্যপ্রভাবে আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া ইহার স্বচ্ছতা সম্পাদন করিয়াছে। আপনার পবিত্র উপদেশ প্রথমে শ্রুতিমধুর, মধ্যে সৌভাগ্যবর্দ্ধক এবং অন্তে মোক্ষফলপ্রদ। ভগবন্ আপনার বাক্যরূপ কল্পবৃক্ষপুষ্প কি দেবতা কি সর্প সকলেরই আনন্দজনক। আপনি গুরু—আপনি তীর্থ বলিয়া মহাহ্রদ স্বরূপ—ইহা শাস্ত্র ও বিচাররূপ হংসমালা সুশোভিত। হে প্রভো ! আপনি কৃপা করিয়া পুনরায় আপনার উপদেশরূপ বিমল-প্রবাহে স্নান করাইয়া আমাদিগকে পাপমুক্ত করুন ইহাই প্রার্থনা।

উপশম ৫ সর্গঃ।

মনের উপশম উপদেশ

বশিষ্ঠ—হে সুন্দরাকৃতে! এই উত্তম-সিদ্ধান্ত-সুন্দর হিতকর উপশম প্রকরণ অবহিত হইয়া—সাবধান চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। রাম! এই যে দীর্ঘ-সংসার-মায়া, ইহাকে রাজস ও তামস প্রকৃতির জীবই ধরিয়া রাখিয়াছে—যেমন দৃঢ় স্তম্ভ, মণ্ডপকে ধরিয়া রাখে সেই-রূপ এই বিষয়ে শ্রুতিও বলিতেছেন "পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভিরিতি"। কিন্তু তোমার মত গুণসম্পন্ন ধীর রাজস-সাত্ত্বিক অর্থাৎ শুদ্ধ-সাত্ত্বিক অর্থাৎ যে সত্ত্বগুণে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় এইরূপ যাঁহারা, তাঁহারা সর্পের ত্বক্-ত্যাগের ন্যায় অবহেলে এই দৃঢ়া সংসারে মায়া ত্যাগ করিতে পারেন। যদি জিজ্ঞাসা কর "কেনোপায়েন ত্যজ্যতে" কি প্রকারে ত্যাগ করেন—বলিতেছি; যাঁহারা সাত্ত্বিক অথবা রাজস সাত্ত্বিক বা সত্ত্বগুণশালী সেই সমস্ত জ্ঞানবান্ লোক জগতের পূর্ব্বাপর ভাব—মূল পরম্পরা অর্থাৎ এই জগৎটা কি, পূর্ব্বে কোথায় ছিল, কিরূপে এটা আসিল—ইত্যাদি বিচার দ্বারা এই সংসার মায়া ত্যাগ করেন। শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন "অন্নেন সৌম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছ" ইতি। মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ কিরূপে পাইবে জান—

শাস্ত্র-সজ্জন-সৎকার্য্য সঙ্গেনোপহতৈনসাম্।
সারাবলোকিনী বুদ্ধির্জ্জায়তে দীপিকোপমা॥ ৫

শাস্ত্র সাহায্যে সজ্জন সঙ্গে এবং সৎকার্য্য সেবনে "যজ্ঞোদান তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণামিতি গীতা" যাঁহারা পাপত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাই প্রদীপ তুল্য সারাবলোকিনী—সারবস্তু প্রকাশিকা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। বলিতে পার তবে যে গীতা বলিতেছেন "মামেব যে

প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে”—যে আমার শরণাপন্ন হয় সেই মায়া উত্তীর্ণ হয়—আমার শরণাপন্ন হওয়াই হইতেছে আমার কাছে শক্তি ভিক্ষা করিতে করিতে শাস্ত্র সজ্জন ও সৎকার্য্য সেবা করা। এতদ্ভিন্ন মুখে বলিলাম আমি তোমার আশ্রয়ে অথচ যা তা কর্ম্ম করি—ইহাকে আশ্রয় লওয়া বলে না। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শরণ লইবার কথা গীতা যে বলিতেছেন ইহাতে স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক কর্ম্ম প্রথমে ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান আশ্রয় করিতে হইবে পরে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে হইবে ইহাই ক্রম।

স্বয়মেব বিচারেণ বিচার্য্যাত্মানমাত্মনা।
যাবন্নাধিগতং জ্ঞানং ন তাবদধিগম্যতে ॥ ৬

“উদ্ধরেৎ আত্মানাত্মানং” আত্মবিচার দ্বারা আত্মাকে সংসার ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করিতে হইবে; যতদিন আপনি এই বিচার না করিবে ততদিন জ্ঞান অধিগত হইবে না অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় ব্রহ্ম জ্ঞাত হইবেন না—ইনি অধিগত না হইলে ইঁহাকে অধিগমন করা যাইবে না—পাওয়া যাইবে না। জগৎ নাই একমাত্র আত্মাই আছেন —আত্মদর্পণে বিম্বশূন্য বিচিত্রকল্পনাপ্রতিবিম্ব ভাসিয়াছে; বাস্তবিক নাই তথাপি দর্পণ ঐ সমস্ত চিত্রে চিত্রিত মত দেখা যাইতেছে—ফলে কল্পনা ছাড়—শুধু নির্ম্মল আত্মদর্পণ আছেন ইহা পুনঃ পুনঃ বিচারে নিশ্চয় কর।

রঘুনন্দন! তুমি শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান্, তুমি শ্রেষ্ঠ নয়বান—প্রমাণ-কুশল, তুমি শ্রেষ্ঠ ধৈর্য্যপরায়ণ এবং তুমি সৎকুলশালী, তুমি রাজসসত্ত্ব ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

স্বয়মালোকয় প্রাজ্ঞ সংসারারম্ভদৃষ্টিষু।
কিং সত্যং কিমসত্যং বা ভব সত্যপরায়ণঃ ॥ ৮

হে প্রাজ্ঞ! সংসার কোথা হইতে আরম্ভ হইল এই দৃষ্টিতে, কি

সত্য কি অসত্য ইহা আলোচনা করিয়া ইহা বিচার দ্বারা দেখিয়া সত্যপরায়ণ হও—সত্যতৎপর হও—অসত্য তৎপর হইও না।

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি কীদৃশী তস্য সত্যতা।
আদাবন্তে চ যন্নিত্যং তৎ সত্যং নাম নেতরৎ॥ ৯

যাহা আদিতে নাই, অন্তেও নাই তাহার সত্যতা আবার কিরূপ সত্যতা? আদিতে অন্তে, যাহা সত্য—যাহা নিত্য সত্য তাহাই সত্য অন্য সমস্তই মিথ্যা।

যাহা আদিতে এবং অন্তে অসৎ, সেই ক্ষণকালের জন্য প্রতিভাত বস্তুতে, যাহার মন সত্য বুদ্ধি করিয়া অনুরক্ত হয়, সেই মুগ্ধ স্বভাব পশুসদৃশ মানুষের বিবেক জন্মিবে কিরূপে? এই যে লোকে যাহা দেখে তাহা কি জান—

জায়তে মন এবেহ মন এব বিবর্দ্ধতে।
সম্যগ্‌দর্শনদৃষ্ট্যা তু মন এব হি মুচ্যতে॥ ১১

এই সংসারে মনই জন্মে, মনই বর্দ্ধিত হয়,সম্যগ্‌ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে মনই মুক্ত হয়। তবেই ত হইল"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" ---মনই বন্ধ মুক্তির কারণ।

রাম। হে ব্রহ্মন্‌ যেরূপে এই ত্রিভুবনে মনই সংসারী, জরামরণ মনেরই হইয়া থাকে তাহা আমি জানিয়াছি। মানুষ মনের সহিত এক হইয়া সংসারীও জরামরণশাল হইয়া রহিয়াছে। সংসারোত্তরণের যে উপায় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। রঘুবংশীয়গণের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবার জন্য আপনিই সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন।

বশিষ্ঠ—হে রাঘব! প্রথমে সৎশাস্ত্র অর্থাৎ অধ্যাত্মশাস্ত্র, পরে বৈরাগ্য এবং সৎসঙ্গ দ্বারা মনের জ্ঞানোদয় যোগ্যতা উৎপাদক বিশুদ্ধি আনিতে হইবে। পর বৈরাগ্য হইতেছে জ্ঞানপ্রসাদ, অর্থাৎ চিত্তের নির্ম্মলতার শেষ সীমা। আত্মা, বুদ্ধি হইতেও পৃথক ইহা প্রত্যক্ষ হইলে প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যে যে অনন্যুরক্তা তাহাই পরবৈরাগ্য; এই পরবৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে অপর বৈরাগ্য অভ্যাস করা চাই। অপর বৈরাগ্য চারি প্রকার।

করিতেন। নির্জ্জন সেই বনভূমিতে রাজা মমতাকৃষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতেন—আমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজত্ব এখন আমার মন্দস্বভাব ভৃত্যবর্গের হস্তগত। ইহারা কি ধর্ম্মানুসারে আমার পরিত্যক্তা পুরী রক্ষণাবেক্ষণ করে? আমার সতত মদমত্ত শূরহস্তী কি পূর্ব্বের মত আহার পাইতেছে? আমার অন্নে পালিত আমার ভৃত্যগণ এখন অন্য রাজার সেবা করিতেছে। আমার দুষ্ট অমাত্যগণ আমার অতি পরিশ্রম-সঞ্চিত-ধন ক্ষয় করিতেছে।

রাজা এইভাবে চিন্তা করেন। কিছুদিন পরে রাজা মুনির আশ্রম সমীপে সমাধি বৈশ্যকে দেখিলেন। বিমায়মান বৈশ্যের মুখে রাজা তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। আমার অসৎ পুত্র ও আমার স্ত্রী ধনলোভে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাই আমি দুঃখিত হইয়া বনে আসিয়াছি। তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল আমি কিছুই জানি না, এইজন্য আমি চিন্তিত। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সমাধি বলিলেন :—

কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ।

* * * * * *

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥

উভয়ের দুঃখ এক প্রকারের কারণ উভয়েই মোহাক্রান্ত। আজ নবীন-প্রাচীন সকল সমাজে নরানারীর এই মোহ, এই দুঃখ। মানুষ মন হইতে এই ভাবনা দূর করিতে পারে না। এই ভাবনা হৃদয় হইতে সরাইতে না পারিলেও মন ভগবানে ডুবিতে পারে না। যে কৌশল অবলম্বন করিলে মনকে মোহশূন্য করিতে পারা যায়— শ্রীশ্রীচণ্ডী তাহাই দেখাইতেছেন। সংসারে থাকিতে হয় থাক, মোহশূন্য হইয়া সংসারের কার্য্য কর। এই জন্যই শাস্ত্রের আবশ্যকতা।

চণ্ডী কিরূপে এই কথা আনিয়াছেন আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব, শেষে চণ্ডী প্রদর্শিত উপায়টী বিশেষ করিয়া বলিব।

রাজা ও বৈশ্য ঋষির নিকট গিয়াছেন। রাজা বলিতে লাগিলেন—

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা॥
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি ;
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনি সত্তম॥
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দ্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাত্যপি॥
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥

ভগবন্ আপনাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি আপনি তাহা আমাকে বলুন। আমার মনের এই যে দুঃখ তাহা আমি আমার চিত্তকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না বলিয়া। জানিয়া শুনিয়াও আমার রাজ্যের উপর এবং নিখিল রাজ্যাঙ্গের উপর মূর্খের ন্যায় এই যে মমত্ব বোধ—আমার আমার বোধ—হে মুনিসত্তম! ইহা কি? এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত এবং ভৃত্য ও ভার্য্যা কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত এবং স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি এইরূপ অনুরক্ত কেন? এইরূপে ইনি ও আমিও—আমরা উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা বিষয়ের দোষ দর্শন করি তথাপি আমাদের মন আমার আমার করিয়া বিষয়ে আকৃষ্ট হয় কেন? হে মহাত্মন্ আমি এবং ইনি—আমাদের উভয়ের বিষয় দোষ দর্শন জ্ঞান থাকিলেও আমরা কি জন্য মোহাচ্ছন্ন হইতেছি? বিবেকান্ধের যে মূঢ়তা তাহা ইহাঁর ও আমার উভয়েরই হইতেছে—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই একপ্রকার মোহ কেন হয়?

ইহাই ত জীবনের সমস্যা—দুই দশ জন ভিন্ন সমস্ত নর-নারীর প্রশ্নই ইহা। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী। অর্জ্জুনের মোহ দূর করিবার জন্য যেমন গীতা, রাজা পরীক্ষিতের মোহ দূর করিবার জন্য ভাগবত, বদ্ধজীব মাত্রেরই—যাহারা আপনাদিগকে বদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন তাহাদের অজ্ঞান বা মোহ দূর করিবার জন্য যেমন যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ সেইরূপ সংসার মোহ দূর করিবার জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী।

যেরূপে এই মোহ দূর হইবে তাহা আমরা শ্রীচণ্ডীর ঋষির মুখে এখন শুনিব পরে চণ্ডীপাঠে কিরূপে এই মোহ দূর হয় তাহা বলিব।

ঋষি তখন উত্তর করিলেন—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈব পৃথক্ পৃথক্॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥
তথাপি মমতাগর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥

সমস্ত জন্তুর—প্রাণিমাত্রেরই ইন্দ্রিয়াদি সমীপাগতবিষয়ের জ্ঞান আছে। অবার বিষয়ও—হে মহাভাগ—পৃথক্ পৃথক্রূপে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কোন কোন প্রাণী দিনে অন্ধ—দর্শনজ্ঞান শূন্য—অপর কোন কোন প্রাণী রাত্রিতে দেখিতে পায়না। কোন কোন প্রাণী দিন ও রাত্রিতে তুল্য দৃষ্টি। মনুষ্যেরা জ্ঞানী সত্য, কিন্তু কেবল যে ইহারাই জ্ঞানী তাহা নহে। যেহেতু পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি সকলেই জ্ঞানী, সেইজন্য মৃগপক্ষী প্রভৃতির জ্ঞান যেরূপ মনুষ্যগণের জ্ঞানও সেই প্রকার। মনুষ্যগণের বিষয় জ্ঞান যেরূপ ইহাদেরও সেইরূপ।অন্য যে জ্ঞান—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান তাহা সাধারণ মনুষ্য ও পশু পক্ষী উভয়েরই একরূপ। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ইহাদের কাহারও নাই। দেখ, জ্ঞান থাকিলেও এই সমস্তই পক্ষী ক্ষুধায় পীড়্যমান হইয়াও, শাবক চঞ্চুতে মোহবশতঃ তণ্ডুলকণা আদরে প্রদান করিয়া থাকে। হে মনুজব্যাঘ্র! মানুষ কিন্তু প্রত্যুপকারের লোভবশতঃ পুত্রগণের প্রতি অনুরাগী কিন্তু পুত্রগণ সেরূপ হয়না ইহা কি দেখিতে পাওনা? তথাপি মানুষ মমতারূপ আবর্ত্ত বিশিষ্ট মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া মহামায়া প্রভাবে সংসার স্থিতির হেতু হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? জগৎপতি শ্রীহরির যোগনিদ্রারূপা এই মহামায়া দ্বারা জগৎ সম্যক-রূপে মোহ প্রাপ্ত। দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন। তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করেন; এই বরদা মহামায়া, প্রসন্না হইয়া মানুষের মুক্তির হেতু হন। এই সনাতনী পরমাবিদ্যারূপিণী মুক্তির হেতুভুতা এবং সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী—সংসার বন্ধনের'ও হেতু।

প্রশ্নোত্তরে চণ্ডীর শিক্ষা আলোচনা করিলে বিষয়টি সহজ হইবে মনে হয়। রাজার প্রশ্ন হইতেছে আমি ও এই বৈশ্য আমরা উভয়েই বিষয়ের দোষ দেখিয়াছি তথাপি আমাদের মন—আমার আমার করারূপ মমতাতে এত আকৃষ্ট কেন? আমাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিবেকান্ধ ব্যক্তির মত এই মোহ কিরূপে আসিতেছে?

ঋষি—তোমরা যে জ্ঞানের কথা কহিতেছ তাহা রূপরসাদি বিষয়ের জ্ঞান। এই জ্ঞান পশু-পক্ষীরও আছে। পৃথক্ পৃথক বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান ইহাদেরও আছে। এই জ্ঞানে কিন্তু মোহ দূর হয় না। স্বরূপের জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মোহ থাকে না। এই তত্ত্বজ্ঞান সাধারণ মানুষেরও নাই পশু পক্ষী মৃগাদিরও নাই। বিষয় জ্ঞানেরও কত পার্থক্য দেখ। দিবালোকেও পেচকাদি দর্শন জ্ঞান হীন, কাকাদি রাত্রিকালে দেখিতে পায়না, আবার কিঞ্চুলুকাদি (কেঁচো) কি দিন কি রাত্রি কোন সময়েই দেখিতে পায়না। এই যে বিষয় সম্পর্কে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান ইহা তোমাদেরও যেমন পশুদেরও সেইরূপ। এই জ্ঞানে মোহের কার্য্য দেখ। পক্ষী আপনার ক্ষুধা অগ্রাহ্য করিয়া শাবককে আহার প্রদান করে। মানুষও প্রত্যুপকারের লোভে সন্তানদিগকে পালন করে, কিন্তু ইহাও জানে যে সন্তান অকৃতজ্ঞ হয়। ইহাই ত মোহের কার্য্য। এই মোহের কার্য্যেই কিন্তু সংসারস্থিতি। এই স্থিতি মহামায়ার প্রভাবেই হইতেছে। যখন শ্রীহরির এই মায়া, শ্রীহরিকেও বাদ দেন না—তখন ইনিই যে জগৎ মোহিত করিবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি? জ্ঞানীদিগের চিত্তকেও এই মহামায়া বল পূর্ব্বক মোহে আচ্ছন্ন করেন। জগতে সৃষ্টিকারিণী ইনিই। ইঁহাকে যদি প্রসন্ন করিতে পার তবে ইনি সংসার হইতে মুক্তিও দিয়া থাকেন। এই মহামায়া মুক্তিও দেন আবার বদ্ধও করেন।

রাজা— ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যা ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥
যৎ স্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥

ভগবন্ সেই দেবী কে, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কি প্রকারে উৎপন্না হয়েন, হে দ্বিজ ইঁহার কর্ম্মই বা কি? সেই দেবীর স্বভাবটি কিরূপ? তাঁহার স্বরূপই বা কি? কোথা হইতে তাঁহার উদ্ভব হয়? হে ব্রহ্মবিদ্ শ্রেষ্ঠ! আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

মানুষ যতদিন সংসারে ডুবিয়া থাকে ততদিন শ্রীভগবানে একাগ্র হইতে পারে না। সংসার ও ভগবান্ তবে পরস্পর বিরোধী। লোকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি মানুষ সংসার করিবে না? ভারতের ঋষিগণ উপদেশ করেন যে, সংসারে তুমি তোমার কর্ম্মের ফলে আসিয়াছ, তুমি যখন সংসার করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া উঠ, যখন সংসারের স্বরূপ দেখিয়া দেখিয়া তুমি ইহা হইতে মুক্ত হইতে চাও তখনও তুমি সংসার ছাড়িতে পারনা। পরে তোমাকে মরিতে হয়। তখনও কিন্তু তোমার কর্ম্ম তোমায় ছাড়ে না। শত সহস্র গাভীর মধ্য হইতে গোবৎস যেমন আপনার জননীর নিকটে ছুটিয়া যায় সেইরূপ তুমি যেখানেই থাক, যাহার মধ্যেই থাক কর্ম্ম তোমাকে বাছিয়া লইবে, এবং কর্ম্ম তোমার অনুসরণ করিবেই। তোমার কর্ম্মফল তোমায় ভোগ করিতেই হইবে। ঐ যে প্রশ্ন করিতেছিলে তবে কি মানুষ সংসার করিবে না ইহার এই মাত্র উত্তর পাওয়া গেল যে তুমি ইচ্ছা করিয়া সংসার করনা—তোমার কর্ম্মে তোমাকে সংসার করায়। এই অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্যই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

সুরথ রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিলেন "তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ। মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ।" মানুষ সংসারস্নেহের দুঃখ জানে তথাপি মহামায়ার মোহশক্তিতে আমি আমি আমার আমার এই বুদ্ধি আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মোহগর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া সংসার স্থিতির কারণ হয়।

অবিদ্যাবৃতা চিৎস্বরূপা মহামায়ার প্রভাবেই তবে জীব মোহ প্রাপ্ত

হইয়া সংসার করে। মেধা ঋষির উপদেশ বুঝিবার জন্য রাজা পুনরায় ছয়টি প্রশ্ন করিলেন।

(১) কা হি সা দেবী মহামায়া—সেই দেবী মহামায়া কে?

(২) কথমুৎপন্না সা—কি প্রকারে তিনি উৎপন্ন হন?

(৩) অস্যাঃ কর্ম্ম চ কিম্—ইহাঁর কার্য্যই বা কি?

(৪) যৎস্বভাবা চ সা দেবী—ইহাঁর স্বভাব কি?

(৫) যৎস্বরূপা—ইঁহার স্বরূপ কি?

(৬) যদুদ্ভবা—কাহা হইতে তাঁহার উদ্ভব?

সুরথ রাজার এই ছয়টি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর শ্রীশ্রীচণ্ডী খুলিবার কুঞ্জী বা চাবী। শুধু চণ্ডীর চাবী নহে, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিবার উপায় পাওয়া যায় এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তরে। শ্রীশ্রীচণ্ডী ধারণা করিবার কথা পরে বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাইবে, এইক্ষণে এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটন কেমন করিয়া হয় তাহাই বলা যাইতেছে।

প্রথম কথা—বেদ বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম বা মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করা—অজ্ঞান মুক্তির আর অন্য পথ নাই। যাঁহারা ভারতের বাহিরের জ্ঞান গুরুর পদাশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে কেহ জানিতে পারেনা—কেহ জানেও না কারণ ঈশ্বর চির অবিদিত এবং তাঁহাকে কখনও জানা যাইবে না। চির অবিদিত ঈশ্বর আছেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ইহা বিশ্বাস করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া অজানা ঈশ্বরের পশ্চাৎ ছুটিতে থাক—কেবল চল, কেবল চল—এইভাবে চলিতেই থাক—কখন এই চলা তোমার শেষ হইবে না—ইত্যাদি। এই যে-শিক্ষা এশিক্ষা ভারতের নহে—এ শিক্ষা বিদেশী পণ্ডিতের শিক্ষা। ইহাতে পণ্ডা বা আত্ম-বিষয়িনী বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না। যাঁহারা চিরদিন ভারতের শিক্ষার দোষ দিয়া থাকেন, ভারতের আচার ব্যবহার নিতান্ত দুস্ট বলিয়া থাকেন তাঁহারাই এই মতের পোষকতা করেন। এই সকল

ব্যক্তি বেদও মানিতে পারেন না। বেদ বা শ্রুতি যে কাহারও রচিত নহে, বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদই যে ব্রহ্ম ইহাও তাঁহাদের অভারতীয় বুদ্ধিতে কখন উদিত হইতে পারে না—কারণ তাঁহারা যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিয়া মনকে গঠন করিয়াছেন তাহাতে ঋষিগণের সূক্ষ্ম বিচার বুঝিবার সামর্থ্যই জন্মে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ২৬ খণ্ডে ৭ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের "আহার শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" উপদেশ শুনিয়া সুবিধাধর্ম্মী যাঁহারা, তাঁহারা যে বলিবেন আহারের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব নাই—ইহা বালকেও বুঝিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম আহার শুদ্ধি না হইলে বেদের "তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইহা সুবিধাবাদী যাঁহারা তাঁহারা মানিতেই পারিবেন না। যাহা তাহা আহার করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন যে ব্রহ্মকে পরমাত্মাকে বা ঈশ্বরকে জানা যায়, পাওয়া যায়, তাঁহাদের ভারতীয় সংস্কার থাকায় তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন মাত্র, কিন্তু রাজনৈতিক পথে চলিতে গিয়া তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও নিজের জীবনে নানাপ্রকারে শাস্ত্র লঙ্ঘনে স্বার্থ সাধন করেন। এ বিষয়ে অধিক বলিবার আর প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা তিনি এইরূপ লোক দিয়াও অমঙ্গলের মধ্যদিয়া মঙ্গলই আনয়ন করেন।

এখন আমরা বেদের "তমেব বিদিত্বা"তে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা কিরূপে আসিতেছে তাহাই দেখাইব।

বেদ বলিতেছেন ব্রহ্মকে জান; শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ রাজাও মেধা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ব্রবীতি—ইত্যাদি অর্থাৎ ভগবন্ সেই দেবী, কে? যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন? মহামায়াকে জান—চণ্ডীর প্রথম কথা এই। এখানে প্রশ্ন উঠিবে মহামায়া ও ব্রহ্ম কি একই বস্তু যে বেদের কথা ও চণ্ডীর কথা এক হইল? সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের শিক্ষা হইতেছে ভারতে যে দেবীর উপাসনা হয় তিনিই ব্রহ্ম। কিরূপে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তদুত্তরে আমরা বলি—পূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি

যে দেবী অর্থে শক্তি ; এই শক্তিই মহামায়া। এই মহামায়া আপন স্পন্দশক্তি দ্বারা জগৎ রচনা করেন আবার যখন তিনি চৈতন্যোন্মুখী হন তখন তিনি স্ত্রী থাকেন না, পুরুষ হইয়া যান। তন্ত্রে স্ত্রীর নাম শিবা আর পুরুষের নাম শিব অথবা এই শিব ও শিবাই হইতেছেন চৈতন্য ও শক্তি। প্রয়োগ সাগরে বলা হইয়াছে "শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতা" ইতি। স্পন্দরূপিণী জগন্মাতা যখন পরমশান্ত, সর্ব্ববিধ চলন রহিত, শ্রুতি যাঁহাকে বলেন "অনেজদেকং" —এই পরম শিবকে স্পর্শ করিতে প্রধাবিত হয়েন তখন তাঁহাকে এই জগতের খেলা গুটাইয়া লইতে হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নির্ব্বাণ প্রকরণের উত্তর খণ্ডের ৮১ অধ্যায়ের ১০২ শ্লোকে মহাপ্রলয়ে প্রলয়-আনন্দমগ্না, ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিষধর ভুজঙ্গ সকল গ্রাসকারিণী ভগবতী কালরাত্রিরূপিণী এই মহাদেবীর অতি ভীষণ নৃত্যের কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—

ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ সহসা ঝম্যঝম্যং প্রঝম্যং
নৃত্যন্তী শব্দবাদ্যৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
পূর্ণং রক্তাসবানাং যমমহিষমহাশৃঙ্গমাদায় পাণৌ
পায়াদ্ বো বন্দ্যমানঃ প্রলয়মুদিতয়া ভৈরবঃ কালরাত্র্যা॥

যোঃ নিঃ উঃ ৮১।১০২।১৩৩

ঐ মহাগ্রন্থের ঐ প্রকরণের ১৩৩ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে শিবোন্মুখী শক্তির কথা আবার বলা হইয়াছে—

বদ্ধা খড়্গাঙ্গশৃঙ্গে কপিলমুরুজটা মণ্ডলং পদ্মযোনেঃ
কৃত্বা দৈত্যোত্তমাঙ্গৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
যা দেবী ভুক্তবিশ্বা পিবতি জগদিদং সাদ্রিভূপীঠমাজ্যং
সা দেবী নিষ্কলঙ্কা কলিততনুলতা পাতু নঃ পালনীয়ান্॥

যোঃ নিঃ উঃ ১৩৩।৩০॥

আমরা বলিতে যাইতেছি বেদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহামায়া তিনিই। উপরের দুইটী শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম

করিবার জন্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে প্রলয় আনন্দবিহ্বলা শিব স্পর্শ-নোন্মত্তা দেবী চণ্ডীর আরও একটু সংক্ষিপ্ত আভাষ দিয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছি।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের কালরাত্রিস্বরূপিণী দেবীর নৃত্য বর্ণনার শ্লোক দুইটী সাধকের বড়ই আনন্দের কণ্ঠহার।

ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব মহামায়ার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—অবিদ্যাবৃতা চিৎ-স্বরূপা, নিখিল সংসারচিত্রে দেদীপ্যমানা, বিদ্যাবলে অবিদ্যামালিন্য দূরীভূত হইলে নির্ম্মল প্রশান্ত আকাশ-স্বরূপিণী—বিশাল শরীরী ভৈরবী দেবী অনন্ত-আকাশব্যাপিনী হইয়া অতি ভৈরবরূপী কল্পান্ত-রুদ্রের পুরোভাগে নৃত্য করিতেছেন। আর কল্পান্তরুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নি প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়া নিখিল সংসার বনভূমি দগ্ধ করিয়া স্থাণু মাত্রে অবশেষ করিতেছে। প্রচণ্ড নৃত্যাবেশে দেবী প্রবল প্রলয় বাত্যা-বিধূনিত অরণ্যশ্রেণির ন্যায় দুলিতেছেন আর নৃত্য করিতে করিতে আকাশের ন্যায় ভীষণদেহ-কল্পান্তরুদ্রকে অর্চ্চনা করিতেছেন ; সঙ্গে সঙ্গে কল্পান্তরুদ্রদেব ও দেবীর ন্যায় বিশাল শরীর ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

হে শ্রোতৃবর্গ ! যে দেবী রক্ত ও মাদকদ্রব্যে পূর্ণ যম মহিষের মহাশৃঙ্গ হস্তে ধারণ করিয়া ডিম্ব ডিম্ব সুডিম্ব পচ পচ ঝম্য ঝম্য প্রঝম্য ইত্যাদি তাল ব্যঞ্জক শব্দ বাদ্যে নৃত্যপরায়ণা, যে দেবী গলদেশে মুণ্ড-মালার মালা পরিয়া শোভমানা, যে দেবী গরুড়ের পক্ষ দ্বারা শিরো-ভূষণ করিয়াছেন, প্রলয়ে জগদ্-ভক্ষণ করিয়া কালরাত্রিরূপিণী যে দেবী প্রলয়আনন্দবিহ্বলা, সেই দেবী নৃত্য করিতে করিতে যে মহাভৈরবকে অর্চ্চনা করিতেছেন— কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান সেই মহারুদ্র—হে শ্রোতৃবর্গ তিনি তোমাদের জ্ঞান-প্রতিবন্ধক দোষ সকল নিরাশ করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

হে ভৈরব ! হে কালরুদ্র ! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর ডিম্বকে, অনর্থভোগের উপাধি স্বরূপ এই স্থূল শরীরাদি প্রপঞ্চবর্গকে ভক্ষণ করিয়া থাক [অঝম্য—ঝমু অদনে] পরে ডিম্বকে সূক্ষ্ম শরীরাদি প্রপঞ্চকেও ভক্ষণ

কর। [বাম্যং]; পুনরায় সুডিম্বকে—মূলোপাধিভূত কারণ শরীরকেও চরম সাক্ষাৎকারে তত্রত আবির্ভূত করিয়া প্রঝম্য—সম্যগরূপে—নিঃশেষে ভক্ষণ করিয়া থাক। ভক্ষণ করিয়া পঞ্চমাদি যোগভূমিকা রোপণ করিয়া, সহসা অতি শীঘ্র পচ পচ—সপ্তমভূমিকা পর্য্যন্ত সম্যক-রূপে পরিপাক করিয়া থাক। কালরাত্রি কর্ত্তৃক বিদেহ-কৈবল্য দ্বারা তুমি স্তূয়মান। আহা! এই নৃত্যপরায়ণা কালরাত্রির সহিত আমরাও তোমাকে নমঃ করি—ন মম—আমার কিছুই নাই—সব তোমার অনুভব করি। তুমি আমাদের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষ সকল নিরাস করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

সর্ব্বশরণ্যা কালরাত্রিস্বরূপিণী ময়ূরী মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড কোটি বিষধর সমূহকে গ্রাস করিয়া যখন নৃত্য করেন তখন উঁহার রূপ কি ভীষণ! যে দেবী মহাকল্লান্তে সংহৃত পদ্মযোনি ব্রহ্মার কপিলউরু-জটামণ্ডল খড়গাঙ্গশৃঙ্গে বন্ধন করেন, যে দেবী দৈত্যগণের মস্তক দ্বারা মুণ্ডমালা গাঁথিয়া আপন গলদেশে ঝুলাইয়া রাখেন, যে দেবী সংহৃত গরুড়ের পর্ব্বতাকার পক্ষ দিয়া শিরোভূষণ করেন, যে দেবী বিশ্বের প্রাণিজাত ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বত ও ভূপীঠের সহিত এই জগৎ পান করেন, এইরূপে সর্ব্বনাশকারিণী হইয়াও যিনি নিষ্কলঙ্কা—দোষ লেশ শূন্যা, শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপা, যে দেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কলিতভনুলতাশরীর স্বীকার করেন, আহা! হরিহরব্রহ্মাদি বন্দিতা সেই দেবী অবশ্য পালনীয় আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মহামায়ার এই যে পরিচয় তাহাতে কি পাওয়া গেল? পাওয়া গেল ইনি অবিদ্যামণ্ডিতা চিৎস্বরূপা। ইঁহার অবিদ্যানৃত্যে জীবের মোহ কিন্তু চিৎস্বরূপে ইনি পূর্ণচিৎকে স্পর্শমাত্রেই সেই ব্রহ্মরূপেই অদ্বৈতা। তখন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। একমাত্র তিনিই আছেন। সমস্ত অবিদ্যা ইহাঁরই প্রভায়—ইহাঁরই অঙ্গে ভাসে। স্পন্দনাত্মিকা এই মায়া আবরণ সরিয়া গেলে মহামায়াই ব্রহ্মরূপিণী।

এই যে ছয়টী প্রশ্নে সুরথ রাজা শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বেদে "তমেব বিদিত্বা" তে এই কথাই লক্ষ করা হইয়াছে;

সর্ব্বশাস্ত্রেই "বিদ্মহে"র উপদেশ প্রথমে। তাহার পরে ধীমহি। শাস্ত্র বলেন "দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ।"

প্রথমে পরিচয়, পরে পূজা, পরে দর্শন, শেষে দর্শনে অভীষ্ট সিদ্ধি। "তমেব বিদিত্বা" তে শ্রুতি নির্গুণ-স্বগুণ ব্রহ্মের পরিচয় লইতে বলিতেছেন। এই জন্য ভারতের নরনারী যেখানে যে আছে তাঁহারা যাঁহারই উপাসনা করুন না তাঁহাদিগকে গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিতে হয়। বৈদিক গায়ত্রীতে খণ্ড চৈতন্যকে অখণ্ড চৈতন্য দেখাইবার জন্য যাহা করিতে হয় তান্ত্রিক গায়ত্রীতে তাঁহারই রূপ, লীলা ও গুণ ধরিয়া সেই অখণ্ড চৈতন্যকেই ভাবনা করিতে হয। উভয় উপাসনাতেই ধ্যান আছে। বৈদিক গায়ত্রীতে মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাঁহাকেই ভাবনা করিতে হয়; ইনিই সৃষ্টি-প্রাক্কালে বিশাল গগনাঙ্গনে প্রণবরূপিণী, ইনিই দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজমানা। ইনিই সেই ক্রীড়াশীল দীপ্তিশীল জগৎ প্রসবিতার উপাসনীয় 'ভর্গ' সর্ব্বদাই শিবোন্মুখী এই শক্তি পরম চৈতন্যরূপিণী নির্গুণ-স্বগুণ ব্রহ্মাই। এস ইহাঁকে আমরা ধ্যান করি। ইনিই আমাদিগকে গন্তব্যপথে লইয়া যান। এই বৈদিক গায়ত্রীও যাহা তান্ত্রিক গায়ত্রীতে যে মূর্ত্তির ধ্যান করিতে বলা হইতেছে —মূর্ত্তি অবলম্বনে সেই পরাচিন্ময়ীই তিনি।

আজ এই কলিযুগে আমরা "বিদ্মহের" মধ্যে যে পরিচয় লইবার উপদেশ আছে তাহার আবশ্যকতা তত দেখি না বলিয়া আমাদের উপাসনার অনুষ্ঠান সমস্ত প্রাণহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এইজন্য ধ্যান ও হয় না—"প্রচোদয়াৎ" তে আমরা পৌছিতেই পারি না। আমরা উপাস্যের যে পরিচয় লইয়া থাকি তাহা যেন মুখের কথায়। ঐ যে সঙ্গীতে বলা হইয়াছে যে—"তোমাতে আমাতে দুটো মুখের কথাতে হবে কি হে পরিচয়" এই বিলাপই যেন ঠিক। মুখের কথায় পরিচয় না লইয়া গুরু ও শাস্ত্রমত উপদেশ লইলে তবেই "তমেব বিদিত্বা" বা "বিদ্মহে"র কার্য্য করা হইবে।

বলিতেছিলাম (১) প্রথমেই শুনিতে হইবে—যাঁহার উপাসনা করি তিনি কে? (২) কি প্রকারে তিনি অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন?

(৩) তিনি কোন্ কর্ম্ম করিবার জন্য উৎপন্ন হন ? (৪) তাঁহার স্বভাবটি কিরূপ ? (৫) তাঁহার স্বরূপটি কি ? (৬) কাহা হইতে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ রাজার এই ছয় প্রশ্নের উত্তর যেমন দেওয়া হইয়াছে, বেদও এই জানাকেই সংসার সাগর অতিক্রম করার পথ বলিতেছেন, এতদ্ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই তাহাও বলিতেছেন।

যাহা চণ্ডীতে পাওয়া যায় তাহাই অন্য শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। ভগবান্ বাল্মীকি, রামায়ণের প্রথমেই এই "বিস্ময়ের" কথা তুলিয়াছেন। দেবর্ষি নারদকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

মানুষের মধ্যে এমন সর্ব্বগুণাধার পুরুষোত্তম কেহই নাই যিনি গাম্ভীর্য্যে—অগাধাশয়ত্বে সমুদ্রের মত, ধৈর্য্যে হিমাচলের মত, যিনি মনে মনেও অধৃষ্য, ইষ্টবিয়োগেও অনভিভূতচিত্ত—রণস্থলে সর্ব্বপ্রকার সহায়শূন্য হইয়াও অটল, তেজে বিষ্ণুর সমান, পূর্ণচন্দ্রের মত প্রিয়দর্শন, ক্রোধে প্রলয়াগ্নির মত, ধর্ম্মার্থে কুবেরের সমান, সত্যবাক্যে ধর্ম্মের মত ; শুধু প্রেমময় নহেন কিন্তু অধর্ম্ম বিনাশে বজ্রাদপি কঠোর। বলিতেছি মহাগ্রন্থ রামায়ণেও সুরথ রাজার ছয়টি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

আবার রামায়ণে স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন উত্তর তাপনীতে এবং অধ্যাত্মরামায়ণে তাহা অতি স্পষ্ট। চৈতন্য ও শক্তি অথবা শিব শিবা যেমন জগতের মূলে সেইরূপ রাম সীতাও ব্রহ্ম এবং অবিদ্যামণ্ডিত চিৎশক্তি। ত্রিপুরা রহস্যে যাহাকে বলা হইয়াছে—

"ওঁ নমঃ কারণানন্দরূপিণী পরচিন্ময়ী।
বিরাজতে জগচ্চিত্র চিত্রদর্পণরূপিণী॥"

উত্তর তাপনীতে তাঁহাকেই বলা হইতেছে—

শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিণী।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-কারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতি সংজ্ঞিতা॥

অধ্যাত্মরামায়ণে ভগবান্ শ্রীরামকে বলা হইয়াছে—

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥

এই রাম নির্গুণ ব্রহ্ম। আর সীতা ?

মাং বিদ্ধি মূল প্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা॥

এই সীতাই পরচিন্ময়ী। অযোধ্যা নগরে জন্ম হইতে রামায়ণের সমস্ত ঘটনাই—এমন কি "মৎপাণিগ্রহণং" পর্য্যন্ত সমস্ত সীতাই করিয়াছেন। আর রাম—

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ—
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণাননুগতো হি তথা বিভাতি॥

চণ্ডীতেও যে কথা রামায়ণেও তাই। গীতাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে ভাগবতেও ইহা।

দেখা গেল সর্ব্বশাস্ত্রে এক উপদেশই পাওয়া যাইতেছে—এই উপদেশ সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের মোহ দূর করিয়া কর্ত্তব্যহীনকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার জন্যই। গীতাতে শ্রীভগবানের উপদেশ শুনিয়া অর্জ্জুন যেমন বলিয়াছিলেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

হে অচ্যুত! আমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার অনুগ্রহে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান—অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ধারণা করিতে পারিয়াছি, এখন তোমার আদেশ পালনে স্থির নিশ্চয় করিলাম; আমার সকল সংশয় দূর হইয়াছে এখন তোমার আদেশ পালন করিব—সকল শাস্ত্রের লক্ষ্যই ইহা—সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এই মোহ বিনাশ।

আমরা এখন সুরথরাজার প্রশ্নের উত্তরে মেধা ঋষি যাহা বলিলেন তাহার কতক আলোচনা করিয়া চণ্ডী পাঠ ক্রমের বিষয় বলিব।

মেধা ঋষি বলিলেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

সেই দেবীই নিত্যা; এই জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি; তিনিই এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার আবির্ভাব আমার নিকটে নানারূপে শ্রবণ কর। দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া লোকে অভিহিত হয়েন।

ঋষির এই উত্তরে রাজার দুই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

এই আলোচনার পূর্ব্বে আর একবার শ্রীচণ্ডীর আবশ্যকতা উল্লেখ করা উচিত বিবেচনা করি। আমার মন সংসারের প্রতি নিষ্ঠুর হইতে চায় না—এই সার্ব্বজনীন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর যে অভ্যুদয় ইহাও স্মর্ত্তব্য বলি।

সংসারের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়ার সীমা কতদূর তাহাও অবগত হওয়া আবশ্যক। সাধারণ মানুষে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র,

কন্যা, আত্মীয়স্বজনের উপর নিষ্ঠুর হওয়াকে সংসারের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া বলে। কিন্তু যাঁহারা ঋষিগণের উপদেশ কিছু জানিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই দেহকে আত্মা বোধ করাই প্রকৃত সংসার। যতদিন দেহকে আমি বলিয়া জানা থাকে, যতদিন দেহের সহিত সম্পর্ক থাকে, ততদিন সকলের সহিত সম্বন্ধ থাকে; ফলে দেহে "আমি" ''আমার'' বোধ থাকে বলিয়াই স্ত্রীপুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। সংসার সুখদুঃখাদি সাধক।

জগতে যাহা কিছু দুঃখ তাহার মূল হইতেছে এই দেহ। দেহ জন্মায় কর্ম্ম হইতে। দেহে যে কর্ম্ম চলে তাহা পুরুষের অহংবুদ্ধি দ্বারা। অহংকার কিন্তু অনাদি। ইহা জড়। অহংকারের জন্ম হয় অবিদ্যা হইতে। ইহা চিৎপ্রতিবিম্ব দ্বারা অগ্নিযোগে অয়ঃপিণ্ডের মত তপ্ত হইয়া—জড় হইলেও চিতের সহিত তাদাত্ম্যতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চেতন মত দাঁড়ায়।

আমি দেহ এই যে বুদ্ধি ইহা আত্মার অহং অভিমানেই জন্মে। দেহে অহংবুদ্ধি হইতেই সংসার হয়—সংসারটা সুখদুঃখাদি সাধক।

নির্ব্বিকার আত্মার তাদাত্ম্যতা সর্ব্বদাই মিথ্যা জীব; আমি দেহ আমি কর্ম্ম কর্ত্তা এই সঙ্কল্পে সর্ব্বদা কর্ম্ম করে।

যথাস্থানে চণ্ডীর সমস্ত বিষয়ই আসিবে বলিয়া আমরা উপক্রমণিকাতে এই বিষয়ের অধিক কিছুর অবতারণা হইতে বিরত রহিলাম।

শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠবিধি ও ক্রম।

নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে "ওঁ তৎসৎ" স্মরণে চণ্ডী পাঠ করিতে হয়। "হা জগদম্ব! আমায় কৃপা কর" ইহা যখন হৃদয় হইতে উত্থিত হয় তখন জগজ্জননীর প্রসন্নতার কার্য্যসমস্ত রসের সহিত হইতে থাকে। "হা" ! শব্দের ভিতরে বৈরাগ্যেরভাব পূর্ণ থাকে। মানুষ—যদি যথার্থ মানুষ থাকে—তবে নিজের দিকে তাকাইলে

কাতর হইবেই। প্রাণ কাতর না হইলে পূজা পাঠাদি অভ্যাস মতই হইয়া যায়—ঠিক মত হয় না।

পবিত্র হইয়া উত্তর মুখে বা পূর্ব্ব মুখে বসিবে। বসিয়া আধারে পুস্তক রাখিয়া পাঠ করিবে। পুস্তক হস্তে ধরিয়া পাঠ করিলে আধাআধি কার্য্য হয়। "হস্তসংস্থাপনাৎ দেবী নিহন্ত্যর্দ্ধফলং যতঃ" হস্তে পুস্তক রাখিয়া পাঠ করিলে দেবী অর্দ্ধফল নষ্ট করেন। যাবৎ অধ্যায় শেষ না হয় তাবৎ পাঠ বিরাম করিবে না। "যাবন্ন পূর্য্যতেঽধ্যায়স্তাবন্ন বিরমেৎ পঠন্"। যদি বিঘ্ন বশতঃ মধ্যে বিরাম ঘটে তবে আবার আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া অধ্যায়ের প্রথম হইতে আরম্ভ করিবে।

পাঠকালে কাহারও সহিত কথা কহিবে না। শিরঃকম্প, শরীর দোলান, গাত্রভঙ্গ, হাইতোলা, তন্দ্রা, হাঁচি, থুথু ফেলা—এই সমস্ত যাহাতে না হয় এইরূপ করিবে। কথা কহিলে বা থুথু ফেলিলে আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সেই অধ্যায়ের প্রথম হইতে পাঠ করিতে হয়; হাইতোলা, তন্দ্রাদি হইলে ব্রাহ্মণ দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবেন।

"ন মানসং পঠেৎ স্তোত্রং বাচিকস্তু প্রশস্যতে" মনে মনে স্তোত্র পাঠ অপেক্ষা বাচিক পাঠই প্রশস্ত। যাঁহারা সমর্থ তাঁহারা চণ্ডী পাঠের পরে প্রদীপ্ত বহ্নিতে তিল ধান্য তণ্ডুলাদি আহুতি দিয়া হোম করিবেন। পায়সান্ন আহুতি দিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষে সিদ্ধি হয়।

আরও জানা চাই যে গানের সুরে পাঠ করিতে নাই, অতি দ্রুত পাঠ করিতে নাই; আপনা কর্ত্তৃক, অপণ্ডিত কর্ত্তৃক এবং অব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হস্ত লিখিত পুস্তক পাঠ করিবে না কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক পাঠের বিধি আছে; অল্প কণ্ঠে পাঠ উচিত নহে এবং অর্থ বুঝিয়া পাঠ করা উচিত।

"গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমঃ॥

স্বয়ং পাঠে অসমর্থ হইলে অনুষ্ঠান পরায়ণ বিজ্ঞ অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারাও পাঠ করান যায়। কিন্তু অন্যের কল্যাণার্থ চণ্ডী পাঠে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের অধিকার নাই।

চণ্ডী পাঠের পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়া দেবীর পূজা করা আবশ্যক। শরতে ও বসন্তে দুর্গা পূজার সময়ে চণ্ডী পাঠ করিলে চণ্ডীপূজা বিধি-পূর্ব্বক করা উচিত। শান্তি স্বস্ত্যয়ন কালেও পূজা বিধিমত করিতে হয়। কিন্তু দেবীর প্রসন্নতা লাভ জন্য নিত্য বা সময় মত চণ্ডী পাঠে চণ্ডী গ্রন্থকে দেবী হইতে অভিন্ন জানিয়া ভক্তিভাবে গ্রন্থকে পূজা করিয়া পাঠ করা যাইতে পারে।

সপ্তশতী চিন্তামণিকে নিকটে পাইয়া অবিধি পূর্ব্বক পাঠ করিলে কান্তার ভ্রমণের ন্যায় বৃথা ভ্রমণ ক্লেশই হয়, মনে রাখিয়া যথাশক্তি অর্থবোধের সহিত বিধিমত পাঠ করাই উচিত। যাঁর সময় আছে তিনি শুধু গ্রন্থ পূজা না করিয়া বিধিপূর্ব্বক দেবীপূজা করিয়া পাঠ করিবেন। পাঠের ক্রম হইতেছে—"নারায়ণং নমস্কৃত্য" পাঠান্তে

(১) দেবী কবচ (কবচং দেবতা গাত্রং)।

(২) অর্গলা স্তুতি।

(৩) কীলক স্তব।

(৪) রাত্রি সূক্ত।

(৫) চণ্ডী মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ। "এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা"...এই শেষ শ্লোক দুইবার পাঠ করিতে হয়—করিয়া যদক্ষরং বলিয়া প্রসাদ ভিক্ষা।

(৬) দেবী সূক্ত।

(৭) রহস্যত্রয়।

(৮) ক্ষমা প্রার্থনা।

এক দিনে ২, ৩ রূপ পাঠ করিতে হইলে কবচ, অর্গল, কীলক, রাত্রি সূক্ত, দেবীসূক্ত, রহস্যত্রয়, ক্ষমা প্রার্থনা একবার পাঠ করিলেই

হইবে—প্রতিবারে এইগুলি পাঠ না করিয়া কেবল দেবী মাহাত্ম্য ১৩ অধ্যায় পাঠ করিতে হয়।

এ সম্বন্ধে মরীচি কল্পধৃত-বচন হইতেছে—

রাত্রিসূক্তং জপেদাদৌ মধ্যে চণ্ডীস্তবং পঠেৎ।
প্রান্তে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তমিতি ক্রমঃ॥

দেবীসূক্ত পাঠের পরে "রহস্যত্রয়ং পঠনীয়ম্"।

আমরা চণ্ডীপূজাবিধি, কোন কোন স্থানে শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন এবং শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয় দ্বয়ের শ্রীচণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সপ্তটীকা দুর্গাসপ্তশতীর বিজ্ঞাপনে আছে শ্রীমচ্চণ্ডীকার প্রসাদসিদ্ধি জন্য অনুষ্ঠান পদ্ধতি অবশ্যই পালনীয়। বৃহজ্জ্যোতিষার্ণবে ধর্ম্মস্কন্ধে ৬০ প্রকরণাত্মক দুর্গোপাসনাধ্যায়ে জপ অর্চ্চন স্তব আরাধনা অনুষ্ঠানাদি প্রমাণ সহ বিবৃত আছে।

চণ্ডীপূজাবিধি।

আচমন—

শুচি হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ। (আচমন ৩ বার)

ওঁ ঐং আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা।
ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা।
ওঁ ক্লীং শিবতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা।
ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং সর্ব্বতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা।
অথবা ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীবচক্ষুরাততম্।
ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষঃ।

অর্চ্চনা

ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ (৩ বার বলিয়া গন্ধাদি পূজার দ্রব্যে ৩ বার জল প্রক্ষেপ করিবে।)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজনীয় দেবতাভ্যোঃ নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গুরুবে নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুস্পে ওঁশ্রী সূর্য্যায় নমঃ।

অর্ঘ্য সাজাইয়া—ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ।

স্বস্তিবাচন

কুশীতে আতপতণ্ডুল লইয়া ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠ—সাঙ্গতার্থং দেবী-পূজন-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু (ওঁপুণ্যাহং ওঁপুণ্যাহং ও পুণ্যাহং)

ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠসাঙ্গতার্থং দেবী-পূজন কর্ম্মণি-ওঁস্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু (ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি)।

ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠসাঙ্গতার্থং দেবীপূজনকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু (ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং)

স্বস্তি সূক্তং

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। বলিয়া চাউলগুলি ছড়াইবে।

সাক্ষ্যমন্ত্রঃ

(কৃতাঞ্জলি হইয়া বল)

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ
সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।

পবনো দিক্‌পতিভূর্মি-রাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥

সঙ্কল্পঃ

তাম্রপাত্রে কুশ তিল হরিতকী ও জল লইয়া দক্ষিণ জানু পাতিয়া উত্তর মুখে বসিয়া

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষঃ॥ বলিয়া—

বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ, অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধিকামঃ শ্রীমচ্চণ্ডিকা প্রীতিকামো বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ওঁ ইত্যন্তগ্রন্থস্য দেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ পাঠমহং করিষ্যে। ২রূপ ৩রূপ পাঠে "সকৃৎ" পদের পরিবর্ত্তে দ্বিঃ, ত্রিঃ, চতুঃ, পঞ্চকৃত্যঃ ষট্‌কৃত্বঃ ইত্যাদি বলিতে হইবে। দুর্গা পূজার সময় চণ্ডীপাঠের সঙ্কল্পে বলিতে হইবে।

বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি অমুকে পক্ষে, অমুক তিথৌ আরভ্য মহানবমীং যাবৎ বার্ষিক-শরৎকালীন-দুর্গা-মহাপূজায়াম্ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়না-ভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ওঁ ইত্যন্ত গ্রন্থস্য দেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ (দ্বিকৃত্বস্ত্রিকৃত্বো বা) পাঠ মহং করিষ্যে।

সঙ্কল্প সূক্তম্

ঈশান কোণে জল ফেলিবে। কোষা উপুড় করিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে তদুপরি পুষ্প বা আতপ তণ্ডুল দিয়া সূক্ত পাঠ করিবে। যথা

ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু, পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ॥

(সামবেদী)

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ ; পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্।
উদ্‌বা সিঞ্চদ্ধ-মুপ বা পৃর্ণধ্বমাদিদ্ বো দেব ওহতে।

(যজুর্ব্বেদী)

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

(ঋগ্বেদী)

ওঁ যা গুংগূর্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী।

ইন্দ্রানীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে॥

ওঁ সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধিরস্তু॥ (ওঁ অস্তু)

ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। (ওঁ ভবতু)

জলশুদ্ধিঃ

ভূমিতে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া, তাহার উপরে গন্ধপুষ্প দিতে দিতে বলিবে—

ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিবৈ নমঃ: ইহার উপরে কোশা রাখিয়া নমঃ মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিয়া কোশার মুখভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া ওঁ মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে গঙ্গা ইত্যাদিকে আবাহন কর।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

ঐ জলের উপরে মৎস্য মুদ্রা করিয়া দশবার ওঁ জপ কর।

ভূতাপসারণ

বামপদের গোড়ালী ৩ বার মাটিতে ঠুকিয়া আতপতণ্ডুল লইয়া ফট্ মন্ত্র সাতবার জপিয়া বল

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।

যে ভূতা বিঘ্ন-কর্ত্তার স্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ চালগুলি ছড়াইয়া দাও।

আসন শুদ্ধিঃ

আসনের নীচে জলদ্বারা ত্রিকোণ লিখিয়া বল—ওঁ আধায় শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।

আসনে গন্ধপুষ্প দিয়া আসন ধরিয়া বল—ও পৃথ্বীতিমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বীত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং॥

ও ভূর্ভুবঃস্বঃ বলিয়া জলের ছিটা দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে নমস্কার করিতে করিতে বল—

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ।
(দক্ষিণে) ও গণেশায় নমঃ। উর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ (সম্মুখে)
ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥

শাপোদ্ধারঃ

ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ চণ্ডিকে দেবি শাপানুগ্রহং কুরু কুরু স্বাহা। ৭ বার জপ কর।

উৎকীলন মন্ত্র

ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ চণ্ডিকে উৎকীলনং কুরু কুরু স্বাহা। ২১ বার জপ কর।

প্রাণায়ম

হ্রীঁ এই মায়াবীজে ১৬, ৬৪, ৩২, কর। ইহা না পার ৮, ৩২, ১৬ কর। না পার ৪, ১৬, ৮ কর।

করাঙ্গন্যাস

হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ
হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা
হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষ্‌ট
হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং
হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট
হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্‌॥
হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ
হ্রীং শিরসে স্বাহা

হ্রূং শিখায়ৈ বষ্‌ট

হ্রৈং কবচায় হুং

হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষ্‌ট

হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্‌ ॥

ঋষ্যাদি ন্যাস

অস্য সপ্তশতী স্তোত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ দক্ষিণামূর্ত্তির্দেবতা হ্রীং বীজং, স্বাহা শক্তিঃ, মমাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

(মস্তকে) ওঁ নারদর্ষয়ে নমঃ (মুখে) ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ (হৃদয়ে) ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তি দেবতায়ৈ নমঃ (গুহ্যে) হ্রীং বীজায় নমঃ (পাদদ্বয়ে) ওঁ স্বাহাশক্তয়ে নমঃ।

ধ্যান

(হস্তে পুষ্প লইয়া)

ওঁ বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং

কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্‌।

হস্তৈশ্চক্রবরাসিখেটবিশিখাং শ্চাপং গুণং তর্জ্জনীং

বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥

অথবা যে কোন শক্তিমূর্ত্তির ধ্যান করিবে। নিজ মস্তকে সেই পুষ্প দিয়া—

মানস পূজা

হৃদয় মধ্যে ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিয়া হৃদপদ্ম আসন, সহস্রদল পদ্মগলিত অমৃত পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, ঐ অমৃত আচমনীয় ও স্নানীয় জল, গন্ধতত্ত্ব পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজস্তত্ত্ব দীপ, হৃদ্‌পদ্মমধ্যে কল্পিত সুধা—সমুদ্রের সুধা নৈবেদ্য। ভাবনা করিয়া

অথবা—

লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং কল্পয়ামি (কনিষ্ঠাদ্বয় একত্র করিয়া)
হং আকাশাত্মকং পুষ্পং ,, (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ,,
যং বায়ব্যাত্মকং ধূপং ,, (তর্জ্জনীদ্বয় ,,
রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ,, (মধ্যমাদ্বয় ,,
বং অমৃতাত্মক নৈবেদ্যং ,, (অনামিকাদ্বয় ,,

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন

স্ববামে হুং গর্ভ ত্রিকোণমণ্ডল লিখিবে। তাহার উপরে ফট্ মন্ত্রে প্রক্ষালিত ত্রিপদিকা (তেপায়া) রাখিয়া তদুপরি শঙ্খ রাখিয়া হ্রাং মন্ত্রে জল-গন্ধ-দুর্ব্বা-আতপতণ্ডুল তাহাতে দিয়া—

মং দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলায় নমঃ (ত্রিপদিকায় গন্ধপুষ্প দাও)
অং দ্বাদশকলাব্যাপ্ত সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ (শঙ্খে গন্ধপুষ্প দাও)
উং ষোড়শকলাব্যাপ্ত সোমমণ্ডলায় নমঃ (জলে গন্ধপুষ্প দাও)
পরে গন্ধপুষ্প দিয়া শঙ্খ পূজা করিবে, যথা—

আগ্নেয্যাং (অগ্নিকোণে) হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ
ঐশান্যাং (ঈশান কোণে) হ্রীং শিরসে স্বাহা
নৈঋত্যাং (নৈঋতে) হ্রূং শিখায়ৈ বষট্
বায়ব্যাং (বায়ুকোণে) হ্রৈং কবচায় হুং
সম্মুখে হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্
মধ্যে হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্

পরে ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি পাঠ করিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ সকলকে আবাহন করিয়া করদ্বয়ে শঙ্খ আচ্ছাদন পূর্ব্বক ওঁ মন্ত্র বা হ্রীং মন্ত্র ১০ বার জপিবে। সেই শঙ্খের জল কিঞ্চিৎ কোশায় দিয়া সেই জল নিজের মস্তকে ও পূজার দ্রব্যে প্রক্ষেপ করিবে। পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই অর্ঘ্য রাখিয়া দিবে।

পুনর্ব্বার পুষ্প লইয়া, ধ্যান করিয়া ঘটে বা পুস্তকে সেই পুষ্প দিয়া আবাহন করিবে—

ওঁ হ্রীং চণ্ডিকে দেবি ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া বল—

ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িস্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥

গণেশাদি পূজা

এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ
এতৎ পুষ্পং ওঁ গণোশায় নমঃ
এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ
এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ
এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ

এইরূপ পঞ্চোপচারে ওঁ সূর্য্যায় নমঃ ; ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ; ওঁ শিবায় নমঃ ; ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ; ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ; ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যা নমঃ ; ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারগণেভ্যো নমঃ ; ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ; ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ ; ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ; ওঁ গুরুভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

শক্তিপূজা

ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প মস্তকে দিয়া এতৎ পাদ্যং হ্রীং ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি বলিয়া ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিবে। তৎপরে ওঁ আবরণ দেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। (পঞ্চোপচারে)।

শক্তি গায়ত্রী ১০ বার জপ

ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে, ত্রিপুরায়ৈ ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

পুষ্পাঞ্জলি ৩ বার

ও এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥

গন্ধপুষ্পে, আধার স্থাপিত গ্রন্থ পূজা—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।

নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ প্রণামান্তে

এষঃ গন্ধ ওঁ দেবীমাহাত্ম্য পুস্তকায় নমঃ,

এতৎ পুষ্পং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ এতৎ নৈবেদ্যং এই পঞ্চোপচারে পূজা। পরে হ্রীং মন্ত্রে ১৬, ৬৪, ৩২ বা ৮, ৩২, ১৬, বা ৪, ১৬, ৮ প্রাণায়াম।

পরে নিম্নলিখিত ধ্যানের কোন একটি বা দুইটি ধ্যান—

ওঁ বিদ্যুদ্দাম-সম প্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্রবরাসি-খেট-বিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জ্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে॥

অপরঞ্চ—

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদি দৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণ চণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রীপরা
সা দেবী নবকোটিমূর্ত্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী॥

অপরঞ্চ—

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ॥

পরে ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং হ্রাং হ্রীং ক্লীং মন্ত্রে পূজা করিয়া নবার্ণ মন্ত্র ন্যাসাদি করিয়া কবচাদি পাঠ করিবে।

নবার্ণ জপের পূর্ব্বে সপ্তশতী ন্যাসাদি

প্রথম-মধ্যমোত্তম-চরিত্রাণাং ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্রা ঋষয়ঃ।

শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ।

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ ছন্দাংসি।

নন্দাশাকম্ভরী-ভীমাঃ শক্তয়ঃ।

রক্তদন্তিকা-দুর্গা-ভ্রামর্য্যো বীজানি।

অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যাস্তত্ত্বানি। ঋক্ যজুঃ সামবেদা ধ্যানানি।

মম সকলকামনাসিদ্ধয়ে শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী দেবতা প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

অঙ্গ ন্যাস—

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।

শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূশুণ্ডী পরিঘায়ুধা—অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।

ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপঃ-জ্যা-নিঃস্বনেন চ-তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ।

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।

ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি—মধ্যমাভ্যাং নমঃ

সোম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।

যানি চাত্যর্থ-ঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্—অনামিকাভ্যাং নমঃ

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।

করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ—কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে!

ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে—

করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ

হৃদয়াদি ন্যাস—

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূশুণ্ডী পরিঘায়ুধা—ইতি হৃদয়ায় নমঃ
শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপ-জ্যা-নিঃস্বনেন চ—ইতি শিরসে স্বাহা
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি—ইতি শিখায়ৈ বষট্
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থ-ঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্—ইতি কবচায় হুঁং
খড়্গ শূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ—ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহিনো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে—ইতি অস্ত্রায় ফট্।

নবার্ণ মন্ত্রে ঋষ্যাদি

ওঁ অস্য শ্রী নবার্ণমন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টপ্ ছন্দাংসি।
শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ
নন্দা-শাকম্ভরী ভীমাঃ শক্তয়ঃ। রক্তদন্তিকা-দুর্গা-ভ্রামর্য্যো বীজানি
অগ্নি বায়ুসূর্য্যাস্তত্বানি। ঋগ্-যজু-সামানি স্বরূপাণি।
ঐ বীজম্। হ্রীং শক্তিঃ। ক্লীং কীলকম্।
শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ
শিরসি ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেভ্য ঋষিভ্যো নমঃ
মুখে গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ ছন্দোভ্যো নমঃ
হৃদি মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী দেবতাভ্যো নমঃ
গুহ্যে ঐং বীজায় নমঃ।
পাদয়োঃ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ
নাভৌ ক্লীং কীলকায় নমঃ
মূল মন্ত্রে কর শোধন করিয়া

ওঁ ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ

ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ

ওঁ ক্লীং মধ্যমাভ্যাং নমঃ

ওঁ চামুণ্ডায়ৈ অনামিকাভ্যাং নমঃ

ওঁ বিচ্চে কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ

ওঁ ঐঁ হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ

ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ

ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা

ওঁ ক্লীং শিখায়ৈ বষট্

ওঁ চামুণ্ডায়ৈ কবচায় হুঁ

ওঁ বিচ্চে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্

ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে অস্ত্রায় ফট

অক্ষর ন্যাস

শিখায়াং ওঁ ঐং নমঃ

দক্ষিণ নেত্রে ওঁ হ্রীং নমঃ

বাম নেত্রে ওঁ ক্লীং নমঃ

দক্ষিণ কর্ণে ওঁ চাং নমঃ

বাম কর্ণে ওঁ মুং নমঃ

দক্ষিণ নাসায়াং ওঁ ডাং নমঃ

বাম নাসায়াং ওঁ য়ৈং নমঃ

মুখে ওঁ বিং নমঃ

গুহ্যে ওঁ চ্চেং নমঃ

ব্যাপক

ওঁ ঐং প্রাচ্যৈ নমঃ

ওঁ ঐং আগ্নেয়্যৈ নমঃ

ওঁ ক্লাং দক্ষিণায়ৈ নমঃ

ও ক্লীং নৈঋত্যৈ নমঃ

ওঁ ক্লীং প্রতীচ্যৈ নমঃ

ওঁ ক্লীং বায়ব্যৈ নমঃ

ওঁ চামুণ্ডায়ৈ উদীচ্যৈ নমঃ

ও চামুণ্ডায়ৈ ঈশান্যৈ নমঃ

ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ঊর্দ্ধ্বায়ৈ নমঃ

ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ভূম্যৈনমঃ।

নবার্ণ মন্ত্র জপ

মন্ত্রের অর্থ জানিয়াই জপ করা উচিত। চণ্ডী হইতেছেন পরব্রহ্মের পট্টমহিষী। ইনি কিন্তু শক্তিরূপ ব্রহ্ম। নবার্ণমন্ত্র দ্বারা দেবীর উপাসনা প্রশস্ত। নবার্ণ অর্থ হইতেছে নব+অর্ণ বা বর্ণ। এই মন্ত্রে ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বি চ্চে এই ৯ বর্ণ। "অর্ণ শব্দোঽপি বর্ণপরঃ সুবর্ণে স্বর্ণ ব্যবহার দর্শনাৎ।" সুবর্ণ যেমন স্বর্ণ বলিয়া ব্যবহৃত সেইরূপ নবার্ণ নব বর্ণরূপে ব্যবহৃত। দেবী উপনিষদে দেবী আত্ম পরিচয় দিয়া বলিতেছেন "অহং ব্রহ্ম স্বরূপিণী" ইত্যাদি। অর্থাৎ পরব্রহ্ম মহিষী ও পরব্রহ্ম—এই উভয়ে অভিন্ন। পূর্ব্বে ইহার আভাস কতক দেওয়া হইয়াছে।

ঐং = বাগ্‌ভববীজ = চিদ্রূপা মহাসরস্বতী

হ্রীং = মায়াবীজ = সদ্রূপা মহালক্ষ্মী (হৃল্লেখা)

ক্লীং = কামবীজ = আনন্দরূপা মহাকালী

চামুণ্ডায়ৈ = চামুণ্ডা শব্দ মোক্ষকারণীভূত নির্ব্বিকল্প বৃত্তি বিশেষঃ।

চমূং সেনাং বিষদাদি সমূহরূপাং ডাতি লাতি (ডলয়োরৈক্যাৎ) আদত্তে স্বাত্মসাৎকারেণ নাশয়তীতি ব্যুৎপত্তেঃ। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আত্মসাৎ করেন—নাশ করেন বলিয়া ইঁহার নাম চামুণ্ডা। "ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ"—পশূ দ্বিবচনে তুলা-মূলা অবিদ্যা নাশ বুঝিতে হইবে।

"যস্মাচ্চণ্ডং চ মুণ্ডং চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকেস্মৃতা দেবী ভবিষ্যসি॥

চণ্ডীতে এখানে তুলা-মূলা অবিদ্যা নাশেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বিচ্চে = ইতি তু বিৎ চ ই ইতি পদত্রয়াত্মকং বীজক্রমেণোক্তানাং

চিৎসদানন্দানাং বাচকং সংবুধ্যন্তম্। ই=হে আনন্দব্রহ্মমহিষি ইত্যর্থঃ। বিৎ পদং জ্ঞানপরং প্রসিদ্ধমেব। চকারোঽপি নপুংসকঃ সত্যপর ইতি যোজ্যম্ সমস্ত মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—

"হে মহাসরস্বত্যাদিরূপে চিদাদিরূপে চণ্ডিকে ত্বাং ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত্যর্থং বয়ং সর্ব্বদা ধ্যায়াম ইতি" অর্থাৎ হে চিৎরূপিণি মহাসরস্বতি হে সৎরূপিণি মহালক্ষ্মি হে আনন্দরূপিণি মহাকালি—হে চণ্ডিকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ জন্য মা তোমাকে আমরা সর্ব্বদা ধ্যান করিব।

"মহাসরস্বতি চিতে মহালক্ষ্মি সদাত্মকে।
মহাকাল্যানন্দরূপেত্বত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধয়ে।
অনুসংদধ্মহে চণ্ডি বয়ং ত্বাং হৃদয়াম্বুজে ॥ ইতি।
শ্রীমৎ ভাস্কর রায়ের নবার্ণ মন্ত্র ব্যাখ্যা।

এখানে ইহাও উল্লেখ করা যায় যে বঙ্গদেশে কোথাও কোথাও "দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা"কেও নবার্ণ মন্ত্র বলা হয়।

যথাশক্তিমন্ত্ররাজ"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে"জপ করিয়া পরে দেবী কবচ, অর্গলা স্তুতি কীলকস্তব, রাত্রিসূক্ত পাঠ করিয়া মাহাত্ম্য আরম্ভ করিবে। শেষে দেবীসূক্ত ও রহস্যত্রয়াদি শেষ করিবে।

এখানে চণ্ডীপাঠের বিশেষত্ব যাহা তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অন্য অন্য শাস্ত্রে বহু সাধন ভজনের কথা বলা হইয়াছে। কলির মানুষ সাধন ভজনের নামে হতাশ হইয়া পড়ে। চণ্ডীবলিতেছেন ভক্তিও যদি তোমার না থাকে, ভক্তি লাভের জন্য তেমন করিয়া ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত হইয়া শুধু ভগবানের জন্য কর্ম্মকরাও যদি না হইয়া থাকে তথাপি যদি মানুষ কোনরূপে নিত্যকর্ম্মাদি সম্পাদনে চেষ্টা করে, কোনরূপে শাস্ত্রীয় আচার পালনে চেষ্টা করে এইরূপ মানুষও মায়ের স্মরণ মাত্রেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেই। দুর্গাপ্রদীপটীকাতে শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ বলেন "তেষাং ভক্তিরহিতেন স্মরণমাত্রেণাপিতজ্জন্যং ভয়াদিকং ন ভবতি"।

"কবচং দেবতাগাত্রং"—ইহা জানিয়া দেহের প্রাপ্তিস্থান রক্ষা জন্য নামরূপী নামীকে সর্ব্ব অঙ্গে মাখিয়া ফেলিতে হইবে।

উৎসবের নিয়মাবলী

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

২৪শ বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩৩৬ সাল। [৭ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বনগমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৪শ বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩৩৬ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

যমুনা তটে।

অয়ি যমুনে আজ তোমার কাছে আসিয়া অনেক কথাই মনে পড়িতেছে, তোমায় দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি উত্তর দিবে অথবা ভক্তিহীনের কথা বলিয়া শুনিবে না।

দেখ যমুনে তুমি শ্যামসুন্দরের অনেক কথাই জান, তুমি যাহা জান অপর কেহ তাহা জানে না, এ বৃন্দাবন লীলার তুমিই প্রধানা সঙ্গিনী, যমুনাতীর, কদম্বতল, বাঁশীর গান, গোপিনী গোপাল ও রাখাল লইয়াই শ্যামসুন্দরের শ্রীবৃন্দাবন লীলা।

দেখ যমুনে আমি মানসে বৃন্দাবনের যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলাম এখানে আসিয়া তাহা পাইলাম না, বেশী কি তোমায় দেখিয়া দুঃখ হইতেছে, ক্ষীণা মলিনা কত ব্যথা যেন তোমার ফুটিয়া উঠিতেছে, কেন যমুনে তুমি এমন হইলে অথবা একথা জিজ্ঞাসা করাই আমার ভ্রম। শ্যামসুন্দরের বিরহই তোমায় ম্লান করিয়াছে, আর ত সে বাঁশীর গান নাই, আর ত শ্যামসুন্দরের যমুনা বিহার নাই, আর ত কৃষ্ণবিরহবিধুরা গোপিনীগন নাই, তাই কি তুমি মলিনা—তাই, কি তুমি ক্ষীণা আহা! তাহাত হইবারই কথা, তুমি যে শ্যামসুন্দরকে দেখিয়াছ, তুমি যে শ্যামসুন্দরকে বক্ষে ধারণ করিয়াছ, তুমি যে শ্যামসুন্দরের ক্রীড়ার সঙ্গিনী তুমি মলিনা হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি।

শ্যামসুন্দরের বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর আর একবার তুমি বড় আনন্দে ছিলে, যে সময় পাতকীতারণ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের পরিকর রূপ সনাতন জীব গোস্বামী গোপাল ভট্ট প্রভৃতি ভক্তগণ এই বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেন, তখনও তুমি কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ লীলা কৃষ্ণ নাম ভক্তমুখে শুনিয়া কোন প্রকারে স্থির ছিলে, একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন, অতীতের ধ্বংসস্তূপ পড়িয়া আছে, আর যমুনে তুমি দূরে অতিদূরে চলিয়া যাইতে চাহিতেছ, কোথায় বৃন্দাবনের সোপান-শ্রেণী আর কোথায় তুমি উপস্থিত কোন প্রকারে যেন তুমি জীবনধারণ করিয়া আছ, এ জনকোলাহল তোমার ভাল লাগিতেছে না, তাই কোন দূরপ্রদেশে নির্জ্জনে যাইয়া শ্যামসুন্দরের চিন্তা করিবার জন্য চলিয়াছ, তরঙ্গিনি! আমায় সঙ্গে লইবে ?

দেখ যমুনে আমি বড় নির্জ্জন ভালবাসি, নির্জ্জনে তোমার সহিত দুইটী কথা কহিব ইহাই আমার ইচ্ছা, কিন্তু সেরূপ স্থান পাইতেছি না, যেস্থানে বসিলে মন আপনাআপনি তোমার সহিত কথা কহিবে,. কাল মদনমোহনের মন্দির নিকট একটী উচ্চ স্থান হইতে তোমায় দেখিয়া তোমার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছি, আচ্ছা তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ ? তুমি কথা কহিবে না, তাহা হইলে চুপ করিয়া শুন।

দেখ যমুনে এ বৃন্দাবন যেন আমার ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে, মানসে অঙ্কিত বৃন্দাবনের চিত্র এখানে মিলিল না, হয়ত তুমি বলিবে তুমি ভাবহীন সেই জন্য তোমার অভাব বোধ, আমি ভাবহীন খুব সত্য, সেই জন্যই বৃন্দাবনে আসিলাম, একটা প্রাণ মাতান স্থান পাইতেছি না, একটী গাছতলায় বসিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিব, তোমার তীরে এমন একটী গাছ পাইতেছি না একি হইল।

আমি একবারে আনন্দশূন্য এ কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে, শ্রীবৃন্দাবনের গগনে পবনে কি যেন কি এক আনন্দের সাড়া পাইতেছি, কৈ আমিত তাহাতে আমাকে হারাইয়া ফেলিতে পারিতেছি না।

দেখ যমুনে আমার ইচ্ছা করে সেই কালছেলেটী পীতধড়া মোহনচূড়া পরিয়া হাতে বাঁশী লইয়া রাখালগণের সহিত গোচারণ করিতেছেন দেখি, কৈ তাহাত দেখিলাম না, তুমি হাসিতেছ যমুনে, আমার মত সাধন ভজনহীনের দুরাশার কথা শুনিয়া হাসিতেছ, হাস - খুব হাস, কিন্তু সত্য আমার ইচ্ছা করে—

বর্হাপীড়ং নটবর বপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্ বাসঃ কনক কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাম্।
রন্ধ্রান্ বেনোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
বৃন্দাবনং স্বপদ রমণং প্রাবিশদ্‌গীতকীর্ত্তিঃ॥

আজ একদল ধেনুর পশ্চাতে এক রাখালকে দেখিয়া সেই কথাই মনে হইতেছিল সেই গোরজচ্ছুরিত কুঞ্চিত কুন্তল, সেই সারাদিন বন ভ্রমণে ক্লিষ্ট মুখখানি, সেই বংশীধ্বনি সে সব কি এ বৃন্দাবনে নাই যমুনে—না না বৃন্দাবনে সবই আছে, আমার মত অভাজনের ভাগ্যে দর্শন মিলিল না, সেই দ্বাপরে সকলে চর্ম্মচক্ষে দেখিত কিন্তু আজ সেদিন নাই, ভাবচক্ষু না হইলে কিছু দেখা যায় না, কি জানি কি সাধনা করিলে সে চক্ষু মিলে যে চক্ষু পাইলে সকল স্থানে সকলের মধ্যে ঠাকুর তোমায় দেখিতে পাওয়া যায়, দেখ আমি বুঝেছি সাধন ভজনে কিছু হয় না, তোমার কৃপাই সকলের মূলাধার, কৃপা কর কৃপা কর ওগো একবার দেখা দাও—হরি হরি!

এস যমুনে বৃন্দাবন দেখিয়া আসি, সে বিনা শূন্য গৃহ অরণ্য হইলেও এখনও বৃন্দাবনে দেখিবার জিনিস অনেক আছে, সেদিন বৃন্দাবনের দক্ষিণে যেদিকে ভক্তগণ কুটীর বাঁধিয়া অবস্থান করেন সেই ময়ুর নিনাদিত বদরী কানন আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল কিন্তু যমুনা তুমি সেস্থান হইতে অনেক দূরে গিয়াছ।

দেখ যমুনে বৃন্দাবনে কালাচাঁদের রঙ্গ দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারি না, সে কদম্বতল নাই, সে রাকেশ কররঞ্জিত—কুসুমিত কানন নাই, তার পরিবর্ত্তে উচ্চ উচ্চ মন্দিরে বসিয়া কাল ঠাকুরটীর রাজার মত সেবা লইতেছেন, দর্শন করিতে যাও তোমার ভাগ্যের জোর থাকেত দর্শন পাইলে—নচেৎ শুনিলে—দর্শন নাই, কোথায় বা ঝাপটা দর্শন অনিমেষ নয়নে দেখিবার উপায় নাই, কিন্তু এসবগুলা মথুরায় করা উচিৎ ছিল, সেখানকার রাজা—রাজার মত চালচলন ব্যবহার সেখানে সাজে, এখানে এসব কেন, এখানে যমুনাতীর, কদম্বতল, কুসুমিত কাননে বিহার এই ত ভাল, কি বল যমুনে?

এ বৃন্দাবনে আসিয়া ঠাকুরটীর মন্দিরের হিসাব করিতে পারিলাম না, অগণ্য মন্দির দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, চরণ আর চলে না।

নদীয়া নাগরী বলিয়াছিলেন

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ সেবা ভাগবত নাম।
ব্রজভূমে বাস পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে যদি এক স্বল্প হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ ভাবোদয়॥

একথা খুব সত্য। ব্রজভূমে বাস করিলে সুবুদ্ধি জনের কৃষ্ণভাবোদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।

অবশ্য বৃন্দাবনে বাহে সে শ্যামলী ধবলী, সে বলরাম, সে নন্দ যশোদা, সে শ্রীদাম সুদাম নাম বসুদাম, গোপিনীগণ না থাকিলেও বৃন্দাবনে এক স্রোত চলিতেছে, মন স্বতঃই উর্দ্ধমুখে ছুটিতে চায়, একটু নির্জ্জনে বসিলেই কি জানি কাহার পরশে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

যমুনে যমুনে বেশ হোলি দেখিলাম

লাল যমুনা জল, লাল তমাল তল,
লাল ফুলে লাল অলি লাল মধু খায়॥

এতটা লাল না দেখিলেও গোবিন্দজী গোপিনাথজী মদনমোহনজী বঙ্কুবিহারীজী প্রভৃতি কাল ঠাকুরটীর অগন্য মন্দির লালে লাল হইয়াছিল দেখিলাম। শেটজীর দোলের উৎসব খুব, অনেক বাজী পুড়িল, বেশ ঠাকুরটীর সবই ভাল।

আরও এক মজা বৃন্দাবনে দেখিলাম—এ রাধারাণীর রাজ্যে সবাই বলে রাধা রাধা—রাম রাম বলিতে যাইলে একটু বাধ বাধ ঠেকে—গৌরীশঙ্করত বলিতেই পারা যায় না, শ্রীরাধারাণীজী বৃন্দাবনে আপনার নামটী একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন।

ব্রজনাথ তোমার জন্মস্থান দেখিতে আসিয়াছিলাম—ঠিক দেখার মত দেখিতে পারিলাম না—সেরূপ দেখিতে হইলে যেরূপ প্রেমের প্রয়োজন তাহাত আমার নাই, আমায় ত তাহা দাও নাই, তুমি না দিলে আমি কোথায় পাইব—তুমি কৃপাকর—তোমার কৃপার অবধি নাই, তথাপি প্রার্থনা করিতেছি কৃপাকর, আমি যেন তোমায় দিবারাত্র স্মরণ করিতে পারি—আমার জিহ্বা যেন সর্ব্বদা তোমার নাম উচ্চারণ করে, এ সৌভাগ্য লাভ করিবার নিজকৃত কোন সুকৃত নাই—তথাপি প্রার্থনাকরিতেছি তুমি কৃপাকর—আমি যদি তোমায় ভুলি তুমি যেন আমায় ভুলিয়া যাইও না—আমার রুদ্ধ হৃদয় দ্বার চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া তোমার

আসনে তুমি আসিয়া উপবেশন কর—এহৃদয় ত তোমারই স্থান, তোমার স্থানে—তোমার আবাসে তুমি আসিবে ইহাতে ইতস্তত করিতেছ কেন—এস এস আর দূরে যাইও না—দেখ তুমি না আসায় আমার বহু জন্ম বৃথা হইয়া গিয়াছে, তাই তোমায় ডাকিতেছি—এস তুমি আমার শত কামনা—কলুষিত—হৃদয় মন্দির রূপ জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া তুমি উদয় হও—আমার আর দ্বিতীয় উপায় নাই—তুমি এস আমি তোমার হইয়া যাই— আমার সব আশাপূর্ণ হউক।

হাঁ একটা কথাবটে তুমি কোথায় নাই—তুমি কোথায় আসিবে—তুমিত আকাশের মত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ—তুমি কোথায় আসিবে—তুমি কোথায় নাই।

দেখ আমি আমার অনুভবে তোমায় নাপাইয়া তোমায় ডাকিতেছি এস তুমি, আমার অনুভব সীমায় তুমি চিরদিন থাক, আমার অনুভব তোমার ভিতরে ডুবিয়া যাউক, আমায় তোমার করিয়া লও—আর কি প্রার্থনা করিব আমি তোমার—

জয় রাধা জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন॥
শ্রীবঙ্কু বিহারী—জয় শ্রীরাধারমন।
রাধা দামোদর জয় গোপিকা মোহন॥
নিকুঞ্জ কানন জয় জয় নিধুবন।
জয় জয় শ্রীযমুনা অতি সুশোভন॥
(জয়) রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
প্রাণ পূর্ণ হয়ে যায় করিলে দর্শন॥
শ্রীবৃন্দাবনের শোভা বর্ণে সাধ্য কার।
শ্রীবিগ্রহ দর্শনে ঘুচে মালিণ্য অপার॥
বৃন্দাবনে যেইজন লইবে আশ্রয়।
পাপতাপ দূরে যাবে হবে ভাবোদয়॥
বৃন্দাবন ধাম আমি ত্যজিবনা কভু।
আশ্বাসিতে ভক্তগণে বলেছেন প্রভু॥
চাও শান্তি বৃন্দাবনে লওরে আশ্রয়।
অবশ্য লভিবে শান্তি নাহিক সংশয়ঃ॥

শ্রীধাম তোমার পদে করিছে প্রণাম।
ঘটুক রসনা সদা রাম রাম রাম॥
জয় রাম সীতারাম॥

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পুরাণতীর্থ।
দিগম্বুই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্তবরাজ।

(১)

পীতবসন পর বারীজ নয়ন,
কুন্দ বদন ঘন নিন্দক বরণ,
ভ্রমর পরাজয়ী কুন্তল ভার,
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার।

(২)

কালীয় মর্দ্দন, ফণ পরিনর্ত্তন,
গোকুল বর্দ্ধন, ধেনু পরিপালন,
হৃদিপরি লম্বিত বন ফুলহার,
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার॥

(৩)

সুর নর বন্দন, করে গিরি ধারণ,
অঘবক নাশন, কেশী বিঘাতন,
স্তনপানে পুতনা প্রাণ সংহার,
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার॥

(৪)

কংশ বিনাশন যদুকুল বর্দ্ধন,
দৈবকী নন্দন, কুব্জা প্রসাদণ;
বাঞ্ছিত পূরণ ভকত জনার;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার॥

(৫)

মন্মথ মনমথ, রাস রসামৃত,
অঙ্গনা মণ্ডলে নাচত গাওত,
গোপীজনা বল্লভ নাম তোমার ;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার ॥

(৬)

করে বেনু বাদন, গোপীমন মোহন,
বর্হা বিনোদন, শিরে চূড়া ধারণ ;
ভৃগুপদ চিহ্নিত হৃদয় মাঝার ;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার ॥

(৭)

বিধি হর পুরন্দর পদ যুগ বন্দ,
যোগীজন ধেয়ত চরণার বিন্দ,
দনু দল নাশনে হরতি ভূভার ;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার ॥

(৮)

জয় নব নাগর, গতি অতি মন্থর,
ওষ্ঠক বিম্বক হাসত সুন্দর,
নিকুঞ্জ কাননে করতি বিহার ;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার ॥

(৯)

চরনক দশনখ শারদ ইন্দু,
গগনক তারকা ভালক বিন্দু,
হৃদয়ক করুনক সিন্ধু অপার ;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার ॥

(১০)

দুষ্কৃতি নাশন, সৎকৃতি পালন,
ভবভয় বারন, ব্রহ্ম সনাতন,
কালভয় বারণ চরণ তোমার ;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার ॥

(১১)

ত্বং পরমাত্মণ ত্বং পরব্রহ্ম,
পরমাংগতি ত্বং পরমং ধর্ম্ম,
ত্বং পরমেশ্বর, ত্বং মুলাধার ;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার ॥

(১২)

জয় মধুসূদন কৈটভ ঘাতন,
জয় কমলেক্ষন, গজেন্দ্র মোক্ষণ ;
দাস নৃসিংহ গতি শরণ তোমার ;
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার ॥

শ্রীউপেন্দ্র নাথ গোস্বামী

পাগলের পাল্লায়।

সবাই এমন এক পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছে যে ইহাকে কিছুতেই ছাড়িবার যো নাই। কেমন বুঝিতেছত—এই পাগল কে? সর্ব্বদা ভ্যান ভ্যান করে, যা দেখে তাই লইয়া তালে নাচে। হরি হরি—এইত ভারি দুঃখ। হয়ত কোন ভাগ্যক্রমে কোথাও সঙ্গ যুটিল—মনে করিলাম—আহা আমাকে ভাল হইতে হইবে—সাধু যাহা করিতে বলিলেন তাহাই করিতে হইবে—লাগিলাম ও করিতে, কিন্তু সাধু নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকে জোর করিয়া ভুলাইয়া দিয়া পাগল বসিল যা তা বকিতে। কোন প্রয়োজন নাই—শুধু শুধু যা তা অসম্বন্ধ বকুনি। বল দেখি এ পাগলের পাগলামি ছাড়ান যায় কিরূপে?

উপায় আছে। পাগলকে ত ছাড়িতে পারিবেনা। এই পাগলকে ভাল করিতে পারিলে তবে তোমার গন্তব্য স্থানে ঐ তোমায় লইয়া যাইবে। কাজেই পাগলের পাগলামি তোমায় ছাড়াইতেই হইবে।

তুমি ত এতদিন ধরিয়া কত কি করিতেছ—কিন্তু পাগলকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা কি করিয়াছ? পাগলকে বুঝাও, পাগলকে সংসারের অসারত্ব দেখাও বল্—রে পাগল—দেখ দেখি তুমি এ কি করিতেছ? কি সব চিন্তা তুমি কর? অসৎ জিনিষ ভাবিলে তোমার পাগলামি বাড়িয়াই যাইবে। নানাবিকল্পের সঙ্কল্প করিলে তোমার ছাই রাই অসৎ সংসার স্ফারতাই পাইবে। গাছেরগোড়ায় জল দিলে গাছের শাখা প্রশাখা বাড়িয়াই চলিবে। তুমি সৎ কি তাই দেখ আর অসৎ যাহা তাহা ছাড়। পাগল তুমি চিন্তা ছাড়। স্থির হইয়া দেখ দেখি কার উপরে দাঁড়াইয়া তুমি পাগলামি করিতেছ? ওরে ঐ হৃদয়ে ডুবলে সব ছাড়িয়া যা আছে তাতেই ডুবিয়া থাকিতে পারিবে।

দিন রাত তাকে চিন্তা কর—আর দুঃখ বিসূচিকা ছাড়। সাধের ঘুমের ঘুম আর ঘুমাইও না। জাগিয়া রাত কাটাও। আরে বাপু! ঘুমটাও ত অসৎ—আর না ঘুমাইলে মরিয়া যাইব, এ চিন্তাও ত অসৎ। কে মরে রে পাগল? যা অসৎ তাই মরে—মরিয়া যে আছে সেই মরে। বল দেখি কতদিন এই পাগলকে প্রবুদ্ধ করিতে রাত্রি জাগাইয়া কাটাইলে? কাটাও রাত্রি—জাগিয়া জাগিয়া —পাগলকে প্রবুদ্ধ করিতে করিতে রাত কাটাও। ইহাই পাগলামির ঔষধ। একবার সারাইতে পারিলে দেখিবে পাগল বড় ভাল কাজ করিল—পাগল তাতে ডুবিয়া আপনার মৃত্যু আনিয়া তোমাকে অমর করিয়া দিল। এই একটা বড় কাজ—পাগলের পাগলামি সারাইবার জন্য পাগলকে প্রবুদ্ধ করা।

কখন ত এরূপভাবে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা কর নাই, শুধু পাগলের সঙ্গে হৈ হৈ করিয়া পরে হায় হায় মাত্র করিয়াছ। এখন এসব না করিয়া প্রবুদ্ধ করিবার জন্য পাগলকে ঐরূপ উপদেশ কর, করিয়া করিয়া রাত কাটাও—দিন কাটাও যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও—আর পাগলকে প্রবুদ্ধ করার অভ্যাস পাকা কর করিয়া দেখ কত শীঘ্র তোমার হয়। ইতি

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

রামপ্রসাদের একটি গান।

মনের দোষে হলাম মাটি।
এ মন কিছুতে হলনা খাঁটি ॥

আমি বলি ও আমার মন, ভজ মায়ের চরণ দুটি
আমার মনের তখন কাজ বেড়ে যায়, ক'রে বেড়ায় ছুটোছুটি ॥
আবার বলি ও আমার মন, এ সংসার ধোঁকার টাটি
সে কথা মন কাণে করে না, ভাঙ্গা ঘরে লাগায় খুঁটি ॥
বসন ভূষণ শয়ন ভোজন, কিছুতেত হয় না ত্রুটি
বলি ইষ্টসাধন কর্ আমার মন, মরে ভূতের বেগার খাটি ॥
রামপ্রসাদ বলে মনের দফা সার্‌লে ছটা ইয়ার জুটি।
ওগো এদের ব্যাভার দেখে, আমার লেগে গেছে দাঁতকপাটি ॥

মনের সন্ধান যে প্রথমেই আবশ্যক। নতুবা ডাকিবে কে ? যে উপাসনায় বসিতে গিয়া প্রথমেই মনের সংবাদ না লয়, তাহাকে মন আদৌ গ্রাহ্য করে না। তুমি যা কিছু করনা কেন, মনও তার যা কিছু তাই করিবেই। কাজেই তোমার তপস্যায় আলো আঁধার এক সঙ্গে চলিল। ইহা তপস্যা নহে; ইহা অসুরকে সংহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা। রামপ্রসাদের গানে একদিকে থাকে মনকে প্রবুদ্ধ করিবার কথা, অন্যদিকে থাকে ইষ্টদেবতার কথা, আবার কোথাও অভ্যাসের, কোথাও বৈরাগ্যের কথা। সাধকের জীবন গঠনে অভ্যাস ও বৈরাগ্য সমকালে অভ্যাস করা উচিত। রামপ্রসাদের গানে ভাব বুঝা যায় নাম যদি আশ্রয় করিয়া থাক তবে কোন প্রকার দুঃখ আসিলে ততক্ষণ নাম কর যতক্ষণে তোমার মন দুঃখ ছাড়িয়া নাম লইয়াই থাকে।

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ।

জ্ঞানযোগের সার কথা হইতেছে কোন কিছুতেই শোক না থাকা, ভয় না থাকা, দৈন্য না থাকা। মনে মনে না হয় কল্পনা কর—যেন তোমার শোক করিবার কিছু নাই, ভয় পাইবারও কিছু নাই এবং দুঃখ দৈন্যও কিছু নাই। যখন তোমার শোক, ভয়, দৈন্য না থাকে তখন তুমি কি হইলে? তুমি যদি তোমার স্বরূপে পৌছিতে পার তবেই তোমার শোক, ভয়, দীনতা থাকে না।

তোমার স্বরূপটি যাহা তাহা পূর্ণ। যাহা পূর্ণ-সাবধি পূর্ণ নহে—ঘট পূর্ণ, ঘটী পূর্ণের মত নহে, কিন্তু অবধিশূন্য পূর্ণ—বলিতেছি যাহা এইরূপ পূর্ণ তাহাই তোমার স্বরূপ। এইরূপ পূর্ণবস্তু একটিই আছে। ইনিই জ্ঞান, ইনিই আনন্দ —খণ্ডজ্ঞান নহে, অখণ্ড জ্ঞান; খণ্ড আনন্দ নহে, নিরতিশয় আনন্দ। ইনি আবার চিরদিন আছেন, চিরদিন ছিলেন, চিরদিন থাকিবেন। এই সচ্চিদানন্দই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তাহারই স্বরূপ। এই স্বরূপের উপরেই জগৎ ভাসিয়াছে, দেহ ভাসিয়াছে, যাহা কিছু আকার বিশিষ্ট তাহাই ভাসিয়াছে। এই অখণ্ড জ্ঞানানন্দ নিত্য বস্তুটির নাম আত্মা। ইনি পূর্ণ—সাবধি পূর্ণ নহেন, নিরবধি পূর্ণ।

তুমি আত্মা, তুমি দেহ নও, তুমি মনও নও। যদি স্বরূপে পৌছিতে পার তবে দেখিতে পাইবে তোমার জনন মরণ নাই, ক্ষুধা পিপাসা নাই, শোক মোহ নাই। জনন মরণ, ক্ষুধা পিপাসা, শোক মোহ—এই সমস্ত জন্মে সেই অখণ্ড বস্তুকে উপাধির মধ্যে দেখিয়া খণ্ড মনে করিলেই। অখণ্ড যিনি তিনি কখনও খণ্ডিত হন না। পূর্ণ যিনি তিনি চিরদিনই পূর্ণ ছিলেন, আছেন, থাকিবেন। আকাশ চিরদিনই আকাশ, ঘটের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলেও আকাশ খণ্ডিত হয় না—আকাশ ঘটাকাশ হয় না। তবে ঘটাকাশ বলিয়া যাহা দেখা যায় তাহা আকাশের প্রতিবিম্ব মাত্র। সেইরূপ আত্মা চিরদিনই অখণ্ড—অখণ্ড বলিয়াই ইঁহার শোক নাই, ভয় নাই, দৈন্য নাই। যাহা খণ্ডমত দেখা যায় তাহা অখণ্ড বিম্বের প্রতিবিম্ব, খণ্ড উপাধিতে প্রতিফলিত পূর্ণের যেন অংশ। ইহাই জীবাত্মা। এই অহংকার বিমূঢ় জীবাত্মাই শোক করে, ভয় পায়, দীনতা প্রকাশ করে। এই যে অখণ্ডকে খণ্ড মনে করা, পূর্ণকে অংশ মনে করা ইহা মনেরই ধর্ম্ম—ইহাই অজ্ঞান, ইহাই অবিদ্যা। অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবাত্মাকে

ইহাঁর স্বরূপে আনয়ন করাই জ্ঞানযোগ। অজ্ঞান দূর করাই জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্য—জ্ঞানত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। যখন জ্ঞানযোগে সিদ্ধি হইবে তখন দেখিবে আত্মা সর্ব্বত্র এবং সমস্তই আত্মাতে।

মানুষ আপনার এই পূর্ণ স্বরূপকে দেখিবে কিরূপে?

জ্ঞানযোগের সাধনই হইতেছে কর্ম্মযোগ। জ্ঞানের কথা শুনিয়াই যদি কাহারও অনুভূতি হয় আমি আত্মা, আমি মন নহি, আমি দেহ নই—জন্ম-জন্মান্তরের এইরূপ সাধকের আর কিছুই করিবার ধরিবার থাকে না। ইনি সর্ব্বদাই পূর্ণানন্দে পূর্ণজ্ঞানে বিরাজ করেন।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার জন্মে নাই, তাঁহার জন্যই কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা। শুনিবামাত্র জ্ঞান হয় না কেন? যাহাকে শুনাইলে সে যদি ভাল লাগা, মন্দ লাগায় আটকাইয়া থাকে, এইটি ভাল, এইটি মন্দ; ইহা লইয়া থাকে, ভালটিতে অনুরাগ, মন্দটিতে দ্বেষ রাখে—ইহা যতদিন থাকে ততদিন সে কখন স্বরূপে পৌছিতে পারে না; সে কখন অজ্ঞান ছাড়িয়া জ্ঞানে পৌছিতে পারে না, সে কখন আত্মাতে পৌছিতে পারে না।

শাস্ত্র এই ব্যাপারকেই বলিতেছেন যতদিন চিত্তশুদ্ধি না হইতেছে ততদিন জ্ঞান হইতেই পারে না।

চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞানযোগে স্থিতির জন্যই কর্ম্মযোগ। যদি বল কর্ম্ম করিতে গেলে ত শত শত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, ইহাতে ত কর্ম্ম ঠিক মত সম্পাদিত না হইয়া—কর্ম্ম বৈগুণ্য বশতঃ প্রত্যবায় জন্মায় তবে কর্ম্মযোগ দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হইতে জীব কিরূপে মুক্ত হইবে; কর্ম্ম করিয়া মানুষ কিরূপে জ্ঞানে পৌঁছিবে?

কর্ম্ম যদি ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের তৃপ্তি জন্য কৃত হয়—এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ কখন বিফল হয় না—ইহা অসম্পূর্ণভাবে কৃত হইলেও প্রত্যবায় নাই অর্থাৎ ইহাতে কোন বিঘ্ন আনয়ন করে না—এই কর্ম্মযোগের অল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে জ্ঞানলাভে কোন বিঘ্ন হয় না—ইহার অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ" এই স্মরণ ধর্ম্ম অতি অল্প আচরণ করিলেও মৃত্যু সংসার সাগরের মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। যখনই স্মরণ হইল তখনই ত স্বরূপে স্থিতি হইল—স্বরূপে স্থিতি যত অল্প সময়ের জন্য হউক না কেন, তুমি তাহাতেই বুঝিতে পারিলে ইহাই মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ, কেননা ইহাই অমৃত্যুর নিত্য রাজ্য। তোমার চিত্ত যখনই বহিঃপ্রকৃতির কোলাহল

ছাড়িয়া এবং অন্তঃপ্রকৃতির সংস্কার অগ্রাহ্য করিয়া—যখনই বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া এবং অনাদি সঞ্চিত সংস্কারের রোমন্থন ত্যাগ করিয়া—যে স্থির চিৎ সমুদ্রের তরঙ্গ এই বহিঃ প্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতি—যে চিৎ ফণির প্রবল ফুৎকার এই প্রকৃতি, প্রকৃতির ব্যাপার অগ্রাহ্য করিয়া যখনই, চিত্ত যাহার উপর নৃত্য করিতেছিল—যে শিবচৈতন্যের উপরে মনঃ কালী নৃত্য করিতেছিল—যখন পদতলে শিবকে দেখিয়া চিত্ত বা মন আর নৃত্য করিতে পারিলনা, নৃত্য ভুলিয়া কি যেন কি দেখিয়া বিভোর হইয়া গেল, তখনই ইহা শান্ত হইয়া সেই শিব-সাগরে আত্ম বিসর্জ্জন করিল—তখন ইহার বিসর্জ্জন হইল, এই শিব সাগরের অতল জলে—লবণ পুত্তলিকা সমুদ্রে ডুব দিতে গিয়া সমুদ্র হইয়াই স্থিতি লাভ করিল—ইহাই অমররাজ্যে যাওয়া—ইহাই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া।

জীব প্রতিদিনই যাঁহার সাহায্যে এই বাহিরের কোলাহল এক নিমিষে ভুলিয়া গিয়া যাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়ে তিনিই ত তিনি। দেখনা কেন এই জাগিয়াছিলে, একক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িলে—তখন কাণের কাছে শত কোলাহলও তোমায় কিছুই করিতে পারিল না—তখন তুমি সুষুপ্তিরাজ্যে—তখন তুমি অমৃত্যুর রাজ্যে—তখন তুমি জগজ্জননীর আরামের ক্রোড়ে। জীব অজ্ঞানে এ রাজ্যে নিত্যই যায়—তুমি সাধনা বলে জ্ঞাতসারে ঐখানে যাও—তোমাকে আর কোন শোক, ভয় ও দৈন্য আক্রমণ করিতে পারিবেন। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ঐ রাজার প্রজা হইলে। সেই জন্য স্মরণ অভ্যাস করিতে হয়। স্মরণ অভ্যাসের নিম্ন স্তরে কর্ম্মদ্বারা স্মরণ—কর্ম্মও কিন্তু কর্ম্মত্যাগ করিয়া শুধু স্মরণে চিত্তকে ডুবাইবার জন্য। কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না।

চিত্তের স্বভাবই কর্ম্ম করা। চিত্ত কিন্তু মূলে চিৎই, বা জ্ঞানই বা আনন্দই। চিতের মুখ্য শক্তিই নিবৃত্তি—ইনিই মোক্ষপ্রদান করেন। চিতের বহিপ্রবাহিণী শক্তির নাম প্রবৃত্তি—এই শক্তিই জীবকে মোহান্ধকারে ডুবাইয়া রাখে। নিবৃত্তি শক্তির সুখময়, আনন্দময় ক্রোড়ে প্রবৃত্তি শক্তিকে অল্পে অল্পে ঘুম পাড়াও, যাহা চাও তাহাই এই নমৃত কামধেনুর নিকটে প্রাপ্ত হইবে।

চিত্তকে নিষ্কাম ধর্ম্ম করাইতে হইবে, কিন্তু ভগবান যে বলিতেছেন "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন

হও "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব। নিষ্কাম কর্ম্ম ও সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ দুয়ের গতি ত এক নহে।

আমার শরণে যখন সম্পূর্ণরূপে আসিতে পারিবে, তখন তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই ত্যাগ হইয়া যাইবে। পূর্ণভাবে আমার শরণে আসিতে পারিলে "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" এই বোধ আর থাকিবেনা। তোমার কর্ত্তা অভিমান যখন থাকিলনা, তখন তুমি কি হইয়া রহিলে? কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ, কামনাবাসনা ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ—এই সমস্ত ত্যাগেরই দ্বিবিধ স্তর আছে। শুভ কামনা করা, শুভ বাসনা রাখা, শুভ কর্ম্ম করা এইগুলি প্রথম স্তর। এখানে কিছু কিছু কর্ম্মও থাকে, বাসনাও থাকে, কামনাও থাকে, কিন্তু সে সমস্ত শুভ। ক্রমে শুভ কর্ম্ম, শুভ বাসনা, শুভ কামনা তোমার ইচ্ছামত ঈশ্বরের আজ্ঞামত করিতে করিতে যখন ঈশ্বরই মুখ্য এবং কর্ম্ম গৌণ হইয়া যাইতে থাকে তখন একটা স্থিতির রাজ্যে যাওয়া যায়। সেখানে কর্ম্মাদি একবারেই থাকেনা।

সাধারণ মানুষ নিজের ইচ্ছায় কর্ম্মকরে, কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা বলেন "করিষ্যে বচনং তব"—তুমি যেমন বলিতেছ সেইরূপই করিব। অর্থাৎ আমি আর আমার ইচ্ছায় কর্ম্ম করিনা, তোমার ইচ্ছাতেই কর্ম্ম করি। এখানে দাস অহং এই অভিমান রাখিয়া তোমার ইচ্ছাতেই কর্ম্ম করিতেছি মনে রাখিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে যখন চিত্ত শুদ্ধ হয় তখন জ্ঞানের উদয় হয়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে, কর্ম্ম করে প্রকৃতি, আমি প্রকৃতি নহি, আমি আত্মা—আমি চৈতন্য। এই ভাবে যখন স্থিতি হয়, তখন অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা আর থাকেনা; ইহা জ্ঞানে স্থিতি বা স্বরূপে স্থিতি না হইলে হয় না।

যতদিন দেহ থাকে ততদিন বহিঃ প্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতি থাকিবেই। কিন্তু "আমি তোমার" ইহা যখন হইতে থাকে তখন ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন রূপ নূতন কর্ম্মের সহিত পুরাতন স্বভাবের সংগ্রাম চলিতে থাকে। প্রতি কর্ম্মে ঈশ্বরের স্মরণে যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভবে আইসে তখনই জীব ঈশ্বরের স্বভাব বুঝিতে পারে। "আমি তোমার" প্রথম অবস্থা, "তুমি আমার" দ্বিতীয় অবস্থা, "তুমিই আমি" শেষ অবস্থা। জ্ঞানে এই শেষ অবস্থা লাভ হয়। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে যখন নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি হয়, তখনই জ্ঞান

লাভ হয়। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন জন্য কর্ম্ম করিতে হয়।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন রূপ কর্ম্ম করানরও ক্রম আছে।

একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, তিনিই সৎ, আর সমস্ত অসৎ। তিনিই নিত্য আর সমস্ত অনিত্য। এই বিচার প্রথমেই রাখা উচিত এবং প্রতি মিনিটে ইহার প্রয়োগ করা উচিত।

নিত্যকর্ম্মাদি করিবার সময়ে প্রথমেই মনে রাখা উচিত আমি সেই নিত্য সৎ বস্তুর নিকটে উপবেশন করিলাম, তিনি ভিন্ন অন্য সমস্তই মিথ্যা। কাজেই চিত্ত ঈশ্বর ভিন্ন অন্য যাহা কিছু ভাবনা করে তাহাই মিথ্যা। মন হইতে মিথ্যা ভাবনা সরাইবার জন্য বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে।

ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন কিছুর উপরেই আসক্তি থাকিবেনা। যতদিন বিষয়ে আসক্তি থাকিবে ততদিন চিত্ত হইতে ভাল লাগা মন্দ লাগা যাইবেনা অর্থাৎ রাগ দ্বেষ রূপ চিত্ত মল ততদিন দূর হইবে না।

বিষয়ে অনুরাগ দ্বেষ যতদিন থাকে ততদিন মলিন চিত্ত ঈশ্বর লইয়া না থাকিয়া বিষয়ের দিকেই ধাবিত হইবে। সত্য মিথ্যার বিচার দ্বারা চিত্তকে বিষয়ের দিকে না যাইতে দেওয়ার চেষ্টাই চিত্তশুদ্ধির প্রথম অবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থায় দেখিতে হয় কোন্ কোন্ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিবৃত্ত হইল— কোনটি বা অবশিষ্ট রহিল?

তৃতীয় অবস্থায় যখন দেখা গেল সমস্তই মিথ্যা তখন চিত্ত আর বিষয় লইয়া থাকিতেই পারিবে না। তখন সাধকচিত্তকেই উৎসুক্য সহকারে সর্ব্বদা দেখিবে।

শেষে ঐ উৎসুক্যের যখন নিবৃত্তি হইবে, তখন চিত্তের ভিত্তি যে চিৎ তাহাতেই লক্ষ্য পড়িবে। সাধক তখন চিৎ বা চৈতন্য লইয়াই থাকিতে পারিবে।

এই চারি অবস্থা হইতেছে অপর বৈরাগ্য অবস্থা। ইহার পরেই পর বৈরাগ্য। এখানে প্রকৃতি হইতে আত্মাকে ভিন্ন—আত্মার সহিত অসত্য কোন কিছুরই সংশ্রব নাই ইহা অনুভবে আসিবে। ইহাতে স্থিতি লাভ করাই জ্ঞানযোগের শেষ ফল।

যতদিন জ্ঞানে স্থিতি না হইতেছে, ততদিন কর্ম্ম করিতেই হইবে। নিত্য কর্ম্ম যথাযথভাবে করিতে পারিলেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে জ্ঞানলাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একদিন অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা কৈলাশ পাহাড়ে সাধুবাবার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তিনি পশ্চিমাস্যে দিগিরিয়া বা দেবগিরি প্যাহাড়কে সম্মুখ করিয়া একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর একাকী স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। সাধুবাবাকে প্রণাম করিয়া আমরা সেই প্রকাণ্ড প্রস্তরখানির একদিকে উপবিষ্ট হইলাম এবং পশ্চিম গগনে সূর্য্যাস্তের অপরূপ শোভা দর্শন করিতে করিতে সাধুবাবার মুখ নিঃসৃত সুমধুর উপদেশ পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণে পুলকিত হইতে লাগিলাম। সাধুবাবা সেদিন বলিতেছিলেন, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং সুখদুঃখ এসকল প্রত্যেক মনুষ্যেরই কিছু কিছু সহ্য করিতে অভ্যাস করা উচিত। সামান্য কারণে বিচলিত হইলে তাহার সুখ শান্তি যে কিরূপ সুদূর পরাহত তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া সেদিন তিনি একটি গল্প করিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। গল্পটী এই :—

একজন সাধুব্যক্তি পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে রাস্তার পার্শ্বে একটী ভস্মস্তূপের উপর শয়ন করিয়া অতি আরামে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সময় ঐ পথ দিয়া এক রাজা বহুলোক সমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে গমন করিতেছিলেন। বহুলোকের আগমনজনিত কোলাহলে সাধুর নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় সাধু উঠিয়া বসিলেন তাঁহার মস্তকের জটাজুটে প্রচুর ভস্ম লাগায় মস্তকান্দোলন করিয়া উহা ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময়ই রাজার শিবিকা-খানি ঐ সাধুর নিকট দিয়া গমন করায় ঐ সাধুর জটাস্থিত ভস্ম শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিল এবং উহার কিয়দংশ বায়ুদ্বারা উড়িয়া গিয়া রাজার গাত্রে লাগিল। উহাতে রাজা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি উহাকে তাঁহার নিকট ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। রাজার আদেশে যখন ঐ সাধু নির্ভয় অন্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ সানন্দচিত্তে আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেন সে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। প্রত্যুত্তরে সাধু প্রশান্তবদনে মৃদুস্বরে যাহা বলিলেন, তাহাতে রাজা বেশ

বুঝিতে পারিলেন যে অতি অল্পকারণেই অর্থশালী ব্যক্তির আরামের এবং সুখ স্বচ্ছন্দের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইঁহাদের মত যাঁহারা সতত ভগবৎ চিন্তায় অহোরাত্র যাপন করেন, তাঁহারা কত আনন্দে নিরন্তর কালযাপন করেন এবং সর্ব্বাবস্থায় কিরূপ সন্তোষ উপভোগ করিয়া থাকেন। সামান্য ভস্ম বায়ুদ্বারা উড়িয়া তাঁহার দেহে লাগায় তাঁহার চিত্ত এরূপ বিচলিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মত সতত ভগবদ্ স্মরণকারী ব্যক্তিগণ মৃত্তিকায় অথবা ভস্মোপরি শয়নে কিম্বা সর্ব্বাঙ্গে ধূলিকণা লাগিলেও তাঁহাদের আনন্দের কিছুমাত্র বিঘ্ন বা সন্তোষের ব্যতিক্রম ঘটে না।

সাধুবাবা আরও বলিতেছিলেন যে প্রত্যেক কর্ম্ম হইতেই দুই প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। এক 'বাসনা' ও অপর 'অদৃষ্ট'। অদৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মফল। পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ যাহা আমরা ভোগ করি। আর নীচ কর্ম্মরূপী অঙ্কুর হইতে নীচ বাসনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষের সংশ্রবে আসিলে নীচ বাসনার নাশ হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল যাহা সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা জীবমাত্রেরই ভোগ করিতে হয়। তাই, সাধুবাবা বলিতেছেন, কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে উহার ভবিষ্যৎফল বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া তবে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। কারণ কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে তাহার ফল একদিন না একদিন ভোগ করিবেই। সৎকার্য্যের ফল শুভ এবং অসৎকার্য্যের ফল অশুভ,—ইহা চিরদিনই সত্য, এবং সেইরূপভাবে ফলিয়াও থাকে। পূর্ব্বে ভালরূপ চিন্তা না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ফল যে পরে কতদূর গড়াইবে তাহার কোন স্থিরতা থাকে না। একটী উপমা দিয়া বলিলেন,—যেমন কোন ব্যক্তি ক্রীড়াচ্ছলে তীর নিক্ষেপ করিতেছে। দৈবক্রমে একটী গরু আসিয়া পড়ায় সেই নিক্ষিপ্ত তীর গরুর দেহ বিদ্ধ করিল এবং গরুটী প্রাণত্যাগ করিল। ঐ ব্যক্তির তখন অনর্থক গোহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হইল। একবার ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন আর ফিরাইবার উপায় থাকে না, তেমনই একটী কার্য্য করিয়া ফেলিলে তাহার ফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। সেইজন্য তীর নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ উত্তমরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক,—সেইরূপ কোন কর্ম্ম করিয়া যাহাতে সেই কর্ম্মবন্ধনে জড়িত হইয়া অধোগামী হইতে না হয়, তাহার জন্য পূর্ব্বেই বিশেষরূপে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

সদগুণ সম্বন্ধে সাধুবাবা আর একটী কথা বলিতেছিলেন, যেমন সাধুপুরুষের

সংশ্রবে আসিলে বা মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ গ্রহণ করিলে নীচ বাসনার নাশ হয়, তেমনই যদি কোন সৎ লোক মন্দ ব্যক্তির সঙ্গ গ্রহণ করে, তবে সঙ্গদোষে ঐ ব্যক্তিও মন্দ হইয়া যাইতে পারে। উপমা দিয়া বলিলেন, যেমন কোন পরিষ্কার জলের সহিত অন্য কোন মন্দ অপরিষ্কার জিনিষ মিশাইলে উহা দূষিত ও রং পরিবর্ত্তন হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে। সেইজন্য কাহারও সঙ্গ করিতে হইলে পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে জানিয়া সৎব্যক্তির সহিতই সঙ্গ করা কর্ত্তব্য।

সাধুবাবার নিকট সেদিন অপর সাধুটীকে না দেখিয়া তিনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করায়, শুনিলাম—লক্ষ্মীনারায়ণ নবাব তাঁহার বাগানের এক প্রান্তে ঐ সাধুর জন্য চতুর্দ্দিক বারান্দাযুক্ত ইষ্টক নির্ম্মিত একখানি গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়ায় তিনি কয়েকদিন হইল তথায় গিয়া বাস করিতেছেন। যদিও তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রায় প্রত্যহই একবার এই পাহাড়ে আসিয়া তিনি কিছুক্ষণ সাধুবাবার সহিত কাটাইয়া যান। মুক্ত গগনতলে প্রস্তরোপরি উপবেশন করিয়া সাধুবাবার সহিত এইরূপ নানা কথোপকথনে সময় বড় আনন্দে অতিবাহিত হইতেছিল, কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর অনতিবিলম্বে সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দ্দিকে ঘনাইয়া আসিতেছিল বলিয়া আমরা বাবাকে প্রণাম করিয়া সেদিন বাড়ী রওনা হইয়াছিলাম।

অন্য একদিন পুনরায় সাধুবাবার নিকট গিয়া বসিলে তিনি এক জ্ঞানী ব্রাহ্মণের গল্প বলিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। সে গল্পটী এই :—

একজন ব্রাহ্মণ অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। সংসারে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা, পত্নী এবং দুইটী পুত্র কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে গৃহে রাখিয়া নিজে তপস্যার্থ কোন নদী তীরে নির্জ্জন স্থানে গিয়া বাস করিতেছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় ঐ দুঃসংবাদ বৃদ্ধ পিতা তপস্যানিরত পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। বৃদ্ধের বিশ্বাস ছিল যে এরূপ বিপদের সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই পুত্র স্থির থাকিতে পারিবে না, অবশ্যই সে গৃহে আসিবে। এই সংবাদ পাইয়াও কিন্তু পুত্র স্বগৃহে ফিরিলেন না। কিয়দ্দিবস গত হইলে ব্রাহ্মণের কন্যাটী দেহত্যাগ করিল। বৃদ্ধ পিতা সে সংবাদ পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন,—তাহাতেও একই ফল লাভ হইল। পুত্র গৃহে ফিরিলেন না। অবশেষে একদা যখন ব্রাহ্মণের পুত্রটীরও মৃত্যু ঘটিল, অথচ এরূপ দুঃসংবাদ শ্রবনে ব্রাহ্মণ শোকাকুল হওয়া দূরের কথা, তিনি গৃহেই প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন বৃদ্ধের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া স্বয়ং

পুত্রের নিকট গমন করিলেন এবং তপস্যানিরত পুত্রের পৃষ্ঠে এক পদাঘাত করিলেন। উহাতে পুত্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া নিকটে বৃদ্ধ পিতাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! আপনি এরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করিলেন? এতক্ষণ আমি দেখিতেছিলাম যেন আমার স্ত্রীর কোড়ে কতশত পুত্রকন্যা শোভা পাইতেছে। আপনি কেন আমার সে আনন্দ নষ্ট করিয়া দিলেন?" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তাহাতো বাস্তবিক সত্য নয়, উহা একেবারে মিথ্যা—তোমার কল্পনা মাত্র। এদিকে যে তোমার গৃহে সত্যসত্যই তোমার পত্নী, পুত্র এবং কন্যা সকলে একে একে দেহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।" পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পিতঃ! উহা যে সত্য তাই বা কিরূপে বুঝিব? কারণ, যাহা সত্য তাহার কখনও বিনাশ হয় না। যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, যাহা অক্ষয়, যাহা অবিনশ্বর,—তাহাই তো সত্য। উহারা যদি বাস্তবিকই আমার হইত, তাহা হইলে চিরদিনই আমার থাকিত, কদাচ আমায় পরিত্যাগ করিরা দুইদিন পরেই চলিয়া যাইত না। "নিত্য যাহা তাহা কভু না হয় বিলীন।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার পুত্রের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে, নতুবা সে এরূপ কথা বলিবে কেন? কিন্তু যাহাদের নিশ্চয় ধারণা :—

"আমি মরি, মরে পুত্র, না মরে মানব,
নাহি হয় উন্নতির তিলার্দ্ধ লাঘব।
জলবিম্ব যায় মাত্র মিশাইয়া জলে,
একে ভাঁটা অন্য দিকে জোয়ার উথলে।"

এইরূপ জ্ঞান যাহাদের অন্তরে দৃঢ়রূপে বসিয়া গিয়াছে তাহারা আর কিসের জন্য বা কাহার জন্য শোক দুঃখ করিবে? আমরা অজ্ঞান ব্যক্তি যে সকল বস্তু কিছুদিনের জন্য লাভ করিয়াছি, যে সকলের সঙ্গে মাত্র কিছুদিনের সম্বন্ধ,—তাহাই চিরদিনের জন্য ভাবি—এবং ঐ বস্তু 'আমার আমার' করি। ঐ সঙ্গে বহু দুঃখ কষ্ট ও হতাশা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লই। এই যে স্রষ্টাকে বিস্মরণ হইয়া সৃষ্ট পদার্থে প্রবল আসক্তি ও অনুরাগ, উহাতেই জীবের যত দুঃখ কষ্ট এবং মন-বেদনা ভোগ করিতে হয়।

সাধুবাবা আর একটী কথা অনেকবার বলেন যে—বাসনাই বন্ধনের হেতু ও যত দুঃখের মূল। বাসনা নাশ হইলেই সংসারের নাশ হইয়া যায়। জীব বাসনার জন্যই এ মরজগতে বারম্বার জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তির বাসনার নাশ হইয়া গিয়াছে তাহাকে আর ইহসংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

একদিন সাধুবাবাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—"অহঙ্কার যায় কি সে?" তাহতে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন,—"জীবের অহঙ্কার দুই প্রকার—এক মলিন অহঙ্কার, দ্বিতীয় শুদ্ধ অহঙ্কার। বিষয়, বৈভব,ক্ষমতা প্রভৃতি মায়িক বস্তু হইতে যে অহঙ্কার হয়,—তাহা মলিন-অহঙ্কার। ইহা জীবের বন্ধনের কারণ হয়। আর আমি আত্মা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব—এইরূপ ভাব শুদ্ধ অহঙ্কার, অথবা আমি তাঁহার দাস বা সন্তান কিম্বা ভক্ত এরূপ ভাবও ভাল,—ইহাও শুদ্ধ অহঙ্কার, শুদ্ধ অহঙ্কার জীবের মোক্ষের কারণ।"

সাধুবাবাকে আর একটী প্রশ্ন করা হইয়াছিল,—"জীবের তৃষ্ণা যায় কিসে?" তাহাতে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, "তৃষ্ণা বাসনাদিই তো জীবের প্রধান বন্ধনের কারণ। ইহা জয় করা অতিশয় কঠিন। তবে সর্ব্বদা বিচার সাহায্যে বৈরাগ্য বা নির্ব্বাসনা আনিতে হইবে। ভোগ বাসনা হইতে জীবের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, ইহা দুষ্পুরণীয়"। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এসম্বন্ধে তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য-বৈরিণা। কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পুরেনানলেন চ॥" জীব যদি পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করে তবে তখনই তাহার পানীয় গ্রহণের বাসনা হয়, তৎপর নিদ্রার ইচ্ছা জন্মে। এইরূপ সর্ব্ব বিষয়েরই ভোগ বাসনার কখনই অন্ত নাই; সর্ব্বদাই একটীর পর একটীর উদয় হইয়া থাকে। অথচ ইহা জীবকে যথেষ্ট পরিমান তৃপ্তিও দিতে সক্ষম হয় না। এইজন্য বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য পদার্থে উদাসীন হওয়াই কর্ত্তব্য। এই দুষ্পুরণীয় কামনায় জ্ঞান সতত আবৃত থাকায় জীব আপন স্বরূপ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে।

মায়িক বস্তু হইতে যাহা সুখ অর্থাৎ বিষয়ানন্দ হইতে যে সুখ তাহা অতি অল্পকাল স্থায়ী। এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "ইহা অতি তুচ্ছ, অল্পক্ষণ স্থায়ী, ইহা অপাতঃ মধুর বোধ হইলেও পরিনামে অশেষ দুঃখের কারণ। জীবের সকল দুঃখের ও বন্ধনের কারণই বাসনা, অথচ ইহা রিক্ত বদ্ধ মুষ্টির ন্যায় সর্ব্বথা ফাঁকি।" তাই, সাধুবাবা বলিতেছিলেন, "বিষয়ানন্দে যে সুখ বোধ

হয় উহা সুখাভাস বা নকল সুখ মাত্র। নকল রত্ন পাইয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তি যেমন 'প্রকৃত রত্ন পাইয়াছি' বলিয়া ভ্রম করে, সংসারী বদ্ধ জীবও বিষয় ভোগের নকল সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া ভ্রম করে। সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ হইতেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়। সেইজন্য অতি অকিঞ্চিৎ কর তুচ্ছ এবং নকল সুখ বর্জ্জন করিয়া প্রকৃত সুখ লাভের জন্য চেষ্টিত হওয়া সর্ব্ব প্রাণীরই কর্ত্তব্য।"

আর একদিন সাধুবাবা মহাবীর হনুমানজী সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াছিলেন। কথাটী এইঃ—একদিন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বিরাট সভায় পাত্রমিত্র অমাত্য বর্গ সহিত বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সুবৃহৎ রাজসভায় কত জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু মহাত্মা বিরাজিত আছেন। এমন সময় শ্রীরাম চন্দ্র তাঁহার পরম ভক্ত মহাবীর হনুমানের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা হনুমান! আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়,—আমাকে তাহা বল।" অর্থাৎ হনুমান শ্রীরাম চন্দ্রকে কিরূপ চক্ষে দেখেন—তাহাই তিনি জানিতে চাহিলেন, হনুমান ভাবিলেন, এখন 'আমি এই সভা মধ্যে যদি বলি যে আপনি প্রভু, আমি দাস,—তাহা হইলে সভাস্থ জ্ঞানীগণ মনে করিবেন যে এতদিন হইল এ শ্রীরাম চন্দ্রের সেবা করিতেছে, তবুও ইহার অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞান লাভ হইল না।' আর যদি বলি যে আপনি ও আমি পৃথক্ কি, আমার তো একই বোধ হয়, তাহা হইলে সভাস্থ ভক্তগণ মনে ব্যথা পাইবেন। তাঁহারা ভাবিবেন, সেবক ও প্রভু এক, এ কিরূপ কথা হইল,—ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ সে বহু চিন্তার পর উত্তর দিল, "দে দৃষ্টায়তে দাসোহস্মি, জীব বুদ্ধ্যাত দংশকা, বস্তু তস্ত তদেবাস্মি ইতি মে নিশ্চলা মতিঃ।" অর্থাৎ যখন আমার শরীর ভাব থাকে—তখন তুমি প্রভু, আমি দাস। আর যদি জীববুদ্ধি করি—তবে তুমি ঈশ্বর আর আমি তোমার অংশ মনে করিয়া থাকি; আর যদি পরমার্থ স্বরূপ দেখি—তবে যে তুমি, সেই আমি। তখন কিছুই পৃকৃক দেখিনা,—সবই এক বোধ হয়। আমার যাহা মনে হয় তাহাই তোমাকে বলিলাম।" হনুমানের উত্তর শুনিয়া শ্রীরাম চন্দ্র এবং সভাস্থ ভক্তগণ ও জ্ঞাণীগণ মহা সন্তুষ্ট হইলেন। সকলেই বলিলেন, "হ্যাঁ—হনুমান ঠিক কথাই বলিয়াছে।"

বাবার সঙ্গে সেদিন আরও ছোটখাট অনেক কথা হইয়াছিল। আসক্তি অর্থে তিনি বলিলেন, 'যাহা আমরা ত্যাগ করিতে পারি না'। আর বলিতে-

ছিলেন, 'মোহ-ই রাজা'। মোহ অর্থাৎ মমত্ব, আমার বোধ,—উহা ভ্রান্তি। আমার বোধ—একেবারে ত্যাগ করা চাই। আর 'সন্তোষ' অর্থে বলিলেন, 'নির্ব্বাসনা',—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্ব বাসনা শূন্য হইলে তবে সে মনে সন্তোষ বিরাজ করিবে। আর 'বৈরাগ্য' অর্থে বলিলেন, 'ভোগ্য পদার্থে দোষ দর্শন করা ও সেদিক হইতে ক্রমে ক্রমে মনকে সরাইয়া আনা।' আর একটী কথা বলিলেন, 'শুভ' বাসনায় মনের উচ্চগতি হয়, উহার দ্বারা জীবের দিন দিনই উচ্চাবস্থা লাভ হয়,—আর অশুভ বাসনা হইতে জীবের নিম্নগতি হয়, কাজেই উহা একেবারে বর্জ্জনীয়। মুনিশব্দের অর্থ বাবা বলিলেন যে ব্যক্তি মননশীল সেই মুনি। এইরূপ সব বহু সদালোচনার পর আমরা সাধুবাবাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমশঃ—

কোন ভদ্র মহিলা, রাজসাহী।

৺ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামিপদ কমলের জীবনী বর্ণনে প্রয়াস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রস্তাবনা।

স্বামীজী চিরদিনই আপনাকে অপ্রকাশিত রাখিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমে তাঁহার নাম নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং অনেকেই তাঁহার জীবনের অদ্ভুত কথা সকল সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং এবিষয়ে আমাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বামীজীকেও এ সম্বন্ধে প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। একদিন স্বামীজী নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঠান্তে আমাকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, ইহার একটা যথাসঙ্গত উত্তর লিখিয়া দিও।

"শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ"

কৃষ্ণনগর

১৩।২।১৯২১

"পরমপূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ সমীপেষু—

"কৃপানিধে!

"বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ দীন দরিদ্রেরও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না, তাই আপনাকে কলিকাতায় আনিয়া দর্শনের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়া এ অকিঞ্চনেরও বহুদিনের সঞ্চিত সাধ পূর্ণ করিলেন। আপনার শ্রীমুখে সে দিন নির্ভরতা ও প্রকৃত বিনয়ের (Humility) অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি, কিন্তু কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে যেমন তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই যায়, তেমনি এ দাসেরও একটা প্রার্থনা জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা আজ শ্রীচরণে নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইহাতে যদি কোন অপরাধ হয় নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

"আজ এই ধর্ম্মসঙ্কটের দিনে সমগ্র ভারত ও বিশেষরূপে আমাদের বাঙ্গালাদেশ সাধকশূন্য হইয়া পড়িতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় জ্ঞানের কথা হাটে, মাঠে, ঘাটে ছড়াইয়া পড়িলেও এ জ্ঞান মুখেই থাকিয়া যাইতেছে, কাজে কিছুই দেখা যাইতেছে না। যে জ্ঞান 'প্রত্যক্ষকামং ধর্ম্মং * * * ছিল, আজ তাহা * * বাহাড়ম্বরে ও বাকছটায় পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহার কারণ অনুষ্ঠানের অভাব ও কায়ক্লেশভয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে এই বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে শুধু পটন পাঠন হইত না, যেখানে ইহার সাধন (Experiment) পর্য্যন্ত করিয়া দেখান হইত ও শিখান হইত। আজ সেই ব্রাহ্মণ-গৃহে পূত হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত, ও তাহার স্থানে আবর্জ্জনাপূর্ণ ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় এই বিমল জ্ঞানপ্রবাহ এ যুগে কচিৎ ছিন্ন, কচিৎ ভিন্ন। ইহার একটা স্থূল কারণ, মনে হয়, আজ কালকার এই মহা অন্নসঙ্কট। এই অন্নাভাবে পড়িয়াই, এই পেটের দায়েই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে যে ছেলেটী মেধাবান, বুদ্ধিমান, ব্রহ্মবিদ্যার উপযুক্ত অধিকারী, তাহাকেই স্ববৃত্তি অবলম্বনের জন্য অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইতেছে। ফলে বিজ্ঞানের স্থানে অজ্ঞান আসিয়া পড়িতেছে, শুদ্ধ

সত্ত্বময় ব্রাহ্মণের গৃহে ঘনতমোময় চণ্ডালের জন্ম হইতেছে ও তৎহেতু গুরু-পরম্পরাগত সাধনা ও সিদ্ধি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালা খুঁজিয়া আজ তাই মাত্র দুই একটী বাঙ্গালী সিদ্ধ সাধক দেখা যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে আপনি অগ্রণী। তাই বাঙ্গলার স্বল্পসংখ্যক সাধক সম্প্রদায় উৎকণ্ঠা-স্ফুটিত চিত্তে আপনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, আপনার ভিতর দিয়া সেই করুণার অমৃতধারা প্রবাহিত হইবে বলিয়া অনেকে উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। যে দেহকে আশ্রয় করিয়া কৃপাময় এই সাধনসিদ্ধ পূর্ণজ্ঞানকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও সফলীকৃত করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধিসাধনের কথা, তাঁহাতে কোন্ সাধন কি ভাবে, কোন্ কোন্ বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য এবং দেখিয়া শিখিবার জন্য সমগ্র সাধক সম্প্রদায় আজ যেন হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে, এই জ্বলন্ত জীবন্ত ছবির প্রদীপ্ত ছটায় নিজ নিজ পথ দেখিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। তাই কৃপানিধে! এ দীনের প্রার্থনা, যদি কৃপা করিয়া এই মহামহিমান্বিত জীবনকথা এ দরিদ্র ভিখারিগণকে উপহার প্রদান করেন, তাহা হইলে ইহারা ধন্য হইয়া যায়।

শ্রীচরণে দাসের ভক্তিসহ কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন। নিবেদন ইতি

সেবকাধম

প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়।"*

আমি পত্র পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম, ইহার কি উত্তর দিব? ইহার যথার্থ উত্তর দেওয়া ত স্বামীজীর জীবনকথা ইহাঁকে জ্ঞাপন করা। তাহাত একখানি পত্রে সম্ভব হইতে পারে না। মনে হইল, তবে বোধ হয়, ভগবানের ইচ্ছা যে, আর বিলম্ব না করিয়া এইবার স্বামীজীর জীবনী বর্ণনে প্রযত্ন আরম্ভ করি। তাই শ্রীভগবানের চরণ স্মরণপূর্ব্বক ততঃপর এ বিষয়ে প্রয়াসী হইলাম।

---

*সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভূত গোয়াড়া-কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়, বি, এ, মহাশয় একজন স্বধর্ম্মপ্রাণ, জ্ঞানানুরাগী, শাস্ত্রনিষ্ঠ, উদারহৃদয় সাধক পুরুষ। ইনি পূর্ব্বে Superintendent of Post Offices ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় গুরুস্থান বৈদ্যনাথধামে বাস ও সাধনায় কালাতিপাত করিতেছেন।

স্বামীজীর জীবন একখানি বেদবিশেষ। যথাযথভাবে ইহাঁর জীবনী অধ্যয়ন করিলে বেদপাঠই হইয়া থাকে, বেদাধ্যয়নেরই ফল লাভ হইয়া থাকে, তবে বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত যেমন সংস্কারের আবশ্যক হয়, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত না হইয়া, কোন পুরুষ বেদাধ্যয়ন করিতে যাইলে, যেমন তাঁহা দ্বারা বেদের যথার্থ অর্থ পরিগৃহীত হয় না, অনন্তরত্নের আকর, পরমশান্তিনিলয় বেদ যেমন তাঁহাকে সুখ-শান্তির অধিকারী করিতে পারগ হয়েন না, তদ্রূপ আর্য্যোচিত সংস্কারবিশিষ্ট না হইয়া স্বামীজীর জীবনবেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত পুরুষের তাহা হইতে পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি, পূর্ণানন্দলাভের সম্ভাবনা নাই। স্বামীজীর জীবন অনেকস্থলে তাঁহার দুর্ব্বোধ্য হইবার সম্ভাবনা, যথোচিত সংস্কার বিশিষ্ট না হইলে তিনি অনেক স্থলে সত্য ঘটনা গুলিও বোধ হয় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। পূর্ণভাবে বৈদিক আর্য্যোচিত সংস্কার বা প্রতিভা না থাকিলেও পাঠকগণ যদি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে চিত্তকে যথাসম্ভব রাগদ্বেষবর্জ্জিত করেন, সত্যানুরাগবিশিষ্ট করেন, সত্যানুসন্ধানের যোগ্য করেন, তাহা হইলেও আমার কার্য্য অনেকটা সুগম হইবে, আমাকে অনেক পরিমাণে অনুগৃহীত করা হইবে, এবং তাঁহারাও পূর্ণ ফললাভে সমর্থ না হইলেও, অনেকাংশে লাভবান্ হইবেন, সন্দেহ নাই। যাহাতে পাঠকগণ যথোচিত-মতিবিশিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের পূর্ণফল প্রাপ্ত হইতে পারেন, আমি তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, সন্দেহ নাই, স্বামীজীর জীবনী লেখকের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য, ইহাই বিশিষ্ট দায়িত্ব। আমি যে এ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারিব, এ দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, আমার বর্ত্তমান যোগ্যতানুসারে এ আশা আমি করিতে পারিনা।

তথাপি বর্ত্তমানে আমি যে এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহার অন্যতম কারণ, স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাত হওয়ার আমার যে ভাগ্য এবং অবসর ঘটিয়াছিল, তাহা অন্যের পক্ষে হয়ত ঘটে নাই, অতএব আমি যতদূর জানিয়াছি, যতটুকু বুঝিয়াছি, জনসাধারণের উপকারার্থ তাহা প্রকাশ করা সমীচীন মনে করিলাম, আমার অবর্ত্তমানে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। স্বামীজীর পূর্ব্বপরিচিতগণের মধ্যে অনেকেই স্বর্গত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবিত থাকিলে, তাঁহাদের সকাশ হইতে এই কার্য্যে আমি অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, তথাপি, যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন,—হইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দূরে অবস্থিত, এবং আমি, তাঁহাদের

অপরিচিত—তাঁহাদের নিকট আমার প্রার্থনা, তাঁহারা স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত আছেন তাহা কৃপাপূর্ব্বক এ দীনকে অবগত করান, ভবিষ্যতে সে গুলি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিব, ইহাতে কোন ভ্রান্তি থাকিলে সংশোধন করিয়া দিব। *

*আপত্তি না থাকিলে, স্বামীজীর যে সকল পত্রাদি তাঁহাদের নিকটে আছে, সেগুলি এ দীনকে পাঠাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব, নিষিদ্ধ হইলে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিব না, বর্ত্তমান কার্য্যের উপযোগী এবং লোকোপকারক অংশগুলি মাত্র গ্রহণ করিব এবং তদনন্তর পত্রগুলি তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিব। স্বামীজীর পত্রগুলি সাধারণ পত্রের ন্যায় নহে, তাঁহার প্রায় প্রত্যেক পত্রই অমূল্য অমৃতোপম জ্ঞানোপদেশের আধার। স্বামীজীর হস্তলিখিত একখানি পত্র পাওয়া অনেকেই বিশিষ্ট ভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন। ঈদৃশ পত্রগুলিকে যে তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অবলম্বনরূপে সাদরে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা আমি সহজেই অনুমান করিতে পারি।

স্বামিজীর জীবনের বিশিষ্টতা

মহাপুরুষগণ জগতে আবির্ভূত হইয়া নিজ জীবন দ্বারা সাধারণতঃ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই মার্গত্রয়ের (কালোচিত প্রয়োজনানুসারে) অন্যতমের বিশেষতঃ উপদেশ করিয়া যান, তাহাকে অবলম্বনীয় মার্গ বলিয়া দেখাইয়া যান। স্বামীজী স্বীয় জীবনে একাধারে এই মার্গত্রয়েরই সানুষ্ঠান উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে লোকে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে তাহার অনুকরণ করিতে পারে। সকল প্রকার মার্গের লোকই তাঁহার নিকটে গিয়া শিক্ষা এবং পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীজীর জীবনে ইহা একটী প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয়। শুধু ইহাই নহে, উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি সদা এই মার্গত্রয়ের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন, ইহাদের সামঞ্জস্য দেখাইয়া গিয়াছেন। এ সমন্বয় কিরূপে সম্ভব হয়? এই মার্গত্রয়ের বিভিন্নতা চির প্রসিদ্ধ, সকলেই ইহাদিগকে বিভিন্ন পন্থা বলিয়া অবগত আছেন; ইহাদিগকে কি করিয়া এক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়? সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিই ভেদবুদ্ধির কারণ, বিমল, অভ্রান্ত, ব্যাপক দৃষ্টিই অভেদ বোধের হেতু। নির্ব্বিতর্ক সমাধিজ বিমল দিব্য বিজ্ঞান দৃষ্টিদ্বারাই স্বামীজী ইহাদের ঐক্য অনুভব করিয়াছিলেন এবং

অতএব বোধার্থিগণকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। যাঁহার দৃষ্টি সকল তত্ত্বের মূল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয় না, তিনি তত্ত্বসকলের সমন্বিত মনোরম রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না। বিমল দিব্য বিজ্ঞানই এই প্রসূতিত্রয়ের গ্রন্থিসূত্র। উক্ত বিজ্ঞানই ইহাদিগকে যেন মনোহর মালাকারে একীভূত করিয়া সর্ব্বদা আমাদের চিত্ত হরণ করিত, আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশালোক দ্বারা ইহাদিগকে এক মার্গ বলিয়াই দেখিতে পাইতাম, বিভিন্ন মার্গ বলিয়া কখন মনে করিতে পারিতাম না। ভেদজ্ঞান দুঃখের এবং অভেদজ্ঞান সুখের হেতু হইয়া থাকে, তাই আমরা সর্ব্বদা এক অনুপম আনন্দ অনুভব করিতাম, সে আনন্দের স্বরূপ বর্ণন করা কঠিন, যাঁহারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অনেকত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভক্তিযোগের সাধক অনেকই এই ভাবভূমিকে সনাথীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞান যোগ ও যোগ যোগের সম্যক্ উপচিতি সহ ভক্তিযোগের পূর্ণ নিষ্ঠা, যোগৈকলভ্য দিব্য বিজ্ঞানদৃষ্টি সহ উৎকৃষ্ট প্রেমভক্তিযোগের অনুষ্ঠান--ইহা জগতে বস্তুতই দুর্লভ পদার্থ। রাগ-দ্বেষ ও মাৎসর্য্যাদি দোষ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, সত্যানুরাগ ও সত্যানুসন্ধিৎসাকেই হৃদয়ের মুখ্য ভাব করিয়া যদি কেহ স্বামীজীর জীবনী পাঠ করেন, তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবেন যে, স্বামীজী ভগবানের জ্ঞান, যোগ ও প্রেম এই বিভূতিত্রয়ের বিশিষ্ট আধার। সাধারণতঃ, মানুষে এরূপ জ্ঞান, এরূপ প্রেম দেখা যায়না। প্রকৃত যোগী না হইলে প্রকৃত জ্ঞানী বা প্রকৃত ভক্ত হইতে পারা যায় না, এবং যথার্থ প্রেম প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়েই বাস করিয়া থাকে।

স্বামীজীর জীবন ত সকল বিষয়েই অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেছে, তথাপি তাহার মধ্যে একটী বিশিষ্টতা যাবজ্জীবন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাহা তাঁহার বিশুদ্ধ একান্ত ভক্তি (বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ভক্তি ইহারা প্রকৃত দৃষ্টিতে অভিন্ন পদার্থ, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে)। এই ভক্তি যাঁহার হইয়াছে, তিনি ভগবান্‌কে সকল বিষয়েই বাধ্য করিয়া ফেলেন, ভগবান্ তাঁহার সকল ভার বহন করেন, তাঁহার সকল অভাব মোচন করেন, তাঁহার সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন, ভগবানের শক্তি ও গুণ সকল তাঁহাতে আসিয়া থাকে, ফলতঃ ভগবানে এবং এতাদৃশ ভক্তে আর কোন ভেদ থাকে না। স্বামীজীর যত বিভূতি সব এই ভক্তিমূলিকা; এই ভক্তির ফলেই তিনি অলৌকিক জ্ঞান, অলৌকিক যোগ-শক্তি ও

অলৌকিক বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, এবং তাহাতে কোন মানুষ গুরুর মাধ্যস্থ্য নাই—সকলই সাক্ষাৎভাবে ভগবান্ হইত। ইহাই স্বামীজীর জীবনের বিশিষ্টতা; তাঁহার অদ্ভুত জীবন সর্ব্বোপরি এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। এ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। ঈশ্বর প্রণিধান হইতে সমাধির (ও তৎপ্রসূত যোগ-বিভূতি সকলের) সিদ্ধি হইয়া থাকে ("সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ") এই পাতঞ্জল যোগসূত্রের সত্যত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান আমরা স্বামীজীর জীবন হইতে লাভ করিয়াছি।

ক্রমশঃ।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

কলির ধর্ম্ম।

আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন "সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার। যথা (১) অপক্ষপাতিতা (২) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (৩) অমৎসরতা (৪) ক্ষমা (৫) লজ্জা (৬) তিতিক্ষা (৭) অনসূয়া (৮) ত্যাগ (৯) ধ্যান (১০) সরলতা (১১) ধৈর্য্য (১২) দয়া (১৩) অহিংসা। এ সমুদয়ই সত্যস্বরূপ। মানদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও একদিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে সন্দেহ নাই।" মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ভৃগু ভরদ্বাজ কথোপকথনে জানা যায় "সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্য প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাপালন করিয়া থাকে। লোকসমুদায় সত্য প্রভাবেই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকার স্বরূপ। ঐ অন্ধকার প্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার স্বরূপ। সত্য ও অমৃতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, প্রকাশ ও অপ্রকাশ, সুখ দুঃখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ, যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ। যাহা অধর্ম্ম তাহাই অন্ধকার। এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ। এই সব বেদ পুরাণোক্ত বচন হইতে বেশ বুঝা যায় যে সত্য দুই প্রকার। প্রথম পারমার্থিক সত্য যাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে আর ১টি ব্যবহারিক সত্য যাহাকে সত্য কথা ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ব্যবহারিক সত্য "ঋতং সত্যং" নহে পারমার্থিক সত্য

"ঋতং সত্যং" অব্যয় ও অবিকৃত। লৌকিক বা ব্যবহারিক সত্য পারমার্থিক সত্যের সোপান। পুনরায় মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে ইক্ষাকু ও ব্রাহ্মণের সংবাদে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা ও সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ ও অক্ষয় বেদস্বরূপ; বেদশাস্ত্রে সত্য জাগরূক হইয়া অবস্থান করিতেছে, সত্য প্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে, তপস্যা, ধর্ম্ম, দমগুণ যজ্ঞ তন্ত্র, মন্ত্র, সরস্বতী স্বর্গ, বেদ, বেদাঙ্গ বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্য্যা ওঁকার এবং জীবগণের জন্ম ও সন্তান সন্ততি সমুদায়ই, সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্য প্রভাবে বায়ু গমনাগমন করে, সূর্য্য তাপ প্রদান করে এবং অগ্নি দাহকার্য্য সাধন করিয়া থাকে, সত্য এবং ধর্ম্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যেরই গৌরব লক্ষিত হয়; ধর্ম্ম সত্যের অনুগামী, সত্য বলে সমুদায় কার্য্যের উন্নতিসাধন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এ যে সত্যের কথা বলিয়াছেন ইহা পারমার্থিক সত্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যের প্রভাবে বায়ুর গমনাগমন, সূর্য্যের তাপ প্রদান ও অগ্নি দাহ কার্য্য করেন যে বলা হইয়াছে এ পারমার্থিক সত্য কঠোপনিষদোক্ত "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্য; ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইনিই সেই আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্যউপনিষদে "সত্য"এ তিন অক্ষর ব্রহ্মনামাক্ষর সত্য এই নামের মধ্যে যে সকার তকার ও যকার তিন বর্ণ আছে ইহার মধ্যে সবর্ণ সৎব্রহ্মের।

ব্যবহারিক মতের বিষয় বিশেষ বিধির কথা আগে বলা হইয়াছে। অবস্থা ভেদে মিথ্যা দোষের হয় না যে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে তাহার কারণ মূলে "হিংসা" বা কুঅভিপ্রায় নতুবা যুধিষ্ঠিরাদি বিরাটভবনে কঙ্ক বৃহন্নলাদিরূপে কত মিথ্যা কথা বলিয়াছেন ও মিথ্যা আচরণ করিয়াছেন তাহা দোষের হইয়াছে বলিয়া মহাভারতে বলেন নাই কারণ আপদ্ধর্ম্মাধ্যায়ে ভীষ্ম বলিয়াছেন আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ যে মিথ্যা কথা বলা যায় তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হয় না। ভগবান সনৎকুমার বলিয়াছেন যেস্থলে সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয় সেস্থলে সত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। এই সব শাস্ত্রানুসারে যুধিষ্ঠিরাদির মিথ্যায় পাপ হইল না, নরকাদি ভোগ হইল না, কিন্তু "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইল কারণ কি? ইহার মূলে হিংসা, পরের অনিষ্ট যার বাড়া পাপ নাই, সেই গুরুবধ উদ্দেশ্য, কাজেই পাপ উদ্দেশ্যেই মিথ্যা প্রয়োগ নরকের কারণ, অন্যথা নহে। ব্যবহারিক সত্য ও অহিংসা মূলক হওয়া চাই তাই "অহিংসা সত্যাস্তেয়—অহিংসাসত্যম-

ক্রোধঃ অহিংসাসত্যমস্তেয়ং” সব শ্লোকেই প্রথমে অহিংসা। ও তন্ত্রে “অহিংসা পরমংপুষ্পং” বলিয়া ভাবপুষ্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুষ্প ধরে গেছেন। এই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম অহিংসা পরমোধর্ম্ম বলে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। অহিংসা ত্রয়োদশ প্রকার সত্যের অন্যতম এ কথা আগে বলা হইয়াছে, ভীষ্মের উক্তিতে তাই অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইয়াও পৃথক আলোচিত হইল না। উদ্দেশ্য অহিংসামূলক কিনা এটা বিশেষ দ্রষ্টব্য। ত্বষ্টা “ইন্দ্র শত্রো বর্দ্ধস্ব” এই বলিয়া যাগ করিতে গিয়া ইন্দ্রের শত্রু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয়।

বিষ্ণায় নমঃ বলিলে জনার্দ্দন পূজা লয়েন, কারণ তিনি ভাবগ্রাহী কিন্তু হিংসা মূল হইলে তিনি ব্যাকরণ দোষ ধরেন। উচ্চারণ দোষ পর্য্যন্ত ধরেন। ধর্ম্মাধিকরণে ও উদ্দেশ্য (intention) দেখিয়া দণ্ডের তারতম্য হয়। আদালতে তাই হলপ সত্য পাঠ লেখান প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ডাক্তার অস্ত্রোপচার করিতে গিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটিলে আইনে দণ্ডার্হ নহেন, কারণ তাহার উদ্দেশ্য তাহার প্রাণরক্ষা করা, প্রাণনাশ নহে।

“সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং” যদি এই মহাবাক্য অনুসারে কার্য্য করিয়া যথাযথ ফলের প্রত্যাশা করা যায়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই দৃঢ়সংকল্প হইয়া সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিব না—প্রাণান্তেও নহে—এইটী মূলমন্ত্র করিতে হইবে। “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন” নতুবা প্রথম হইতেই যে যে বিষয় দোষের নহে, এগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে যাইলে, সত্য প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়া যাইবে, কোন কাজই সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইবে না। যদি ঘটনাচক্রে কখন মিথ্যা কথা বাহির হইয়া পড়ে, তখনই কেবল দেখা উচিত যে উপরোক্ত বিশেষ বিধির মধ্যে তাহা পড়ে কি না, যদি পড়ে ভালই, বিশেষ ভাবনার কারণ নাই, নতুবা অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—কেননা শাস্ত্রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরক পর্য্যন্ত ব্যবস্থা আছে। মনুসংহিতায় একাদশ অধ্যায়ে মহাপাতকাদির চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎদর্শী ঋষি ছিলেন হীনবল কলির জীবের অবস্থা দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া অনুকম্পা বশতঃ স্বল্পায়াসসাধ্য প্রায়শ্চিত্তও ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাকে “অপাত্রীকরণ” পাতক বলে। ইহার প্রায়শ্চিত্ত একমাসকাল চান্দ্রায়ণ করা। ইহা আমাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব জানিয়া দূরদর্শী সংহিতাকারক ব্যবস্থা করিলেন “খ্যাপনে নানুতাপেন তপসা অধ্যয়নেন চ পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি” (২২৮) আবার

তার পরই বলিয়াছেন "কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে, নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যাপূয়তেহি স" ? (২৩১) মহাভারতে আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে ১৫২ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে "পাপ একবার অনুষ্ঠিত হয় তাহা অনুতাপ দ্বারা, যাহা দুইবার অনুষ্ঠান করা যায় তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিনবার প্রবৃদ্ধ হওয়া যায় তাহা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে, আর যে পাপ বার বার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা তীর্থ পর্য্যটনের দ্বারা তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই"। এ তীর্থ পর্য্যটন রেলে দ্বিতীয় শ্রেনী বা প্রথম শ্রেনীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া হয় না—ইহা পদব্রজে করিতে হয়। বিবিধ পাপের বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে। আপাততঃ আমাদের মিথ্যা কথনরূপ পাপ লইয়া সম্বন্ধ। এ যুগে ত উর্দ্ধপদ অধঃশির ইত্যাদি তপস্যা নাই—পরীক্ষিতের উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে, কাজেই আমাদের জন্য অনুতাপ, খ্যাপন ও অধ্যয়ন রহিল। তবে গীতায় যে তপের কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্ভব বটে—তাহা দেবদ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ব্রহ্মচর্য্যা মহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে। আর্জব অর্থাৎ সরলতা কৌটিল্যবর্জন ইহার মধ্যে সত্য আসিল। আবার বাঙ্ময় তপের মধ্যে "অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ স্বাধ্যায়াভ্যসনংচৈব বাঙ্ময়তপউচ্যতে"। ভগবানের কথায় স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ মনুর মতে তাহাই অধ্যয়ন। অধ্যয়ন অর্থে বেদপাঠের অনধিকারী বা অপারকলোকের পক্ষে উপনিষদ, গীতা, যাগবাশিষ্ট প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশাত্মক যোগশাস্ত্রই বেদ। মনুর মতে "ব্রহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃক্ষত্রস্যরক্ষণম্ ইত্যাদি (২৩৬ শ্লোক ১১শ অধ্যায়) অধ্যয়নের ফল জ্ঞান। সর্ব্বংজ্ঞানপ্লবেনৈববৃজিনং সন্তরিষ্যসি, জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মাণিভস্মসাৎ কুরুতেরথা" জ্ঞান হইলেই কাজ মিটিল।

লোকসমাজে যদি নিজের পাপ জ্ঞাপন করিতে লজ্জা হয় ত মনে মনে অনুতাপ কর। ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর "ক্ষন্তব্যোমেহপরাধ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে" বলে মা মা বলে একবার কাঁদ—যে এমন কাজ আর করবোনা—এবারকার মত ক্ষমা কর। মা শক্তিদায়িনী পাপ হতে নিবৃত্ত হবার শক্তি দাও মা! তারপর বিষ্ণুপুরাণে "কৃতে পাপেঽনুতাপোবৈযস্যপুংথঃ প্রজায়তে প্রায়শ্চিত্তস্তুতস্যেকং হরিসংস্মরণং পরম্।"

এই সাহসে বুক বেঁধে ভগবানের নাম কর, সব পাপ দূরে যাবে। নবদেহে নববলে কার্য্যে অগ্রসর হও।

"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত বন্ধঃ পরং ব্রজেৎ"

এখন দেখা গেল যে এক সত্যরূপ পাদ আশ্রয় করে কলিতে ধর্ম্ম দণ্ডায়মান। শাস্ত্রান্তরে বলিতেছেন—

সত্যমেব ব্রতংযস্য দয়াদীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

সত্যের কথা বলা হইয়াছে, দানের মাহাত্ম্য শাস্ত্রে এত করেছেন কেন দেখা যাক্। সত্য প্রতিষ্ঠায় অনেক বিষয়ে পাপ নিবারণ হইল—মনও শুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু দয়া বলিয়া বৃত্তিটির অনুশীলন ব্যতিরেকে আসক্তি ত্যাগ হওয়া সুকঠিন হইবে না বলিলেও চলে। অবশ্য বৈরাগ্য আসিলে আসক্তি আপনাআপনি যায়। কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্য কয়জন লোকের ঘটে? আবার ভগবানের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই আসক্তি ত্যাগ হবে সত্য—কিন্তু দয়ানুশীলনে বহুতর গুণের উদয় হয়।

ভগবান মনু বলিয়াছেন "দানমেকং কলৌযুগে" ১।৮৬ "কলৌদানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ। তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্র সৎক্রিয়ান্বিতঃ" মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৮।৯৫

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র বলছেন "ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলং দয়া স্মৃতা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়াধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ"। দান ব্যতিরেকে ত্যাগ শিক্ষা হইবে না। ত্যাগ শিক্ষা না হইলে আসক্তিও যাইবে না। যেমন বদ্রিনারায়ণ যাইতে গেলে পুঁটলি পাটলা ব্যাগ Suitcase লওয়া চলে না, হালকা হতে হয়—সেইরূপ ভগবৎ সন্নিধানে যাইতে হইলে আসক্তিরূপ পুঁটলি ফেলে দিয়ে হাল্‌কা হতে হবে। ত্যাগ শিক্ষা না পাইলে আসক্তিও যাইবে না। শুধু গীতা পড়িলে ফলাশা বর্জ্জন হয় না। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন গীতা নয়রে তাগী (ত্যাগী) ত্যাগী হইতে হইলে প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক অন্ততঃ ৵২॥০ দান কর। দান ক্রমে বাড়াইতে থাক। বাড়াইতে বাড়াইতে কাঞ্চন মূল্য দান করিতে করিতে কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ হবে। তখন কামিনীকাঞ্চন ত্যাগরূপ যে পূর্ণ গীতা তাহার অর্দ্ধেক আয়ও হবে। শ্রুতি বলেছেন "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশু" এ ত্যাগ শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ হইলেও এই ত্যাগের রাজ সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দান দয়ার অন্তর্গত। চিত্তে দয়ার উদ্রেক না হইলে দানে ইচ্ছা হয় না, তবে আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করেও দান করা হয়। ক্রমে দান ক'রতে ২ দানে রুচি হয়। দান দ্বিবিধ

সৎপাত্রে দান ও অসৎপাত্রে দান। মহাভারতে বলেগেছেন দান পঞ্চবিধ নিমিত্তক। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য। গীতায় স্বাত্তিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ দান বলেগেছেন। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলেছেন (১) শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ (২) শ্রিয়া দেয়ম্ (৩) হ্রিয়া দেয়ম্ (৪) ভিয়া দেয়ম্ (৫) সংবিদা দেয়ম্. মহাভারতে ধর্ম্ম ও কারুণ্য নিমিত্তক যে দান বলেছেন, উপনিষদের সংবিদা দেয়ম্ অর্থাৎ সহানুভূতির সহিত যে দান বলেছেন উভয় একই কথা। কিন্তু গীতার স্বাত্তিক দানের খাঁটি পাত্র পাওয়া কঠিন অর্থাৎ তপস্যা বিদ্যাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান—আজ কাল এরূপ পাত্র মেলা দুস্কর। মহানির্ব্বাণের দরিদ্রসৎক্রিয়ান্বিত ধরে গেছেন এ পাত্র কতক মেলে। এ সূত্রে জাতি বিচার করেন নাই, সৎক্রিয়ান্বিত হলেই গেলো। আজ কালের বাজারে গীতার তামসিক দানের পাত্রই যথেষ্ট—দাতা গৃহীতা উভয় পক্ষেই। অনেকে Socratesর মত অনুসরণ করে বলেন, কুঠে কাণা খোড়াকে দান করতে নেই, কেননা তাহা হলে ভগবানের বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, ভগবান তাহাদের কৃত পাপ কর্ম্মের দরুন সাজা দিয়েছেন, তাহাদের সাহায্য কল্লে দণ্ড বিধানের উদ্দেশ্য বিফল হয়। কারাগার হতে কয়েদীকে বাহির করে আনা যেমন দণ্ডনীয়, অন্ধ প্রভৃতিকে দানও তদ্রূপ দোষণীয়। এটা মনকে প্রতারণা করা মাত্র—না দিবার একটা অছিলা মাত্র। তাঁদের জানা উচিত যে ভগবানের বোধ হয় ইচ্ছা যে অন্ধ কুঠেরা তাঁহাদের হাত তোলা দান পেয়ে জীবিত থাকবে, এটাও দণ্ডের অন্তর্গত। তাঁদেরও দয়া বৃত্তিকে উদ্রিক্ত করে দান করান ভগবানের তাঁদের প্রতি দয়া করা। উপকার শব্দের অর্থ হচ্চে উপ-সমীপে—করোতি নয়তি ইতি উপকার, যে জিনিষ ভগবানের দিকে অগ্রসর করে তাহাই উপকার, দান দাতার দয়া বৃত্তিকে উদ্রিক্ত করে বলিয়া অতি মহৎ। তাই শাস্ত্রে দানের এত মহিমা। তিনি যে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়া রূপেনসংস্থিতা" হয়ে বিরাজ করছেন। দয়া না করাও তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত পাপ জানিবে। ভগবান "দয়া ভূতেষু" গীতায় বলে গেছেন। দয়া বৃত্তির উপেক্ষায় শুধু যে নিজের ভাব শুদ্ধি হবে না তাহা নহে। সামাজিক লৌকিক ব্যবহারের ও ত্রুটি হবে। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র সকলে এক বাক্যে দানের মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন। সেইজন্য নিত্য কিছুনা কিছু দান করা চাই। যদি তোমার আর্থিক অবস্থা হীন হয়—পয়সা টাকা দান করিতে না পার—ত্রিবিধ দানের মধ্যে

অপর তুটিকর। বাচিকদান কর, আশীর্ব্বাদ কর, জীবের কল্যান প্রার্থনা কর, উপদেশ দান কর, কথার দ্বারা উপকার কর, কায়িক দান কর, শরীরের দ্বারা সাহার্য্য কর। ভাগবতে "দয়া" ধর্ম্মের ভগ্ন পাদ বলেছেন, কিন্তু ছিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেন নাই—সুতরাং তপঃ শৌচ ও দয়া বলহীন ভাবে বর্ত্তমান। তন্ত্রে সত্য বলবৎ বলেছেন—অন্য ত্রিপাদ খঞ্জ বলিয়াছেন। একেবারে লোপ হয় নাই। নতুবা এ সকল গ্রন্থে দানের এত মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন কেন? দয়া কারণ দান কার্য্য তাই শাস্ত্রে দয়া শব্দের উল্লেখ বিশেষ ভাবে হইয়াছে, দান দয়ার অন্তর্গত বলিয়া, পৃথক ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। শাস্ত্রের যত রকম পূণ্যকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে দানই শ্রেষ্ঠ।

পরোপকার শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। পরোপকাররূপধর্ম্ম দ্বারাই পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভৃগু বলিয়াছেন দান দুই প্রকার—ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎ পাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখ লাভ হয়। যিনি যেরূপ দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ যশলাভ হয়। ন্যায় পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভূরি দান করা দূরে থাকুক, অতিকষ্টে কাকিনী মাত্র (কড়ি) দান করিলেই মহাযশ লাভ হইয়া থাকে। রাজার বা ধনীর লক্ষমুদ্রাদান ও দরিদ্রের ৫ পয়সা দান তুল্য। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহার সন্তোষার্থ যাহা দান করা যায় সেই দান উৎকৃষ্ট। যাচ্ঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম, আর যাহা অশ্রদ্ধা -অবজ্ঞা সহকারে প্রদত্ত হয় তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। গীতায় যে সাত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে যে ত্রিবিধ দানের কথা বলা হইয়াছে, মহাভারতের দানের কথাও তাই। গোদান, অন্নদান প্রভৃতি বিবিধ দানের বিভিন্ন ২ ফল শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইষ্ট, পূর্ত্ত প্রভৃতি দানের কথা শাস্ত্রে আছে—স্বর্গলাভ এবং আগামী জন্মে সুখ সংক্ষেপ ফলশ্রুতি ইহকালে সুখ্যাতিও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্ররোচনা। যাহাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, তাহারা সুখ্যাতির খাতিরে ভাল কাজ করেন। শুধু যে হিন্দু শাস্ত্রে পরজন্মে দানের ফল ভোগ হয় বলেছেন তাহা নহে "জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত নিজের সমাধি মন্দিরে (epitaph) লিখাইয়াছিলেন what I gave I have, what I had I lost" অর্থাৎ যাহা দান করিয়াছি, তাহা আমার আছে, যাহা রাখিয়া গেলাম, তাহা হারালাম—বা নষ্ট হ'লো। যত প্রকার দান আছে অন্ন দান ও পানীয় দান শ্রেষ্ঠ। অন্য রকম দানের ফল পরকালে যাহা হবার হবে, অন্ন বা জল

দানের ফল প্রত্যক্ষ। ভোজনান্তে বা পানান্তে তাহার পরিতৃপ্তি সূচক "আঃ" শব্দ দাতাকেও তৃপ্তি দান করে। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দানের মহাফল দাতার আত্মতৃপ্তি। ইহাতে দাতার ও গৃহীতার উভয়েরই তৃপ্তি It blesseth him that gives and him that takes শাস্ত্রোক্ত সৎপাত্রে দান লক্ষ্য স্থল থাকিবে বটে কিন্তু দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পীড়িত, আতুর দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও ধনদান কর্ত্তব্য, এ কথা মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়ে লক্ষ্মী ও ইন্দ্রের কথোপকথনে পাওয়া যায়। আমাদের মতেও অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতিকে দান চিত্তশুদ্ধি কারক ও আত্মতৃপ্তি দায়ক বলিয়া মনে হয়। আত্মতৃপ্তিতে দাতার চিত্ত—প্রসাদ উৎপন্ন হয়—স্বাস্থোন্নতি ত হয়ই। আবার "প্রসাদে সর্ব্ব দুঃখানাং হানিস্যোপজায়তে (প্রসন্নচেতসা হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে" বিষ্ণু পুরাণে স্বর্গ ও নরকের সংজ্ঞা করেছেন—মনঃ প্রীতিকর স্বর্গো নরকস্তদবিপর্য্যয়'' যে দান প্রীতির সহিত করা যায়, তাহাতে মন প্রীতি উৎপন্ন হইবে—তাহাই স্বর্গকর। তাহা হইলে প্রেমের সহিত দানে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উন্নতি হয়, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে। প্রেমের সহিত দানে আহার ঔষধ দুইই আছে। বিদ্যার্থীদের অন্ন দান মহা ফলদায়ক, বিশেষতঃ বিদ্যার্থী যদি ব্রাহ্মণ হয়। শাস্ত্রে বিদ্যার্থীদের দানের বিষয় কি বলিতেছেন দেখুন। "কুক্ষৌ তিষ্ঠতি যস্যান্নং বিদ্যাভ্যাসেন জীর্য্যতি। গোত্রাণি তারয়েত্তস্য দশপূর্ব্বান্ দশাবরান্"

"যাবতো গ্রাসতে প্রাণান্ বিদ্বান্ বিপ্রঃ সুসংস্কৃত
অন্ন প্রদস্যাতাবন্তঃ ক্রতবঃ পরিকীর্ত্তিতা" ॥

বিদ্যার্থীদের দানে—দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হয়। (১) দরিদ্রনারায়নের সেবা ব্রাহ্মণের সেবা করা হয় (২) সেই বিদ্যার্থী সময়ে অন্য বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান করিবে, এইরূপে সমাজের সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইবে। এজন্য সকলেরই অল্পবিত্তর চরিত্রবান্ বিদ্যার্থীদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা বিধেয়। তারপর প্রশ্ন বিদ্যার্থীদের শুধু অন্ন সংস্থাপন করিলে চলিবে না, তাহারা বিদ্যার্জ্জন করে কোথায়? চতুষ্পাটীতে। আজকাল আর সস্তাগণ্ডার সময় নহে যে অধ্যাপকেরা ছাত্রের পোষণে সমর্থ। তাঁদের নিজের অন্নসংস্থান হওয়াই দুর্ঘট। পূর্ব্বে অধ্যাপকেরা রাজা প্রভৃতি অনেক ধনি লোকের নিকট বৃত্তি পাইতেন, এখন অধিকাংশ স্থলেই তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে যাজন উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে। অর্থাভাবে ও অবিশ্বাসবশতঃ পূজা শ্রাদ্ধাদি উঠিয়া যাইবার উপক্রম অনেক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। যে সব ব্রাহ্মণ

যাজনবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন বা করেন তাঁহাদের নিজের অসচ্ছল অবস্থার দরুন ছাত্রদের পোষণ করিতে পারেন না। কাজেই বিদ্যার্থীদের সাহায্য যেমন আবশ্যকীয়, তাহাদের আচার্য্যদিগকে সাহায্য করাও তেমনি দরকার, নতুবা একটির অভাবে অন্যটি লোপ পাইবে। সংস্কৃত অধ্যাপক ও ছাত্রের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের উন্নতি অবনতি সাপেক্ষ। নবীনদের সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ও প্রবীনদের দানের বিষয় স্মরণ করাইবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা। নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থে নানাবিধ দান ও তাহার ফলের বিষয় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু একত্রে কয়েকটি সন্নিবেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাঠ অপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ী হইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২নং ধ্রুবেশ্বর লেন, ৺কাশীধাম।

সাধন ধর্ম্ম রক্ষার উপায়।

সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় লিখিত।

এ হতভাগ্য বঙ্গদেশে একমাত্র গার্হস্থ আশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রম আছে, এ সংস্কার আজকাল বিস্মৃতি ও অনভিজ্ঞতার অতলজলে নিমজ্জিত। অন্য জাতির কথা কি বলিব, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণজাতির কথাই বলিতেছি, আজ ব্রাহ্মণসন্তান উপনীত হইয়া ব্রহ্মচারী হয়েন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কোন আশ্রম আছে, ইহা তিনি কখনও কর্ণে শুনিতে পান না, গুরুকুল বাস কাহাকে বলে তাহা তাঁহার আজন্ম অপরিচিত; পিতা পিতামহকে তিনি গৃহস্থ দেখিয়া আসিতেছেন—তিনি জানেন "আমি গৃহস্থের ছেলে গৃহস্থ" এই পর্য্যন্তই আজ বঙ্গদেশের ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যজ্ঞান। তারপর গার্হস্থ, গার্হস্থের মূল বিবাহ, বিবাহ শব্দের ধাত্বর্থ বিশেষরূপে বহন করা, গৃহস্থ অর্থাৎ এ সংসারের বাজারে তিনি কেবল বহনের বলদ। বিবাহের রাত্রিতে শুভক্ষণে সে বহনের মঙ্গলাচরণ হইল, সেই যে প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে চাপিল, আর তাহা নামিল না, সেই বোঝা বহিতে বহিতেই ধরাশয্যায় শয়ন, কর্ম্মফলে সেই বোঝা

বহিতেই আবার জন্মান্তরে দেহ ধারণ। এই বোঝা পিঠে চাপাইয়া দিতে পারিলেই আজ কালকার পিতামাতা মনে করেন, তাঁহাদেয় সন্তানের জন্য কর্ত্তব্যের দায়িত্ব মিটিল, সন্তানও মনে করেন, আজীবন এই বোঝা অকাতরে বহিতে পারিলেই আমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হইল। এই জন্যই আজকাল্‌কার সংসারে সন্তানের ধর্ম্মভাব দেখিলে সর্ব্বপ্রথমে চমকিয়া উঠেন পিতামাতা—যেন হায় কি সর্ব্বনাশই হইল, ছেলেটা একেবারে অধঃপাতে গেল, আশা ভরসা সব ডুবিল। অনেকে মুখেও বলেন—ও যদি এমনই হইল, তবে জন্মমাত্র কেন মরিয়া গেল না? তাহা হইলেও ত এত দুঃখ এত মনস্তাপ হইত না! ব্যাপারটা কি না উপনয়নের পর হইতে প্রত্যহ স্নান করিয়া আসিয়া আহারের পূর্ব্বেই ছেলে ঠাকুরঘরে গিয়া কোশাকুশীতে একটু জল লইয়া প্রায় ১৫ মিনিট বসিয়া সন্ধ্যা করে, (এমন ছেলেও শতকরা দশটি পাওয়া কঠিন)।

ছেলেবেলা হইতে যে ছেলের এই দুর্ম্মতি, সে ছেলের কি আর বাঁচিবার আশা আছে? এই ছেলের প্রতিই পিতামাতার ধর্ম্মশাসন যে—পিতামাতা মহাগুরু, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার, তাঁহাদের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া যে ছেলে সন্ধ্যা আহ্নিক করে, তার কি আবার নরকেও স্থান আছে। ছেলে এ সকল কথায় অবশ্য হৃদয়ে ব্যথা পায়, মুখে কিছু না বলিলেও এই সকল ব্যাঘাত দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ক্রমে সন্ধ্যা আহ্নিকের নামও আর করে না, পিতামাতার ও আর আনন্দের সীমা থাকে না। ছেলে মূর্খ হউক, অক্ষম হউক, দুরাত্মা দুশ্চরিত্র হউক, সেও ভাল তবু যেন সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া অধঃপাতে না যায়। স্নান করিয়া আসিয়া জল খাইয়া স্থির হইয়া ততক্ষণ না হয় একটু গান বাজনা আমোদপ্রমোদ করুক্ সেও ভাল, তবু ত সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া পরকালের পথ নষ্ট হইবে না? সাধক বুঝিবেন—এ পরকাল বিবাহের পর হইতে, আজ কালকার পিতামাতা তাহাকেই পরকাল বলিয়া বুঝেন—আর, কথাও মিথ্যা নহে, যে কদিন না বিবাহ হয়, সেই কদিনই যা কিছু ইহকালের জীবন—তার পরে ত—"যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ"। যাহা তাহার বাঁচিয়া থাকা, তাহাই তাহার মরণ, যাহা তাহার মরণ, তাহাই তাহার বিশ্রাম।

এখন জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণসন্তানের ব্রাহ্মণ পিতামাতার এ সকল সংস্কার আসিল কোথা হইতে? ইহারই মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইলে কথাটি কিন্তু মর্ম্মান্তিক হইয়া পড়িবে। এই সকল পিতামাতা, পিতামাতা বটেন, কিন্তু

ব্রাহ্মণসন্তানের পিতামাতা নহেন ইহা ধ্রুব সত্য। অন্যথা নিজসন্তানের ব্রাহ্মণ বৃত্তি দেখিয়া তাঁহারা চটিবেন কেন? আর আমাদের এই কথাই বা তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক হইবে কেন? সত্য কথা খুলিয়া বলিতে গেলে ইহাই দাঁড়ায় যে, আজ কালকার পিতামাতা ধর্ম্মকে একটা নিতান্তই পোষাকী জিনিস বলিয়া মনে করেন এবং প্রতিদিন বা অষ্টপ্রহর তাহা ব্যবহার করিতে দেখিলেই বুঝিবা ধর্ম্মেরও রং মলিন হইয়া গেল, ছেলেও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল বলিয়া সত্য সত্যই হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান। এইজন্য আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এ ধর্ম্ম কেবল নকল শাটিনের জামা। আবার তাহাও বলি, কেবল পিতামাতার উপরে দোষ চাপালেই চলিবে না, নিজেরও কর্ম্মফল এই সঙ্গে সঙ্গেই দেখিয়া লইতে হইবে। পিতামাতা যদি তাঁহাদিগের নিজ নিজ পিতামাতার নিকটে ধর্ম্মশিক্ষা পাইতেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে চলিতেন, আর সেই অবস্থায় যদি সন্তানের প্রতি এরূপ অযথা—নাস্তিক্য ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই রাগ করিবার, দুঃখ করিবার কথা ছিল। মূলেই যখন বহুশত শতাব্দী হইতে সে সংস্কার উঠিয়া গিয়াছে, তখন এ সকল পিতামাতার উপরে রাগ করিয়া উপায় কি? অধিকাংশ স্থলেই আজ কাল পুত্রের উপনয়ন সময়ে পিতা আচার্য্য গুরু হইয়া থাকেন। এই সকল পিতার তপোবন বা আশ্রম, হয় আপিশ, নয় স্কুল কলেজ অথবা বাজারে বন্দরে দোকান গোলা ইত্যাদি। তাই যেমন গুরুকুলে বাস, তেমনই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা। উপনয়ন সময়ে পুরোহিতের মুখে শুনিয়া এক গায়ত্রী দশবার ভুল করিয়া কষ্টেসৃষ্টে যে রূপে হউক একরূপে তাহার উচ্চারণ করিয়া পিতা সাবিত্রীদীক্ষা প্রদান করিয়া নিজে অব্যাহতি গ্রহণ করেন,তারপর, সেই গায়ত্রী সম্বল করিয়া,ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণকুমারকে সন্ধ্যা শিখিতে হইলে কিছু দিন পূর্ব্বে অবসরক্রমে পুরোহিতের হাতে পায়ে ধরিয়া অথবা গ্রামের মধ্যে ধর্ম্ম-রোগগ্রস্ত কোন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি থাকিলে তাঁহার নিকটে গিয়া সন্ধ্যা শিখিতে হইত। আজ কাল আবার অদৃষ্টক্রমে তাহাও উঠিয়া গিয়াছে, ছেলের যাহা কিছু সন্ধ্যাগায়ত্রীর প্রভাব, তাহা কেবল বটতলার ছাপা পুস্তক পদ্ধতির প্রসাদে। তাই বলিতেছিলাম—ছেলের নিজের জন্মজন্মান্তরের বিশেষ কর্ম্মফল না থাকিলে আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে আসিয়াও এরূপ ব্রাহ্মণের বংশে ও ঔরসে জন্ম হইল কেন? উপনয়নের পর আচার্য্য গুরু পিতাকে সন্ধ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন, **সন্ধ্যা যদি আমাকে শিখাইতে হইবে, তাহা হইলে আর পুরোহিতকে**

রাখা কেন? আমার পিতা পিতামহ কে কবে সন্ধ্যা শিখিয়াছেন বা আমাকে সন্ধ্যা শিখাইয়াছেন যে, সেই নজিরে আমার ছেলেকে সন্ধ্যা শিখাইতেই হইবে? এই ত গেল, আস্তিক সংসারে ধার্ম্মিক পিতামাতার কথা। ইহার পর, আর এক সম্প্রদায়ের সুশিক্ষিত পিতামাতা আছেন, যাঁহারা ৺কালীঘাটে মায়ের নাটমন্দিরে বেলা ৮টার মধ্যে ছেলের উপনয়ন দিয়া, আসিবার সময়ে দণ্ড ও উপবীত দুইই গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া দোকান হইতে খাবার খাওয়াইয়া হ্যাটকোট পরাইয়া গাড়ীতে চড়াইয়া ১০টার মধ্যে ছেলেকে কলেজে পাঠাইয়া তবে বাড়ীতে আসেন। ইহাঁদের কথা আর তুলিবারও প্রয়োজন নাই, বলিবারও প্রয়োজন নাই, কেননা, সেখানে পিতা পুত্রের কোন মতান্তরও নাই, কথান্তরও নাই। অবস্থাগুলি দেখিয়া কেবল সেই প্রাচীন শ্লোকটিই মনে পড়ে —

পিতরৌ ধনলুব্ধৌ চ রাজা খড়্গধরস্তথা।
দেবতা বলি মিচ্ছন্তী কো মে ভ্রাতা ভবিষ্যতি॥

কোন সময়ে কোন দেবতার স্থানে কোন রাজার নরবলি দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তিনি এক দরিদ্র গৃহস্থদম্পতির নিকট হইতে তাহাদের পুত্রটি ক্রয় করিয়া দেবতার সম্মুখে তাহাকে বলি দিতে উদ্যত হইলে বালক তখন দেবতার নিকটে কাঁদিয়া বলিয়াছিল—"মা! আমি বালক, পিতামাতা বালকের রক্ষাকর্ত্তা; আজ সেই পিতামাতা ধনলোভে পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে রাজার নিকটে বিক্রয় করিয়াছেন। পিতা মাতার আশ্রয়হীন হইলে অনাথ শিশু তখন গিয়া রাজার শরণাগত হয়, আমার অদৃষ্টক্রমে সেই প্রজারক্ষক রাজা আজ নিজেই বলিদানে খড়্গ উদ্যত করিয়াছেন। পিতামাতার নিকটে এবং রাজার নিকটেও যখন আত্মরক্ষার উপায় না হয়, তখন মা! জীব কেবল নিখিলরাজরাজেশ্বরী তোমারই শরণাপন্ন হয়; কিন্তু মা! দুঃখের কথা বলিব কি, সেই ত্রৈলোক্যজননী করুণাময়ী তুমিও নাকি আজ আমাকে বলিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তাই বলি মা! আমার রক্ষাকর্ত্তা আর কে হইবে?" প্রবাদ আছে, এই আত্মনিবেদনের পর বালক জগদম্বার প্রসাদে তাঁহারই চরণপ্রান্তে বলিদানের পর তাহার আসন্ন দেবদেহ দেখিতে পাইয়া তখন নিজেই বলিদানের জন্য বলিস্তম্ভে নিজ স্কন্ধ সংস্থাপিত করিয়া দিব্য দেহ লাভ করে।

বর্ত্তমান সমাজের আর্য্যশিক্ষার অবস্থা দেখিয়া আমাদের ও আর্য্যসন্তানের,

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকুমারের এই অবস্থাই মনে হয়। আজকালকার ধনলোভে অন্ধ পিতামাতা দাসত্ববৃত্তির জন্য রাজদ্বারে এইরূপেই নিজ নিজ সন্তান বিক্রয় করিয়া সুখী হয়েন। রাজা বলপূর্ব্বক কাহারও সন্তান গ্রহণ করেন না, পিতামাতা অর্থলোভে নিজেরাই বিক্রয় করেন, অথচ দোষ চাপাইয়া দেন রাজার উপরে। ইংরাজরাজত্বে ইংরাজ কাহাকেও ইংরাজ করিতে চাহেন না; কিন্তু সমাজের পিতামাতা বলেন, রাজভাষায় শিক্ষিত না হইলে, রাজদ্বারে দাসত্ব না করিলে ছেলে বাঁচিবে কি করিয়া? এদিকে কিন্তু নিত্য নূতন লক্ষ লক্ষ দাসত্ববৃত্তি যোগাইতে যোগাইতে রাজার প্রাণ অস্থির, তবুও যত কিছু অপরাধ রাজার। তাহার পর রাজা খড়্গ ধরিয়াছেন—রাজ্য শান্তিবিধানের জন্য, তোমার আমার অনিষ্ট করিবার জন্য বা ধর্ম্মলোপ করিবার জন্য নহে; অধিকন্তু পরস্পর বিরোধে যাহাতে কাহারও ধর্ম্মের ব্যাঘাত না হয়, বরং তাহারই জন্য। পিতামাতা যদি বালককে সেই বলিস্থানে বিক্রয় করেন অর্থাৎ নিজ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পাঠাইয়া দেন, তবে সেখানে ত রাজার শাণিত খড়্গ চিরকালই উদ্যত রহিয়াছে, তাহাতে আর ইংরাজরাজের অপরাধ কি? রাজার দেবোদ্দেশে বলিদানের ইচ্ছা বা সংকল্প হইয়াছিল; কিন্তু অমুকের ছেলেকে বলি দিবেন, এ কথাত তিনি বলেন নাই? অন্য পশুপক্ষীও যেমন ক্রয় করা হয়, বলিদানের জন্য মানবকেও সেইরূপেই ক্রয় করা হইত। এরূপস্থলে রাজাকে খড়্গাধর না বলিয়া প্রকারান্তরে পিতা মাতাকেই বলা উচিত ছিল আর "স্বধর্ম্ম রক্ষা কর" বলিয়া রাজার শরণাপন্নই বা কে কবে হইলেন? হইবেনই বা কোন্ মুখে? যে রাজ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত থাকে, সেই রাজ্যেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য রাজার শরণাপন্ন হইতে হয়। যে রাজার রাজ্যে কাহারও কোন ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত নাই সেখানে শরণাগতি হইবে কিসের জন্য? তুমি সাধ করিয়া ছেলেকে ইংরাজী শিখাইবে, শিখাও তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু রাজার আইনে ত একথা লেখা নাই যে, "আমার রাজ্যে বাস করিতে হইলে তোমার ছেলেকে ইংরাজী শিখিতে হইবেই হইবে।" আবার, না হয় ইংরাজীই শিখিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া উপনয়নের দিনেই পৈতা ফেলিয়া কলেজে আসিতে হইবে, ইহাও ত রাজা বলেন নাই? তবে আর রাজদ্বারে আত্মরক্ষা হইল না, ইহাই বা বলিবার উপায় কি আছে?

ক্রমশঃ

মহর্ষি সংবর্ত্ত কথিত প্রণালী না জানিয়া আমি যাহা যাহা করিতেছি, তাহা আমার নিকট সর্ব্বতোভাবেই বালকের ক্রীড়ার মত প্রতিভাত হইতেছে। ১৬

পূর্ব্বে আমি প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রচুর অন্নাদি দ্বারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের আরাধনা করিয়াছি বটে, কিন্তু মহর্ষি সংবর্ত্তের মুখে আমি শুনিয়াছি—তৎসমুদয়ই অল্প ফলপ্রদ। আমারও (এখন) মনে হইতেছে তাহা বাস্তবিকই অল্প ফলপ্রদ, যেহেতু সর্ব্বপ্রকারে উহা দুঃখই উৎপাদন করে। ১৭—১৮।

অসুখ বা সুখের অভাবকে দুঃখ বলে না, অল্প সুখকেই দুঃখ বলে। যেহেতু সুখের অবসানে দুঃখই গুরুতররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ১৯।

(এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম অল্প সুখপ্রদ বটে, কিন্তু ধারাবাহিক যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলে যদি অল্প সুখকেও ধারাবাহী করা যায়, তাহা হইলেই ত চলে, জ্ঞানের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—)

এই যে কর্ম্মের ফলে অল্প সুখ, ইহাই মাত্র মানুষের চরম লভ্য নহে, ইহা অপেক্ষাও অধিক সুখ-বৈভব আছে। অপিচ কর্ম্মধারা দ্বারা সুখ ধারা লাভ করা গেলেও পুন মৃত্যুর গ্রাস হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? কর্ম্মীর মৃত্যু হইবে না ইহা ত বলা যায় না। ২০।

আমি ভগবতী ত্রিপুরার উপাসনা প্রসঙ্গে যাহা যাহা করিয়াছি তাহাও এই কর্ম্মসমূহেরই মত অল্প ফলপ্রদ, কারণ তাহাও মানস কর্ম্মমাত্র, তাহাও বালকের ক্রীড়ার ন্যায়। ২১

এই যাহা আপনি বলিলেন—তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রের কথিত সাম্প্রদায়িক উপদেশ ভেদে ইহা অপেক্ষা অন্য প্রকারেও করা যাইতে পারে, নিয়ত বা অনিয়ত, সর্ব্বপ্রকারেই ইহার অনুশীলন সম্ভবপর।

শালগ্রাম ও নর্ম্মদাশীলা নর্ম্মদেশ্বরাদি আলম্বনভেদে এই উপাসনা বিবিধ প্রকারে করা যাইতে পারে—অনুভব হয়। সুতরাং ইহা অসত্য ফলযুক্ত কর্ম্মেরই অনুরূপ। ২৩।

মানস বলিয়া উহা স্বরূপতঃ ও অসত্য স্বরূপ। (শ্রুতি বলেন—'নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন' অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পাদিত কৃত্রিম উপায়ে অকৃত-সত্যবস্তু লাভের সম্ভাবনা নাই) সুতরাং তাহা কিরূপে সত্যসম হইবে? (প্রশ্ন হইতে পারে শাস্ত্র ঈশ্বর সংকল্প স্বরূপ, সুতরাং শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের উপরে এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত তদুত্তরে বক্তব্য এই—মানিলাম ঈশ্বর সঙ্কল্পিত শাস্ত্রবিধির উপরে অনুযোগ চলে

না, কিন্তু) নিত্য কর্ত্তব্য এই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি কখনও হইতে পারে না। ২৪।

ভগবন্‌, মহর্ষি সংবর্ত্তকে আমি সর্ব্বাঙ্গ সুশীতলরূপে লক্ষ্য করিলাম। অথচ তিনি কর্ত্তব্য লেশরূপ বিষম বিষজ্বালা হইতে নির্গত হইয়াছেন। (সুতরাং আমার মনে হয়, যথাযথরূপে জ্ঞানলাভ করিলেই অধিকারী কৃতার্থ হয়, কর্ম্ম বা উপাসনা দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্তি অসম্ভব)। ২৫।

(তাহাকে দেখিলে বোধ হয়) তিনি স্বয়ং অভয় পন্থার আশ্রয় লইয়া লোক ব্যবহার সমূহকে যেন উপহাস করিতেছেন। তিনি দাবাগ্নিসঙ্কুল বনে সুশীতল জলনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। ২৬।

সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য বুদ্ধি বিকল হইয়া পড়িয়াছে, এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির বৈকল্যরূপ অমৃত আস্বাদন করিয়া ভগবান্‌ সংবর্ত্ত আনন্দিত। ইনি কিরূপে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, এবং ইনি যাহা আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন গুরুদেব, এতৎ-সমুদয় দয়া করিয়া আপনি আমাকে বলুন। কর্ত্তব্য বুদ্ধিরূপ-কালসর্পের কবলে আমি পতিত, আমাকে মুক্তিদান করুন। ২৭—২৮।

ভার্গব পরশুরাম এইরূপ বলিয়া শ্রীগুরুর চরণদ্বয় মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। অনন্তর দয়ালু স্বভাব ভগবান দত্তাত্রেয় মুক্তিভাজন পরশুরামকে সেইরূপ (আর্ত্ত ও প্রণত) দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। বৎস ভার্গব তুমি ধন্য, যেহেতু তোমার এইরূপ সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। ২৯—৩০।

সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির নিকট পূর্ব্ব পুণ্যফলে যেমন নৌকা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ তুমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন, তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে তোমার নিকট এই সুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। ৩১।

(তুমি বলিতেছিলে কর্ম্ম ও উপাসনা ব্যর্থ, বস্তুতঃ তাহা নহে—) শারীরিক ক্রিয়া (কর্ম্ম) ও মানসিক ক্রিয়া (উপাসনা) সমূহে এই পরিমাণ সুকৃতি (অর্থাৎ সুবুদ্ধি প্রাপ্তি) তোমার ঘটিয়াছে। এই সুকৃতির ফলেই বিশ্বজীবের হৃদয়াকাশরূপিণী ভগবতী ত্রিপুরা দেবী জীবকে পরম পাবন মোক্ষপদে আরোহণ করাইয়া থাকেন॥ ৩২।

ভগবতী ত্রিপুরাদেবী তাঁহার অনন্য শরণ ভক্তের হৃদয়ে এই (সুবুদ্ধি) রূপে পরিণত হইয়া তাহাকে শীঘ্র মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। ৩৩।

মানবগণ যে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যরূপ বেতাল হইতে দৃঢ়রূপে ভীতিপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎকাল, সর্ব্বদা বেতালাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সুখলাভ করিতে পারে না। ৩৪।

করাল গরল জ্বালায় যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, তাহার ন্যায় কর্ত্তব্য-রূপ কালসর্পদষ্ট মানবগণের কোন অবস্থাতেই সুখ হইতে পারে না। ৩৫।

এই জগৎ কর্ত্তব্যরূপ বিষের সংসর্গে মূর্চ্ছিত ও অন্ধীভূত হইয়া নিজের হিতকর কার্য্য কি তাহা বুঝিতে পারে না। ৩৬।

পুনরায় অন্যথাচরণ করে, পুনরায় মোহপ্রাপ্ত হয়, এই সংসার এইরূপেই কর্ত্তব্যের বিষ মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। ৩৭।

জীব অনাদিকাল হইতে ভয়ানক বিষসাগরে পড়িয়া দগ্ধ হইতেছে।

তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন কতকগুলি পথিক বিন্ধ্য নামক মহাপর্ব্বতে উপস্থিত হইবার পরে ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বনে বহু ফল দেখিতে পাইয়াছিল, তিলুক ( ) ফল বোধে 'বিষমুষ্টি' ফল ভক্ষণ করিয়াছিল, ক্ষুধায় তাহাদের রসনা এমনই বিকৃত হইয়াছিল, যে তাহারা ভক্ষণকালে উহা 'বিষমুষ্টি' ফল বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। অনন্তর 'বিষমুষ্টি' ফলের বিষজ্বালায় তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ জ্বলিতে লাগিল, তাহারা যাতনায় অত্যন্ত পীড়িত ও অন্ধপ্রায় হইয়া তখনও বুঝিতে পারিল না যে তাহারা 'বিষমুষ্টি' ফল ভক্ষণ করিয়াছে। প্রত্যুত তাহারা তিলুক ফল সেবনে শরীরে জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে, মনে করিয়া সেই বিষের জ্বালা উপশমের উপায় অনুসন্ধান করিতে করিতে ধুস্তুর (ধুতুরা) ফল প্রাপ্ত হইল, ভ্রমবশতঃ উহা জম্বীর (জামির) মনে করিয়া সকলে উহা ভক্ষণ করিল। ৩৮—৪২।

অনন্তর তখন তাহারা উন্মত্ত হইল, ক্রমে পথভ্রষ্ট দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া অতি গহন নিম্নভূমিতে পতিত হইল, কণ্টকে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইল, কাহারও বাহু কাহারও উরু, কাহারও পদদেশ ভগ্ন হইল, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে নিন্দা করিতে করিতে ভীষণ কলহ আরম্ভ করিল। ৪৩—৪৪।

তাহারা পরস্পর মুষ্টি শিলা ও কাষ্ঠ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল, এইরূপে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইবার পরে তাহারা কোন পুরের নিকটবর্ত্তী হইল। ৪৫।

পুরের দ্বারপালগণ তাহাদিগকে পুরী প্রবেশে প্রতিরোধ করিলে তাহারা দেশকালোচিত কর্ত্তব্যে অনভিজ্ঞতা বশতঃ অতিমাত্র কলহ আরম্ভ করিয়া দিল। অনন্তর দ্বারপালগণ যখন তাহাদিগকে গুরুতর প্রহার করিল, তখন তাহারা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ পরিখায় পতিত হইয়া পরিখাস্থিত মকরের গ্রাসে প্রাণত্যাগ করিল, কেহ গর্ত্তে, কেহ কূপে পতিত হইয়া প্রাণ

বিসর্জ্জন করিল; আবার কেহ জীবিত অবস্থায়ই ধরা পড়িয়া দ্বারপালগণের হস্তে নিহত হইল।

লোক এইরূপে স্ব স্ব হিতাভিলাষে কর্ত্তব্যের বিষ মূর্চ্ছায় উৎকট ও বিস্ময়কররূপে মূর্চ্ছিত হইয়া জ্ঞানান্ধ হইয়া থাকে, এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪৭—৫০।

ভার্গব, তুমি ধন্য, কেন না তুমি অভ্যুদয় লাভ করিয়াছ। বিচারই সকল উন্নতির প্রথম সোপান, এবং এই বিচারই সকল অভ্যুদয়ের মূল। ৫১।

ভার্গব, তুমি সম্যকরূপে ইহা জানিও যে—পরম শ্রেয়োরূপ মহাসৌধে আরোহণ করিতে হইলে সুবিচার ভিন্ন কাহারও কল্যাণ লাভ হইতে পারে না॥ ৫২।

অবিচারই পরম মৃত্যু, লোক অবিচার দ্বারাই নিহত হয়। বিমৃষ্যকারীর জয় সর্ব্বত্র, কারণ সর্ব্বত্রই সে অভীষ্ট লাভ করে॥ ৫৩।

দৈত্য ও রাক্ষসগণ সর্ব্বত্র অবিচারেই নিহত হইয়াছে। আর বিচার-পরায়ণ দেবতাগণ সর্ব্বত্র সুখভাগী হইয়াছেন। ৫৪।

(দেবগণ) বিচারপূর্ব্বক বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে জয় করিয়াছেন। বিচারই সুখরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর জননশক্তি বিশিষ্ট বীজ। ৫৫।

বিচার দ্বারাই মানব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিচারের মহিমায়ই ব্রহ্মা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ভগবান্ হরি বিচার মাহাত্ম্যেই পূজিত হইয়া থাকেন।

মঙ্গলময় মহেশ্বর বিচারের ফলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন। ভগবান্ রামচন্দ্র অতি বুদ্ধিমান হইয়াও অবিচারেই (সুবর্ণ) মৃগে আসক্ত হইয়া অতি বিপন্ন হন, এবং বিচারের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করিয়া রাক্ষসগণ সমাকীর্ণ লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাও অবিচারবশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া অভিমানের ফলে শিরশ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা তোমার অবিদিত নাই। ৫৯।

ভগবান্ মহাদেবও অবিচারে অসুরকে বরদান করিয়া নিজে ভস্মীভূত হইবার ভয়ে পলায়ণপর হইয়াছিলেন। ৬০

ভগবান্ বিষ্ণুও অবিচারে ভৃগুপত্নীকে বিনাশ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অভিসম্পাতে অত্যন্ত দুঃসহ পরম দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬১।

এইরূপ অন্যান্য দেবতা, অসুর, রাক্ষস মনুষ্য ও মৃগগণ অবিচারবশতঃই বিপন্ন হইয়া থাকে। ৬২।

হে ভার্গব, এই সংসারে তাঁহারাই মহাভাগ ও ধীরজন, যাঁহারা কোন অবস্থায়ই বিচারহীন হন না। আমি তাঁহাদিগকে নিরন্তর প্রণাম করি। ৬৩।

অবিচারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুশীলন করিলে মানব সর্ব্বতোভাবে মোহপ্রাপ্ত হয়। আর বিচার পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে মনুষ্য সকল অপার সঙ্কটে মুক্ত হইয়া থাকে। ৬৪।

এইরূপে বহুকাল হইতে এই অবিচার মনুষ্য-হৃদয়ে সংবদ্ধ হইয়া আছে। যাহার যতদিন অবিচার থাকে, ততদিন তাহার কিরূপে বিচার উৎপন্ন হইতে পারে। ৬৫।

গ্রীষ্মের ভয়ানক সূর্য্যকিরণ সন্তপ্ত মরুভূমিতে শীতল জলের সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী অবিচারের জ্বালামালায় যাহার হৃদয় পরিব্যাপ্ত, তথায় বিনা সাধনায় বিচারের শীতলস্পর্শ কিরূপে সম্ভবপর?

এই বিষয়ে সর্ব্বহৃদয়বিহারিণী পরম দেবতার পরম করুণাই একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা। এই কৃপা ভিন্ন কাহার কি প্রকারে মহাশ্রেয়োলাভ হইতে পারে। ৬৮।

বিচার-সূর্য্যই অবিচারান্ধ জনগণের মহান্ধকার বিনাশে সমর্থ। ভক্তিপূর্ব্বক উপাস্য দেবতার আরাধনাই এই বিচারের মূল। ৬৯।

পরম দেবতা যখন আরাধনার ফলে প্রসন্ন হন, তখন তিনিই আকাশে সূর্য্যের ন্যায় চিত্তাকাশে বিচার-রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। ৭০।

অতএব সদ্‌গুরুর সাহায্যে (দীক্ষিত হইয়া) ক্রমে সর্ব্বহৃদয়বাসিনী নিজাত্মরূপিনী চিন্ময়ী মঙ্গলময়ী শ্রীমহেশ্বরী সেই পরমেশ্বরী ত্রিপুরাকে অকপট মনে আরাধনা করিবে। নির্ম্মল শ্রদ্ধা ও ভক্তিই আরাধনার মূল। ৭১—৭২।

মাহাত্ম্য শ্রবণ, ভক্তি ও শ্রদ্ধার মূল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে রাম, অতএব প্রথমতঃ তোমার জন্য ত্রিপুরা মাহাত্ম্যই শ্রবণ করাইতেছি। ৭৩।

তাহা শুনিলে এখনই তুমি কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে। যেহেতু বিচারই সকল কল্যাণের মূল, অতএব বিচারের উদয় পর্য্যন্তই অবিচাররূপ আত্ম দোষগ্রস্ত ব্যক্তির প্রত্যহই মহত্তর ভয় বর্ত্তমান থাকে। ৭৪—৭৫।

যেমন সন্নিপাতগ্রস্ত ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিলেও বায়ু পিত্ত কফরূপ ধাতুত্রয়ের অশুদ্ধি যাবৎ থাকে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত মহাভয় থাকে, সেইরূপ। ৭৬।

পরম আত্মবিচার লাভ করিলেই মনুষ্যের জীবন সফল হয়। যে সকল জন্মে মনুষ্যগণের মোক্ষ সাধন বিচারের উদয় না হয়, সে সকল জন্মরূপ বৃক্ষ বিফল—বন্ধ্য। সেই জন্মবৃক্ষই সফল, যাহাতে বিচারের উদয় হইয়া থাকে। ৭৭—৭৮।

যে সকল মনুষ্য বিচার বর্জ্জিত, তাহারা কূপমণ্ডুকসদৃশ। যেমন কূপসমুৎপন্ন ভেক শুভ বা অশুভ কিছুই জানেনা, কেবল কূপে উৎপন্ন হইয়া কূপেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডকূপে বৃথা উৎপন্ন মানবগণও কোনও অবস্থায়ই নিজ আত্মার শুভ ও অশুভ কিছুই জানেনা, কেবল পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া তাহারা বিনাশ যাতনাই অনুভব করে; নিজের হিত ইহারা বুঝিতে পারে না। ৭৯—৮১।

ইহারা অবিচারের ফলে দুঃখজনক কার্য্যকে সুখজনক বলিয়া মনে করে, সুখজনক কার্য্যকে দুঃখজনক বলিয়া মনে করে, ফলে সংসারানলে দগ্ধ হয়। ৮২।

দুঃখজনক কার্য্য দ্বারা ক্লেশ অনুভব করিয়াও কোনও প্রকারেই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। যেমন শত শত পদাঘাতে তাড়িত হইয়াও মহা গর্দ্দভ গর্দ্দভীর অনুগমনে বিরত হয় না, সেইরূপ সহস্র ক্লেশ অনুভব করিয়াও জীব সংসারের অনুরাগ পরিত্যাগ করেনা।

পরন্তু রাম! তুমি বিচার পরায়ণ, তুমি দুঃখের পরপারে চলিয়াছ।

ইতি ত্রিপুরা রহস্যের জ্ঞানখণ্ডে
বিচার মাহাত্ম্য নামক
দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পূর্ণ।

ইহাতে অঙ্গের কোন্ স্থান আর বিকৃত হইবে না। এইরূপে ভিতরে মায়ের নাম করিয়া করিয়া মনকে বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিতে হইবে আর বাহিরের কোন কিছুই যেন ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে এবং মনের মধ্যেও আর যেন কোন অসম্বন্ধ প্রলাপ না উঠে। দেহ ও মন মায়ের নামে যখন শুদ্ধ হইল তখন এমন স্থানে থাকিতে হইবে যেখানে আর পেষিত হইবার ভয় থাকিবে না। "প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" হইয়া নির্ভয় স্থিতিই ইহা। স্বরূপের নিকটে থাকিয়া স্বরূপে স্থিতি যখন হইবে তখন তিনিও যখন যাহা করিবেন সেই সঙ্গে সাধকের তাহাই হইয়া যাইবে অথচ কিছুতেই আর "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" এই অভিমান থাকিবে না। ভক্তের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি"—আহা! ইহাই ত শেষ কথা।

উপসংহারে বলিতে ইচ্ছা করে অহংটাই মানুষের প্রবল শ । আমি সব বুঝিয়াছি মনে করা অপেক্ষা দম্ভ অহংকার বুঝি আর নাই। যদি ঠিক ঠিক চণ্ডী পাঠ হইত তবে ত চণ্ডী কথিত গুণ গুলি দেহে প্রকাশ পাইত। তাহা যখন হয় নাই তখন দীনের দীন হইয়া মায়ের কৃপালাভ জন্য যতটুকু পারা যায় আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করা ভিন্ন অন্য উপায় আর কি আছে ?

মা! সত্য সত্য "মা" বলিতে তুমি শিখাইয়া না দিলে আমার "মা" বলা বুঝি মৌখিক হইয়া যায়। যদি সত্য সত্য "মা" বলা হইত তবে ত চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় আর বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পারিত না। যে চক্ষু মায়ের রূপ দেখিতে ব্যাকুল, যে কর্ণ মায়ের শ্রীমুখের কথা শুনিতে লালায়িত, যে নাসিকা মায়ের অঙ্গ গন্ধ আঘ্রাণে ত ব্র ইচ্ছা করে—সে চক্ষু কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় আর কি বাহিরের রূপে, শব্দে, গন্ধে আকৃষ্ট হইতে পারে ? আর যে মন স্বরূপ চিন্তায় রস অনুভব করে সে মন কি আর কল্পনার কোলাহলে রস পাইবে, না সে আবার অসম্বন্ধ প্রলাপে ব্যথিত হইবে ?

এই সমস্ত হয় নাই বলিয়াই ত চণ্ডীপাঠ আবশ্যক—চণ্ডী পূজা

বিধি পূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া চণ্ডীপাঠে প্রযত্ন করা পুনঃপুনঃ আবশ্যক। হইবেই নিশ্চয়—যখন মাতা উপযুক্ত মনে করিবেন। মেধা ঋষি যদি কিঞ্চিৎ কৃপা করেন, তবে মায়ের রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ—ঋষি যেমন যেমন অনুভব করিয়া বলিতেছেন, সেইরূপে সরস ভাবে প্রাণকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য ভগবতীর ভক্ত। চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে ভক্তের কৃপা হয় ত এক দিন অনুভবে আসিতে পারে। তখন আর অপ্রাপ্য কি রহিল? সেই জন্যই এই চেষ্টা। সকল ভক্ত সহ মাতার চরণ ধূলি শিরে ধরিয়া—সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া—যাহাতে মায়ের আজ্ঞা পালন করিয়া ধন্য হইয়া যাইতে পারি—সেই আশীর্ব্বাদ সকলের নিকট প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ।

২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।
শুক্লা দ্বাদশী ১৩৩৬।

দেবী কবচম্ ।

"জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ"

চণ্ডীপাঠ করিতে যাইতেছ (আপনাকে আপনি বলা হইতেছে) ভিতরে বাহিরে একটু পবিত্র হইয়া লও। জগতে একমাত্র পূর্ণ পবিত্র বস্তু হইতেছেন এই চিচ্ছক্তি ভুবনেশ্বরী—ইনিই জগন্মাতা, জগদম্বা। মানুষের পবিত্র করিবার বস্তু তিনটি—শরীর, মন ও বাক্য। মানুষকে শরীর, মন ও বাক্যে পবিত্র হইতে হইবে। কবচ দিয়া শরীর, অর্গল দিয়া মন এবং কীলক দিয়া বাক্য পবিত্র কর।

"কবচং দেবতাগাত্রম্। পটলং দেবতাশিরঃ॥" যাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হয় তাহাদিগের অঙ্গরক্ষা যাহাতে হয় তাহাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কবচকে অঙ্গরক্ষা (অঙ্গ রাখা) সাঁজোয়া বা বর্ম্মও বলা হয়। তোমার কবচ হইতেছে দেবতার গাত্র। সর্ব্বাঙ্গ দেবতাকে অর্পণ করিয়া দেবতার শরীরকেই নিজ শরীর ভাবনা কর। এইজন্য কবচ দ্বারা অঙ্গ আবৃত কর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নাম ও নামী অভিন্ন। দেবতার নাম করিয়া সর্ব্ব অঙ্গের সর্ব্বস্থান রক্ষার ভার তাঁহাকেই অর্পণ কর। মা! তুমিই আমার সাঁজোয়া হও। সর্ব্ব অঙ্গে তোমার নাম করিয়া রক্ষা ভার তোমাকেই প্রদান করিতেছি। ইহাতে কি হয়?

অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রু মধ্যগতা রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্ত্তঃ শরণং গতাঃ॥
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখ ভয়ঙ্করীম্॥

অগ্নি মধ্যেই পড় বা যুদ্ধে শত্রুর মধ্যেই পড়, বিষম দুর্গম স্থানে ভয়ে আর্ত্ত হইয়া যদি জগজ্জননীর শরণ লও—যাহারা এইরূপ করে রণসঙ্কটেও তাহাদের কোন অশুভ হয় না—শোকদুঃখ ভয়ঙ্করী আপদ ও তাহাদিগকে দেখিতে হয় না।

সংসারটা ত যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। এখানে শত শত শত্রু ভিতরে বাহিরে। সকলেই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তোমাকে বধ করিতে ফিরিতেছে। ভিতরে কাম ক্রোধাদি—বাহিরেও ভোগে অদম্য পিপাসা। এক কথায় বলিতে গেলে কামই তোমার বিষম শত্রু। তোমার দেহের

তিন স্থানে এই দুরাসদ শক্র অভেদ্য দুর্গ-স্থাপন করিয়া তোমাকে যাতনা দিতেছে। "জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥" ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিন স্থানে এই শক্র প্রবল দুর্গ স্থাপন করিয়া রহিয়াছে। বাহিরেও শত শত মূর্ত্তি ধরিয়া এই শক্র নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তোমাকে বিপদ হইতে বিপদান্তরে পাতিত করিতেছে। তাই জগতে চিরদিন হাহাকারই উঠিতেছে। চণ্ডী এই রণসঙ্কটে পরিত্রাণ জন্য তোমাকে কবচ করিতে বলিতেছেন। সর্ব্বস্থান রক্ষার জন্য মায়ের উপর ভার দাও বিশ্বাস করিয়া ভক্তিভাবে এই ভার দিতে হইবে। শেষে বল—

রক্ষাহীনন্তু যৎস্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।
তৎসর্ব্বংরক্ষমে দেবি দুর্গে দুর্গাপহারিণি॥

বর্ম্ম দিয়া ঢাকা যায় না। দেহের এমন স্থান সকলও জগজ্জননি দুর্গতি হারিণি তুমি রক্ষা কর। কবচের একস্থানে বলা হইয়াছে—

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দেবী তুষ্টা ভবেৎ তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ॥

শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্র হইয়া, শুদ্ধ হইয়া, সংযত হইয়া, নিয়ম যুক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যায় যিনি ইহা পাঠ করেন দেবী তাঁহার উপর প্রসন্ন হন, তুষ্ট হন, আর ত্রৈলোক্যে কোন শক্রর দ্বারা তাঁহার পরাজয় হয় না।

"জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ"

চণ্ডীপাঠের প্রথমেই কবচ পাঠ করিতে হয়। সংসার রণসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য গীতা শাস্ত্রে বহু সাধনার কথা বলা হইয়াছে; চণ্ডী শুধু পাঠের কথা বলিতেছেন—পাঠ কর, বিশ্বাস করিয়া ভক্তিভরে পাঠ কর—নিত্যকর্ম্ম যথাসাধ্য কর,আর চণ্ডীপাঠ কর। মা-ই তোমার সকল সাধনা করিয়া দিবেন—মাতা ত এইরূপই—মায়ের স্বভাবই ত এই। ক্ষণস্থায়ী ভিন্ন কোন কিছুই ত পাইলে না—এই জ্বালায় হৃদয়কে কাতর করিয়া বালক হইয়া যাও, বালকের মত কাঁদিলেই মা ছুটিয়া আসেন রক্ষা করিতে—অভাব দূর করিতে। বালক হইবার প্রার্থনা করিতে করিতে মায়ের শরণাপন্ন হও—এমন

আশ্রয় সকলের আছে, তবে জীবের ক্লেশ কেন হইবে ? আর অবিশ্বাস করিও না—বিশ্বাস কর—মা আছেন—সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে দুঃখ দূর করিবার জন্য মা আছেন—এস আমরা নির্ভয় হইয়া যাই।

কখন নির্ভয় হইবে জান ? যখন "মহামায়া প্রসাদেন লভতে পরমং স্থানং"—যখন মহামায়া প্রসন্ন হইয়া সেই পরম স্থানে লইয়া যাইবেন, তখন "শিবেন সমতাং ব্রজেৎ"—শিবের সমান না হওয়া পর্য্যন্ত—চৈতন্য দেখিয়া চৈতন্য ভজিয়া চৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রান্তি নাই। দেবী কবচের শেষ কিন্তু এই "শিবেন সমতাং ব্রজেৎ" ॥

দেবী কবচম্।

অস্য শ্রীদেবী কবচস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চামুণ্ডা দেবতা অঙ্গন্যস্তা দেব্যঃ সায়ুধা মাতরো বীজম্। দিগ্‌বন্ধদেবতাস্তত্ত্বম্। দেবী প্রীত্যর্থং সপ্তশতী পাঠাঙ্গ জপে বিনিয়োগঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদ্‌গুহ্যং পরমং লোকে সর্ব্বরক্ষাকরং নৃণাম্।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

লোকে ইহজগতি যৎ পরমং উৎকৃষ্টং গুহ্যং রহস্যমস্তি হে পিতামহ তৎ মে ব্রূহি। তৎ কিং ব্রহ্মরূপং ? নেত্যাহ। সর্ব্বরক্ষাকরং যেন সর্ব্বেষামেব রক্ষা ভবতি। সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদেন রক্ষাকরং কবচমিত্যর্থঃ। লোকে বর্ম্মণঃ সর্ব্বতনুত্রত্বদর্শনাৎ। নৃণাং পামর প্রভৃতী না মপি তাদৃশমিত্যর্থঃ। ব্রহ্ম তু উত্তমাধিকারিণামেব রক্ষকং ন সর্ব্বেষামিত্যর্থঃ। নন্বু সন্ত্যন্যানি কবচানি লোকে ইতি চেৎ সত্যং সন্তি তথাপি যত্তবতা কস্যচিৎ কস্যাপি নাখ্যাতং নিধিবুদ্ধ্যা স্থাপিতমস্তি তদিত্যর্থ। তেন চ নিঃসংশয়মেব রক্ষণং ঝটিতি স্যাদিতি ভাবঃ। অন্যথা নিধিবুদ্ধ্যা তস্য রক্ষণং নিরর্থকং স্যাদিতি। নন্বু কিমিত্যুৎকৃষ্টং বস্তু ময়া দেয়মিতি চেৎতত্রাহ। হে পিতামহ স্ব-সন্ততিরক্ষণার্থং পিতামহেনাবশ্যং দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ দুর্গাপ্রদীপ।

প্রশ্ন—কবচাদি প্রথমেই পাঠ করিতে হয় কেন ?

উত্তর—সপ্তশতী ষড়ঙ্গযুক্তা। অঙ্গহানী করিয়া সপ্তশতী পাঠে শাপগ্রস্ত হইতে হয় এবং পদেপদে হানীও অবশ্যম্ভাবী। মহাভারতের ভাষ্যকার শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ শূরীর দুর্গাপ্রদীপে কাত্যায়নী তন্ত্র হইতে ধৃত হইয়াছে—

ব্রহ্মোবাচ।

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্ব্বভূতোপকারকম্।
দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মহামুনে॥ ২

হে বিপ্র! ত্বয়া যৎপৃষ্টং তাদৃশং দেব্যাস্তু দেব্যা এব কবচং পুণ্যম্ একং নিধিবুদ্ধ্যা স্থাপিতমস্তি তন্মহামুনে শৃণুষ্ব। সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তত্বাৎ মহামুনে ইতি সম্বোধনম্॥ ২

অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
অঙ্গষট্‌ক বিহীনাতু তথা সপ্তশতী স্তুতিঃ॥
তস্মাদেতৎ পঠিত্বেব জপেৎ সপ্তশতীং পরাম্।
অন্যথা শাপমাপ্নোতি হানীঞ্চৈব পদে পদে॥
রাবণাদ্যাঃ স্তোত্রমেতদঙ্গহীনং সিষেবিরে।
হতো রামেণ তে যস্মানাঙ্গহীনং পঠেত্ততঃ॥

রাবণাদি অঙ্গহীন করিয়া সপ্তশতী পাঠ করাইয়াছিলেন সেই জন্য রাম কর্ত্তৃক নিহত হন। এইজন্য সপ্তশতী অঙ্গহীন করিয়া পাঠ করিবে না।

প্রশ্ন—ষড়্ অঙ্গ কি কি?

উত্তর—কবচ, অর্গল, কীলক এবং রহস্যত্রয়। কাত্যায়নী তন্ত্রে কবচাদি ত্রয়—রহস্যত্রয় রূপাঙ্গ ষট্‌ক যুক্তস্যৈব সপ্তশতী স্তোত্রস্য পঠনীয়ত্বং শ্রূয়তে। তৎপ্রামাণ্যাচ্চ কবচাদি ত্রয়ং রহস্যত্রয়ঞ্চ তন্ত্রান্তরস্থমেবাঙ্গং ভবতি।

প্রশ্ন—এই কবচের শ্রোতা কে? বক্তাই বা কে?

উত্তর—গুপ্তবতী টীকায় ভাস্কর রায় বলিতেছেন "ব্রহ্মা মার্কণ্ডেয়ং প্রতি ব্যক্তি। মার্কণ্ডেয়স্তু ক্রৌষ্টুকিং ভাগুরিং প্রতি বক্তীতি; পক্ষি রূপৈর্দ্রোণ মুনিপুত্রৈ জৈমিনি মুনিং প্রত্যুবাচ ইতি সংবাদস্থিতিঃ।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি সম্পাদিত

দেহতত্ত্ব

দেহী সকলেই অথচ দেহের আভ্যন্তরিক খবর কয় জনে রাখেন? আশ্চর্য্য যে, আমরা জগতের কত তত্ত্ব নিত্য আহরণ করিতেছি, অথচ যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল করিয়া থাকি, সেই দশেন্দ্রিয়ময় শরীর সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। দেহের অধীশ্বর হইয়াও আমরা দেহ সম্বন্ধে এত অজ্ঞান যে, সামান্য সর্দ্দি কাসি বা আভ্যন্তরিক কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলেই, ভয়ে অস্থির হইয়া দুই বেলা ডাক্তারের নিকট ছুটাছুটি করি।

শরীর সম্বন্ধে সকল রহস্য যদি অল্প কথায় সরল ভাষায় জানিতে চান, যদি দেহ যন্ত্রের অত্যদ্ভুত গঠন ও পরিচালন-কৌশল সম্বন্ধে একটি নিখুঁৎ উজ্জ্বল ধারণা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি সম্পাদিত "দেহ তত্ত্ব" ক্রয় করিয়া পড়ুন এবং বাড়ীর সকলকে পড়িতে দেন।

ইহার মধ্যে—কঙ্কাল কথা, পেশী-প্রসঙ্গ, হৃদ্-যন্ত্র ও রক্তাধার সমূহ, মস্তিষ্ক ও গ্রীবা, নাড়ী-তন্ত্র মস্তিষ্ক, সহস্রার পদ্ম, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির সংস্থান এবং উহাদের বিশিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি—শত শত চিত্র দ্বারা গল্পচ্ছলে ঠাকুরমার কথন নিপুণতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা মহাভারতের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ, উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ইহা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের এবং গ্রাম্য চিকিৎসকবৃন্দ-বান্ধবের, নিত্য সহচর হউক।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে—(৪১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা মূল্য মাত্র ২৸৵০ আনা, ডাঃ মাঃ পৃথক।

শিশু-পালন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত, ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আকারে, বহু চিত্র সম্বলিত হইয়া সুন্দর কার্ডবোর্ডে বাঁধাই, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা; মূল্য নাম মাত্র এক টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

"উৎসবের" নিয়মাবলী

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২৪শ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল। [৮ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষ্মণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৪শ বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল। { ৮ম সংখ্যা

মানবের ভারতীয় উন্নতি।

জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করাই মানব জীবনের উন্নতি। প্রতি জীবনেই সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রাম হইতেছে পুরাতন কর্ম্মের সহিত নূতন কর্ম্মের সংগ্রাম। মানুষের পুরাতন কর্ম্ম মানুষকে এক পথে টানিতেছে, মানুষ কিন্তু করিতে চায় আর কিছু।

মানুষের মধ্যে অনাদিসঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার আছে। এই কর্ম্মই মানুষের প্রকৃতি। মানুষ কিন্তু আদর্শ পথেই চলিতে চায়। সকল মানুষের মধ্যেই কি জানি কিসের যেন আদর্শ আছে। মানুষ মনের মত করিয়া যখন কর্ম্ম করিতে না পারে, তখন বলিয়া উঠে—কি করিব ভাবিলাম আর কি হইয়া গেল? এই যে কি হইয়া গেল ইহা করাইলেন প্রকৃতি—অনাদি (সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার। আর কি করিব ভাবিলাম ইহা) আদর্শ সেবকের উক্তি। আদর্শ-উক্তি শাস্ত্র ধরিয়াছেন এবং তাহার পরিপুষ্টি কিরূপে করিতে হয় শাস্ত্র তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। গুরু শাস্ত্র পথ দেখাইয়া দেন—শাস্ত্রমত কর্ম্ম ধরাইয়া দিয়া থাকেন—ইহাই নূতন কর্ম্ম।

বলিতেছি নূতন কর্ম্মের সহিত পুরাতন কর্ম্মের যে সংগ্রাম তাহাই জীবন সংগ্রাম। যাঁহারা নূতন কর্ম্ম মানেন না—তাঁহারা স্বভাববাদী। ইহার অনাদিসঞ্চিত পুরাতন কর্ম্ম যে দিকে চালায় সেইদিকে চলেন এবং নূতন

কর্ম্মের পথ প্রদর্শক শাস্ত্রও গুরু মানেন না বলিয়া নূতন কর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করেন না। গুরু ও শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে মানুষ গণ্ডীর মধ্যে প্রথমে আবদ্ধ হইলেও মনের ব্যভিচারবন্ধন খুলিবার জন্যই এই বন্ধন লইতে হয়। মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়িয়া দিলে ইহা বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে পড়িয়া অশেষ যাতনা ভোগ করে, আর গুরু ও শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে মনকে তুলিতে পারিলে ইহা ঈশ্বরমুখী হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইয়া ঈশ্বরে বা স্বরূপেই স্থিতি লাভ করে।

শাস্ত্র ও গুরু নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকেই আমরা নূতন কর্ম্ম বলিতেছি। এই কর্ম্ম দিয়াই মনকে অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত করা যায়। ইহা যিনি করিতে পারেন তিনিই জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া জীবন সফল করিতে পারেন।

শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ত অনেক প্রকারের। শাস্ত্র কি এমন কর্ম্ম কিছু উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সকল প্রকার সাধকের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে? পারে। বলিতেছি। এই নূতন কর্ম্ম আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধ অবতারিত হইয়াছে।

এই নূতন কর্ম্ম যাঁহারা অভ্যাস করিতে যাইবেন তাঁহাদের শরীর শুদ্ধি ও মনঃ শুদ্ধির জন্য আরও কিছু করা আবশ্যক। শরীরের জড়তা দূর করাই শরীর শুদ্ধি। ইহার জন্যই স্নান বিধি। স্নানও বহুপ্রকারের। যাঁহারা প্রাতঃস্নানে অসমর্থ তাঁহাদের জন্য মার্জ্জন স্নানও উল্লেখ করা হইয়াছে। এ প্রবন্ধে এই সমস্ত আলোচনা করা অনাবশ্যক। তাহার পর আচার। ইহাও মনঃ শুদ্ধির জন্য। "আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ আচার হীনান্ ন পুনন্তি বেদাঃ"। আচার ধর্ম্মের প্রথম সোপান। আচার যাঁহারা মানেন না, বেদও তাঁহাদিগকে শুদ্ধ করিতে পারেন না। স্বয়ং শ্রুতি আজ্ঞা করিতেছেন— আচারং গ্রাহয়তি—অথবা যান্যস্মাকং সুচরিতাণি তাপি ত্বয়ো পাস্যানি। নো ইতরাণি। তৈত্তিরীয় ১১ অনুবাহ ২।৩। আবার আচারের মধ্যে মেধ্যা মেধ্য আহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। শ্রুতি এখানেও বলিতেছেন "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ। সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"॥ ছান্দোগ্য। এসম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা হইবে না। স্নান, আচার, আহার যে নূতন কর্ম্ম অনুরাগের সহিত অভ্যাস করিবার জন্য আবশ্যক আমরা এই প্রবন্ধে সেই নূতন কর্ম্মের কথাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে যাইতেছি। যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহাদের জন্য সর্ব্বাগ্রে সন্ধ্যা

বন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম প্রথমেই আবশ্যক। তাহার পরে সকল প্রকার সাধকের জন্য যে নূতন কর্ম্ম, পুরাতন কর্ম্ম সংস্কারের ঘাতক, তাহা হইতেছে জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার। ইহার মধ্যেই কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত এবং জ্ঞানীর সমস্ত সাধনার কথা বলা হইয়াছে। জপ, ধ্যান ও আত্ম বিচারের কথা গুরু মুখে ও শাস্ত্র মুখে অবগত হইয়া যাঁহার যাহাতে অনুরাগ লাগে তিনি সেইটিকে মুখ্য করিয়া অন্য সাধনা সমস্তই প্রত্যহ আলোচনা করিবেন, এই জন্য জপ, ধ্যান ও আত্মবিচারের সাধনার সমকালে আবশ্যক. ইহাই ঋষিগণের উপদেশ। শাস্ত্র বলিতেছেন "জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাচ্ছ্রান্ত পুনর্জপেৎ জপধ্যান পরিশ্রান্তঃ আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ।" কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানী--সকল প্রকার সাধকের জন্য এই মিশ্রপথ।

প্রথমেই আমরা জপের কথা আলোচনা করিতেছি। জপ উত্তমরূপে করিতে হইলে ধ্যানের সহিত জপ করা আবশ্যক। ধ্যান সহ যে জপ তাহাতে নাম বা নামীর স্বরূপ চিন্তা, নাম বা নামী যে স্থাবর, জঙ্গম, দ্যাবা, অন্তরীক্ষ সর্ব্বব্যাপী তাহার চিন্তা, নাম বা নামী যে সকলের মধ্যে আত্মারূপে আছেন তাহার চিন্তা এবং নাম বা নামী যে মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার লীলা করেন তাহার রূপ, গুণ ও লীলা চিন্তা করিতে হয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় জপের সঙ্গে নাম বা নামীর নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার ভাব চিন্তা করিয়া লইয়া জপ করা আবশ্যক।

জপের দ্বিতীয় চিন্তা হইতেছে শাস্ত্র চিন্তা করিয়া জপ করা। তত্ত্ব চিন্তায় যেমন নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতারের ভাবনা করিতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্রচিন্তায় অশোচ্য বিশয়ে শোক করা হইতেছে কি না এবং কোন শাস্ত্র এই অশোচ্য বিষয়ের শোক মন হইতে দূর করিবার জন্য কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া মন হইতে অন্য ভাবনা দূর করিয়া জপ করা। মানুষ যে শোক করে তাহা কেন করে? শোক কি আত্মার জন্য করে, না দেহের জন্য করে, না দেহ হইতে আত্মা ছাড়িয়া যাইবেন সেই দুঃখে করে—গীতা শাস্ত্রে এইগুলি দেখান হইয়াছে, আবার চণ্ডীতে মহামায়া নিম্নতরঙ্গে জীবকে মোহে আচ্ছন্ন করেন, আবার ঊর্দ্ধ তরঙ্গে মোক্ষ প্রদান করেন—মহামায়ার এই স্বভাব আলোচনা করিয়া জপ করিতে হয়। সকল শাস্ত্রে এই সত্য ও মিথ্যার বিচার আছে—এবং বিচারই যে দীর্ঘ সংসার রোগের ঔষধ কিরূপে তাহাও দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জপের তৃতীয় চিন্তা হইতেছে মন্ত্র চিন্তা। ইহাতে গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপে সেই ত্রিকোণ মণ্ডলস্থিত দেবতাতে অথবা সহস্রার ও দ্বাদশ দলের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণে—গুরুপাদপদ্মে মনকে লগ্ন করিতে হয় তচ্চিন্তা করিতে হয়।

জপের চতুর্থ চিন্তা হইতেছে তীর্থ চিন্তা। অবতার হইয়া ভগবান কোন স্থানে কেন কোন লীলা করিয়াছেন চিন্তা করিতে করিতে জপ। নিপুণ ভাবে দেখিলে জপের ব্যাপারটি ভাল করিয়া করিতে পারিলে ধ্যান ইহার সঙ্গেই আছে।

কিন্তু জপে ও ধ্যানে চিত্ত শুদ্ধি মাত্র হয়। এই জন্য শেষ কথা আত্ম বিচার।

আত্ম বিচারে আছে আমি কে ও জগৎ কি ইহার বিচার। আমি আত্মা আর জগৎ আত্মার উপরে মায়ার কল্পনা। এই বিচারে মিথ্যা জগৎ চিন্তাকে অজস্র অনাস্থা একদিকে করিতে করিতে বৈরাগ্য অভ্যাস ও দ্বিতীয় দিকে আত্মার সম্বন্ধে অজস্র শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করা। এই বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা জ্ঞান লাভ হইবেই। এই জন্য জপ ধ্যান ও আত্মবিচারকে অবলম্বন করিয়া যিনি সাধন করিতে পারেন, তিনিই পুরাতন কর্ম্মকে পরাস্ত করিয়া নূতন কর্ম্ম করিতে করিতে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া জীবন সফল করিতে পারেন। ইতি

এই প্রবন্ধে সাধনার কথা যাহা বলা হইল তাহার প্রয়োগ কিরূপে করিতে হয় তাহা বলিয়াই উপসংহার করা যাইতেছে।

প্রথমে আসনে—স্থির আসনে উপবেশন করিয়া মনের সংবাদ লইতে হয়। মনটা যদি কোন প্রকার শোক করে তবে তাহাকে শোক ছাড়াইবার জন্য প্রথমেই বিচার করান হউক্; আমি যদি দেহ হই তবে বহু জনের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকে বলিয়া আমার শোকের কারণ অনেক। কিন্তু আমিত দেহ নই—আমি আত্ম। এক আত্মাই জ্যোতির্ম্ময়রূপে জগৎ সাজিয়া আছেন—এবং জগতের সকল বস্তুর ভিতরে আছেন। যেমন আকাশে সূর্য্যকে বৃক্ষপত্রের অন্তরাল দিয়া দেখিলে শত সহস্র রশ্মির বিচ্ছুরিত ক্ষুদ্রাকৃতি জ্যোতিস্ময় বস্তু দেখায়, কিন্তু সকল মানুষই পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই এক সূর্য্যকেই দেখে, আর ব্রাহ্মণগণ সেই খণ্ডমত আত্মসূর্য্যকে অখণ্ড জগৎব্যাপীরূপে দেখিবার জন্য তাঁহাকে গায়ত্রী মন্ত্রে সর্ব্বব্যাপীরূপে দেখিবার সাধনা করেন, অর্থাৎ খণ্ডভাবে

যিনি নিজের মধ্যে অনুভূত হয়েন তাঁহাকে অখণ্ডভাবে দেখিয়া স্বরূপ স্থিতির জন্য পুনঃ পুনঃ প্রতিদিন যত্ন করেন সেইরূপে অন্ততঃ বিশ্বাসেও আমি আত্মা—এই আত্মাই জগৎব্যাপী—এই আত্মার কোন শোক তাপ নাই, জনন মরণ নাই, ইনিই একমাত্র সত্য বস্তু আর সমস্ত মিথ্যা হইয়াও তাঁহারই উপরে ভাসে বলিয়া সত্যমত বোধ হইতেছে—আত্মার এই স্বরূপটি প্রথমেই চিন্তা করিয়া লইতে হয়; পরে তাঁহারই আজ্ঞাপালনে তাঁহার নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া লইতে হয়; ভাবিয়া লইতে হয় শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তিই আমার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ধারণ করেন, আবার আমাকে সমস্ত স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য গুরু মূর্ত্তি ধারণ করেন, এই ভাবে অনুগ্রহ ভাবনা করিয়া যখন মনের মধ্যে স্থির করা যায় আমি আত্মা আমার কোন শোক নাই, কোন সম্বন্ধ নাই, কোন অভাব নাই—এই ভাবে অন্য সমস্ত চিন্তা অগ্রাহ্য করিতে করিতে মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া শুধু নামীর নামটিতে মনকে ভরিয়া ফেলিবার জন্য কিছুক্ষণ ধরিয়া জ্যোতির নাম দেখিতে দেখিতে জপ করিতে হয়—ইহা হইলেই মন সুস্থ হইয়া শুভ কর্ম্মে প্রস্তুত হয়।

ইহার পরে জপের দ্বিতীয় কর্ম্মে ভাবনা করিয়া লইতে হয়, এক অখণ্ড নাম সর্ব্বত্র সমভাবে চিৎস্বরূপে বিদ্যমান—আর কিছুই নাই—ইনিই আছেন, ইনিই সত্য বস্তু। যখন নাম আপনি আপনি আছেন তখন সৃষ্টি নাই। পরে নামের ভিতরে যখন শক্তির স্পন্দন হইতে আরম্ভ হয় তখন এই নামই বহু আকারে আকারিত হইয়া জগৎরূপে সাজিয়া উঠেন। এই ভাবে নির্গুণ যিনি তিনি আপন শক্তি স্পন্দনে জগদাকার ধারণ করেন। পরে ইনিই প্রতি বস্তুর মধ্যে আত্মারূপে প্রবেশ করেন। শেষে ইনিই জগতের অধর্ম্ম উদয়ে ধর্ম্মভাবে জগৎটাকে লইয়া যাইবার জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া আপনি আচরণ করিয়া লীলা করেন এবং ধর্ম্মের বিঘ্ন দূর করিয়া মানুষকে স্বধর্ম্মে তুলিয়া দিয়া যান। এইভাবে অবতারের জন্মহইতে সমস্ত লীলার কথা যখন যেটা ভাবনা কর তাহাতেই হৃদয় আত্মার ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। ধ্যানের অর্থই চিন্তা। ঈশ্বর চিন্তাতেও ধ্যান হয়, আবার রূপ, গুণ ও লীলার চিন্তাতেও ধ্যান হয়। এইভাবে ধ্যানের সহিত জপ করিয়া জপ ও ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে আমি কি এবং জগৎ কি ইহার ভাবনা করিয়া করিয়া আত্মবিচার করিতে হয়। বিচারেই সংসার নিবৃত্তি হয়, জপ ও ধ্যানে মন বিচার করিবার পরে আইসে মাত্র। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে স্থায়ীভাবে বিচার আইসে না। "দীর্ঘ সংসার

রোগস্য বিচারোহি মহৌষধম্" জানিয়া একদিকে জগৎচিন্তা উঠিয়া অজস্র অনাস্থা এবং অন্যদিকে শুধু সত্য নাম লইয়া অর্থের সহিত অজস্র নাম করা ইহাই কার্য্য। ইহাই ঋষিগণের প্রদর্শিত পথ। এখন যার যা ইচ্ছা কর অথবা না কর আর মর। ইতি

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

১৩৩৬ কার্ত্তিক অমাবস্যা-কালীপূজা-মধুপুর।

এখানে সঙ্গী কেহ নাই—যাঁহারা আছেন তাঁহারা কথা কহেন না—একেবারে চলন শূন্য অবস্থায় সেই "অনেজদেকং"কে ছুঁইয়া থাকিতে হয় কিরূপে সর্ব্বদা যেন তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন আর ভিতরে ভিতরে কথা কহিয়া যেন বলিতেছেন আমাদের মত শুদ্ধই থাক আর দেখ আমরা যেমন যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হই কিন্তু স্পন্দন থামিলেই—প্রকৃতি তুফান না তুলিলেই আবার যে স্পন্দন রহিত সেই স্পন্দন রহিত স্বভাবেই ফিরিয়া যাই, তুমিও সেইরূপ সমস্ত স্পন্দন আমাদের স্মরণে মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া আমাদের মত হইয়া নিরন্তর থাকিতে যত্ন কর। এই যত্নে সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা কর। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে দুই একজন ভাগ্যবান এই যত্নসিদ্ধিতে লাগিয়া থাকে—যাঁহারা এই যত্নসিদ্ধি লাভ করেন তাঁহাদের সহস্রের মধ্যেও ক্বচিৎ দুই একজন সেই জ্ঞানস্বরূপ আনন্দ স্বরূপ নিত্য বিদ্যমানকে সমস্ত তত্ত্বের সহিত জানিতে পারেনা। হইবে আমাদের মত? যদি হইতে চাও তবে পরম সত্য যিনি তাঁহাকে শাস্ত্র ও গুরু সাহায্যে কিছুও ধারণা কর, করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে করিতে তাঁহারই আজ্ঞাপালনে—কোন লাভ অলাভের হিসাব না রাখিয়া, কোন সুখ দুঃখের খতিয়ান না করিয়া শুধু তাঁহার প্রসন্নতার অনুভব জন্য তাঁহার আজ্ঞা পালনে যত্নকর আর যত্নসিদ্ধিতে প্রাণপণ কর—যত্নসিদ্ধিকে জীবনের ব্রত করিয়া জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইতে থাক; বুঝিলে?

এখন পরম সত্যের কথা কিছু শ্রবণ কর। প্রধান ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করিতে শিক্ষা কর। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পরেই পদ্মাসনে বসিয়া ভাবনা কর।

প্রাতঃস্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিদ্ সুখং পরমহংস গতিং তুরীয়ম্।
যৎস্বপ্ন জাগর সুষুপ্তিমবৈতি নিত্যং
তৎব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূত সংঙ্ঘঃ॥

প্রাতঃকালে হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে বা সহস্রার দ্বাদশদল মধ্যবর্ত্তী অগ্নি সূর্য্য চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত ত্রিকোণমণ্ডলস্থিত আত্মতত্ত্ব স্বরূপ গুরুপাদুকা ভাবনা কর। বৃক্ষপত্রের অন্তরাল হইতে অবলোকন করিয়া যে সূর্য্যকে সূক্ষ্মসূক্ষ্ম জ্যোতি সহস্র রশ্মিপরিবেষ্টিত অপূর্ব্বরূপে দেখা যায় সেইরূপে আত্মতত্ত্বকে দেখিতে থাক। যখন নাভিদেশে ইহাকে উদিত হইতে ভাবনা করিবে তখন "কেতব উদ্বহন্তি" সেই জাতবেদাকে এই রশ্মিরাশি অধোমুখ সহস্রার তলে ও উর্দ্ধমুখ দ্বাদশের কর্ণিকারে তুলিয়া ধরিয়াছেন—তুমি দেখিবে বলিয়া।

একদিন ইহা চিন্তা করিয়া মনে করিও না ইহা পুরাতন হইয়া গেল। এই চিন্তা নিত্য নূতন থাকিবে যখন ভাবনা করিবে এই আত্মতত্ত্বই প্রতিদিন জগতে প্রতিদিন স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি অবস্থা আনয়ন করেন। ভাবনা কর দেখি তোমার আমার সমস্ত প্রাণিজড়িত এই ব্রহ্মাণ্ডের এই জাগ্রৎ—স্বপ্ন—সুষুপ্তি অবস্থা প্রতিদিন আসিতেছে কিরূপে? আহা! যাঁহার উপরে এই জাগ্রৎ—স্বপ্ন—সুষুপ্তির খেলা হইতেছে সেই অতি রমণীয় দর্শন, মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, বচোভিরাম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষই এই আত্মতত্ত্ব। ইনিই পরম সত্য। আর যেমন মানুষের আত্মার উপরে মন খেলা করে সেইরূপে জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি লইয়া যে ৺কালী শিববক্ষে নিরন্তর নাচিতেছেন—যাঁহার নাচনই এই জগতের স্থিতি ভঙ্গ জন্মরূপ খেলা—এই কালীকে—এই শক্তিকে শিবোন্মুখী কর—ইহারই জন্য হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বংকে নিত্য ভাবনা কর—আর কালীকে—মনকে বলাও তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূত সংঙ্ঘঃ। পারিবে এই চিন্তা করিতে পারিবে? প্রাতঃকালে প্রথমেই মনের মধ্যে এই প্রবাহ তুলিতে—

অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোক ভাক্ সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান্॥ অথবা অহং দেবী ইত্যাদি।

এই ভাবনার প্রবাহ যদি না হৃদয়ে বহাইতে পার তবে তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। তুমি পার না কেন জান? বহুমেঘ মালা তোমার ঐ জ্যোতির্মণ্ডিত আত্মসূর্য্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে—"আমি আছি" এই অপরোক্ষানুভূতিতে ইহা কিছু প্রকাশ হইতেছে বটে কিন্তু মেঘমালার আঁধারে তেমন করিয়া দেখা যাইতেছে না। মেঘপটল সরাও—চিত্তশুদ্ধ কর—অহম্ভাবনা দূর কর—যাঁহার প্রকাশে জগৎ উদ্ভাসিত তিনিই পরম সত্য। এই পরম সত্যটী অখণ্ড। অহম্ভাবই হইতেছে ইহার খণ্ডভাব—ইহার আবরণ। আর জগতে যাহা কিছু দেখ, তাহা সেই সত্য বস্তুর উপরে ভাসিয়া মিথ্যা হইয়াও সত্য মত বোধ হইতেছে। এই মিথ্যা সরানই কার্য্য। তুমি ত যত্ন করিবেই, কিন্তু তোমার যত্ন কিছুতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞাপালনে তুমি কর্ম্ম কর বা নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর। কর্ম্ম আর কিছুর জন্য করিও না—কোন সুখ পাইবার আশায় করিও না, কোন দুঃখ বর্জ্জনের জন্য করিও না, কোন লাভের আশায় করিও না—শুধু সে বলিয়াছে বলিয়া আদর করিয়া ভালবাসিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ জন্য আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্ম করিয়া যাও, এই কর্ম্ম দ্বারা তোমার মন আর তরঙ্গ তুলিতে পারিবে না—তোমার মন তোমার শবকে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া শিবরূপেই "অনেজদেকং" স্বরূপে স্থিতি লাভ করিবে। ভগবানকে ভালবাস—আর কোন কিছুকে ভালবাসিও না—এই ভালবাসা যেখানে আজ্ঞাপালন হয় না—সেখানে বিষয় ভোগের জন্য ভালবাসা বা কাম হইতেছে জানিয়া "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" করিয়া সংসারের পারে চলিয়া যাও। ইতি ৺কালীপূজায় নির্জ্জন সঙ্গীদের উপদেশ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

১৩৩৬ কার্ত্তিক—প্রার্থনা।—জগদ্ধাত্রী পূজার প্রভাতে—মধুপুরে।

দয়াময়! এই যে একদিন ভাল লাগা, পরদিন না লাগা ইহাকে তুমি একটু পরিবর্দ্ধিত করিয়া দাও। যে দিন তোমায় ডাকিতে ভাল লাগিল, সে দিন তুমি আমার ভিতরে এমন একটু কিছু করিয়া দিলে তাহাতে আমার মনে হইতে লাগিল প্রতি স্থূলের কোলে কোলে যেন তোমার খেলা আছে, তোমার হস্তের প্রকাশ আছে। বৃক্ষ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আমি দেখি তাহাতে তোমার প্রকাশের খেলা। শ্রুতি যে বলিতেছেন "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" এ যেন অতি সত্য কথা। স্থির কোন কিছুকে স্পর্শ করিতে না পারিলে কেহ স্থির হইতে পারে না। জগতে সর্ব্বব্যাপী বিরাট চৈতন্য পুরুষই ত একমাত্র স্থির। জগতের অপর সকল বস্তুই গতিশীল। সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন তুমি অনেজদেকং"। এজ্ ধাতুর অর্থ কম্পন। এক মাত্র তুমিই সমস্ত চলন রহিত—অতি স্থির—অতি শান্ত। আজ বৃক্ষ যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা যেন তোমাকে ছুঁইয়া। মানুষ যে স্থির হয় সেও কিন্তু মানুষের সদা চঞ্চল মন তোমাতে লগ্ন হইলে হয়। সেই জন্য বলা হয় গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্। সেই কর্ত্তিত ত্রিভুজের ভিতরে অথবা নিম্নমুখ সহস্রারের তলে ও উর্দ্ধমুখ দ্বাদশ দল পদ্মের কন্দলিত শূন্যস্থানের ত্রিকোণ মণ্ডলে যে আর একটি জ্যোতির্ম্ময় পাদপীঠ তাহাতে সেই সুন্দর চরণ যুগল রক্ষা করিয়া যে গুরু উপবিষ্ঠ আছেন, যে চরণ সম্বন্ধে বলা হয় "যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্যে নিষেদুঃ "যে চরণ সম্বন্ধে বলা হয় "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" সেই গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে যাহার মন লগ্ন হইল না তবে আর তার জপ পূজায় কি হইল? সেই চৈতন্য চরণকে মন দিয়া স্পর্শ করিলেই বুঝি সব স্থির হইয়া যায় নতুবা চৈতন্য ভিন্ন সকল বস্তুই স্বভাবতঃ চঞ্চল। বৃক্ষ দেখিয়া তোমার প্রকাশ যখন মনে হয়, ফুল দেখিয়া তোমার হাসি যখন মনে হয়, ছোট ফুল তোলা হইল না দেখিয়া যখন ফুল কথা কহিয়া বলে আমি ছোট বলিয়া তুমি বুঝি আমায় দেব সেবায় লাগাইলে না, পাখী চিচি কুচী করে লোকে দেখে কিন্তু তুমি কিছু জাগাইয়া দিলে মনে হয় পাখীর চিচিকুচীর

ভিতরে তোমার আদর—তোমার কথা যেন কতই আছে ; এই যে এই বনভূমির নিস্তব্ধতা—ইহার ভিতরে তুমি যেন অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছ তুমি কত শান্ত, তুমি কত আনন্দময় ; যখন সারা বিশ্বে, সমস্ত স্থূল বস্তুর অন্তরালে কি এক প্রকাশের প্রকাশ হয় তখন যাহা দেখা যায় তাহাই যেন তুমি, এই অবস্থা যদি নিত্য থাকে তবেই নিত্য সত্ত্বস্থ থাকা হয়—ইহা লক্ষ্য করিয়া সখাকে ভগবান্ বলিতেছেন নিত্যসত্ত্বস্থ তুমি থাক—সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুকে বস্তুর আকারে দেখিও না, আমার প্রকাশে প্রকাশিত দেখ, সকল বস্তু দেখিয়া, সকল মানুষ দেখিয়া সুন্দর কুৎসিৎ, সদ্ অসৎ, সু কু সব দেখিয়া, সব আর দেখিও না—দেখ আমার খেলা—এই অবস্থা সর্ব্বদা রাখ তোমার ভয় আর থাকিবে না—আমাকে সর্ব্বদা লইয়া রহিলে ভয় আর কোথায় থাকিবে ? এই জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে এই যে জবা বিল্বদলে শেফালি পুষ্পে দুর্ব্বামিয়াইয়া গঙ্গাজল সহ যে অর্ঘ্য দিতেছ, এযে সেই চরণেই পৌঁছিল ইহা কি আরও বলিয়া দিতে হইবে ? যদি না পৌঁছিত তবে কি এই আনন্দ আসিত ? আর সেই আশীর্ব্বাদ—সেই যে মা যেন বলিতেছেন—তা যে মুখ দিয়াই বলুন—সেই যে বলিতেছেন তুমি সর্ব্বদা প্রতি ভাবনায়, লোক সঙ্গে প্রতি বাক্যে এবং লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্ম্মে আমাকে লইয়াই থাক—আমার স্মরণে সব কর, সব বল, সব ভাব—এই যে তাঁর আশীর্ব্বাদ, এ আশীর্ব্বাদ কি তোমার তরে জীবন্ত হয় না ? হয়—নিশ্চয়ই হয়—বিশ্বাস রাখ মাই তোমার—তোমার সংসার শেষ করিয়া তোমার অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া নিত্য তাঁহারই কাছে রাখিবেন। বল দেখি এই দেহ বদল করিয়া যখন তুমি তাঁর রাজ্যে যাইবে তখন কি আর তোমার একদিন ভাল লাগা, একদিন মন্দ লাগা থাকিবে ? তাঁর রাজ্যে যে সব জীবন্ত, সব চৈতন্য, সব ভাল, সব প্রকাশ। সেখানে সে যে তার সকল বস্তুতে সর্ব্বদা দেখা দেয়, যেখানে সেখানে যে সেই ভাসে ; সেখানে যে সেই তাকে ভুলিতে দেয় না ; ভুলার অভিনয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া দেয়— এই যে আমি, দেখ যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা স্থূল ইন্দ্রিয় যাহা দেখাইয়া দিতেছে তাহাই নহে—সবই আমি—বাহিরের আবরণ মাখিয়া—বাহিরের সাজ পোষাক পরিয়া নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি ধরিয়া আমিই তোমার সঙ্গে খেলা করি। তোমাকে আনন্দ দিবার জন্যই আমার এই খেলা। আজ ১৩১৬ কার্ত্তিক জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে তুমি যে প্রার্থনা জাগাইলে তাহা যেন আর না ভুল হয়—এই

পূজার দিনের আশীর্ব্বাদ—ভাবনায়, বাক্যে ও কর্ম্মে যেন তোমার সঙ্গেই আছি—এই আশীর্ব্বাদ যেন ক্ষণকালের জন্যও ভুল না হয়। ইহার জন্য এই প্রার্থনা লিখিয়া রাখা।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

মন্ত্রোচ্চারণ।

কোন এক ব্রাহ্মণ মরনের অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে পূর্ণজ্ঞানে তাঁহার তৎকালের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলেন "তুমি কখনও কাহার মরণ কালে উপস্থিত থাক নাই, আমার মরণ কাল সমুপস্থিত, তুমি আমার বামকর্ণে ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম এই কয়েকটী কথা বলিতে আরম্ভ কর।" পিতৃ আজ্ঞানুসারে আসন্নমৃত্যু পিতার বাম কর্ণে পুত্র ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন ও অপরাপর পুত্রেরাও আত্মীয়গণ তাঁহার সহিত সমস্বরে কিঞ্চিৎ অবন্তরে থাকিয়া ঐ কথা কয়েকটি বলিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুর এক মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "তুমিও উহাদের সহিত যোগ দাও"। সুতরাং তিনিও ঐ বাক্যগুলি অর্থাৎ "ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" বলিতে আরম্ভ করেন। এমত সময়ে তিনি পত্নীকে বলেন "তুমি স্ত্রীলোক তোমাকে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে নাই, তুমি বল, নম গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম"। আজ্ঞা যথাযথ প্রতি পালিত হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ শিক্ষিত হইলেও আসন্ন মৃত্যু পিতা বামকর্ণে কেন যে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে আদেশ দিলেন ও স্ত্রীজাতিকে কেন যে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে নাই তাহা পুত্র জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু তদবধি তাঁহার ঐ তত্ত্ব অবগত হইবার বাসনা অন্তরে অন্তরে সঞ্চিত থাকে, পরে ঐ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্র কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাই নিম্নে সঙ্কুচিত চিত্তে নিবেদিত হইল।

বেদ যে অপৌরুষেয় তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তবে কোন কোন মতানুসারে পঞ্চবক্ত্র, দেবাদিদেব মহাদেব বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে চারি অংশে বিভক্ত করেন ও তাঁহার চারি মুখ হইতে চতুর্ব্বেদের অর্থ বুঝাইয়া দেন ও পঞ্চম মুখ হইতে যাহা

প্রকাশ করেন তাহাই তন্ত্র শাস্ত্র। এই তন্ত্রশাস্ত্র ৫৬ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ২৮ খানি তন্ত্রে প্রকাশিত মতবেদের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল,অপর ২৮খানিতে প্রকাশিত মত বেদের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। প্রথম ২৮ খানিকে আগম ও দ্বিতীয় ২৮ খানিকে নিগম বলা হয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমরা বলিব যে বেদ ও তন্ত্র একই শাস্ত্র। উহাদের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ যে বেদের দুর্ব্বোধ্য মহাবাক্য সকল সহজ ও বোধগম্য ভাষায় মহাদেব ও পার্ব্বতী কৌশলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণের হিতার্থে যুগান্তরে বা সত্যাদি যুগের পরে যখন মানবগণের পরমার্থিক জ্ঞান যুগধর্ম্মে হ্রাস ও লোপ হইতে আরম্ভ হয় ও বেদোক্ত-মন্ত্রসকল বীর্য্য রহিত হইয়া পড়ে তখন এই ভারত ভুমিখণ্ডের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। কোন্ পন্থা অবলম্বনে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য উপায়ে কলিযুগে মানবের দৈহিক শক্তি, সর্ব্বপ্রকারের সুখ, শান্তি, রোগমুক্তি, লাভ হয় এবং চির প্রার্থিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রাপ্তি বা আত্মার উন্নতি হয় তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তন্ত্র শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। (১) সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্র (২) সাধন ধর্ম্ম শাস্ত্র। অ, আ, ক, খ, প্রভৃতি পঞ্চাশৎ বর্ণসকল এক প্রকার শব্দ শক্তি। জিহ্বামুল, দন্ত, নাসিকা, আদি অষ্টস্থান হইতে উহাদের উৎপত্তিকালে জীবের অন্তরে এক প্রকার কার্য্য করে। এক একটি বর্ণে এক একটি দেবতার আকার ও বিভূতি সন্নিবিষ্ট আছে। বর্ণের সমষ্টি হইতে মন্ত্রের সৃষ্টি। সুতরাং মন্ত্রোচ্চারণে জীবের দেহে ও মনে অতি অদ্ভুতভাবে কার্য্য করে, এবং বিশেষ বিশেষ দেবতার আকারের ও বিভূতির পূর্ণ বিকাশ হয়, এমন কি জীবের সংসার বন্ধন ছেদন করে। (১) মন্ত্রসকল চারি ভাগে বিভক্ত। যথা (১) সিদ্ধ (২) সাধ্য (৩) সুসিদ্ধ (৪) অরি। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীগণের তন্ত্র শাস্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বীজ মন্ত্র। অর্থাৎ দেবী অন্নপূর্ণার বীজ মন্ত্র হ্রীং আর দেবী লক্ষ্মীর বীজমন্ত্র শ্রীং। এদিকে দেবী অন্নপূর্ণার বীজমন্ত্রও যাহা, দেবী অন্নপূর্ণাও তাহা। লক্ষ্মী দেবীর বীজমন্ত্র যাহা লক্ষ্মী দেবীও তাহা। বীজমন্ত্রগুলিই দেবী ও দেবতা-

---

(১) মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণাং সংসার বন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধো মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ॥

গণের স্বরূপ। বীজমন্ত্র জপের পূর্ব্বে জপকারীর আপনাপন ইষ্টদেবতার বা বীজমন্ত্রের স্বরূপ দেবতার আকার মনে ধ্যান করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ দেবতাকে মনে মনে চিন্তা করিয়া মানসচক্ষে সেই আকার দর্শন করিয়া বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই মন্ত্রজপের আশু ফল প্রাপ্তি হয়। (যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যা চ দেবতা। চিন্তয়িত্বা তদাকারং মনসা জপমাচরেৎ) সকল বীজমন্ত্র গুলিই হয় বেদোক্ত না হয় তন্ত্রোক্ত অথবা উভয় মতোক্ত। এই সকল বীজমন্ত্র আর ওঙ্কার মহামন্ত্র স্বতন্ত্র। এক একটি বীজমন্ত্রের উচ্চারণ সম্বন্ধে যে সকল বিধি আছে ওঙ্কার মহামন্ত্র উচ্চরণ সম্বন্ধে ঐ সকল বিধি প্রযোজ্য নহে। অর্থাৎ ওঙ্কার মহামন্ত্র উচ্চারণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধি। বীজমন্ত্রগুলি বংশ পরম্পরা ক্রমে সাধিত হয়। এক একটী বীজমন্ত্রের এক এক বংশে সাধনা হইয়া থাকে। সেই বীজমন্ত্রে আমি দীক্ষিত যে বীজমন্ত্রে আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ ইত্যাদি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পুরুষপুরুষানুক্রমে যে মন্ত্র সাধিত হইয়াছে, সেই বংশে সেই মন্ত্র অধিক বা আশুফলপ্রদ। ঐ বীজমন্ত্র কেবলমাত্র বংশের দীক্ষা গুরু অবগত থাকেন, অপর কেহই তাহা অবগত থাকেন না। ঐ বীজমন্ত্র বংশগত অতুল সম্পত্তি। যদি জন্মে দোষ না থাকে এবং সদ্‌গুরুদত্ত মন্ত্র শক্তি, শিষ্য যথাযথ গ্রহণ করিতে ও সাধনা করিতে সক্ষম হইয়া থাকে এবং ঐ শক্তির পরে অপচয় না হয়, তাহা হইলে শিষ্যের বংশের চিরসাধিত মন্ত্রে যে অমোঘ ফল প্রাপ্তি হয়, বা সাধক যে সিদ্ধ (২) হন তাহা বিজ্ঞান সম্মত, যেমন কোন উৎকট রোগের বীজ দেহে প্রবেশ করিলে সেই রোগবীজ বংশের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উহার ফলভোগ হয়, সেই প্রকার গুরুদত্ত মন্ত্র শক্তি বংশে বহুকাল পর্য্যন্ত সঞ্চিত বা জাগ্রত থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে প্রকার (অমোঘ বচনং শান্তো বেদ বেদাঙ্গ পারগঃ) গুরু নাই, সে প্রকার (আস্তিকে দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরো মন্ত্রে চ দৈবতে) শিষ্যও নাই। প্রকৃত দাতা ও প্রকৃত গৃহিতা দুইএরই অভাব। যিনি প্রকৃত গুরু, তিনি পিতা বা মাতাপেক্ষাও বড় (ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা। পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমং। গুরু শুশ্রূষায়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥)। যিনি প্রকৃত শিষ্য তিনি মাতা ও গুরুকে শুশ্রূষায় সদারত থাকেন। প্রকৃত গুরুপদবাচ্য হওয়াও অতি কঠিন। প্রকৃত গুরুর দায়িত্ব অতি অধিক। শিষ্যকে মন্ত্রদান করিয়া তাঁহার পুঁজি কমিয়া যায়,অর্থাৎ আমার তপোবলে সঞ্চিত শক্তি হ্রাস হইয়া যায় ও তিনি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দীপ্তিহীন বা নিগু‍র্ন হইয়া পড়েন। যেমন সর্প কোন জীবকে

দংশন করার পরে বীর্য্যহীন হইয়া সে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, গুরুও তদভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। বহু আয়াসে, বহু জপের ফলে, বহুসাধনায়, তাঁহার পুনরায় পূর্ব্বশক্তি লাভ হয়। শিষ্যের অজ্ঞানে আবৃত মন আলোকে পূর্ণ হয়, তিনি ধন লাভে ঐশ্বর্য্যশালী হন।

শাস্ত্র বাক্য আছে যে দেহাবসান কালে মানবের চিত্তে যেমন যেমন ভাবনা জাগিয়া উঠে মৃত্যুর পরে, তিনি সেই সেই যোনিতে যাইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে পার্থিব সকল প্রিয় পদার্থ ও আত্মীয়স্বজনকে ভুলিয়া যাইয়া গঙ্গাকে, নারায়ণকে ও ব্রহ্মকে মনে জাগাইয়া তোলা আজীবন বহু সাধনার ফল বা অভ্যাস যোগ মুক্ত থাকার পরিচয়, আবার গঙ্গা, নারায়ণ ও ব্রহ্ম ইহাঁদের সহিত ওঁকার শব্দ উচ্চারণের প্রবল ইচ্ছা যে কি প্রকার আজীবন সাধনার পরিচয় তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। মৃত্যুকালীন ঐ কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি মরেন তিনি ধন্য, আর যিনি আসন্নমৃত্যু সাধকের কর্ণে ঐ মন্ত্র ভক্তি সহকারে প্রবেশ করাইয়া দেন তিনিও ভাগ্যবান। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহাদের জন্য নিম্নে দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

(১) যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজন্ততে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদভাব ভাবিতঃ॥

(২) দেহাবসান সময়ে চিত্তে যদ যদ্বিভাবয়েৎ।
তত্তদেব ভবেজ্জীব ইত্যেবং জন্ম কারণং॥

ব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে স্পন্দন আরম্ভ হয় ও পরে এক হইতে দুই হয়। কেহ কেহ এই দুইকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধানামে অভিধেয় করেন, কেহ কেহ শ্রীরাম সীতা নাম দিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা হর পার্ব্বতী বলেন। শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে আপন বামভাগে বসাইয়া রাখেন। যাহা শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরাধায়, জগৎব্রহ্মাণ্ডেও তাহা, সুতরাং জগৎব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সকলই দুই ভাগে বিভক্ত। এই যে কাল ইহাও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক মানব দেহ, প্রত্যেক পশু, কীট, পতঙ্গাদি, প্রত্যেক লতাপাতাদির দেহ ও

---

(২) সিদ্ধি—মন্ত্রজপে তিনিই সিদ্ধ যিনি কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ষড়চক্র ভেদে সমর্থ।

দুই ভাগে বিভক্ত। একটি পুরুষ ভাগ অপরটি স্ত্রীভাগ। (দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহ মর্দ্ধেন পুরুষোভবেৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাংস বিরাজমসৃজৎ প্রভূঃ।] স্ত্রীভাগ দেহের বামভাগে স্থিত, পুরুষভাগ দেহের দক্ষিণ ভাগে স্থিত। শব্দ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি, যাহাদের আমরা অ, আ, উ, ম, প্রভৃতি পঞ্চাশৎ বর্ণ নাম দিয়া থাকি (শব্দব্রহ্মেতি যৎখ্যাতং সর্ব্ববাঙময় কারনম্) ইহারাও দুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ কতকগুলি পুরুষবর্ণ ও কতকগুলি স্ত্রীবর্ণ। আমরা উপরে বলিয়াছি, বর্ণের সমষ্ঠিই মন্ত্র, সুতরাং মন্ত্র সকলও দুই অংশে বিভক্ত। স্ত্রীমন্ত্র ও পুরুষমন্ত্র। কেবল ওঁকার মহামন্ত্র অবিভক্ত, উহা দুইয়ের সমষ্টি। ওঁকার প্রণব—ওঁকার সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, বিদ্যুৎভাব বিশিষ্ট, পরব্রহ্ম। (যঃ ওঁকার, স প্রণবো, যঃ প্রণবঃ স সর্ব্বব্যাপী, যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তো স্তত্তারং, যত্তারং তৎসূক্ষ্মং, যৎসূক্ষ্মং তচ্ছুক্লং যচ্ছুক্লং তদ্বৈদ্যুতং, যদ্বৈদ্যুতং তৎপরব্রহ্মেতি) তন্ত্র শাস্ত্রে লিখিত আছে অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ও অং ইহারা পুংরূপ এবং আ, ঈ, ঊ, ঐ, আঃ ইহারা স্ত্রীরূপা (ইমে হস্বদীর্ঘা এমাৎ শিবশক্তিময়া হ্রস্বা অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ও অং এতে. শিবময়াঃ পুংরূপাশ্চ ইত্যর্থঃ। আ, ঈ, ঊ, ৠ, ঐ, ঔ, অঃ এতে দীর্ঘাঃ শক্তিময়াঃ স্ত্রীরূপাশ্চেতি সারদাতিলক) ওঁকার মহামন্ত্র উচ্চারণ সম্বন্ধে দক্ষিণ বা বাম কর্ণের বিচারের প্রয়োজন নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা পুরুষানুক্রমে তন্ত্র মতে স্ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহাদের দেহের বাম ভাগের যন্ত্র গুলিই সকল প্রকার মন্ত্র গ্রহণের বা মন্ত্রোচ্চারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বা অভ্যস্থ হইয়া পড়ে। কোন দূরদেশে গমন করিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন পন্থা বলম্বনে সহজে বা কষ্টে একই গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজসাধ্য ও চিরাভ্যস্ত পথ বহিয়া যাইলে পথিকের ক্লেশের যে লাঘবতা হয় তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। সেই মত যাঁহাদের অভ্যাস যোগযুক্ত জন্য পুরুষানুক্রমে দেহের বামভাগ মন্ত্র গ্রহনোপযোগা তাঁহাদের বামকর্ণ ওঁকার মন্ত্র সহজে গ্রহণ করিতে পারে ও তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে মন্ত্র জপ জন্য কষ্টের লাঘবতা ও হয়, এমন কি দেহস্থিত কুলকুণ্ডলিনী সহজেই জাগ্রত হইয়া পড়ে। আমরা আসন্ন মৃত্যু জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ স্ত্রীমন্ত্রে কিংবা পুরুষমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি, কিন্তু আমাদের ধারণা তিনি নিশ্চয়ই স্ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, এবং সেই জন্যই পুত্রকে বামকর্ণে মৃত্যুকালে ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম এই মন্ত্র প্রবেশ করাইতে আদেশ দিয়াছিলেন।

এক্ষণে সাধক ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীকে কেন যে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে

নিবারণ করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের সংক্ষেপ আলোচ্য। নৃসিংহতাপনীয় তন্ত্রে লিখিত আছে "সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়া মৃতঃ সোঽধোগচ্ছতি।" সুতরাং তন্ত্র শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতির ওঁকার মহামন্ত্র মন্ত্রভাবে উচ্চারণ নিষিদ্ধ। উচ্চারণ করিলে তাহাদের মরণের পর নরকগামী হয়। আবার মহানির্ব্বান তন্ত্রে লিখিত আছে কলিকালে ব্রাহ্মণ সমূহের গায়ত্রীতে অধিকার আছে, এ সম্বন্ধে ভগবান ব্যাসদেব তাঁহার অতুলনীয় শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থে বলিয়াছেন যে স্ত্রী, শূদ্র, এবং হীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বেদে অধিকার নাই (স্ত্রীশূদ্রদ্বিজ বন্ধুনাংত্রয়ীন শ্রুতি গোচরা) সুতরাং স্ত্রী জাতির, বেদান্তর্গত ওঁকার মহামন্ত্র উচ্চারণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। আমাদের মনে হয় আমাদের বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতা মাতৃবৃন্দ অভিমান ভরে যদি শাস্ত্রোপদেশ অমান্য করিয়া ওঁকার মহামন্ত্র যথাযথ উচ্চারণের জন্য প্রয়াস পান তাহা হইলে তাঁহাদের দৈহিক যন্ত্র সকল চিরজন্মের জন্য ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। ইতি—

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী—
৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা

সাধারণ ধর্ম্ম রক্ষার উপায়।

সিদ্ধসাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় লিখিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাহাই হউক, রাজার জন্য না হউক, পিতা মাতার জন্যই হউক, আত্মরক্ষার অর্থাৎ স্বধর্ম্মরক্ষার উপায় যে আর নাই, ফলতঃ ইহা একরূপ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন, সেইজন্য যদি দেবতার শরণাপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলেও দেখিতে পাই, ভারতে এখন কাল কলি যুগ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান,পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্ন সকল কালেরই অধীশ্বরী দেবতা, তাই মায়ের নাম মহাকালী, "গ্রসনাৎ সর্ব্বভূতানাং কাল দন্তেন চর্ব্বনাৎ" মা জা কি কালদন্তে চর্ব্বিত করিয়া এ অনন্ত জগৎ গ্রাস করেন, তাই মায়ের নিকটে বলিদানের ব্যবস্থা। মা! আমরা ও এ কলি যুগে তোমার সেই বলিরই অন্তর্ভূক্ত। তুমি চিরকালই তোমার কালদন্তে এ বলি চর্ব্বিত করিয়া আসিতেছ. সেই অনুসারে কর্ম্মফলে এবারেও কাল-শক্তি-স্বরূপিনী তোমাতে এদেহ

সমর্পণ করিবার জন্যই আসিয়াছি, তাই মা! তুমিও যখন বিরূপাক্ষী, তখন আর রক্ষা করিবার কে আছে?

আর্য্য সন্তান! বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সন্তান! মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কারত-প্রাণে এখন তোমারও সেই কথা বলিবারই দিন আসিয়াছে, পিতা মাতা যাহা করিবার তাঁহারা ত পুত্র স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া তাহা করিয়া আসিয়াছেন ও করিতেছেন, এখন তোমরা যদি মায়ের প্রসাদে মায়ের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া এবার এই আর্য্য দেহের—ব্রাহ্মণ দেহের অবসান জন্মান্তরেও মায়ের চরণতলে নিজ নিজ ভাবি আসন দেব মূর্ত্তির অবস্থান দেখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে পার, তবেই জানিও এবার—"যা লোকদ্বয় সাধিনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।" "যাহাতে ইহলোক পরলোক উভয়ই সাধিত হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী"। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন মা যদি বলেন রক্ষা, তবেই রক্ষা আর্য্য পিতামাতার উদাহরণ স্বরূপে এই স্থলে আর একটি কথা বলিব। ৺কাশীধামে গুরুজির (অধ্যাপক ব্রহ্মচারীর) আশ্রমে আমি যখন ছিলাম, তখন তাঁহারই মুখে, তাঁহারই আজন্মব্রহ্মচর্য্যের মূল ঘটনা যাহা শুনিয়াছি, সেই কথাটা বলিতেছি। গুরুজি অতি শৈশবকালে পিতৃহীন হয়েন, গর্ভাষ্টমে অর্থাৎ সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাতা তাঁহাকে উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত করেন। দেশীয় নিয়মানুসারে দ্বাদশ দিন ব্রহ্মচর্য্য সহকারে গৃহে অবস্থানের পর যেদিন দণ্ড বিসর্জ্জন করিতে হইবে, সেই দিন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, ৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেই ৺জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া তাহার পর সমুদ্রে দণ্ড বিসর্জ্জন করিবেন। পুত্রের এই সাধু ইচ্ছা অবগত হইয়া মাতা তাহার অনুমোদন করিলেন এবং অন্য অভিভাবকের অভাববশতঃ নিজেই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া দণ্ড বিসর্জ্জন করিবার জন্য পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, পুত্র ও বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সমুদ্রজলে দণ্ড বিসর্জ্জন করিয়া মাতার চরণ প্রান্তে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—মা! আমার আর একটী ইচ্ছা, মাতা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ইচ্ছা? পুত্র উৎকণ্ঠীত হৃদয়ে কাতর কণ্ঠে বলিলেন—মা! আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে,দণ্ড বিসর্জ্জন করিলাম; কিন্তু আজীবন এ ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিব না,আর আমি গৃহে ফিরিয়া যাইব না। মাতা আনন্দে উল্লসিত হৃদয়ে সস্নেহ নয়নে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—পারিবে ত? পুত্র ও মস্তক

অবনত করিয়া বলিলেন—পারিব। মাতা আবার বলিলেন, ইহা অপেক্ষা আমার সুখ সৌভাগ্যের কথা আর কিছু নাই। চল আমি তোমাকে গুরুর মঠে রাখিয়া যাই, তুমি তাঁহার সঙ্গে তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিও, কিন্তু বাপ, আমার একটী কথা স্মরণ রাখিও, তোমার তীর্থপর্য্যটনব্রত সমাপ্ত হইলে যদি তোমার তপস্যার কোন ব্যাঘাত না হয়, আর আমি তত দিন বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে একবার আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইও। পুত্র তাহাই স্বীকার করিলেন এবং মাতার সঙ্গে গুরুজির মঠে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, মাতাও সন্তানকে অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রাহ্মণোচিত তপঃসিদ্ধির আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরুর চরণে তাঁহাকে জন্মের মত অর্পণ করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। আমার গুরুজি এই অবস্থায় কিছু দিন পরে নিজ গুরুর সঙ্গে ওঙ্কার পর্ব্বতে গমন করেন এবং নিজ গুরুকে তথাতে অধিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তাঁহারই আশ্রমে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তাঁহারই অনুমতিক্রমে দিগদিগন্তে দেশদেশান্তরে তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেন। বঙ্গদেশেও তিনি আসিয়াছিলেন, ৺চন্দ্রশেখর পর্ব্বত হইতে ৺কামাখ্যা পীঠ দর্শনে যাত্রা করেন, তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে নাটোরে মহারাজ রামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিতা ৺মা জয়কালীকে দর্শন করিয়া যান, এ কথাও আমাকে বলিয়াছেন।

এইরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তীর্থ সকল পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বশেষে ৺কাশী ধামে উপস্থিত হয়েন। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাতৃদেবীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কি না? তদুত্তরে বলিলেন, ৺কাশীধামে আসিয়া আর যাইতে ইচ্ছা হয় নাই। ৺কাশীধামে জীবের নির্ব্বাণ ভূমি, একবার এই স্থান স্পর্শ হইলে ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া জীবের পক্ষে মহাপাপ। এইবার আমি উন্মুক্ত ব্রহ্মদ্বারে আসিয়াছি, আর কোথাও যাইব না। আর, আমার মা যে এত দিন জীবিত আছেন ইহাও আমার বিশ্বাস হয় না।

ব্রাহ্মণ কুমার! একবার চাহিয়া দেখ, তুমিও মায়ের সন্তান, আমার গুরুজি ও মায়ের সন্তান! এখনকার মা হইলে, বিশেষতঃ এ হতভাগ্য বঙ্গ দেশের মা হইলে সপ্তম বর্ষীয় পুত্রের মুখে ঐরূপ আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য, গৃহপরিত্যাগ ও বিবেক বৈরাগ্যের কথা শুনিলে তিনি কি সে সময়ে ছেলের হাতে পায়ে লোহার শিকলের অলঙ্কার পরাইতে ক্ষান্ত থাকিতেন? তাই বলি, যেমন কর্ম্ম ফল, তেমনই জন্ম হইয়াছে, তেমনই পিতামাতা পাইয়াছ, তাহার জন্য রাগ

করিবে কাহার উপরে, আর একটা কথা এই সঙ্গে ভাবিয়া লও না, ব্রহ্মচারীর মাতাই বা অমন হইলেন কেন? আর এ দেশেই বা সহাস্রব মধ্যে একটীও তেমন হয়েন না কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ দেশের পিতামাতা, কেবল পিতামাতাই হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ সন্তানের পিতামাতা হওয়া তাঁহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব, কিন্তু ব্রহ্মচারীর মাতা ছিলেন, ব্রহ্মচারীর মাতা ও ব্রহ্মজ্ঞা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নী। তাই পতির সহধর্ম্মিণী হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যে অর্দ্ধাধি-কারিনী তিনি হইয়াছিলেন, তাহারই বলে তাঁহার গর্ভে এই জন্মান্তরসিদ্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। আর তোমার আমার যেমন কর্ম্মফল, মাতাও তেমনই পাইয়াছ, কিন্তু ইহা মাতার দোষ নহে। ব্রহ্মচারীর মাতা ছিলেন ব্রহ্মচারীর মাতা, আর তোমার আমার মাতা কেবল কর্ম্মচারীর মাতা। তাই উভয়ের ধর্ম্মচর্চ্চা একরূপ নহে।

সন্তানের অদৃষ্টদোষে পিতামাতার এরূপ ব্যবহার ইহাত সত্য; কিন্তু সে অদৃষ্টও আর খণ্ডিত হইবার নহে, পিতা মাতার মতি গতি ও আর পরিবর্ত্তিত হইবার নহে, অথচ সন্তান এই অবস্থায় বিষম সঙ্কটময় সমস্যায় পতিত। সে সমস্যা এই যে পিতা মাতা বা গুরুজন অভিভাবকবর্গ ধর্ম্মানুষ্ঠানের এইরূপ বিরুদ্ধাচারী হইলে তখন সন্তানের কর্ত্তব্য কি? এক দিকে পিতা মাতা মহাগুরু, তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন না করাও পাপ, অন্যদিকে নিজের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মোচিত নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাপূজা ইত্যাদি না করাও পাপ, তাই, কোনটি ছাড়ি, কোন্‌টি ধরি? কালবশে তাহার একটা মীমাংসার প্রয়োজন হইয়াছে। সেই মীমাংসাই বা করিবে কে? আমরা বলি, সে মীমাংসা কাহাকেও করিতে হইবে না, যাঁহার মীমাংসাবশে তুমি আমি মানব কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং যাঁহার মীমাংসা বাক্যকে শাস্ত্র বলিয়া আমরা অবনত মস্তকে বিশ্বাস করি, এ মীমাংসা তাঁহার সেই শাস্ত্র বাক্যদ্বারা যাহা হইবে, তাহার উপরে আর কাহারও মীমাংসা করিবার সাধ্য নাই। শাস্ত্র কোন স্থানেও পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের পিতামাতাকে কখনও তাহাদের গুরুজন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, মনুর সন্তান মানবের প্রতিই শাস্ত্রের শাসন।

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিত্ত যে কত দূর দুর্দ্দমনীয় ইহা জানিয়া প্রার্থনার সহিত নিত্য কর্ম্ম করা ইহাই কর্ম্মের কৌশল। মন্ত্ররূপী তুমি, জলরূপী তুমি, সূর্য্যরূপী তুমি—যখনই আমি যে মন্ত্র প্রয়োগ করিতেছি তখনই প্রার্থনা করিতেছি জল তুমি, তুমি আমার অশুভ নাশ কর। সব সাজিয়া তুমি আছ, বাহিরে তোমার মোহ উৎপাদিকা শক্তি আর ভিতরে মোক্ষদায়িনী তুমি—এইটী লক্ষ্য রাখিয়া সকলকেই তুমি বোধে মনে মনে প্রার্থনা করিলে কর্ম্মে শিথিলতা ও আসিবেনা আর লয় বিক্ষেপও ক্রমে শান্ত হইয়া যাইবে।

শাস্ত্র বৈরাগ্য অভ্যাসের জন্য (১) যতমান সংজ্ঞা বৈরাগ্য (২) ব্যতিরেক সংজ্ঞা বৈরাগ্য (৩) একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা বৈরাগ্য এবং (৪) বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য এই চারিপ্রকার অপর বৈরাগ্য ও শেষে স্থিতির জন্য পরবৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অবশ্যই এই বৈরাগ্য বিশেষ ভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। প্রতিদিনের কর্ম্মে প্রথমেই পাগল চিত্তকে এই বৈরাগ্য ঔষধ খাওয়াও—একদিনের জন্যও ঔষধ সেবনে বিরত হইও না তবেই চিত্তের পাগলামি রোগ সারিবে। পাগলের চিকিৎসা করিলে না—কাহাকে বল জপ ধ্যান আত্ম বিচার করাইবে? ইহা পানাপুকুরে ঢিল ফেলা মাত্র। ঢিল পড়িবামাত্র পানা কিছু সরিয়া গেল কিন্তু ঢিল তলাইলে যেমন পানা তেমনি জল ঢাকিয়া ফেলিল।

সেই জন্যই প্রথমেই চিত্তের সংবাদ লও। লইয়া ইহাকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রাণপন কর। চিত্ত পাগলের ভান করিয়া পাগল সাজিয়া অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির তালে নাচে। কিন্তু চিত্ত পাগল নহে। চিৎই আপন বহিঃপ্রবাহিত শক্তিতে চঞ্চল মত হইয়া চিত্ত আখ্যা ধারণ করে। শাস্ত্রের উপদেশ সম্পূর্ণ সত্য। শাস্ত্র চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিতে যাহা উপদেশ করিতেছেন তাহা প্রতিনিয়ত অভ্যাস করা উচিত।

ইতস্ততঃ কথং ভ্রান্ত প্রধাবসি পিশাচবৎ।
ন ত্বং নাহং জগন্নেদং সর্ব্বমাত্মৈব কেবলম্॥
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ বর্ত্ততে ন চ তেন মে।
ত্বমেব পরমং তত্ত্বমতঃ কিং পরিতপ্যসে॥

ত্বমেব তত্ত্বং হি বিকারবর্জ্জিতং
নিষ্কম্পমেকং হি বিমোক্ষ বিগ্রহম্।
ন তে চ রাগো হ্যথবা বিরাগঃ
কথং হি সন্তপ্যসি কাম কামতঃ॥

সখে মনঃকিং বহুজল্পিতেন, সখেমনঃ সর্ব্বমিদং বিতর্ক্যম্।
যৎ সারভূতং কথিতং ময়াতে, ত্বমেব তত্ত্বং গগনোপমোঽসি॥

এই প্রবন্ধে করিবার কথা যাহা বলা হইল তাহা একত্র করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

(১) মন হইতে অপর চিন্তা বাহির করিয়া না দিতে পারিলে ভজনে একাগ্রতা লাভ হয় না। সুষুপ্তিতে মন যাঁহার ক্রোড়ে গিয়া লীন হইয়া পড়ে সেই একের ভাবনা করিতে হইবে; মানুষ জ্ঞাতসারে ত সুষুপ্তি আনিতে পারে না। সুষুপ্তি সাধারণ মানুষের অজ্ঞানেই হয়। সাধনাতে জ্ঞাত সারে সুষুপ্তি আনিতে পারিলেই তাঁহাতে ডুবিয়া থাকা যায়।

অজ্ঞানে মানুষ যাঁহার ক্রোড়ে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে তিনিই তিনি। তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ সর্ব্বশক্তি বিজড়িত। জ্যোতির দেশ তাঁহার দেশ। সূর্য্য কোটি প্রতীকাশ তিনি, আবার চন্দ্র কোটি সুশীতল তিনি। মানুষ তাঁহার কোলে যখন যায় তখন সব অসার যাহা—এই দেহ, এই মন, এই রূপ রসাদির ভাবনা, এই জগৎ সংসারের ভাবনা সব ফেলিয়া—সব মিথ্যা বস্তু ফেলিয়া তাঁহার কাছে যায়। সেই জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে গিয়া জ্যোতির মানুষ হইয়াই তাঁহাতে বিশ্রাম করে। অংশ যেমন পূর্ণে মিশিয়া যায়, সেইরূপে সে আপন স্বরূপে বিশ্রাম করে। পূর্ণ চৈতন্যে ভ্রান্তিতে অংশ চৈতন্য যাহা সাজিয়াছিল, সেই ভ্রান্তি ফেলিয়া সেই পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ আনন্দে ডুবিয়া যায়। সে রাজ্যের সংবাদ জ্ঞান পূর্ব্বক পায় না বলিয়া আবার এই দুঃখময় মনে, দুঃখময় দেহে ফিরিয়া আসিতে হয়। জ্ঞান পূর্ব্বক মিশিতে পারিলে আর ফিরিতে হয় না।

কিন্তু কে ফিরিয়া আসে? যায় চিত্ত আবার চিত্তই ফিরিয়া আইসে। এই চিত্তকে জ্ঞান পূর্ব্বক সেখানে লইতে হইবে ইহাই সাধনা।

কিরূপে লওয়া যাইবে? সেইজন্যই উপাসনা ইত্যাদি বা জপ ধ্যান আত্ম বিচারাদি।

এই যে লোকে কত কি সাধনার কথা কয় তথাপি মন যেরূপ কোলাহল।

ক্রান্ত বরাবর ছিল—চিত্ত বাহিরে আসিলে সেইরূপই রাগ দ্বেষে ভরা থাকে কেন?

আহা! যাহাকে উপাসনা করাইবে তাহাকেই যদি ধরা না হয়—তাহার দিকে যদি বিশেষ লক্ষ্য না করা হয়, তবে শুধু উপদেশে কি হইবে? বালক কি করে, কি না করে এ বিষয়ে যদি সতর্ক দৃষ্টি না রাখ তবে বালককে শত উপদেশ দিলেও ত কিছু হয় না। এইজন্য চিত্ত বা মনের দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখাই বিশেষ প্রয়োজন। কি সৎ কি অসৎ; কি সত্য কি মিথ্যা; ইহা—এই বিচার মনকে করাইতে হইবে—সৎসঙ্গে ঔষধ খাওনার মত ইহাকে নিত্যানিত্য বস্তু বিচারের ঔষধ খাওয়াতে হইবে। মিথ্যাকে অগ্রাহ্য করিতে শিখাইতে হইবে এবং সত্যের দিকে ইহাকে ফিরাইতে হইবে। নতুবা মোহ গ্রস্থ চিত্তই যদি থাকিয়া গেল তবে পানা পুখুরে ঢিল ফেলার মত ক্ষণিক একটু পানা সরিয়া জল দেখা গেলেও ঢিল তলাইয়া গেলে সৎ সঙ্গ ছাড়িয়া—বা জপ পূজা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেই যেই পানা—সেই পানায় সব ঢাকা পড়িয়া যায়।

লোকে বলে চিত্তটা পাগল। তুমি পাগল হইতে দাও বলিয়াই এটা এই হৈ হৈ রৈ রৈ তালে নাচে। আবার যদি ইহাকে একটু ভাল করিয়া সত্যমিথ্যা স্মরণ করাইয়া দাও, যদি ইহাকে ভগবানের স্বভাব, ভগবানের উপদেশ শুনাও তবে এই চিত্তই আত্মবধ নাটকের অভিনয় করিয়া সেই রমণীয় দর্শনের কোলে তোমাকে পৌঁছাইয়া দেয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গীতার দৃষ্টান্ত ইহা।

অর্জ্জুনের চিত্তে মোহ আসিয়াছিল। ত্রই মোহ তিন প্রকারের। (১) এই সকল লোকের আত্মা মরিবে (২) এই সকল লোকের দেহ মরিবে (৩) ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধাদি অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম। এই তিন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে গিয়াও যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া জড় প্রায় রহিলেন। আর ভগবান অর্জ্জুনের চিত্ত মার্জ্জন করিয়া যখন তাঁহার চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া দিলেন তখনই অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম করিতে দাঁড়াইলেন, বলিলেন "করিষ্যে বচনং তব"—তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।

চণ্ডীতেও এই উপদেশ। রাজা ও বৈশ্য কেহই সংসারের উপরে নিষ্ঠুর হইতে পারা যায় না বলিতেছিলেন, আর ঋষি তাঁহাদের মোহ দূর করিবার

জন্য জগজ্জননী জগদম্বার লীলা শুনাইলেন—তাঁহারা তিন বৎসর ধরিয়া মায়ের উপাসনা করিলেন। পরে উপাসনা দ্বারা চিত্ত যখন নির্ম্মল হইল, তখন রাজা মন্বন্তরাধিপ হইবেন বর চাহিলেন আর বৈশ্য বলিলেন—আমার সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস জন্য মা আমায় জ্ঞান দান কর। মাত স্মৃতকাম ধেনু। উভয়েই অভিলষিত বর পাইয়া ধন্য হইলেন।

তাই বলিতেছি চিত্তকে প্রবৃত্তি পথে ছাড়িলেই এটা পাগল হইয়া মোহের কার্য্যই করিবে আর ক্রমেই মহামায়ার মোহে জড়াইয়া দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে পড়িয়া নিরন্তর কষ্ট পাইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রবৃত্তি পথ ছাড়াইয়া ইহাকে নিবৃত্তি পথে লইয়া চল—এই চিত্ত জগদম্বার স্মিত-প্রসন্ন হাস্য দেখিয়া দেখিয়া মোক্ষদায়িনীর অনুগ্রহে তাঁহারই ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবে।

চিত্ত আপন স্বরূপে সেই চিৎবস্তুই। স্বরূপের স্মরণ করাও ইহা শান্ত হইবেই। সেই জন্য যাহা নিত্য অভ্যাস করিতে হইবে তাহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাই চারি প্রকার অপর বৈরাগ্য, শেষে পর বৈরাগ্যের প্রত্যহ অভ্যাস। ইহাতে চিত্ত অসৎ ছাড়িয়া সত্তের দিকে ফিরিবেই।

সত্যের দিকে ফিরিলেই চিত্ত বুঝিবে "মামেকং শরণং ব্রজ" কোন বস্তু। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই দেখিবে একমাত্র "আমিই আছি" আর যাহা কিছু সমস্তই সর্ব্বব্যাপী আমার গাত্রে মায়ার ভ্রান্তির বিলাস। যেমন বায়স্কোপের ক্যানভাসের উপরে ছবির মিথ্যা খেলা। বৈরাগ্য অভ্যাসে মিথ্যা মায়ার খেলাকে মিথ্যা জানিয়া অগ্রাহ্য করিতে করিতে আমার স্মরণ কর—নিত্য অভ্যাস কর–নিত্য আমার শরণাপন্ন হও। ইহারই জন্য অজস্র স্মরণ, প্রার্থনার সহিত করিতে হইবে। এই অজস্র স্মরণ ও প্রার্থনার সঙ্গে নিত্য কর্ম্ম করা চাই। ব্রাহ্মণের উপাসনাতে ঋষিগণ ইহাই করিতে বলিয়াছেন। "শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ; আপঃ শুধ্যন্তু মৈনসঃ" ইত্যাদি প্রার্থনার সহিত স্মরণ। চিত্ত বাহিরের বস্তু লইয়া মায়াতেই ডুবিয়া আছে জানিয়া কাতর হইয়া উদ্ধার কর উদ্ধার কর বলিতে বলিতে জপ ধ্যান আত্ম বিচার করিতে থাক–ইহাই পথ। আবার সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে ব্রাহ্মণের জন্য যাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা–তাঁহাকে জপিয়া জপিয়া যে কার্য্য করার বিধি গুরু দিয়াছেন—সেই কালেও তাঁহার উচ্চারণে ও যেন অজস্র প্রার্থনার সহিত স্মরণটী হয় ইহাও লক্ষ্য রাখিও।

শেষে একান্তে নিত্য কর্ম্ম ও লোক সঙ্গে সব তুমি সব তুমি স্মরণে বাহিরের মায়ার প্রভাব যে রাগ দ্বেষ তাহা ছাড়িয়া ভিতরে তোমাকে লইয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

এই সাধনা ব্যাপারের ব্যভিচার হইতেছে আরোপ করা। আরোপ করিয়া প্রবৃত্তি পথে বাহিরে ছুটাছুটী কর না, নিবৃত্ত পথে ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা কর—ইহার বিচার কর আপনিই বুঝিবে ঈশ্বরের ডাক না যমের ডাক কোন ডাকের সাড়ার দিকে ছুটিয়াছ। ইহা ধরিতে না পার তবে বুঝিও তোমার বুদ্ধি নষ্ট বুদ্ধি। ইহার জন্য নিত্য নির্জ্জনে প্রার্থনা কর আর কাঁদ—যদি ইহা পার হইবে—নতুবা—তুমিই পরে জানিবে কোথায় পোটলা পুটলি লইয়া ছুটিয়াছ।

এই প্রবন্ধে করিবার কথা এইরূপই বলা হইয়াছে। পড়িয়া যদি কিছু করিতে ইচ্ছা হয় তবে জানিও ইচ্ছাটা বন্ধ্যা ইচ্ছা নহে। যেমন ভালবাসিয়া যদি নিত্যবস্তুর জন্য কর্ম্মে প্রাণপণ না আসিল, তবে ভালবাসাটা যেমন সূক্ষ্মভাবে বিষয় ভোগের একটা শঠতা মাত্র, সেইরূপ ভাললাগালাগিতে যদি কোন কর্ম্ম না হইল তবে ভাললাগা লাগি বন্ধ্যা মাত্র—বন্ধ্যার সন্তান আর কি হইবে? শঠতায় ভগবানের দিকে যাওয়া যায় না। আহা! মায়ের কাছে কতই প্রার্থনা করিতে হয়।

জগদম্ব—"নৈতচ্ছঠত্বংমম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধা তৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি"

সত্যই ক্ষুধা তৃষার্ত্ত হইয়াছ কি না—তাহারও পরীক্ষা আপনাকেই করিতে হইবে। ভাল হউক, ভাল হউক ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীরাম দয়াল মজুমদার।

মার্জ্জন মন্ত্র—'আপঃ—চক্ষসে'।

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রণবময়ি জলদেবতে, যেহেতু তুমি সুখ ভূমি বা সুখের খনি স্বরূপ; এ হেন তুমি আমাদিগকে ধারণাবল দান কর এবং পরম রমণীয় তোমার দর্শনের নিমিত্ত আমাদিগকে ধারণ কর।

গূঢ়ার্থ সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, শ্রুতি জলদেবতাকে মহারমণীয় বলিলেন। আমি বুঝিতেছি না—কিরূপে জলদেবতা মহারমণীয়। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—জলদেবতাকে সুখময়ী জানিবার পরে ও সুখ প্রার্থনা না করিয়া ধারণা-বল বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইল কেন?

আচার্য্য] বৎস, তোমাকে পূর্ব্বে ও বলিয়াছি শ্রুতির চরম সিদ্ধান্ত হইল—যাহা কিছু দেবতাবাচক শব্দ তৎসমুদয়ই অখণ্ড আত্ম বস্তুর বাচক। শ্রুতি বলেন—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নি মাহু—
রথো দিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্।
একংসদ্ বিপ্রা বহুধাবদ—
স্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ।

বিপ্রগণ এক সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি সুপর্ণ বহুপ্রকার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু হইতে স্বকর্ম্মানুরূপ খণ্ড সত্তা লাভ করিয়া জীব যখন বহির্ম্মুখ গতিতে সংসার-পথে চলিতে থাকে, তখন বাগ্‌দেবীও বহির্ম্মুখী হইয়া জীবের ব্যবহার নিষ্পাদনের নিমিত্ত ঈশ্বর সঙ্কেতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঘট পটাদি শব্দে পরিমিত অর্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আবার এই জীবই যখন কর্ম্মক্ষয়ে বিশুদ্ধ চিত্তের অন্তর্মুখ জ্যোতিতে অখণ্ড আত্মসত্তার দিকে অগ্রসর হন,

তখন বাগ্‌দেবী ও অন্তর্ম্মুখী হইয়া অনিয়ন্ত্রিত রূপে নিখিল শব্দে এক আত্ম—বস্তুই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন (১)।

অতএব শন্ন আপঃ 'আপোহিষ্ঠা'ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতা বাচক অপ্‌শব্দের চরম ও পরম অর্থ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাঁহাকেই এখানে জলদেবী বা জল দেবতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ঈশ্বর চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ব্যাপ্তি মহিমা কীর্ত্তনে আপনি বলিয়াছিলেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ভূরাদি সপ্ত স্বর্গ, অতলাদি সপ্ত পাতাল তাঁহারই একাংশে বিকসিত। জলে স্থলে অনলে অনিলে নভোমণ্ডলে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু রমনীয়, তৎসমুদয় তাঁহারই অঙ্গাভরণ। কেবল নিখিল সুষমা মণ্ডিত বলিয়া তাঁহাকে মহারমণীয় বলিতেছি না—তিনি স্বরূপে ও রমণীয় দর্শন—সকল সৌন্দর্য্যের খনি। যাঁহার সংস্পর্শ সুখের কণামাত্র লাভ করিলে সৌন্দর্য্যলুব্ধ অতৃপ্ত চিত্ত আপ্যায়িত হইয়া যায় সেই মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর বা ঈশ্বরী গায়ত্রীই—অপ্‌ প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্দ সমূহের পরম অর্থ। এই অপ্‌ বা গায়ত্রীই ময়োভূ বা সুখের ভূমি সুখময়ী।

বৎস, তুমি নিজে নিজে প্রার্থনা করিলে হয়ত এই সুখের সাগরের উপকূলে আসিয়া সুখেরই প্রার্থনা করিতে। শ্রুতি কিন্তু তোমাকে সে প্রার্থনা করিতে দিলেন না। মন্ত্রময়ী জননী তোমাকে দিয়া প্রার্থনা করাইলেন—সেই সুখময়ী তুমি আমাদিগকে ধারণা বলের জন্য প্রস্তুত কর; শ্রীগুরু উপদিষ্ট মনন মথিত শব্দ সিন্ধু হইতে যখন প্রবোধ চন্দ্রমা উদিত হইবেন, তখন সেই মহারমণীয় দর্শন আত্মতত্ত্বকে যেন ধারণা করিতে পারি, আমাকে মা সেই ভাবে প্রস্তুত করিয়া লও।

বৎস, জগজ্জননী শ্রুতি সর্ব্বতোমুখী। অনন্ত সন্তানের জননী ইনি. ইহার সর্ব্বতোমুখী না হইলে চলেনা। অনন্ত সন্তান অনন্ত আকাঙ্ক্ষা-ভাব হৃদয়ে লইয়া ইহাঁর নিকটে উপস্থিত, কাহারও দিকে অভিমুখী হইয়া কাহারও দিকে বিমুখী হইলে ইহাঁর দয়াময় স্বরূপে কলঙ্ক স্পর্শে. সুতরাং এই ভক্ত কাম দুঘা শ্রুতি বহু অর্থে ব্যবহৃত হন। 'উর্জ্জ' শব্দের আধিভৌতিক (স্থূল) অর্থ অন্ন। উর্জ্জ্‌ ধাতুর অর্থ বলধারণ বা প্রাণধারণ, যদ্দারা প্রাণ বা বল ধারণ করা যায় এই অর্থে ক্বিপ্‌ প্রত্যয়ান্ত উর্জ্জ্‌ ধাতু হইতে উর্জ্জ্‌ শব্দ নিষ্পন্ন। এই জন্য প্রাণ ধারণের কারণ অন্নকে উর্জ্জ্‌ বলা হইয়াছে। যাঁহারা স্থূল অন্নের অভাবে

বিব্রত, তাঁহারা 'তান উর্দ্ধে দধাতন' বলিয়া শ্রীজগদম্বা সাবিত্রীর নিকট স্থূল অন্নই প্রার্থনা করিবেন, তাহাদের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক আর যাহারা ঐহিক ও পারলৌকিক অন্নভোগে বিরক্ত, শ্রীজগদম্বা—স্বরূপানন্দই যাঁহাদের লোভনীয় ও লভনীয় তাঁহারা তাঁহাকে সুখময়ী বলিয়া অনুভব করিবা যে ধারণার ফলে এই সুখময় স্বরূপে চিরনিমগ্ন থাকা যায়, সেই ধারণাবলই তাঁহার নিকট প্রার্থনীয় মনে করেন। সুখ প্রার্থনীয় নহে, কারণ প্রার্থণার ফলে সুখ পাইলাম. কিন্তু কতক্ষণ সে সুখ থাকিবে? পক্ষান্তরে যিনি আনন্দময়ী স্বরূপে অন্তরে বাহিরে নিত্য বিরাজমান, শুধু ধৃতিশক্তির অভাবেই তাঁহাকে আমরা অনুক্ষণ হারাইয়া ফেলিতেছি, সুতরাং ধারণাবলই একমাত্র প্রার্থনীয়।

সন্তান জননীর নিকট আরও প্রার্থনা করিতেছেন—বলিতেছেন—মহারমণীয় তোমার দর্শনের জন্য আমাদিগকে ধারণ কর। আকাশের চন্দ্রমা সুধাময় কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া সমুদিত হইয়াছেন, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশু সে সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত, সে তাহার নিজের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু না পাইয়া কাঁদিয়া আকুল। এই মুগ্ধ শিশুর ক্রন্দন নিবারণের জন্য জননী যেমন পরম রমণীয় চন্দ্রমা দর্শন করাইবার জন্য তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করেন, জগজ্জননি, তুমি ও আমাকে তোমার মহা রমণীয় দর্শনের জন্য ক্রোড়ে ধারণ কর, তোমার আনন্দময় স্বরূপ চন্দ্রমার ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ও তুচ্ছ বস্তুর জন্য আমার আকুল ক্রন্দন ভূলিয়া যাই—তোমার স্বরূপ-সুধায় গলিয়া অমৃতময় হইয়া যাই।

শ্রীকেদার নাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।
সহকারী সম্পাদক।

——

৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামিপদ কমলের জীবনী বর্ণনে প্রয়াস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্ঞান স্বামীজীর একটী মুখ্য স্বরূপ-জ্ঞাপক লক্ষণ এবং জ্ঞানার্জ্জন প্রবৃত্তি তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ক্রিয়াবিধায়ক শক্তি, কিন্তু এই জ্ঞানপিপাসা ও তাঁহার সেই বিশুদ্ধ অলৌকিক ভক্তি দ্বারাই নিয়ামিত বলিতে হইবে; জ্ঞান প্রার্থনা করার অর্থ সেই জ্ঞানস্বরূপ, বেদস্বরূপ ভগবান্‌কেই প্রার্থনা করা, জ্ঞান বা

বিদ্যাকে স্বামীজী কখনও ভগবান্ হইতে পৃথক্‌রূপে চাহেন নাই, যে জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ বুঝাইয়া দেয়, যে জ্ঞান বা যোগ ভগবানের সমীপে উপনীত করিয়া দেয়, তিনি তাদৃশ জ্ঞানেরই প্রার্থনা করিয়াছেন, সমগ্র জীবন তাদৃশ জ্ঞান বা যোগেরই অনুশীলন করিয়াছেন, যোগ বা বিদ্যার অন্য কোন রূপের কখন উপাসনা করেন নাই। ভগবানের চরণ লক্ষ্য করিয়া যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত পুরুষের সমীপে যোগ বিভূতি সকল পথে পর্য্যটনশীল পুরুষের গাত্রে মার্গস্থ ধূলিসংযোগের ন্যায় আপনা হইতেই আসিয়া সমুপস্থিত হইয়া থাকে। স্বামীজীর যোগবিভূতি সকল এই ভাবেই সমধিগত হইয়াছে, বিভূতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কখন যোগের অনুশীলন করেন নাই। যথার্থ বৈরাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে তাহা করাও প্রাকৃতিক নহে। বিভূতি সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা ভগবান্‌কে এইরূপই বলিয়াছেন, "তোমার বিভূতি তোমাতেই থাক্, আমার প্রয়োজন হইলে চাহিয়া লইব, এবং পরে আবার তোমারই থাকিবে, আমি জানিব, তোমার শক্তির দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইল, যাহা কিছু শক্তি সব তোমারই; আমাকে বিভূতি দিলে হয়ত কখন তাহা 'আমার' বলিয়া অভিমান হইতে পারে; অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র যেমন প্রয়োজন হইলে পিতার নিকট হইতে ধন চাহিয়া লয়, ধন কিন্তু পিতার নিকটেই থাকে, সেইরূপ আমাকে তোমার শিশুসন্তান বলিয়াই জ্ঞান করিও, আমার প্রয়োজন হইলে আমাকে ধন দিও, নচেৎ তোমার ধন তোমার কাছেই রাখিও। 'বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে, সব তোমার, আমিও তোমার' আমি সর্ব্বদা এই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে চাই, 'ইহা আমার' এরূপ অজ্ঞান বা ভ্রান্তিতে কখন যেন পতিত না হই।"

অবিদ্যা ক্লিষ্ট জীবগণের ক্লেশমোচনেচ্ছাই যে স্বামীজীকে প্রধানতঃ জগতে আবির্ভূত করিয়াছিল, 'সংসারিজীবগণকে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ হইতে মুক্ত করিব, সর্ব্বতোভাবে সুখী দেখিব', ইত্যাকার অভিমানবশতই যে তাঁহার জন্মগ্রহণ হইয়াছিল, *তিনি যে অধিকারী পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যে সকল গুণ ও প্রবৃত্তি সহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

---

* তাঁহার জন্মের কারণ সম্বন্ধে ভৃগুসংহিতায় একস্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—"* * * অভিমানাৎ পুনর্জন্ম * * * হিতায় জগতাং কবে॥"

জীবগণের দুঃখোৎপত্তি মল বা স্বরূপচ্যুতি হইতেই হইয়া থাকে। অতএব মলশোধনই দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তির হেতু। মল ত্রিবিধ ; মনোমল, বাগ্মল ও কায়মল ; ইহাদের শোধন যথাক্রমে যোগশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান হইতে হইয়া থাকে। স্বামীজী এই ত্রিবিধ শাস্ত্রেই প্রাগভবীয় পূর্ণ পারদর্শিতা সহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।*

উক্ত শাস্ত্রত্রয়ে এরূপ একান্ত নিষ্ঠা হইবার কারণ কি, তাহা চিন্তা করিতে যাইলেই স্বামীজীর স্বরূপ অনেকাংশে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জীবের প্রতি আত্যন্তিক করুণাই ইহার কারণ ; জীবকে কোন দুঃখে দুঃখী দেখিতে যিনি পারেন না, জীবকে সর্ব্বতোভাবে সুখী দেখিবার যাঁহার তীব্র অভিলাষ, তাঁহারই উক্ত শাস্ত্রত্রয়ে এরূপ একান্ত প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব, নচেৎ নহে। জীবের প্রতি এত প্রেম, এত করুণা কাঁহার হইতে পারে, 'দয়ানিধি,' 'কৃপাসিন্ধু' 'করুণাসাগর' প্রভৃতি শব্দ বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে তাহাদের ঠিক অর্থবোধ হয় নাই, করুণাসাগর কিরূপ বস্তু তাহা ঠিক বুঝি নাই, ভগবান্ করুণাসাগর, বা কেহ যে করুণাসাগর হইতে পারেন, তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় নাই ; স্বামীজীর জীবন দেখিয়াই তাহা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারি, স্বামীজীতে যদি কোন ভাব সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক লক্ষীভূত হইয়া থাকে, তবে তাহা ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং জীবের প্রতি করুণা। 'এত করুণা কাঁহার হইতে পারে' ? এই প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিতে যাইয়া আমাদের মনে হইয়াছে :—প্রকৃত যোগের অনুশীলন সমাপ্ত হইলে, যথার্থ আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলে, জীবন্মুক্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, বিশ্বকে আত্মবোধে দেখিতে সমর্থ হইলে, ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হইলে, সদা ভগবদ্ভাবে পূর্ণরূপে ভাবিত হইলে,—ও যখনই জীবের প্রতি ঈদৃশ করুণার আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর এক কথা ; ভগবান্ শ্রীরামাবতারে করুণার আতিশয্য দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং শঙ্কর চিরদিনই দয়ার সাগর ; অতএব "করুণৈকসীম" শ্রীরামচন্দ্রের এবং "দয়াসারসিন্ধু" শঙ্করের অপররূপ ** স্বামীজীও যে অশেষ করুণার আবাস স্থল হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক।

---

* পাঠকগণের মধ্যে অনেকের বোধ হয় এই সময়ে "যোগেন চিত্তস্য ; পদেন বাচাং, মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোৎ—"পতঞ্জলিদেব সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধির কথা মনে পড়িবে।

ইতঃপর স্বামীজীর জীবনের আর একটী বিশিষ্টতার বিষয় উল্লেখ করিব।

মানব সুখী হইলেও, সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও, শান্তিলাভ করিলেও সকল সময়ে বুঝিতে পারে না কে তাহাকে বস্তুতঃ সুখী করিয়াছে বা সমৃদ্ধির অধিকারী করিয়াছে, কে তাহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে শান্তি প্রদান করিয়াছে। কার্য্যের কারণানুসন্ধান মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও কারণের সূক্ষ্ম রূপ মানবমাত্রের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়না, কারণের অপেক্ষাকৃত স্থূল রূপ প্রাপ্ত হইয়াই অধিকাংশ মানব সন্তুষ্ট থাকে।

পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট প্রতিভাবশতঃ স্বামীজী অল্পবয়স হইতেই সাধারণতঃ অনুপলব্ধ কয়েকটী সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুভব করিয়াছিলেন। বেদই নিখিল জগতের একমাত্র কল্যাণ বা সুখবিধায়ক পদার্থ, বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ, বেদই সগুণ নিগু'ণ ব্রহ্ম, বেদই জ্ঞানরূপে নিখিল জ্ঞেয়ের উদ্ভাসক, বেদই জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান এবং বেদই জ্ঞেয়রূপে বিবর্ত্তিত, বেদই বিষয় এবং বেদই বিষয়ী, শব্দ—বা বেদ—হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বেদই সর্ব্বশাস্ত্রের উৎপত্তিহেতু, মানবের সকল সমীহা বেদচোদিত মানবের সকল সিদ্ধি বেদ হেতুক, বেদ হইতেই নিখিল ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইয়াছে, বেদ, ধর্ম্ম, সত্য, প্রকাশ ও সুখ ইহারা সমানার্থক, বেদবোধিত ধর্ম্মই সুখ—বা—শান্তি লাভের একমাত্র হেতু ইত্যাদি সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি শিষ্টজনোচিত প্রতিভাবশতঃ স্বামীজী অল্পাবস্থা হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই সকল কল্যাণময় তত্ত্বগুলি জগৎকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াগিয়াছেন।

ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কারণ কি, ভারতীয় পৌর্ব্বকালিক সুখ-সমৃদ্ধির হেতু কি, বৈদিক আর্য্যগণের পূর্ব্বতন অতুলনীয় উন্নতির নিদান কি, এবং বর্ত্তমান দুর্গত ভারতের পুনঃ স্বাস্থ্য লাভেরই বা উপায় কি—এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতে গিয়া স্বামীজী 'বেদ' এই নামই আন্তর শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে শ্রবণ করিয়াছিলেন, মনোনেত্রে বেদের রূপই দর্শন করিয়াছিলেন. হৃদয়ে বেদের ছন্দোময় স্পন্দনই অনুভব করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগ অতীত হইয়াছে, ঋষিগণ অন্তর্হিত হইয়াছেন, বেদের অবিদ্যাধ্বান্তনিবারক, সর্ব্বদিগ্বিভাসক, নয়নাভিরাম রূপ মেঘাবৃত হইয়াছে, বেদরূপ জ্বলন্ত পাবক এখন ভস্মাচ্ছাদিত।

*** "রামরূপো ভবেদ্বালঃ"—ভৃগুসংহিতা।

"চন্দ্রভালঃ সমাধৌ চ"—ভৃগুসংহিতা।

হইয়াছেন, বেদের স্মৃতি পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে অনেক স্থলে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, বৈদিক সংস্কারাদির অভাববশতঃ বেদের স্বরূপের অনভিজ্ঞতা, বেদের অনন্তশক্তিমত্তা উপলব্ধি করিতে না পারা; নচেৎ স্পর্শ মণিকে কোন অর্থার্থী ত্যাগ করিতে পারে? এই নিমিত্ত স্বামীজী সর্ব্বকল্যাণ বিধান, নিখিলদুঃখহারক, সর্ব্ব-সুখবিধায়ক বেদের স্বরূপ উন্মোচন করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া জগৎকে বেদের অপূর্ব্ব রূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বয়ং বেদাত্মা ও বেদময় ছিলেন বলিয়াই একালে এ কার্য্য তাঁহাদ্বারা সম্ভব হইয়াছে। কালের প্রভাব ও সংস্কারলোপজনিত যোগ্যতাভাববশতঃ আমরা বেদের স্বরূপ একেবারেই ভুলিতে বসিয়াছিলাম, তিনি কৃপা করিয়া আমাদের নয়নসম্মুখে বেদের সেই অভয়দায়ক, সর্ব্বাভীষ্টসাধক, হৃদয়রমণ ভাস্বর রূপ পুনরপি ধারণ করিয়াছেন। বেদই যে নিখিল জগতের একমাত্র কল্যাণ-বিধায়ক পদার্থ, তাহা সূক্ষ্মদর্শিগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। তাই ঋষিগণ বেদের রক্ষাবিষয়ে এত যত্নবান ছিলেন, তাই ভগবান্ বেদরক্ষার নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন, বেদের রক্ষা না হইলে জগতের রক্ষা হয় না, বেদের পূর্ণরূপ—সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সকলের নাই, তাই বেদ স্মৃতি ও দর্শনাদিরূপে, পুরাণ ও তন্ত্রাদিরূপে আপনাকে রূপিত করিয়া থাকেন। কালে কালে নিত্য বেদের ভিন্ন ভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি হয়, কারণ কালে কালে লোকের গ্রহণযোগ্যতার ভেদ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালের উপযোগী যে রূপ তাহা স্বামীজী তাঁহার গ্রন্থাদিতে জগৎকে প্রদান করিয়াছেন।

অনেক যোগী যোগের অনুশীলনে প্রস্তুত, কিন্তু যোগাভ্যাসের একটী প্রধান উদ্দেশ্য যাহা—বেদের স্বরূপ জানা, সে উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বেদবিৎ হইবার জন্যই যে বিশেষতঃ যোগবিৎ হইতে হয় তাহা ভুলিয়া ("যো যোগবিৎ স বেদবিৎ"), অনেক দ্বিজ বৈষ্ণব ভক্ত ভগবানে ভক্তি করিতে ব্যগ্র, কিন্তু ভগবানের প্রাণ হরণ করিয়া অর্থাৎ বেদকে ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা, ভুলিয়া যান যে বেদই বাসুদেবের প্রাণ ("বেদাঃ প্রাণা বাসুদেবস্য"), অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিরত, কিন্তু ইহাদের মূলকে বিস্মৃত হইয়া, ইহাদের মূলের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া, তাঁহারা ভুলিয়াছেন যে বেদই সর্ব্বদর্শন ও সর্ব্ববিজ্ঞানের একমাত্র প্রসূতি; অনেক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় একান্তনিরত, কিন্তু আক্ষেপ

করিতেছেন এবং অনুকৃত আক্ষেপের সমর্থন করিতেছেন যে বৈদিক আর্য্য জাতির কোন ইতিহাস নাই, তাঁহারা ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন না, তাই তাঁহারা তাঁহাদের কোন ইতিহাস রাখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে অপারগ যে বেদই বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস। প্রাগুক্ত যোগী, ভক্ত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ দোষ নাই, অজ্ঞতাবশত'ই, বেদের স্বরূপ না জানাবশ'তই তাঁহারা ঈদৃশ মত পোষণ করিয়াছেন এবং ঈদৃশ বচন সকল প্রয়োগ করিয়াছেন। বেদ অতি পুরাতন বস্তু, বেদ এই নামটা ভারতবর্ষীয়গণের মুখে প্রায়ই শুনা যায়, বেদকে বৈদিক আর্য্যগণ সর্ব্বোপরি প্রমাণ বলিয়া মনে করে, নিজ ধর্ম্মের মূল বলিয়া জ্ঞান করে, অতএব বেদসম্বন্ধে গবেষণা করা উচিত, যাঁহারা এই নিমিত্ত বেদসম্বন্ধে কিছু গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদকে অসার কাব্য বা কৃষকের গান বলিয়াই প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই স্বামীজী বেদের স্বরূপ উন্মোচনের এত আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন এবং তৎসাধনে এত যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাই স্বামীজী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, বেদ ত্যাগ করিয়া যোগ হয় না, বেদত্যাগী ভক্ত ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে পারেন না, বেদ্‌দেষ্ঠকে জানিতে পারেননা। বেদালোক বিরহিত হইলে দর্শন দর্শনবিহীন হইয়া থাকেন, বেদসম্বন্ধত্যাগেচ্ছু বিজ্ঞান অকৃতজ্ঞ অজ্ঞাননামকপদার্থ।

বেদই যদি প্রকৃত সুখবিধায়ক পদার্থ হন, এবং সুখ যদি মানবমাত্রের ঈপ্সিত পদার্থ হয়, তাহা হইলে মানুষ বেদকে মানিতে চায়না কেন, বেদোক্ত মার্গ অনুসরণ করিতে চায় না কেন, বেদবোধিত ধর্ম্মকে অবলম্বন না করিয়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় কেন? বেদ—শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে না পারাই তাহার কারণ। যথার্থ অর্থবোধ না হওয়া হেতু, প্রতিভাভেদে বহু বিভিন্ন মতের, অনেক বিবাদ বিসম্বাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব যিনি বেদ-শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম উদ্ভাসিত করিয়া দেন, তিনি জগতের কীদৃশ কল্যাণ করিয়া থাকেন, তাহা প্রেক্ষাবান্ মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিরূপে বেদ-শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিরূপে বেদ-শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণের যোগ্যতার উন্মেষ হয়, স্বামীজী তাহা দেখাইয়া দিয়া সমগ্র জগতের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। বেদের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া জ্ঞান ও উপাসনা সম্বন্ধীয় বহু মতভেদের সমন্বয় করিয়া দিয়া স্বামীজী নিজ জীবনে বেদাবতার ঋষিরূপ আমাদের নয়ন গোচর করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থের মূল ও গ্রন্থে অবলম্বনীয় রীতি।

স্বামীজীর জীবনীর অধিকাংশ আমি তাঁহার মুখ হইতেই শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার আত্মীয় ও পরিচিতগণের সকাশ হইতেও কিছু কিছু জ্ঞাত হইয়াছি, পত্রাদি হইতেও অনেকটা সংবাদ পাইয়াছি।

ঠিক কোন্ সময়ে বা কোন্ দিনে জীবনের কোন্ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা অনেক স্থলে বোধ হয় সম্ভব হইবেনা। না হইলেও তত ক্ষতি হইবে না, মনে করি। সাধারণভাবে কালনিরূপণ পূর্ব্বক জীবনের ঘটনাগুলি বিবৃত হইবে। কোন পুরুষের জীবনীবর্ণনে যে, কালের পৌর্ব্বাপর্য্যের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখিয়া ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হয়, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, সাধারণতঃ মানবজীবনে এক একটী বিশিষ্ট শক্তির উন্মেষ এক একটী বিশিষ্ট কালে হইতে দেখা যায়, এবং তৎপ্রতি জীবনের তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা অবস্থাগুলি কারণ এবং সহায়রূপে অবস্থান করেন; অতএব সেই শক্তির যথার্থ পরিচয় দিবার কালে, তাহা কোন্ কোন্ কারণ সহযোগে কোন্ কোন্ অবস্থার আনুকূল্যে কত সময় ব্যাপিয়া উপচিত হইয়া বিশিষ্ট পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস প্রদান করিতে হয়, এবং তজ্জন্য জীবনের ঘটনাগুলির যথাযথ পৌর্ব্বাপর্য্য (chronology)—প্রদর্শ আবশ্যক হয়। স্বামীজীর জীবনে তাদৃশ বিধির বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ,উহাঁর কোন শক্তি, কোন গুণই ইহজীবনে দিনে দিনে উপচিত হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা যেন সকলে উপচিতাবয়ব অবস্থাতেই উহাঁর সহিত আবির্ভূত হইয়াছে। উহাঁর জীবনের প্রথম ভাগে যে জ্ঞান, যে-যে শক্তির ও যে-যে স্বভাবের লীলা দৃষ্ট হয়, জীবনের অন্যান্য ভাগেও সেই জ্ঞান, সেই সেই শক্তি ও সেই সেই স্বভাবের লীলাই অনেকত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি, ভগবান্‌কে পাইবার চেষ্টা, জ্ঞানপিপাসা, জ্ঞানার্জ্জন, যোগাভ্যাস, জীবের প্রতি করুণা, পরোপকার, আর্ত্তের সেবা, বিদ্যার্থীকে জ্ঞানদান, গ্রন্থপ্রণয়ন প্রভৃতি উহাঁর জীবনের সকল ভাগে প্রায় সমভাবেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যৌবনে প্রণীত গ্রন্থাদিতে স্বামীজীর জ্ঞানশক্তির যেরূপ প্রকটিত দৃষ্ট হয়, উত্তর কালে প্রণীত গ্রন্থাদিতেও অনেকত তদ্রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কালের উপচয়ের সহিত উহাঁর জ্ঞানের যে কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। জ্ঞানের যে স্বর্গীয় ধারা আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের উপক্রমণিকাদি প্রথমলিখিত গ্রন্থসমূহে প্রবাহিত হইয়াছিল, উত্তরকালে লিখিত গ্রন্থাদিতেও

তাহাই দৃষ্ট হয়, কাল ও প্রয়োজনের সামান্য ভেদানুসারে রূপাদি (Form) বিষয়ে সামান্য একটু ভেদ দৃষ্ট হয় মাত্র। ভাগবত (ভগবান্ হইতে আগত) শক্তির উপচয়ের আবশ্যকতা থাকে না, সুতরাং স্বামীজীর শক্তিসমূহের বৃদ্ধি-নিয়ম দেখাইবার আবশ্যকতা নাই; স্থলে স্থলে অভিব্যক্তির নিমিত্ত কারণগুলি মাত্র প্রদর্শিত হইবে; অতএব জীবনের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে কালের পৌর্ব্বাপর্য্য বিষয়ক সংবাদ পূর্ণভাবে দিতে না পারিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না মনে করি।

প্রশ্ন হইবে, 'উপচিতাবয়ব' 'জীবন্মুক্ত' ইত্যাদি শব্দের সহিত 'জ্ঞানপিপাসা' 'জ্ঞানার্জ্জন' 'যোগাভ্যাস' ইত্যাদি পদের সামঞ্জস্য হয় কি? 'অধিকারী' পুরুষগণের আবির্ভাবতত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে উক্ত সংশয় নিরস্ত হইয়া যাইবে। জীবন্মুক্ত পুরুষ যদি সর্ব্বদা মুক্তবৎ থাকেন, নিষ্ক্রিয় ও স্থির অবস্থায় অবস্থান করেন, তাহা হইলে আবরগণ কিছু শিখিতে পারেন না। সদাচার পালন, জ্ঞানপিপাসা, যোগাভ্যাস ইত্যাদি মুমুক্ষুধর্ম্মের যদি কেহ আচরণ করিয়া দেখাইয়া না দেন, তাহা হইলে আমরা তাহা শিখিব কি করিয়া? অতএব তাঁহাদের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও লোকপ্রয়োজন-বশতঃ, লোকশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা উক্তরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে পূর্ণ সংবাদ পাঠকগণকে অন্যত্র দিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজীর জীবনী তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থসমূহে সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত আছে; কিন্তু স্বামীজীর গ্রন্থনিবদ্ধ উক্তিগুলি সর্ব্বত্র সকলের পক্ষে সুগম নহে। এই নিমিত্ত একটু উপবৃংহণ আবশ্যক; বিশেষতঃ ভক্তজন ও জ্ঞানপিপাসু মুমুক্ষু-গণের তাঁহার জীবনেতিহাসের একটু বিবৃতরূপ সন্দর্শনের অভিলাষী হওয়াই প্রাকৃতিক। স্বামীজীর জীবন বেদের প্রত্যক্ষ রূপ, তিনি নিজ জীবন দ্বারা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদকেই সমুদাহৃত করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে স্বামীজীর জীবনী একাধিক ভাগে প্রকাশিত হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাঠক-গণকে পরে বিজ্ঞাপিত করিবার ইচ্ছা রহিল। যাঁহার জীবনীবর্ণনে প্রয়াসান্বিত হইয়াছি তাঁহার নামতত্ত্বটী প্রথমেই প্রকাশ করা উচিত মনে করিয়াছি, কারণ, ইহাও অনেকের পক্ষে সুগম নহে। তৎপরে স্বামীজীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। তৎসহ বা তদন্তে স্বামীজীর জীবন যে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের রূপ তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইবে।

পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, স্বামীজীর জীবন অনেক স্থলে সাধারণের পক্ষে সুবোধ্য না হইবার কথা। স্বামীজীর জীবনের অন্ত্যভাগের ৺কাশীধাম হইতে অন্তিমবার বঙ্গদেশে আসিবার পরবর্ত্তী কালের ব্যবহার কোন কোন স্থলে কাহার কাহার পক্ষে দুর্বোধ্য হইয়াছে। তাঁহার দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেকের হৃদয়ে বিশেষতঃ ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। আমি এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না। যে সকল উপকরণের সদ্ভাব থাকিলে তাঁহার জীবনের ও তৎকালের ইতিহাস তাঁহাদের সুবোধ্য হইত তাহাদের অভাববশতই তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমার কর্ত্তব্য হইবে, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করা, তাঁহাদের ভ্রান্ত জ্ঞান অপসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে তৎসম্বন্ধীয় সত্য জ্ঞান নিবেদন করা। অতএব প্রার্থনা, তাঁহারা যেন সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয়বিশিষ্ট হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করেন, যাবৎ এ সকল বিষয়ের আলোচনার যোগ্য কাল না উপস্থিত হয়।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

শোক সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে লিখিতেছি যে ২৫শে কার্ত্তিক ১৩৩৬ সাল সোমবার রাত্রি ১টার কিঞ্চিৎপরে কাশীমবাজারের বিখ্যাত স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, তাঁহার কলিকাতাস্থ ৩০২ নম্বর অপার সারকুলার রোডের ভবনে বঙ্গভূমির জনসাধারণকে ও আত্মীয়গণকে কাঁদাইয়া ৭১ বৎসর বয়সে স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। এমন পরদুঃখকাতর, এমন সর্ব্বলোকপ্রিয়, এমন সর্ব্বশুভকর্ম্মেরত, এমন দাতা, এমন সাহিত্য সেবক, এমন স্বার্থত্যাগী মহাপ্রাণের পুরুষ এই বঙ্গদেশে বহুকাল জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন সকল বাঙ্গালীর শিক্ষনীয়। বহু চেষ্টা করিলেও তাঁহার কার্য্যপটুতার, দানের, স্বার্থত্যাগের, প্রতিভার বিবরণ আমরা লিখিতে পারিব না। কবি মধুসূদন স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যাঁরে নাহি ভুলে।
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন॥"

আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি স্বর্গীয় মহারাজকে বঙ্গদেশের "সর্ব্বজনে" আপনাদিগের মনের মন্দিরে নিত্য সেবিবে, সুতরাং কবি মধুসূদনের ভাষায় মহারাজ যথার্থই ভাগ্যবান। তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। মহারাজকুমারকে সান্ত্বনা দিবার বাক্য আমাদের নাই।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী
৭৭।১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

পরলোক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন লিখিত।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তমৃতমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিত॥

শ্রীগীতা ৮।৬

হে কৌন্তেয়! চিরজীবনে সর্ব্বদা চিন্তা জন্য মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্থূলদেহ পরিত্যাগ কালে মনের সংকল্প শক্তি যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সূক্ষ্ম শরীর তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় যে ব্যক্তি পার্থিব ভোগ্য বিষয় চিন্তা করে, সে পুনঃ পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া থাকে; যিনি শিব বিষ্ণু প্রভৃতি চিন্তা করেন, তিনি তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হন। ভাগবতে এই সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত আছে। রাজা ভরত বিভব ছাড়িয়া বনে গিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াও মৃগশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হওয়ায় এবং সর্ব্বদা তাহারই ভাবনায় তন্ময় হওয়ায় সাধনভজন হারাইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকালেও তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিয়া হরিণ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মাধর্ম্ম মানুষের চিত্তবৃত্তি। সুভাব নিয়া মরিলে সুফল লাভ করিবে, এবং কুভাব নিয়া মরিলে কুফল পাইবে ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তম বিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥

শ্রীগীতা ১৪।১৪

যদি দেহাভিমানী জীব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে নির্ম্মল লোকে তাহার গতি হইয়া থাকে।

ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দেওয়ার জন্য মুমুর্ষুর কর্ণে দেব দেবীর নাম শুনান প্রথা আবহমান কাল প্রচলিত আছে। এই উদ্দেশ্যেই গঙ্গাযাত্রা ও তীর্থাদিতে মৃত্যুর ব্যবস্থা। তীর্থাদির স্থান প্রভাবে মানুষের মনে সুবাসনা জাগরিত হয় এবং জীবের শুভ লোকে গমনের যোগ্যতা সম্পাদিত হয়। কোন স্থানে মানুষের দেবভাব ও কোন স্থানে পিশাচভাব জাগিয়া উঠে, ইহা আমরা নিয়ত লক্ষ্য করিতেছি। স্থান প্রভাবে লোকের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন অস্বীকার করা যায় না।

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ মলিনস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতাস্মৃতা॥

কাশীখণ্ড পূর্ব্বকাণ্ড ৬।৪০

ভূমির অদ্ভুত প্রভাব, জলের প্রভাব, এবং মুনিগণের অধিষ্ঠান তীর্থ সকলের পবিত্রতার কারণ। স্থানের শক্তি ও সাধু মহাত্মাগণের তপস্যা প্রভাবে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং স্থানীয় পবিত্র প্রকৃতির গুণে তমোগুণী ব্যক্তির সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়। এই জন্যই তীর্থে পবিত্র করিবার যোগ্যতা বিদ্যমান। এই সকল স্থানে গমন করিলে স্বতঃই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল ফুটিয়া উঠে।

শ্রাদ্ধে কতগুলি মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে। মন্ত্রগুলি শুদ্ধরূপে সংস্কৃত ভাষায় যথাবিধি উচ্চারণ করা আবশ্যক। ভাষান্তর করিয়া পাঠ করিলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়। মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে আত্মশক্তির সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্র শক্তির তেজ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্য বটে মন্ত্র

কতকগুলি শব্দবিন্যাস মাত্র ; কিন্তু শব্দ শক্তির অতুলনীয় প্রভাব। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে শব্দের স্পন্দনদ্বারা কাচের স্থূল জিনিষ ও ভগ্ন করা যায়। আর্য্যগণ মন্ত্রশক্তির প্রভাব ভুবর্লোকে প্রেরণ করার কৌশল অবগত ছিলেন। শ্রাদ্ধের মন্ত্রদ্বারা সূক্ষ্ম ভুবর্লোকে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তদ্বারা প্রেতশরীর স্পন্দিত হইয়া জীবকে শান্তিপ্রদ সূক্ষ্মদেহ ধারণের উপযুক্ততা প্রদান করে। অধ্যাত্মবিৎ শুদ্ধাচার উত্তম ব্রাহ্মণের দ্বারা কার্য্য সম্পাদন না করাইলে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না ; কারণ ঐরূপ ব্রাহ্মণই শুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রগুলিকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে পারেন। এজন্য শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচনের এত কঠোর বিধি।

শ্রাদ্ধাদিতে গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রপাঠ দ্বারা প্রেতলোকে জীবের শুভ বাসনা উদ্দীপিত হইয়া উঠে। শুভ বাসনা জাগিয়া উঠিলে অশুভ বাসনা ক্ষয় হইয়া যায় এবং জীবের শুভগতি লাভ হয়।

গীতা মাহাত্ম্যে আছে ,—

> পিতৃণুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতা পাঠং করোতি হি।
> সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ যান্তি স্বর্গতিম্॥
> গীতা পাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধ তর্পিতাঃ।
> পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদ তৎপরাঃ॥

আমাদের শুভ বাসনা দ্বারা ও প্রেত দেহের উপকার সাধিত হইয়া থাকে, এজন্য মঙ্গল কামনা ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য ভুরিভোজন ও দানের ব্যবস্থা আছে। যিনি যত উন্নত অবস্থার লোক হইবেন, তিনি তত মঙ্গল কামনা সূক্ষ্ম জগতে প্রেরণ করিতে পারিবেন ; এবং তদ্বারা প্রেত শরীরের মন্দ কামনামূলক রাজস ও তামস উপাদন গুলি নষ্ট হইয়া জীবকে উত্তম সাত্ত্বিক দেহ ধারণ করাইয়া শান্তি ও সুখ প্রদান করে।

শ্রাদ্ধের দ্রব্যগুলিও শুদ্ধভাবে আহৃত হওয়া আবশ্যক, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে শ্রাদ্ধীয় উপকরণ সংগৃহীত না হইলে কোন ফল হয় না। এজন্য শাস্ত্র এই ক্রিয়ার নাম "শ্রাদ্ধ" দিয়াছেন। যাহা শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। মৃতের ইহলোকে যে সকল বস্তু প্রিয় ছিল, সে সকল বস্তুই শ্রাদ্ধে দেওয়া আবশ্যক।

ভক্তি বিহীন হইয়া শ্রাদ্ধে কেবল বঞ্চনা মূলক কার্য্য করিলে, তদ্বারা পিতৃলোকের উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। শ্রাদ্ধের জন্য অকর্ম্মণ্য নিকৃষ্ট দ্রব্যই লোকে প্রায়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকে ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত একবৎসর কাল মৃতের কল্যাণের নিমিত্ত ১৬টী শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহার ফলে মৃত ব্যক্তি "প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগ দেহং প্রপদ্যতে" প্রেত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগ দেহ ধারণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ কি নরকে গমন করে।

এক বৎসর যাবৎ মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ এইরূপে অন্নজল দান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে প্রেত মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রেত দেহ হইতে মুক্তি লাভ করে। (১)

লোকের কর্ম্মানুসারে যে গতিলাভ হয়, তাহার খণ্ডনের অধিকার কাহারও নাই; ইহা আর্য্যঋষিগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল জীবকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং"; ইহা তাঁহাদেরই কথা। ষোড়শ শ্রাদ্ধাদি দ্বারা জীব প্রেত দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভোগ দেহ ধারণ পূর্ব্বক সত্বর কর্ম্মভোগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে। এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা জীব যখন যে অবস্থায় থাকে তদবস্থায়ই তাহার শান্তিলাভ ঘটে।

শ্রাদ্ধ পাঁচ প্রকার;—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি ও পার্ব্বণ। প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা নিত্য। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক,—ইহাকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলে; কারণ একজনের উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ কাম্য। বিবাহ, অন্নপ্রাসনাদি—মাঙ্গলিক কার্য্যের পূর্ব্বে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ। মহালয়া অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা পার্ব্বন।

---

(১) দ্বাদশাহে ততঃ কুর্য্যান্মাসে পৃথক্।
এবং বিধি সমাযুক্তো প্রেত মোক্ষং করোতি হি॥

গরুড় পুং উঃ খণ্ড ৩৭।১৩

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

বৃহৎ হিন্দু-নিত্যকর্ম্ম। পঞ্চম সংস্করণ দুই খণ্ড একত্র আট আনা। হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক পোষ্ট বরাহনগর গ্রন্থকারের নিকট এবং ১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা মহেশ লাইব্রেরীতে প্রাপ্য।

অদ্যাবধি যতগুলি নিত্যকর্ম্ম বা ঐ জাতীয় পুস্তক দেখা যায় ঐ সকলই ব্রাহ্মণদিগের সহিত মেলামেশা থাকায় অন্যের কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে অসুবিধা হয়, স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই নিত্যকর্ম্মের পুস্তকখানি স্ত্রীলোক এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে লেখায় ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে বড়ই সুবিধা-জনক হইয়াছে। ইহাতে আচমন হইতে স্নান তর্পণ সন্ধ্যা পূজাদি কর্ম্মানুষ্ঠান-গুলির এবং ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুবাদের ভাষা বেশ সরল হইয়াছে। এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে আচমন ও শিক্ষাতত্ত্ব হইতে উপাসনাতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সন্ধ্যা পূজাদি তত্ত্ব, শিবলিঙ্গ ও শ্যাম শ্যামা তত্ত্ব ও বর্ণাশ্রমী দিগের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য প্রভৃতি বহুতত্ত্ব ব্যাখ্যা লেখা থাকায় পুস্তক খানি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা সর্ব্বজাতীয় হিন্দু নরনারীকে এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক বরাহনগর সানুবাদ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ॥০ আট আনা। হইতে প্রকাশিত দেবীসূক্ত অর্গলা কীলক ও কবচাদির অনুবাদ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা গুলি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিলাম। মূলচণ্ডীর অনুবাদ ও বেশ সরল হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রার্থনা প্রবন্ধে বর্ত্তমান সমাজের শোচনীয় অবস্থা এবং তাহার প্রতিকার প্রার্থনা কথাগুলি বেশ উপদেশ পূর্ণ হইয়াছে। চণ্ডীপাঠ ক্রম ও ব্যবস্থা প্রভৃতি সুপ্রণালীতে লেখায় সাধারণের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। ফল কথা এই চণ্ডীখানি নূতন ধরণের বলা যায়। মূল্য ও সুলভ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান।—১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মহেশ লাইব্রেরি।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় প্রোক্তবচঃ শ্রুত্বাত্যন্ত সুকৌতুকী।

জামদগ্ন্যঃ পুনরপি পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ॥ ১॥

টীকা] আত্রধ্যায়ে ধাম পন্থে মাহাত্ম্য শ্রবণেঽপি বৈ। তৎসঙ্গ কারণমিতি চাখ্যানেন নিরূপ্যতে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ে মাহাত্ম্য শ্রবণাদ্ ভক্তিস্তত উপাসনং ততো বিচারোদয় ইত্যুক্তম্। তত্র মাহাত্ম্য শ্রবণে এব কিংকারণমিতি পপ্রচ্ছ ইত্যাহ (হারিতায় নমঃ ?) দত্তাত্রেয়েতি। ১—২॥

বঙ্গানুবাদ] ভগবন জমদগ্নি পুত্র পরশুরাম দত্তাত্রেয়-কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন, এবং বিনয়ান্বিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।১॥

ভগবন! গুরুণাঽথোক্তং ভবতা যত্তথৈব তৎ।

অবিচারাৎ পরোনাশঃ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা জনৈঃ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ] ভগবন্, আপনি গুরু, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সেইরূপই বটে—মানবগণ অবিচারবশেই সর্ব্বতোভাবে পরম নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২॥

বিচারেণ ভবেচ্ছেয় স্তন্নিদানমপি শ্রুতম্।

মাহাত্ম্য-শ্রুতিরিত্যেব, তত্রমে সংশয়ো মহান্॥৩॥

টীকা] তত্র মাহাত্ম্য শ্রুতৌ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ] বিচারে শ্রেয়ো লাভ হয়,শুনিলাম; মাহাত্ম্য—শ্রবণই বিচারের মূল তাহাও শুনিলাম। কিন্তু এই মাহাত্ম্য—শ্রবণ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আসিতেছে॥৩॥

কথংবা তদপি প্রাপ্যং সাধনং তত্র কিং ভবেৎ।

স্বাভাবিকং তদ্‌যদিস্যাৎ তৎসর্ব্বৈর্ন কুতঃ শ্রুতম্॥৪॥

টীকা] তদপি—মাহাত্ম্য শ্রবণমপি। প্রাণি মাত্র-স্বাশনায়া পিপাসাদিবৎ স্বাভাবিক মেবৈতৎ ইতি চেদাহ—তৎসর্ব্বৈরিতি॥৪॥

বঙ্গানুবাদ] সেই মাহাত্ম্য—শ্রবণই বা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে ? এই বিষয়েই বা সাধন কি ? যদি ক্ষুধা পিপাসাদির ন্যায় ইহা স্বাভাবিক বলা যায়, তাহা ও সঙ্গত হয় না, কারণ তাহা হইলে এই মাহাত্ম্য-শ্রবণ সকলের ভাগ্যে ঘটে না কেন ? ॥ ৪॥

অহং বাল্যাবধি কুতঃ প্রবৃত্তিং নাপ্তবানিহ ।
দুঃখং মত্তোঽধিকং প্রাপ্তা বিহতাশ্চপদে পদে ॥৫॥

টীকা] শৌর্য্য বীর্য্যাদিবৎ তাদৃশানামেবায়ং স্বভাব ইতিচেদাহ অহং বেতি। ইহ মাহাত্ম্য শ্রবণে। দুঃখ প্রাপ্তিরেবাত্রমূলমিতিচেৎ আহ দুঃখমিতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ] [যদি বলা যায়—শৌর্য্যবীর্য্যাদির ন্যায় ইহা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষেই স্বাভাবিক, সকলের নহে, ইহাও সঙ্গত হয় না, কারণ] আমিই বা আজ পর্য্যন্ত এই মাহাত্ম্য—শ্রবণে প্রবৃত্তি সম্পন্ন হই নাই কেন ? [যদি বলা যায় বহু দুঃখ ভোগে নির্ম্মল না হইলে মানবের এ বিষয় প্রবৃত্তি হয় না। ইহাও সমীচীন হয় না, কারণ]—বহু লোক আমার অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ প্রাপ্ত ও পদে পদে পরাজিত হইয়া থাকে, তাহাদের ও ত এই মাহাত্ম্যশ্রবণে প্রবৃত্তি দেখা যায় না ॥ ৫ ॥

নকুতঃ সাধনং প্রাপ্তা এতন্মে কৃপয়া বদ ।
ইত্যাপৃষ্টঃ প্রাহ ভূয়ো হৃষ্টো দত্তোদয়া নিধিঃ ॥৬॥

টীকা] অহং যথা রামেণ বিহতঃ পরাজিত এব মন্যে পদে বিহতা অপি কুতো ন মাহাত্ম্যং শ্রত বন্তঃ এতদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ] এইরূপে বহু দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া ও পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া ও ইহারা মাহাত্ম্য-শ্রবণরূপ বিচার-সাধন কেন লাভ করে না, কৃপা করিয়া আপনি ইহা আমাকে বলুন। এইরূপ জিজ্ঞাসায় আনন্দিত হইয়া দয়ানিধান ভগবান্ দত্তাত্রেয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

শৃণুরাম প্রবক্ষ্যামি নিদানং শ্রেয়সঃ পরম ।
সদ্ভিঃ সঙ্গঃ পরং মূলং সর্ব্ব দুঃখ নিবর্হনম্ ॥ ৭ ॥

টীকা] নিদানমাদি কারণম্। মূলমাদি কারণম্ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ] রাম, শ্রবণ কর—আমি শ্রেয়োলাভের পরম নিদান বলিতেছি। সৎসঙ্গই শ্রেয়োলাভের পরম নিদান। ইহারই চরম ফল সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ॥৭ ॥

পরমার্থ-ফল প্রাপ্তৌ বীজং সৎসঙ্গ উচ্যতে ।
ত্বঞ্চাপি তেনহি সতা সংবর্ত্তেন মহাত্মনা ॥ ৮
সঙ্গতঃ সন্নিমাং প্রাপ্তো দশাং শ্রেয়ঃ ফলোদয়াম্ ।
সন্ত এবহি সংযাতা দিশন্তি পরমং সুখম্ ॥ ৯ ॥
বিনা সৎসঙ্গতঃ কেন প্রাপ্তং শ্রেয়ঃ পরং কদা ।
লোকেঽপি যাদৃশং সঙ্গং যোযঃ প্রাপ্নোতি মানব ॥ ১০ ॥

তৎফলং স সমাপ্নোতি সর্ব্বথা নহি সংশয়ঃ।
অত্রেতি কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণু রাম কথা মিমাম॥ ১১॥

টীকা] তচ্ছ রামে এব নিদর্শয়তি ত্বঞ্চেতি॥ ৮॥ সৎসঙ্গং স্তৌতি সন্তইতি ॥৯—১০॥ তৎফলং সঙ্গানুরূপং সদসদ্বা। পূর্ব্বাধ্যায়ে সংবর্ত্তোপদিষ্টং বিজ্ঞানং সংবর্ত্তস্য তাদৃশস্থিতিঞ্চ বদেত্যুক্তম্‌, তৎসর্ব্বং সৎসঙ্গ ফলত্বেন বক্তুমাখ্যায়িকা-মুপক্রমতে অত্রেতি॥ ১১—১৮॥

বঙ্গানুবাদ] সৎসঙ্গই পরমার্থরূপ ফলের প্রাপ্তিতে বীজ স্বরূপ। তুমিও সজ্জন ও মহাত্মা সংবর্ত্তের সঙ্গ মাহাত্ম্যেই শ্রেয়ঃ ফলোদয় কারিণী এই অবস্থা লাভ করিয়াছ। নিকটবর্ত্তী হইলে সজ্জনগণই পরমসুখকর পথের উপদেশ করিয়া থাকেন॥৮—৯। সৎসঙ্গ ব্যতিরেকে কে কবে পরমশ্রেয় লাভ করিয়াছে? লোকেও দেখা যায়—যে ব্যক্তি যে প্রকার সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সে তদ্রূপ ফল লাভ করে। আমি তোমার নিকট এই বিষয়ে একটী ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি রাম, তুমি আমার কথিত উপাখ্যানটী শ্রবণ কর॥১০—১১॥

পুরা দশার্ণাধিপতি মুক্তা চূড় ইতী রতঃ।
তস্য পুত্রৌ হেমচূড় মণিচূড়ৌ বভূবতুঃ॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ] পুরাকালে দশার্ণ প্রদেশে মুক্তাচূড় নামে এক রাজা ছিলেন। হেমচূড় ও মণিচূড় নামে তাহার দুইটি পুত্র ছিল॥ ১২॥

সুরূপৌ সুগুণৌ চোভৌ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদৌ।
কদাচিন্মৃগয়োৎসাহাৎ সেনাভিঃ পরিবারিতৌ॥ ১৩॥
সহ্যাচল বনং ভীমং সিংহব্যাঘ্রাদি-সঙ্কুলম্‌।
মহাবলৌ বিবিশতু ধনুর্ব্বান ধরৌ কিল॥ ১৪॥
অথ তত্র মৃগান্‌ সিংহান বরাহান্‌ মহিষান্‌ বৃকান্‌।
জঘ্নতুর্নিশিতৈ র্বাণৈ লাঘবাৎ কার্ম্মুকচ্যুতৈঃ॥ ১৫॥
এবং বিনিঘ্নতোর্বন্যান্‌ মৃগান্‌ রাজকুমারায়োঃ।
চণ্ডবায়ুঃ প্রাদুরাসীচ্ছর্করাশ্ম প্রবর্ষণঃ॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ] তাঁহারা উভয়েই সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, সুরূপ ও গুনবাণ। কথিতআছে, কখনও মৃগয়া কবিবার উৎসাহে মহাবল সম্পন্ন সেই ভ্রাতৃদ্বয় সেনা-পরিবৃত ও ধনুর্ব্বাণধারী হইয়া সহ্য পর্ব্বতের সিংহ ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কুল ভয়া-নক বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন॥ ১৩—১৪॥

অনন্তর তাহারা উভয়ে ক্ষিপ্রতার সহিত কার্ম্মুকচ্যুত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা—মৃগ, সিংহ, বরাহ, মহিষ ও বৃক প্রভৃতি জন্তুদিগকে বধ করিয়াছিলেন॥ ১৫ ॥

রাজকুমারদ্বয় এইরূপে বন্য পশু বধ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রস্তর কঙ্কর-বর্ষী প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল॥ ১৬॥

পাংশুভি র্নভ আক্রান্তমভূদ্দর্শনিশোপমম্।
ন দৃশ্যতে তত্র শিলা বৃক্ষঃ পুরুষ এববা॥ ১৭॥
কুতোনীচোচ্চতাং পশ্যেদেবং ধ্বান্তাবৃতোগিরিঃ।
নিহতা শর্করা বর্ষৈঃ সেনাত্যন্তং পলায়িতা॥ ১৮॥
বৃক্ষান্ কেচিচ্ছিলাঃ কেচিদ্‌গুহাঃ কেচিদুপাসদুঃ।
অশ্বারূঢ়ৌ রাজ পুত্রাবপি দূরং পলায়িতৌ॥ ১৯॥
হেমচূড় কচি তত্র প্রপেদে তাপসাশ্রমম্।
কদলী খর্জ্জুর বনৈরাক্রান্তমতি সুন্দরম্॥ ২০
তত্রাপশ্যচ্ছুভাং কাঞ্চিৎ কন্যা মগ্নিশিখামিব।
প্রদ্যোতমানাং বপুষা তপ্তহেম সুবর্চ্চসাম্॥ ২১॥
তাং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রোপি পদ্মামিব সুরূপিণীম্।
স্মবমান ইবা পৃচ্ছৎ কাত্বং পদ্মাননে বনে॥ ২২॥

টীকা] উপসেদুঃ—সংশ্রিতা বভূবুঃ॥ ১৯—২২॥

বঙ্গানুবাদ] আকাশ ধূলী-পটলে আক্রান্ত হইয়া অমানিশার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তথায় শিলা, বৃক্ষ বা পুরুষ কিছুই পরিলক্ষিত হইল না॥ ১৭॥

পর্ব্বত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, নীচতা বা উচ্চতা কিরূপে পরিলক্ষিত হইবে? কঙ্কর বর্ষণে অতিমাত্র আহত হইয়া সেনাগণ পলায়ন করিল॥ ১৮॥

কেহ বৃক্ষের, কেহ বা গুহার আশ্রয় লইল, অশ্বারোহী রাজপুত্রদ্বয়ও দূরে পলায়ন করিলেন॥ ১৯॥

হেমচূড় সেই বনের কোনও প্রদেশে কদলী ও খর্জ্জুর বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত অতি সুন্দর এক তপোবন প্রাপ্ত হইলেন॥ ২০॥

সেই আশ্রমে তিনি মনোরমা কোন কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যার শরীর অগ্নি-শিখায় দেদীপ্যমান তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় কান্তিযুক্তা॥ ২১॥

রাজপুত্র লক্ষীর ন্যায় সুরূপশালিনী সেই কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—

নির্জ্জনে ভীতি জননে নির্ভয়ে বশমাস্থিতা ।
কস্যাত্বমপি কেনাত্র নিবসস্যেকলা কথম্‌ ॥ ২৩ ॥
পৃষ্টৈব প্রাহ সা কন্যা রাজপুত্রমনিন্দিতা ।
স্বাগতন্তে রাজপুত্র বিষ্টরং প্রতি পদ্যতাম্‌ ॥ ২৪
তপস্বিনা ময়ং ধর্ম্মঃ পূজনং হ্যতিথেস্তু যৎ ।
শ্রান্তং ত্বামভি পশ্যামি ব্যথিতং চণ্ড বায়ুনা ॥ ২৫ ॥
বদ্ধা খর্জ্জুর বৃক্ষেঽশ্ব মত্রাসীনো গতশ্রমঃ ।
মদ্‌বৃত্তমর্হসি শ্রোতুমিত্যুক্তঃ স তথাঽকরোৎ ॥ ২৬ ॥

টীকা] কেন হেতো নিবসসি, কথমেকলামিবসসীতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৩ ॥

বিষ্টরম্‌ আসনম্‌ ॥ ২৪ ॥ মৎপ্রশ্নস্যোত্তর মনুক্তা কুত আদৌ পূজনং ক্রিয়তে ইতি চেদাহতপস্বিনামিতি । অত্র হেত্বন্তরমাহ শ্রান্তং ত্বামিতি ॥ ২৫ । ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ] হে পদ্মাননে, তুমি কে ? এই নির্জন ও ভয়ঙ্কর বনে নির্ভয়ার মত কিরূপে সুখে বাস করিতেছে ? তুমি কাহার ? এবং কি জন্য এই বনে একাকিনী বাস করিতেছ ? । ২৩ ॥ সেই অনিন্দিতা কন্যা প্রশ্নের পরক্ষণেই রাজপুত্রকে বলিল—রাজপুত্র আপনার শুভাগমন ত ? এই আসন গ্রহণ করুন ॥ ২৪ ॥ অতিথির পরিচর্য্যা তপস্বিগণের ধর্ম্ম, আপনাকে পরিশ্রান্ত প্রচণ্ড বায়ুতে ব্যথিত দেখিতেছি ॥ ২৫ ॥

খর্জ্জুর বৃক্ষে অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক এই আসনে উপবেশন করিয়া শ্রমাপনোদন করুন, পরে আমার ঘটনা শ্রবণ করিবেন। সেই সুন্দরী এইরূপ বলিলে রাজপুত্র তাহাই করিলেন ॥ ২৬ ॥

ফলানি ভোজয়া মাস পায়য়ামাস সদ্‌ রসম্‌ ।
এবং তং বিশ্রমং প্রাপ্তং রাজপুত্র অনিন্দিতা ॥ ২৭ ॥
প্রাহ সা মধু সংশ্রাব পেশলা কারয়া গিরা ।
রাজপুত্র ব্যাঘ্র পাদো মুনিঃ শিব পদাশ্রয়ঃ ॥ ২৮

টীকা] সদ্‌রসং স্বাদূদকম্‌ ॥ ২৭ ॥ পেশলা কারয়া শোভনয়া ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ] সেই কন্যা রাজপুত্রকে ফল ভোজন করাইলেন, সুস্বাদু জল পান করাইলেন। রাজপুত্র এইরূপে বিশ্রাম লাভ করিলে সেই অনিন্দিতা কন্যা মধুদ্রবের ন্যায় সুমধুর বাক্য রাজপুত্রকে বলিলেন। রাজপুত্র ব্যাঘ্রপাদ নামে শ্রীশিব চরণে শরণাগত এক মুনি ছিলেন। যিনি নিজ তপোবলে পুণ্যতম

লোকসমূহ জয় করিয়াছিলেন। সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন এই মুনিবর অন্যান্য মুনিপুঙ্গবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইতেন। আমি তাঁহারই ধর্ম্ম কন্যা; 'আমি হেমলেখা' নামে বিশ্রুত ২৭-২৮॥

যেন লোকাঃ পুণ্যতমাজিতাঃ স্বতপসো বলাৎ।
পরাবরজ্ঞো হ্যানিশং পূজিতো মুনি-নায়কৈঃ॥ ২৯॥
তস্যাহং ধর্ম্মতঃ পুত্রী হেমলেখেতি বিশ্রুতা।
বিদ্যুৎ প্রভাখ্যা বিদ্যাধ্রী সা সর্ব্বাঙ্গ মনোরমা॥ ৩০॥
ইমাং বেনা মনু নদীং স্নাতুমভ্যা যযৌ ক্বচিত।
তদা তত্রা জগামার্থাৎ সুষেণো বঙ্গভূপতিঃ॥ ৩১॥
সদদর্শ বিগাহন্তীং নদীং তাং লোক-সুন্দরীম্।
ক্লিন্নাং শুকান্তরাত্যন্ত ব্যক্ত পীন কুচদ্বয়ীম্॥ ৩২॥
কামবাণোহত স্তত্র তাং প্রার্থয় দমাপিসা।
সৌন্দর্য্য-মোহিতা তস্য তদযুক্তিং সমমং সত॥ ৩৩॥

টীকা] পরাবরজ্ঞো ব্রহ্মজ্ঞঃ॥ ২৯॥ তস্যাঃ-ধর্ম্ম পুত্রত্বমেব নিরূপয়িতু-মাহ ধর্ম্মত ইতি ন ত্বমু জেত্যর্থঃ। বিদ্যুদিতি॥ ৩০—৩২॥ অথ সা পিত্যম্বযঃ। সমমংসত অঙ্গীচকার॥ ৩৩-৩৪॥

বঙ্গানুবাদ] কোন সময়ে বিদ্যুৎপ্রভা নাম্নী সর্ব্বাঙ্গে মনোহারিণী প্রসিদ্ধ বিদ্যাধরী এই বেণা নদীতে স্নান করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করেন। সেই সময়ে সুষেণ নাম বঙ্গদেশীয় এক ভূপতিও প্রয়োজন বশতঃ সেই স্থানে আগমন করেন॥ ২৯-৩১॥ রাজা সুষেণ দেখিলেন—এক লোক সুন্দরী রমণী বেণা নদীতে অবগাহন করিতেছে। সিক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রের মধ্য দিয়া তাহার স্তনদ্বয় সুব্যক্তরূপে দেখা যাইতেছে॥ ৩২। রাজা কামবাণে আহত হইয়া সেই রমণীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, অনন্তর সেই বিদ্যাধরী ও রাজার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহার সহিত সঙ্গম স্বীকার করিলেন॥ ৩৩॥

সঙ্গম্যার্থ তয়া রাজা যযৌ স্বনগরং প্রতি।
দধার সাহপিবিদ্যাধ্রী গর্ভং রাজর্ষি বীর্য্যতঃ॥ ৩৪॥
ভীতা হ পচারাৎ পত্যুঃ সা গর্ভং ত্যক্ত্বাহত্র সংযযো।
অমোঘবীর্য্যাৎ রাজর্ষে জাতাহহং কন্যকা ততঃ॥ ৩৫॥
মাং দদর্শ ব্যাঘ্র পাদঃ সন্ধ্যো পাস্ত্যর্থমাগতঃ।
দয়য়া মা মুপাদায়া পালয় জ্জননী যথা॥ ৩৬॥

ধর্ম্মেণ যঃ পালয়িতা প্রোচ্যতে হি পিতৈব সঃ।
অহন্তস্য ধর্ম্ম-পুত্রী পিতৃ-সেবা পরায়ণা ॥ ৩৭ ॥

টীকা] (আমোঘ) বীর্য্যত্বাদহং গর্ভে পরিপাকং বিনৈব তদ্বীর্য্যাৎ কন্যাকা জাতেতি ভাবঃ ॥ ৩৫-৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ] অনন্তর রাজা সুষেণ তাঁহার সহিত সঙ্গম করিয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বিদ্যাধরীও রাজর্ষির বীর্য্যে গর্ভধারণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিদ্যুল্লেখা পতির অতিক্রম হেতু ভীত হইয়া এই স্থানে গর্ভ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর আমিও রাজর্ষির অমোঘ বীর্য হইতে জন্মগ্রহণ করিলাম ॥ ৩৫ ॥

ঋষি ব্যাঘ্রপাদ সন্ধ্যা উপাসনার নিমিত্ত নদীতীরে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন এবং করুণা পরবশ হইয়া আমাকে তুলিয়া লইলেন, এবং জননীর ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

যিনি ধর্ম্মতঃ পালয়িতা, তাঁহাকেও পিতা বলিয়াই বলা হয়, সুতরাং ব্যাঘপাদ আমার ধর্ম্ম-পিতা আমি পিতৃসেবা-পরায়ণা তাঁহার ধর্ম্মপুত্রী ॥ ৩৭ ॥

তস্য মাহাত্ম্যতো মেহত্র ভয়ং নাস্ত্যেব কুত্রচিৎ।
নায়ং সুরাসুরৈর্ব্বাপি কদাচিদ্দুষ্ট বুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রবেষ্টুমাশ্রমোহর্হঃস্যাৎ প্রবিশন্ নাশমাপ্নুয়াৎ।
এতন্মেহভিহিতং বৃত্তং তিষ্ঠ কিঞ্চিন্ন পাত্মজ ॥ ৩৯ ॥
আযাস্যতি স ভগবান্ পিতা মে তং নিরাময়।
প্রণম্যাতং প্রাপ্য চেষ্টং ততঃ কল্যা প্রযাস্যসি ॥ ৪০ ॥
হেমলেখা-বচঃ শ্রুত্বা তৎ সৌন্দর্য্যেণ মোহিতঃ।
ভীতঃ কিঞ্চিৎ প্রবক্তুং তাং বিমনাইব চাভবৎ ॥ ৪১ ॥

টীকা] কথমেকলা নিবসসীত্যস্যা উত্তরমাহ তস্যেতি ॥ ৩৮-৩৯ ॥ রাজপুত্রস্য স্বস্মিন্নভিপ্রায়মালক্ষ্য স্বাঙ্গীকারং দ্যোতয়ন্ত্যাহ প্রাপ্যচেষ্টমিতি। আবয়োরণুরূপত্বান্ন্যাং তুভ্যং দাস্যতোবেত্যাশয়ঃ। কল্যে-উষসি ॥ ৪০ ॥ মাহাত্ম্যাদ্ ভীতঃ—কিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায়ম্ ॥ ৪১-৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ] তাঁহার মহিমায় এই আশ্রমে কোথাও আমার ভয় নাই। সুর বা অসুর যিনিই হউন দুষ্ট বুদ্ধি হইয়া কেহই এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহেন। যদি প্রবেশ করেন, তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবেন। এই আমার

ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। রাজকুমার আপনি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন ॥ ৩৯ ॥ আমার পিতা ভগবান ব্যাঘ্রপাদ আগমন করিবেন তাঁহাকে দর্শন করুন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়া তারপর প্রত্যূষে গমন করিবেন ॥ ৩৮—৪০ ॥

রাজপুত্র হেমলেখার বাক্য শুনিয়া তদীয় সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ও তাহাকে কিছু বলিতে ভীতি অনুভব করিলেন, এবং বিমনা হইলেন ॥ ৪১ ॥

অথালক্ষ্য রাজ-পুত্রং কামস্য বশমাগতম্।
প্রাহ সা বিদুষী ভূয়ো রাজপুত্র ধৃতিং ভজ ॥ ৪২ ॥
আগচ্ছতি পিতা সদ্যস্ততোঽভিলষিতং ভজ।
এবং বদন্ত্যাং তস্যাং স ব্যাঘ্রপাদো মহামুনিঃ ॥ ৪৩ ॥
আজগাম বনাদ্ যত্র পুষ্পাদেঃ কৃত সঞ্চয়ঃ।
মুনিং সমাগতং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রণম্য নাম সংশ্রাব্যোপবিষ্ট স্তেন দেশিতঃ।
অথ দৃষ্টা রাজপুত্রং কামেন বিকৃতাকৃতিম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকা] দেশিতঃ—আজ্ঞপ্ত ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ] অনন্তর বিদুষী হেমলেখা রাজপুত্রকে কাম-বশীভূত লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন—রাজকুমার, ধৈর্য্য ধারণ করুণ ॥ ৪২ ॥

আমার পিতা এখনই আসিতেছেন, তিনি আসিলে পর আপনার অভিলষিত প্রাপ্তি ঘটিবে। এইরূপ বলিতে বলিতেই মহামুনি ব্যাঘ্রপাদ—যে বনে পুষ্পাদি চয়ন করিতে গিয়াছিলেন—তথা হইতে আগমন করিলেন। মুনিকে সমাগত দেখিয়া রাজপুত্র সমুত্থিত হইলেন প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় নাম নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর (মহর্ষি ব্যাঘ্রপাদ) রাজপুত্রকে কামবশে বিকৃতাকৃতি দেখিয়া যোগ দৃষ্টিতে সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন, এবং সেই সময়ে কন্যাদান যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া বিবাহের নিমিত্ত হেমলেখাকে রাজপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৪৩-৪৬ ॥

তুষ্টো রাজ কুমারোঽপি তামাদায় পুরংযযৌ।
মুক্তাচূড়ো হৃতি সন্তুষ্টো মহোৎসব বিধানতঃ ॥ ৪৭ ॥
বিবাহমকরোত্তস্য বিধানেন ক্ষিতীশ্বর ॥
অথ রাজ কুমারোঽপি তয়া ক্রীড়াপরঃ সদা ॥ ৪৮ ॥

অত্র কবচাংশে ব্রহ্মাণং প্রতি মার্কণ্ডেয়স্য প্রশ্নমাহ। এই কবচাংশে ব্রহ্মা বলিতেছেন মার্কণ্ডেয়কে। মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে বলেন; পক্ষিরূপ দ্রোণমুনির পুত্র চতুষ্টয় ব্যাসশিষ্য জৈমিনি মুনিকে বলেন।

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥ ৩

পরন্তু সা দেবী নবমূর্ত্তাত্মিকা ধ্যেয়া ইত্যভিপ্রায়েণ তাসাং মূর্ত্তীনাং নামান্যাহ। প্রথমং শৈলপুত্রীতি। নামজ্ঞানে জাতে তদ্‌বাচ্যাকারস্য প্রসিদ্ধত্বাদেব জ্ঞানং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। সর্ব্বোত্তরৈশ্বর্য্যবত্যপি ভগবতী শৈলেন ভক্তেন অতিতপশ্চর্য্যয়া প্রার্থিতা সতি কারুণ্যবশাৎ অতিনীচমপি পুত্রীত্বং স্বীকৃতবতী ইত্যহো ভক্তবাৎসল্যং কিয়ৎ বর্ণনীয়ং ভগবত্যাইতি কূর্ম্মপুরাণে প্রসিদ্ধম্।

ব্রহ্মচারিণীতি—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপং তচ্চারয়িতুং প্রাপয়িতুং শীলমস্যাঃ সা ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মরূপপ্রদেত্যর্থঃ।

চন্দ্রঘণ্টেতি—চন্দ্রোহস্তগতায়াং ঘণ্টায়াং যস্যাঃ চন্দ্রঘণ্টাবৎ নির্ম্মলা বা যস্যা ইত্যর্থঃ।

যদ্বা—"আহ্লাদকারিণী দেবী চন্দ্রঘণ্টেতি কীর্ত্তিতা" ইতি রহস্যাগমোক্তেঃ। যদ্বা চন্দ্রং ঘটয়তি প্রতিবাদিতয়া ভাষতে স্বাস্যাহ্লাদ কারিত্বাভিমানেনেতি।

চন্দ্রঘণ্টা। চন্দ্রাপেক্ষয়াপি অতিশয়েন লাবণ্যবতীত্যর্থঃ।

কুষ্মাণ্ডেতি—কুৎসিৎ উষ্মা সন্তাপস্তাপত্রয়রূপো যস্মিন্ সংসারে স সংসারঃ অন্তে মাংসপেশ্যামুদররূপায়াং যস্যাঃ ত্রিবিধতাপযুক্ত-সংসার ভক্ষণকর্ত্রীত্যর্থঃ "অণ্ডঃ পেশীচ মুষ্কং চ" ইতি মেদিনী ॥৩॥

মার্কেণ্ডেয়—এই লোকে যাহা অত্যন্ত গোপনীয়—উৎকৃষ্ট রহস্য তাহা বলুন।

ব্রহ্মা—ব্রহ্মই ত অতি গুহ্য। তাহাই বলিব?

মার্কণ্ডেয়—না, তাহা নহে। যাহাতে সকলের রক্ষা হয় তাহাই বলুন। ব্রহ্ম ত উত্তম অধিকারীর রক্ষক—সংসারাসক্ত পামর লোকের রক্ষক নহেন।

ব্রহ্মা—দেবীকবচই সকল লোককে রক্ষা করেন।

মার্কণ্ডেয়—অন্য দেবতার কবচও ত আছে? মহানিধির মত যাহা আপনি গোপনে রাখিয়াছেন—যাহা কাহাকেও বলেন নাই তাহাই বলুন। এই কবচে নিঃশসয়ে ঝটিতি রক্ষা হইবে। অন্যথা মহানিধি এই বুদ্ধিতে গোপনে রাখিলে ইহা নিরর্থক হয়।

পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্টং কাত্যায়ণীতি চ।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্॥ ৪

স্কন্দমাতেতি—সনৎকুমারস্য ভগবতী বীর্য্যাদুদ্ভূতস্য স্কন্দ ইতি সংজ্ঞা "ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে" ইতি ছান্দোগ্য-শ্রুতেঃ। তথাচ জ্ঞানিভিরপি যদুদরে জন্মাভিলষণীয়ম্—ইতি অতিশু-দ্ধেত্যর্থঃ।

কাত্যায়নীতি—দেবকার্য্যার্থং কাত্যায়নাশ্রমে আবির্ভূতা তেন কন্যাত্বেন স্বীকৃতেতি কাত্যায়নীতি নাম ভগবত্যাঃ। অস্যানিরন্তরং কুমারীত্বেন শত্যনধীনতয়া স্বতন্ত্রত্বম্।

কালরাত্রীতি—সর্ব্বমারকস্য কালস্যাপি রাত্রির্ণাশিকেত্যর্থঃ। প্রলয়ে কালস্যাপি নাশাৎ।

মহাগৌরীতি—ইয়ং চ মহামানিনী। নর্ম্মোক্তা শিবেন কালীত্যুক্তে তপসা গৌরবর্ণস্য সম্পাদিতত্বাৎ। কালীপুরাণে স্পষ্টমেতৎ॥ ৪

যদি বলেন এই অতি উৎকৃষ্ট রত্ন তোমাকে দিব কেন? দিতেই যে হইবে, কারণ আপনি যে পিতামহ। স্ব-সন্ততি রক্ষার জন্য পিতা-মহের ইহা অবশ্যদেয়॥ ১

(২ শ্লোক)—প্রশ্ন—সর্ব্বভূতোপকারম্ পুণ্যং কবচং শৃনুধ্ব। পুণ্য কথার অর্থ কি ?

উত্তর—একং নিধিবুদ্ধ্যাস্থাপিতমস্তিতং হে মহামুনে শৃনুধ্ব। মহারত্ন একটি আমি মহানিধি বুদ্ধিতে যাহা রাখিয়াছি তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রশ্ন—মহামুনে এই সম্বোধনের স্বার্থতকতা কি ?

উত্তর—সকলের উপকার করিতে প্রবৃত্ত বলিয়া মহামুনি সম্বোধন।

(৩ শ্লোক) প্রশ্ন (১) শৈলপুত্রী (২) ব্রহ্মচারিণী (৩) চন্দ্রঘণ্টা (৪)কুষ্মাণ্ডা (৫) স্কন্দমাতা (৬) কাত্যায়নী (৭) কালরাত্রি (৮) মহাগৌরী (৯) সিদ্ধিদাত্রী প্রথমেই এই নয় নাম করা হইল কেন ?

উত্তর—সা দেবী নবমূর্ত্ত্যাত্মিকা ধ্যেয়েত্যভিপ্রায়েন তাসাং মূর্ত্তীনাং নামান্যাহ। দেবীর নয় মূর্ত্তি। এই নয় মূর্ত্তিতেই দেবীকে ধ্যান করা উচিত এই জন্য নয় নাম ব্রহ্মা প্রথমেই করিলেন।

নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি*নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মনৈব মহাত্মনা ॥ ৫

সিদ্ধিদাত্রীতি=মোক্ষদাত্রীত্যর্থঃ ॥ ইতি=ইতিশেষঃ ॥ সিদ্ধিদাত্রী ইতি নবমং ইত্যন্বয়ঃ।

নবদুর্গা ইতি=যোগিনঃ কায়ব্যূহবদেকস্যা এব দুর্গায়া এতে নবভেদা যে শাস্ত্রে ধ্যেয়ত্বেন প্রোক্তাস্তে ময়া কীর্ত্তিতা ইত্যর্থঃ। অতএব দেব্যাস্ত্র কবচমিত্যেকবচনং সঙ্গচ্ছতে। নাম্নাং স্বকল্পিতত্বশঙ্কাব্যুদাসার্থমাহ—উক্তান্যেতানীতি। মহাত্মনা সর্ব্বজ্ঞেন ব্রহ্মণৈব বেদৈনৈবৈতান্যুক্তানীত্যর্থঃ ॥ ৫

প্রশ্ন—শুধু নাম উচ্চারণ করিলেই কি হইল ?

উত্তর—না—যে জন্য সেই নাম তাহাও জানা চাই—নামের অর্থ জানিলে ভাব আসিবে।

প্রশ্ন—শৈলপুত্রীতি-নাম জ্ঞানে কি পাওয়া যায় ?

উত্তর—ভগবতীর ত অনন্ত ঐশ্বর্য্য। তাঁহার কোথাও প্রিয়ও নাই আর অপ্রিয়ও নাই। সর্ব্বত্র সমভাব। কিন্তু যিনি তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণান্ত করেন তাঁহার নিকটে মাত্র ঐশ্বর্য্য গুটাইয়া মাধুর্য্যে মূর্ত্তি ধরিয়া ধরা দিয়া থাকেন। ভক্ত হিমালয় কঠোর তপস্যায় মাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া "তুমি আমার কন্যা হও" এই প্রার্থনা করায় করুণাপরায়ণা জগজ্জননী তাঁহার পুত্রীত্ব স্বীকার করেন। অহো ভক্তবাৎসল্য ! কূর্ম্মপুরাণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচারিণীতি—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপং তচ্চারয়িতুং প্রাপয়িতুং শীলমস্যাঃসা ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মরূপপ্রদা ইত্যর্থঃ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে যিনি দান করেন তিনি।

চন্দ্রঘণ্টেতি=চন্দ্রং ঘটয়তি প্রতিবাদিতয়া ভাষতে ইতি চন্দ্রাপেক্ষয়াপ্যতিশয়েনলাবণ্যবতীত্যর্থ। চন্দ্র অপেক্ষা অতিশয় লাবণ্যবতী।

কুষ্মাণ্ডেতি=কুৎসিত উষ্মা সন্তাপস্তাপত্রয়রূপো যস্মিন্ সংসারে স সংসারঃ অণ্ডে মাসপেশ্যামুদররূপয়াং যস্যা ত্রিবিধতাপযুক্তসংসার ভক্ষণকর্ত্রীত্যর্থঃ=সংসারের উষ্মারূপ ত্রিবিধ দুঃখ যিনি ভক্ষণ করেন তিনি।

---

(৪) শ্লোক স্কন্দমাতেতি=ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ভগবান সনৎ কুমার স্কন্দ হইয়া মাতার গর্ভ হইতে উৎপন্ন। নিত্য জ্ঞানীও মায়ের উদরে জন্মিতে ইচ্ছা করেন—মা বড়ই পবিত্রা।

নবমং সিদ্ধিদা প্রোক্তা ইতি বা পাঠঃ

অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্যগতারণে।

বিষমে দুর্গমেচৈব ভয়ার্ত্তাঃ শরণংগতাঃ ॥ ৬

ইমং কবচপাঠে ধ্যেয়ং দেবতাস্বরূপং প্রদর্শ্য তৎফলে অবিশ্বাসো নৈব বর্ত্তব্যঃ। অগ্নিনেতিযোঽগ্নিনা দহ্যমানোরণে শত্রুমধ্যে চ গতঃ সন্ শরণংগত ইতি শেষঃ। অথ যে বিষমে দুর্গমে চাতিসঙ্কটে ভয়ার্ত্তা ভয়-পীড়িতাঃ সন্তঃ শরণং গতাঃ ॥ ৬

প্রশ্ন—কাত্যায়নী নাম কেন ?

উত্তর—দেবতার কার্য্যে কাত্যায়ন আশ্রমে দেবীর আবির্ভাব এবং কন্যাত্ব—স্বীকার। ইনি চির কুমারী, কখন পতির অধীন না হওয়ায় স্বতন্ত্রা।

প্রশ্ন—কালরাত্রি কেন ?

উত্তর—সর্ব্ব-সংহারককালেরও নাশিকা। প্রলয়ে কালেরও নাশ হয়।

প্রশ্ন—মহাগৌরী সম্বন্ধে ?

উত্তর—তপস্যা দ্বারা কিরূপে গৌরবর্ণা হন ইহা কালিকাপুরাণে বর্ণিত।

(৫ শ্লোক) প্রশ্ন—নবম নাম কি ?

উত্তর—সিদ্ধিদাত্রী বা সিদ্ধিদা।

প্রশ্ন—নবদুর্গা কি ?

উত্তর—যোগিগণ এক শরীরে থাকিয়াও যেমন বহু দেহ ধারণ করিতে পারেন সেইরূপ দুর্গাও এই নয় প্রকারে ধ্যেয়া। এই নয় নাম যিনি পাঠ করেন তাঁহার বিঘ্ন নিবৃত্তি হয়। নবদুর্গা = নয় নাম বিশিষ্টা দুর্গা দেবী।

(৬ শ্লোক)—প্রশ্ন—কবচ পাঠে ধ্যানের মূর্ত্তির কথা বলা হইল; কিন্তু কবচ পাঠে কি হয়?

উত্তর—যে কোন সঙ্কটে পড়িয়া যদি দেবীর স্মরণ করা যায়—যেমন অগ্নিদাহ, যুদ্ধে শত্রু মধ্যে, অতি সঙ্কট অবস্থায়, ভয় পীড়িত হইয়া শরণ লইলেই মা রক্ষা করেন। ভক্তি থাক্ বা না থাক্ স্মরণ মাত্রেই মাতা রক্ষা করিয়া থাকেন।

ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে।
নাপদং তস্য পশ্যামি শোক-দুঃখ-ভয়ং নহি ॥৭
যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে।
প্রেত সংস্থা চ চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা ॥৮
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা ॥৯

তেষাং তস্য চ ভয় রহিতেন স্মরণ মাত্রেনাপি তজ্জন্য ভয়াদিকং ন ভবতীত্যাহ ন তেষামিতি ॥ ৭ ॥

যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা ভবতি তেষাং পূর্ব্বোক্তং ফলম্। ঋদ্ধিঃ ধর্ম্মার্থ—কামমোক্ষাণাং চ ভবতীত্যত্র কিমু বক্তব্যমিত্যাহ। যৈস্তিতি। ইদানীং দেব্যা অতিবাৎসল্যংদর্শয়তি ভক্ত্যুৎ পাদনার্থং প্রেতসংস্থেতি। তত্র সপ্তমাতৃণাং বর্ণনং শ্লোকদ্বয়েন।

৭ শ্লোক—অতি সঙ্কটে ভয় পীড়িত হইয়া যাহারা শরণ লয় তাহাদের রণসঙ্কটে কিঞ্চিৎমাত্রও অশুভ থাকে না। তাহাদের আপদ আমি দেখি না এবং শোক দুঃখ ভয়ও তাহাদের থাকে না।

৮শ্লোক—ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণে কি হয় তাহা বলা হইল—ইহাঁদের ঋদ্ধিলাভ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।

প্রশ্ন—দেবীর স্মরণে কিরূপে রক্ষা হয়?

উত্তর—মাতৃকাগণ ক্রোধসমাকুলা হইয়া আপন আপন বাহনে আসিয়া উপস্থিত হয়েন।

প্রশ্ন—কোন্ কোন্ দেবীর বাহন কি কি ?

উত্তর—চামুণ্ডার বাহন প্রেত, বারাহীর বরাহ, যমপত্নীর মহিষ, ইন্দ্রাণীর গজ, বিষ্ণুপত্নীর গরুড় মাহেশ্বরীর বৃষ, কার্ত্তিকপত্নীর ময়ুর।

ব্রাহ্মী হংসসমারূঢ়া সর্ব্বাভরণভূষিতা।

নানাভরণশোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ ॥ ১০

দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ।

শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলং চ মুসলায়ুধম্ ॥ ১১

খেটকং তোমরং চৈব পরশুং পাশমেব চ।

কুন্তায়ুধং ত্রিশূলং চ সাঙ্গায়ুধমনুত্তমম্ ॥ ১২

দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ।

ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং দেবানাং চ হিতায় বৈ ॥ ১৩

মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি।

ত্রাহি মাং দেবি দুঃপ্রেক্ষ্যে শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধিনী ॥ ১৪

দৃশ্যন্তে=দেবাদিভিরিত্যর্থঃ॥১১॥ তাঃ মাতরঃ শঙ্খং চক্রমিত্যাদি শ্লোকোক্তানি আয়ুধানি ধারয়ন্তি ॥ ১২ ॥ কিমর্থং ? দৈত্যানাং দেহনাশার্থং ভক্তাভয়ার্থং দেবহিতার্থঞ্চ ॥ অয়ং ভাবঃ। অপ্রার্থিতা অপি এতা মহত্যো দেবতা জগদ্রক্ষণে বৎসলতয়ৈব প্রবৃত্তা মাতৃবৎ তাঃ কুতো মন্দ-ভাগ্যেন স্বরক্ষনার্থং প্রার্থন্ত ইতি ॥ ১৩ ॥ ইতঃ আরভ্য ভক্তঃ প্রার্থয়তে মহাবলে ইত্যাদিনা। কবচপাঠস্যাদাবিমংপ্রার্থনামন্ত্রং পঠিত্বা পশ্চাৎ কবচং পাঠনীয়ম্ ইত্যভিপ্রায়েনাহ। মহাবলেতি=মহৎবলং মায়াশক্তিরূপং যস্যাঃ ॥ মহোৎসাহেতি=মহানুৎসাহো জগদ্রক্ষণে যস্যাঃ ॥ মহাভয়বিনাশিনীতি=মহাভয়ং মৃত্যুরূপং তস্য জ্ঞানদানেন

নাশিনী ॥ তুঃপ্রক্ষে = দুর্দ্দর্শনীয়ে শত্রুণাং কামক্রোধাদিকানাম্ ॥ ১৪

১১-১৪ শ্লোক।

প্রশ্ন—মাতৃকাগণ অস্ত্রাণি ধারণ করিয়া সঙ্কটস্থলে আসিয়া কি শত্রুকে বিনাশ করেন ?

উত্তর—শত্রু বিনাশ করেন, ভক্তকে অভয় দেন এবং দেবগণের হিতসাধনা করেন। এই খানে বিচার করিও, প্রার্থনা না করিলেও সন্তানবৎসলা মাতা জগৎ রক্ষণে এইরূপে প্রবৃত্ত হয়েন তবে বল এমন মন্দ ভাগ্য কে আছে যে আপনার রক্ষার জন্য প্রার্থনা না করিবে ? এখানে ইহাও লক্ষ্য কর কবচ আরম্ভ হইতেছে ১৫ মন্ত্র হইতে। ১৪ মন্ত্র প্রার্থনা মন্ত্র। কবচ পাঠের আদিতে ইহা পাঠ করিয়া তবে কবচ আরম্ভ কর।

দেহতত্ত্ব

দেহী সকলেই অথচ দেহের আভ্যন্তরিক খবর কয় জনে রাখেন? আশ্চর্য্য যে, আমরা জগতের কত তত্ত্ব নিত্য আহরণ করিতেছি, অথচ যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল করিয়া থাকি, সেই দশেন্দ্রিয়ময় শরীর সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। দেহের অধীশ্বর হইয়াও আমরা দেহ সম্বন্ধে এত অজ্ঞান যে, সামান্য সর্দ্দি কাসি বা আভ্যন্তরিক কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলেই, ভয়ে অস্থির হইয়া দুই বেলা ডাক্তারের নিকট ছুটাছুটি করি।

শরীর সম্বন্ধে সকল রহস্য যদি অল্প কথায় সরল ভাষায় জানিতে চান, যদি দেহ যন্ত্রের অত্যদ্ভুত গঠন ও পরিচালন-কৌশল সম্বন্ধে একটি নিখুঁৎ উজ্জ্বল ধারণা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি সম্পাদিত "দেহ তত্ত্ব" ক্রয় করিয়া পড়ুন এবং বাড়ীর সকলকে পড়িতে দেন।

ইহার মধ্যে—কঙ্কাল কথা, পেশী-প্রসঙ্গ, হৃদ্-যন্ত্র ও রক্তাধার সমূহ, মস্তিষ্ক ও গ্রীবা, নাড়ী-তন্ত্র মস্তিষ্ক, সহস্রার পদ্ম, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির সংস্থান এবং উহাদের বিশিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি —শত শত চিত্র দ্বারা গল্পচ্ছলে ঠাকুরমার কথন নিপুণতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা মহাভারতের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ, উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ইহা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের এবং গ্রাম্য চিকিৎসকবৃন্দ-বান্ধবের, নিত্য সহচর হউক।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে—(৪১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা মূল্য মাত্র ২৷৵০ আনা, ডাঃ মাঃ পৃথক।

শিশু-পালন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত, ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আকারে, বহু চিত্র সম্বলিত হইয়া সুন্দর কার্ডবোর্ডে বাঁধাই, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা ; মুল্য নাম মাত্র এক টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 588

২৪শ বর্ষ।] পৌষ, ১৩৩৬ সাল। [৯ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবায় কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষ্মণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—**শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।**

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৪শ বর্ষ। } পৌষ, ১৩৩৬ সাল। { ৯ম সংখ্যা

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

তোমার প্রিয়কার্য্য কি ?

যাহা আমি মানুষকে করিতে বলিয়াছি।

কোথায় বলিয়াছ ? কবে বলিয়াছ ?

মানুষ যদি মনকে আমাতে একাগ্র করিতে পারে তবে মানুষ দেখিতে পায় সদা জাগ্রত আমি—আমি শুদ্ধচিত্তে সর্ব্বদা বলি আমার প্রিয়কার্য্য কি! এই যে মানুষের মনে আমি উদয় করিয়া দিয়া থাকি আমার প্রিয়কার্য্য কি—ইহা চিত্তশুদ্ধি যাহাদের নাই, রাগ দ্বেষ যাহাদের যায় নাই, যশো-লিপ্সা যাহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা অশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহারা ইহা নিজের মনে কখনই ধরিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত নরনারী নিজের স্বার্থ যে কার্য্যে সিদ্ধ হইবে তাহাকেই আমার প্রিয়কার্য্য মনে করিয়া সমাজকে, পরিবারকে বড়ই অপবিত্র করিয়া ফেলে। নিজের মনে যাহা উঠে তাহার সহিত ঋষিগণের কথার মিল যদি না হয় তবে নিজের মনের কথায় যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা নষ্টবুদ্ধি। সদাচারপালন, মেধ্য-আহার-গ্রহণ, গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যাপূজা জপাদি অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ তর্পণ, পিতা মাতা, অতিথি, আচার্য্য ইঁহাদিগকে "আমি বোধে" সেবা করা এই সমস্ত আমি করিতে বলিতেছি কি না মানুষ বুঝিবে কিরূপে ? যাহারা সন্ধ্যা পূজা, জপ তপ, শ্রাদ্ধ তর্পণ, সদাচার, মেধ্য আহার ইত্যাদি করেনা

তাহারা আমার প্রিয়কার্য্য করে না। ইহাদের অশুদ্ধ মনের যুক্তিতে ইহারা লোককে বুঝাইতে চায় যে প্রাণহীন অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মজগতে স্থান পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ অন্য কোন জাতিতেও আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য নাই। ফলাফলে দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জন্যই তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই সাধু উপদেশ। ঈশ্বরকে অমান্য করিয়া যে নষ্ট যুক্তি মন গড়া কিছুর সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা যাঁহাদের অন্তরে সততার কোন প্রকার বীজ আছে তাঁহারাই ধরিতে পারেন। এমন ও দেখা যায় যৌবনে ভ্রষ্ট পথে চলিয়া, আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মনগড়া ধর্ম্মের চাকচিক্যে ভ্রান্ত হইয়া কত কি করিয়া শান্তি না পাইয়া শেষে সদগুরুর আশ্রয়ে আসিয়া এই সমস্ত যথার্থ বীজ-ধার্ম্মিক ভ্রষ্ট-নূতন-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া ঋষিগণের আচরিত ধর্ম্ম পথ গ্রহণ করেন এবং নিজে শান্তি লাভ করিয়া বহু নরনারীকে ভ্রষ্ট পথ ছাড়াইয়া সনাতন পথে লইয়া চলেন।

যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বর চাহেন তাঁহারাই এইরূপ ভাবে মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিতে পারেন। যাহারা পারেন না তাঁহারা মিথ্যার আড়ম্বরে গা ঢাকা দিয়া সুবিধার ধর্ম্ম লইয়াই থাকেন।

এমন ও শুনা যায় ভারতের মানুষ বিদেশে গিয়া পুত্র কন্যা উৎপাদন করেন। ইহাঁরা আচারহীন দেশে জন্মিয়াও প্রাচীন বয়সে গুরুর আশ্রয়ে আসিয়া আপনাদের কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া সনাতন পথ অবলম্বনে যথার্থ ধার্ম্মিকের আচরণ পালন করেন।

বলিতেছিলাম তোমার প্রিয়কার্য্য কি ইহার উত্তর করিতে গিয়া নিজের মন যাহা বলে তাহাই মাত্র শুনিলে চলেনা। বেদে যেখানে যেখানে তোমার প্রিয়কর্ম্মের কথা তুমি আপনি বলিয়াছ তাহার সহিত যদি লোকের মন একমত হইতে পারে তবেই তোমার "প্রিয় কার্য্য কি" নিশ্চয় করা যায়।

যাঁহারা বেদের মধ্য হইতে তাঁহাদের মনের মত কথাটি মাত্র গ্রহণ করেন অন্য কথা মানেন না তাঁহারা বেদও মানেন না—ঈশ্বর ও মানেন না,মানেন নিজ নিজ প্রতিভা। ইহাঁদের দ্বারা সমাজের যত অনিষ্ট হয় তত অনিষ্ট আর কাহারও দ্বারা হয় না। এইরূপ লোকের মধ্যে যদি কেহ যথার্থ ঈশ্বর প্রার্থী থাকেন তাঁহাদিগকে আমরা বলি ইহাঁরা যেন নিজের হৃদয় খুঁজিয়া দেখেন ইহাঁরা শান্তি পাইতেছেন কিনা তবেই ইহাঁরা Natural religion এবং Revealed Religion এই দুয়ের সামঞ্জস্য কোথায় দেখিতে পাইবেন।

বেদে কি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সব বলা আছে?

আছে। বেদ যে ব্রহ্ম। ইনি শব্দ ব্রহ্ম। এখানে নাই এমন কিছু কি থাকিতে পারে? ঈশ্বরে নাই এমন কিছুই যেমন থাকিতে পারে না সেইরূপ বেদে নাই এমন কিছুই হইতে পারে না।

বেদ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য যাহা দেখাইতেছেন তাহার কিছু শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রবণ কর।

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" প্রত্যহ সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। সম্যক্ ধ্যানকে সন্ধ্যা বলে আবার যে সন্ধিকালে ধ্যান করিতে হয় তাহাকেও সন্ধ্যা বলে। ইহাই প্রাতঃকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য ও সায়ংকৃত্য। ইহা বৈদিক সন্ধ্যা ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা। যাহার যাহাতে অধিকার তিনি সেইরূপই করিবেন। বেদ যখন সন্ধ্যার ব্যবস্থা করেন সন্ধ্যার সকল মন্ত্রই বেদমন্ত্র—তখন সন্ধ্যা না করাই ঈশ্বরের অপ্রিয় কার্য্য করা। এইরূপ আচার ও আহার সম্বন্ধে বেদেরই উক্তি আছে; প্রয়োজন হইলে পরে ইহা দেখান যাইবে।

বেদ কি ইহা জানা নাই বলিয়াই নষ্ট বুদ্ধিতে বেদেও ভুল আছে এই কথা প্রচার করা হয়।

বেদের সকল মন্ত্রই ছন্দবন্ধ। যাঁহাদের ছন্দ জ্ঞান নাই তাঁহারাই বেদের মন্ত্রকে কাট্যাং কুট্যাং করিয়া নিজের মন গড়া শব্দ তাহাতে যোজনা করেন। বেদের একটি অক্ষরও যে স্থান-চ্যুত করা যায় না তাহা যাঁহারা সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। ভগবান শঙ্কর যে বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এমন কি গীতার ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতে এই ছন্দনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কোথাও অন্বয় করেন নাই।

সমাজ কি ধ্বংসপথে?

চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় বৃক্ষ। একধারে স্বামীজীর ঝুপড়ী। স্বামীজীর দুই একটি শিষ্য কতকগুলি ভদ্রলোকের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। প্রণাম করিয়া সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন স্বামীজী সমাজের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে চিত্ত বড়ই ব্যথিত হইতেছে। হিন্দু সমাজের আর ত কিছুই থাকিতেছে না। লোকে আর শাস্ত্র মানিতে চায় না, দেবতা ত নাইই, ঈশ্বর অনেকেই মানে না, যাহারও মানে তাহারা ঈশ্বরকে নিজের মনের মত গড়িয়া লয়, জাতিভেদ প্রায় নাই, আচার ত উঠিয়াই গিয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রায় লোকেই করে না, শ্রাদ্ধ তর্পণ নাই বলিলেই হয়, বিধবাদের বিবাহ বেশ চলিতেছে, ঘোমটাত উঠিয়াই গেল, স্ত্রীলোক আর অন্তঃপুরে থাকিতে চায় না, সবাই স্বাধীনতার জন্য ক্ষেপিয়াছে, আপনার অধীন হওয়া যে স্বাধীনতা তাহার নাম গন্ধও নাই—ইহা তুলিয়া দিয়া দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বালক, যুবক ও যুবতী মহলে প্রচার করিতেছেন মন যাহা চায় তাহাই কর—মনকে বাঁধিয়া রাখাটা উন্নতির বিরোধী স্বাধীনতার বিরোধী—সকল জাতির মধ্যে বেশ খাওয়া দাওয়া চলিতেছে আর যুবকেরা ও যুবতীরা গর্ব্ব করিয়া বলিতেছে হিন্দুধর্ম্মের কি ভয়ানক সঙ্কীর্ণতা—হোটেলে খাইলে জাত যায়, অন্য জাতি ছুইয়া দিলে অন্ন মার যায়, কেহ কাহারও অধীনে থাকিতে চায় না, পিতামাতা যদি স্বার্থপর হন তবে এমন পিতা মাতাকে কিছুতেই ভক্তি করা উচিত নয়। কত আর বলিব স্বামীজি—সমাজ কি খরতর বেগে ধ্বংস পথে ছুটিতেছে? ইহার কি প্রতীকার নাই?

তখন পৌষমাস এই পড়িতেছে। প্রথম দিন পূর্ণিমা গেল—সেই দিন সূর্য্য উঠিলেন না—সমস্ত দিন রাত্রি ধরিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি হইল। পরদিন সূর্য্য উঠিলেন—কিন্তু বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। স্বামীজী ঝুপড়ীর মধ্যে বসিয়া আছেন। বড় বড় বৃক্ষের শুষ্কপত্র ঝরিয়া পড়িতেছে। যখন ঐ সমস্ত প্রশ্ন উঠিল তখন স্বামীজী দুই একটি শুষ্ক পত্র হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—দেখ বাপু এ গুলি বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়িল কেন বলিতে পার?

বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু পাতা আর রস আকর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া শুষ্ক হইয়া গেল। এই যে বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছে দেখিতেছ—কেহ বলিতেছে শীতকাল, শীত বেশী পড়িবে বলিয়া বাতাস জোরে বহিতেছে—ইহাও হইতে পারে কিন্তু ইহার মধ্যে আর একখানি অদৃশ্য হস্ত কার্য্য করিতেছে।

শ্রোতাগণ কিছু বিস্মিত হইয়াছেন—যে প্রশ্ন হইল স্বামীজী তাহার কি উত্তর দিতেছেন ? স্বামীজী শ্রোতাদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন তোমরা ভাবিতেছ বাপু আমি কি প্রলাপ বকিতেছি। বাবা! সবটা শুনিয়া তবে যাহা বলিতে হয় বলিও। সহিষ্ণুতা বড় ভাল জিনিষ।

রস আকর্ষণ করিতে না পারিয়া বৃক্ষপত্র যখন শুষ্ক হয় তখন শুষ্কপত্রকে বৃক্ষচ্যুত হইতে হয়। এই দেশে কত বৃক্ষ আছে তাহাত জান, এই ভারতের বৃক্ষ সমূহ কত তাহা কি তোমরা গণনা করিতে পার ? এই পৌষ ও মাঘ মাস ধরিয়া ভগবানের কার্য্য হইবে শুষ্কপত্র ঝরাইয়া ফেলা ও তাহার স্থানে নূতন পত্র দিয়া বৃক্ষকে সঞ্জীভূত করা।

এই যে নরনারী সমাজ বৃক্ষ হইতে আর রস পায় না—সন্ধ্যা আহ্নিকে রস নাই, জাতিভেদে রস নাই, আচারে রস নাই, সংযমে রস নাই—এই যে ইহারা আর সমাজ বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারে না ইহাদের অবস্থা শুষ্ক পত্রের মত। ভগবান্ এই সমস্ত আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন পত্র দিয়া সমাজ বৃক্ষ সাজাইবেন বলিয়া তিনিই এইরূপ করিতেছেন। নূতন কিছুই হইবে না, পুরাতনই নূতন হইয়া আসিবে। একটি স্ত্রীলোক আমার কাছে আসিয়া সে দিন বলিয়া গেল যখন উহারা আমাকে কিছু মন্দ বলে তখন আমি তিন বা চারিদিন কোন উত্তর দি না, তাহাতেও যখন না থামে তখন আমি একটা "ঝাঁকি" দি। ভগবানও শুষ্কপত্র ঝরাইবার জন্য নানা খেলা খেলেন। কিন্তু পাছে কেউ দেখিয়া ফেলে এইজন্য এত গোপন। তবুও খেলা চাই, কোথাও অল্প হয় কোথাও বেশী ঝাঁকি দিতে হয়। বল দেখি কত কার্য্য তাঁহাকে এই শীতে করিতে হয় ? শ্রীঅর্জ্জুন যখন বিশ্বরূপ দেখিয়া প্রব্যথিত হইয়া, বুঝিতে না পরিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন ঠাকুর—"নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্" তুমি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না তখন ভগবান্ বলিয়াছিলেন—"কালোস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" আমি কাল পুরুষ লোকক্ষয়ের জন্য বর্দ্ধিত দেহ ধারণ করিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও তাই। নতুবা

ভগবান যে ধর্ম্ম ভারতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা সনাতন। এই ধর্ম্ম-বৃক্ষ কি মরিতে পারে? তবে পুরাতন শুষ্কপত্র ফেলিয়া দিয়া ঐ পত্রই নূতন ভাবে আনিবার জন্য এই আয়োজন। যাহা সনাতন তাহার কোনটিই নষ্ট হইবার নয়। যে সমস্ত পত্র বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারিবে না তাহারা শুষ্ক হইবে—আর ভগবান "ঝাঁকি" দিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া ঐ পত্র সমূহ-কেই আবার নূতন করিয়া বৃক্ষ গাত্রে উঠাইবেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই এইরূপ কথা আছে—আমি যে জ্ঞান-যোগ ও কর্ম্ম যোগের কথা বলিতেছি তাহা সৃষ্টির প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন, রাজর্ষিগণ, পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। ইহলোকে কালবশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পুরাতন জ্ঞান যোগ ও কর্ম্ম যোগ তোমাকে বলিলাম—যেহেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা আর এই যোগও সনাতন—ইহা উত্তম ও গুহ্য।

বাপু! যাহা সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তাহাই ধরিয়া থাক—যাহারা তোমার আত্মীয় স্বজন—যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে—আপনি আচরণ করিয়া তাহাদিগের নিকট সত্য সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত কর্ম্ম করিতে বল ইহাই তোমার কর্ত্তব্য। ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মত্যাগী হইয়া হায় হায় করিলে কোন্ কার্য্য হইবে? যে প্রবলবেগে এই সব ব্যভিচার চলিতেছে তাহার জন্য ভগবানই বিধান করিতেছেন—তুমি তোমার কর্ম্ম করিয়া যাও আর জানিয়া রাখ সনাতন কখন ধ্বংস হয় না।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

রাসপূর্ণিমায়।

সারাদিন কার অপেক্ষার ডাক
হৃদয়ে এসেছে ফিরিয়া,
অলস শয্যায় অবশ নয়ন
আবেশে আসিল মুদিয়া।
আধেক রজনী, না হতে প্রভাত
ঘুমঘোর গেল টুটিয়া ;
অলস নয়নে স্বপন বুলান
তখনো যায় নি মুছিয়া।
কি জানি কাহার সুখের পরশ
শীতল করটি লেপিয়া,
শিথিল অবশ তনুটী ঘিরিয়া
পরশি রেখেছে চুমিয়া।
দেখিনু হাঁসিছে প্রেমের গরবে
একেলা চন্দ্রমা জাগিয়া ;
নীরব নিথর গগন প্রাঙ্গনে—
নিখিল গিয়েছে ভাসিয়া।
কানায় কানায় ঢেউগুলি দুলে
নদী বুকে কানাকানি।
গগনে পবনে চলে কোন সাড়া
মরমরি হাত ছানি।
উপহাসে যত মালতী বকুল
মল্লিকা চামেলী মাতিয়া ;
কাননে কাননে আলাপন চলে
নয়নে নয়ন ঠারিয়া।
রাস রজনীর আজি যে পূর্ণিমা
সকলি এসেছে সাজিয়া।
সলাজে শিহরি উঠিনু চমকি
বঁধু কোলে আছি ঘুমিয়া॥

অনুরাগ লেখিকা

ভক্ত ও ভগবান।

ভগবানের মাধুর্য্যের মধুরিমা এত সুন্দর করিয়া কি প্রকাশ হইত যদি ভক্ত না থাকিত? ভক্তের মধ্য দিয়াই যে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন আপনাকে আপনি ফোটান, এ আস্বাদনের তৃপ্তি আপনাকে আপনি ভোগ করিতে হইলে আপনাকে আপনি দেখা আত্মপ্রতিবিম্বের প্রতিচ্ছায়া নহিলে কিরূপে হইবে? সমান চিত্তবৃত্তির সঙ্গমজনিত যে সুখ এ মিলনের অনুভব কোথায়? ভক্তেরও যেমন ভগবানকে আবশ্যক ভগবান না হইলে চলেনা ভগবানেরও সেইরূপ ভক্ত না হইলে তাঁহার প্রকাশ হয় না তাঁহার মাধুর্য্যের রূপ উপভোগ হয় না। ভগবান যে ভক্তের ও ভক্ত, তাঁহার ভক্তের ভগবান নাম কে প্রচার করিত যদি ভক্ত না জন্মাইত! শিষ্যের যেমন গুরু না হইলে শিষ্যত্ব হয় না সেইরূপ শিষ্য না থাকিলে গুরুর গরিমার প্রকাশ গুরুত্ব কাহার নিকট প্রচারিত হইবে? পতিতপাবন নামের মহিমা কে বাড়াইত যদি পতিত কাঙ্গাল না থাকিত? সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রকাশ হইবেন কাহার নিকট তাই দয়াল নামের ঘোষণার জন্য দয়ার পাত্রও থাকা চাই নয় কি? নহিলে এ দয়াগুণ প্রকাশ হইবে কাহার নিকট। গুরুর মহিমা প্রচারের জন্যই শিষ্যের সৃষ্টি। জামদগ্ন্য পুত্র পরশুরামের শিষ্য ভীষ্ম ও কর্ণ সমরে দুর্দ্ধর্ষ বীর হইয়া গুরুর মহিমাকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। দ্রোণগুরু যে জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য এ কথা কে জানিত যদি জগৎ বিখ্যাত অর্জ্জুনের বিক্রম না প্রকাশ হইত? গুরু শিষ্যের মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন আপনার শক্তির বিকাশ দেখেন ও দেখান তাই শিষ্যের নিকটে পরাজয় স্বীকারে গুরুর মহত্বই বাড়িয়াই যায়, গুরু ইহাতে লঘু হইয়া যান না। কেহ কাহারও নিকট পরাজয় লাভ করিতে চায় না, একমাত্র গুরুই শিষ্যের বিক্রম প্রকাশে আপনার পরাজয় স্বীকারে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া যথার্থ আনন্দ লাভ করেন। শিষ্যের মহিমায় গুরুকে গৌরবে পূর্ণ করিয়া তোলে। আনন্দময় ভগবান্ আপনার ভক্তের নিকটে আপনাকে খর্ব্ব করিয়া ভক্তের জয়কীর্ত্তন করান। ভক্তের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে আপনাকে খাটো করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রাখেন না ভক্তের নিকট হার খাইয়া ভগবান সুখ বোধ করেন। ভগবান্ শ্রীগীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন অর্জ্জুন তুমি সকলের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল "ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি" ভগবান্ নিজে

প্রতিজ্ঞা করিলেন না কেন? ভক্তের মুখ হইতে বলাইলেন—ইহার কারণ ভগবান্ বলিতেছেন—"দেখ, আমার প্রতিজ্ঞা থাকে না তুমি আমার ভক্ত তুমি আমার দিকে চাহিয়া আমার উপর নির্ভর করিয়া যাহা বলিবে "আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হয় না;" এ কথার সত্যতা চিরদিন থাকিবে তাই তোমাকে দিয়া বলাইলাম। আমার শরণাগত ভক্তের নিকট আমার কোন জোরই চলে না আমি এখানে পরাধীন অথবা ভক্তাধীন। ভগবানের আত্মদান বড় সুন্দর, আপনাকে বিলাইয়া ভক্তের দেওয়া নামরূপকে আপনার করিয়া লইয়া ভক্তের নিকট আপন সত্বাটুকু পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়া যায়। ইহাই তাঁহার ঈশত্ব, অন্তর্যামিত্ব সর্ব্বব্যাপীত্ব, আত্মারামের স্বরূপের—নির্গুণ ব্রহ্মের—মায়ার খেলা বা আপনাকে আপনি আস্বাদন, নিত্য তৃপ্তের মাধুর্য্যের তৃপ্তি ভোগ। শ্রীভগবান্ মায়াতীত হইয়াও আপনার মায়ায় আপনি মুগ্ধ হয়েন, মায়াকে স্বীকার করিয়া মায়ার খেলায় হাঁসেন কাঁদেন নাচেন সব করেন। তিনি ভক্তের হাতের ক্রীড়াপুত্তলিকা হয়ে ভক্ত তাঁহাকে যেমন সাজায় তেমনি সাজিয়া ভক্তের সহিত খেলা করেন। ভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

"প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি—
ভারত সমরে অস্ত্র কভু নাহি ধরি।
পশ্চাতে কহিলা বীর গঙ্গার কুমার—
কৃষ্ণেরে ধরাব অস্ত্র প্রতিজ্ঞা আমার।।"

ভগবানের বাক্য যদি অসত্য হয় তবে জগৎ রসাতলে যায়, ভগবানের বাক্যের সত্যতা রাখিতে হইবে, আবার ভক্ত তাঁহার চরণ চাহিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ভগবান্ অঙ্গীকারবাক্য রক্ষা করিলেন, সুদর্শন চক্র ধরিলেন না কিন্তু ভক্তের প্রতিজ্ঞাবাক্য রক্ষা করিতে হইবে; ভগবানকে ইহার মীমাংসা করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরানল, ভীষ্ম যেন কালান্তক যম, ভীষ্মের বিক্রমের নিকট আজ সমস্ত কুরুসৈন্য, পাণ্ডব আশ্রিত সকল সৈন্য, সমুদ্রে ঝটিকাপাতের ন্যায় চঞ্চল ক্ষুব্ধ; কে সেই জ্বলন্ত অনলের সম্মুখীন হইবে? জগৎজয়ী অর্জ্জুন আজ পরিশ্রান্ত, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, অর্জ্জুন মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে ভগবানের দিকে মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন "একি আজ পাণ্ডব বিনাশে কি ঠাকুর সংকল্প করিয়াছেন,—আজ সে মূর্ত্তিতে কি ভাবের খেলা বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে? ভীষ্মকে এ অপরাজেয় শক্তি কে দিয়াছে? অর্জ্জুন বড় কাতর হইয়াছেন ভগবান্ যেন সহ্য করিতে পারিতেছেন না, ভীষ্মের মধ্যে আপনি

অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ বেগরোধের সামর্থ্য কাহারও নাই, ভীষ্ম কিন্তু বড় নিশ্চিন্ত, ভগবানের পদে সকল নির্ভরতা ঢালিয়া দিয়াছেন। ভগবানের শ্রীমুখে উদ্বেগ চিহ্ন; যেন অর্জ্জুনের কাতরতায় বড় চঞ্চল হইয়াছেন, অস্থির চরণে দ্রুতপদে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, করে ভগ্ন রথচক্র, তাহাই সুদর্শনাকারে হস্তে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; ভালে ঘর্ম্ম-বিন্দু, রক্তপাতে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ জড়িত অর্দ্ধচন্দ্র ললাটেপতিত ধূলার সহিত মিশ্রিত হইয়া বিন্দু বিন্দু চন্দনের আকারে মুক্তাফল সজ্জিত করিয়াছে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের ন্যায় ভাস্বর উজ্জ্বল পীত উত্তরীয় আজ দ্রুতগমনের ব্যস্ততায় স্কন্ধচ্যুত হইয়া ধূলায় অবলুণ্ঠিত, কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই—ভগবান্ বড় ব্যস্ত, রথ হইতে নামিয়াছেন—সম্মুখে যাহা পাইলেন রথচক্রই চক্রা-কারে ঘুরাইয়া—

"ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিভুবন নাথ"—ভীষ্ম কিন্তু আজ বড় প্রশান্ত, মুখে প্রফুল্লতা, চক্ষু সজল, দর বিগলিত ধারায় বক্ষ ভাসিতেছে, হাতের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছেন, বড় নিশ্চিন্ত তাঁহার মূর্ত্তি, অনিমেষ নয়নে শ্রীমুখের পানে চাহিয়া আছেন, হর্ষে কণ্ঠ গদগদ, স্তব বাক্য উচ্চারণে স্খলিত হইয়া যাইতেছে। অর্জ্জুন সম্বিত পাইয়া ক্ষণ পরে প্রভুকে আসিয়া ধরিলেন। আর একদিন অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন অভিমন্যু সেদিন রণে সপ্তরথী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অন্যায় যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। পাণ্ডব শিবির অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সকলেই হেটমুখে অবস্থিত; ধর্ম্মরাজ ধূলায় পতিত, অর্জ্জুন আসিয়া অভিমন্যুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবেন? অর্জ্জুন আজ যুদ্ধ কালে অমঙ্গল দর্শন করিয়াছেন, কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বড় ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন; শিবির কেন অন্ধকার? তবে কি ধর্ম্মরাজের কোন অমঙ্গল ঘটিল? ব্যাকুল নয়নে সকলকে অন্বেষণ করিতেছেন, বক্ষের মধ্যে ঝক করিয়া উঠিল, অভিমন্যু! আমার অভিমন্যু! কই অভিমন্যুকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? সকলেই নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন, মুখে বাক্য নাই, সকলেই সম্বিত হারা! অর্জ্জুন ভীমের প্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "বল ভাই বৃকোদর! যে বীর শিষ্য সকলকে পশ্চাৎ করিয়া অগ্রে যুদ্ধের সংবাদ জানাইত, বীরোৎসাহে উত্তম পূর্ণ কণ্ঠে বীরগাথা শুনাইতে ও শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া ছুটিয়া আসিত; আজ কেন তার মুখ চন্দ্রমা এ সভায় ঝলসিয়া ওঠে নাই? আমি অভিমন্যু বিহীন হওয়া কল্পনাতেও আনিতে

পারিতেছি না আমার অভিমন্যু কি নাই? ভীম বড় কাতর হইয়া জয়দ্রথের সঙ্গে রণ বিবরণ, নিজেদের অক্ষমতা ও সেই কেশরী শিশুর অপূর্ব্ব বীরত্ব, অন্যায় যুদ্ধে সপ্তরথীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া নিধনের বিবরণ জানাইলেন। ষোড়শ বর্ষীয় শিশুর এ বিক্রম চিরদিন ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছে। অগ্নি স্ফুলিঙ্গের এ বিশ্বদাহী তেজ এ যে কেহ কখন দেখে নাই কেহ কখন শোনে ও নাই—কৌরবেরা এই বীরের সম্মান না রাখিয়া পশুর মতন বিনাশ করিয়াছে। শিশু আপন বলে ব্যূহ ভেদ করিয়া গেল,কিন্তু জয়দ্রথ, কাল জয়দ্রথ প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া আমাদের কাহাকেও সাহায্যের অবসর দিল না, অসহায় শিশুকে পিঞ্জরে বদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় নির্ম্মম ভাবে উহারা হত্যা করিয়াছে। একা জয়দ্রথের জন্যই আমরা কেহ কিছু করিতে পারি নাই। অর্জ্জুনের শোক গেল, আসিল দুর্জ্জয় ক্রোধ, ক্ষত্র বীরের স্বাভাবিক প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া অর্জ্জুনকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাইল। অর্জ্জুন সূর্য্যাস্তে জয়দ্রথ বধে সঙ্কল্প করিয়া নিজ মৃত্যুকে পণ রাখিলেন। সমস্ত পাণ্ডবগণ হর্ষে জয়নাদ করিয়া আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া তুলিল। বীর কোষে অসি সকল ঝন ঝনিয়া উঠিল। কুরুবীরগণ দূতমুখে সংবাদ পাইয়া অর্জ্জুন বিনাশ কল্পনা করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। সর্ব্বত্র যখন বীরত্বের আস্ফালন, শিবিরের জন কোলাহলে বীরগণের মদগর্ব্বিত উন্মত্ততা, উগ্র প্রতিজ্ঞা বাক্যের উত্তেজনার স্রোতের ফেনগঞ্জিত সুরার তরলতার ন্যায় অধীরতা সর্ব্বত্র প্রচারিত; বিপদকালে মধুসূদনের কথা সকলে বিস্মৃত হইয়াছে, দারুক তখন শিবিরে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে-ছেন। পাণ্ডব ত পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে প্রতিজ্ঞা করিল, সকল পাণ্ডবগণ সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ না চিন্তিয়া এই যে উন্মত্ততার মাদকতায় গোবিন্দকে বিস্মৃত হইয়া আপনাদের বিপদ কল্পনা করিতে পারিতেছে না, এই বিপত্তি কালে মধুসূদন কোথায়? বিপদে মধুসূদন কই? দারুক দূরে একটী নিভৃত কক্ষে গোবিন্দকে চিন্তামগ্ন নিরীক্ষণ করিলেন। করতলে কপোল সংলগ্ন, শ্রীভগবানের শ্রীমুখে পঙ্কজে গভীর চিন্তার রেখা অঙ্কিত, যেন কোন সম-স্যার মীমাংসার অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া উপায় খুঁজিতেছেন। দারুক এক মুহূর্ত্ত সেই মধুর মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলেন, পরে প্রণাম করিয়া অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বাক্যের উল্লেখ করিয়া পাণ্ডব নাশ, অর্জ্জুনের বধাশঙ্কা জানাইয়া কুরুবীর গণের হর্ষ ধ্বনির সংবাদ জানাইলেন। শ্রীভগবান্ উপবেশনে ছিলেন, দারুক বাক্য শ্রবণে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আকর্ণ বিশ্রান্ত নীল নলিনাভ নয়ন যুগল

রক্ত কোকনদ শোভা ধারণ করিল, নীল গণ্ডে রক্ত দ্যুতি ফুটিয়া শোণিত ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিল; শ্রীভগবান্ দারুকের প্রতি তীব্র বিজলী দৃষ্টি হানিয়া শিখর তারকা খণ্ড বিমণ্ডিত আকাশ খণ্ড সুগঠিত অঙ্গুলী তুলিয়া দারুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন জেন দারুক, অর্জ্জুন শূন্য পৃথিবীতে আমি ক্ষণ কালও থাকিব না।" ভক্তের যে সবই ভগবানে অর্পিত, শরণাগত বৎসল তিনি, শরণাগতের তেজ, তাই তিনি নিজের হইতেও বেশী করেন, ভক্তের জন্য তাই এত ব্যাকুল হন। ভক্ত যে তাঁহার শরণে আসিয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়াছে: গর্ভস্থ ভ্রূণের মত সে যে আত্মরক্ষায় উদাসীন একান্ত নির্ভরশীল। তাঁহার আশ্রিত বৎসল নামের প্রচার করিতে ভক্তকে এ জোর তিনি দিয়াছেন তাই ভক্ত তাঁর চরণ চাহিয়া এ গরিমা প্রকাশ করিবার শক্তি পায়— নইলে ভক্তের আবার অহঙ্কার কোথায়?

ভক্ত কবি হিন্দিতে গাহিয়াছেন—

"যো যিস্‌কা শরণ লিয়ে ওহি রাখে উনকা লাজ।
উলট জলে মছলি চলে বহি যায় গজ রাজ॥"

অনুরাগ লেখিকা।

চূড়ালার কিছু।

রাজা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন। কতক্ষণ কোন কথা ছিলনা শুধুই দেখা। যখন ভাষা আসিল তখন রাজা বলিতে লাগিলেন—

জ্বলৎ কনক গৌরাঙ্গি! আ মরি মরি একি রূপ? পরিধানে চন্দ্র কোটি রুচিচ্ছবি এই বস্ত্র, সুগন্ধি কুসুমাবদ্ধ এই কেশ পাশ। কৃশোদরি-চারুলোচনে! আর এই বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত ভালতটে এই মনোহর বিন্দু! আহা রূপরত্নাকরের রূপলক্ষ্মীর মত তুমি—জ্বলৎ-কনক-দেবতা-রুচির-সর্ব্বাঙ্গি – এ বেশ কার জন্য?

একাকিনী এই নির্জ্জন উপবনে তুমি কি আমার অপেক্ষা করিতেছ? এমন হইয়া গেলে কেন? কিছু কি গোপন করিবে? কিন্তু গোপন করিবে কি? প্রতি অঙ্গ দিয়া আর কাহারও যে সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

চূড়ালা মুখে কিছুই বলিলনা। মনে মনে বলিল কি অমূল্যধনের অধিকারী তুমি করিয়াছ—ঐ চরণকমলের মধুর আস্বাদ—যাহা তুমি জানাইয়াছ—যে প্রীতির আস্বাদে আজ এই পবিত্র রাজ্যের কাঙ্গালিনীও ভিতরে বাহিরে সত্য-সত্যই রাজ রাজেশ্বরী, তোমাকে বলিতে আজ আমার কথা নাই। তোমারই দেওয়া আদরে আমার আজ সাহস, নতুবা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বরের আসন কি এই দীনার চির অযোগ্য হৃদয় কুটীর?

চূড়ালা কিছুই বলেনা। রাজা ভিতরে কিছু বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন রাণি! তুমি আমি উভয়েই অভিভূত। রাণী কথা না কহিয়া পারিলেন না—বলিলেন আমি স্ত্রীজাতি আমি অভিভূত হইতে পারি—আর এখানে অভিভূত হওয়াই আমার ধর্ম্ম কিন্তু তুমি অভিভূত হইবে কিরূপে? তুমি রাজা—কত প্রকার মানুষের অভিনয় তুমি নিত্য দেখিতেছ—আবার তোমার বিচার—মহাত্মা সকলের বিচারের সঙ্গে মিলাইতেছ তোমার হৃদয় ও কি অন্ধ? সহসা চূড়ালার রঙ্গ জাগিল, চূড়ালা অন্য ভাব অবলম্বন করিল। বলিল তুমি যে আমার সঙ্গে এই অপূর্ব্ব— রাজা বাধা বাধা দিলেন—বলিলেন এ আর একটা অপূর্ব্ব কি? সবাইত এই রকম করে।

রাণি—ছাই করে। তুমি নাকি সব দেখেচ?

রাজা—দেখি নাই কি?

রাণি—কি দেখেচ? তোমার কাছে এই রকম আদর কেউ কি দেখিয়েচে? যদি সর্ব্বত্রই এই আদর থাকে তবে তোমার কাছে এত দুঃখের নালিশ আসে কোথা হইতে? তুমি ত লোকের ব্যভিচারই দেখিয়াছ—তারই ব্যবস্থা ত তুমি কর। এরূপ সরল ব্যবহার কোথায় দেখিলে? আর আদরই বা তোমায় দেখাল কে?

রাজা—তুমি কি বলিতে চাও আমাদের পরস্পরের এই ভাব কখন পুরাতন হইবেনা? চিরদিনই এই সব নবীন নবীন মূর্ত্তি ধরিয়া শুধু আনন্দেই ভাসাইবে? কখন কোন বিবাদ হইবে না?

রাণি—কখন না।

রাজা—সকলেত প্রথমে এইরূপই বলে—তবে স্বামী স্ত্রীতে আবার বিষ উঠে কেন?

রাণী—মনের মিল বুঝি সবার হয়? কামে একটা মিলন হয় বটে কিন্তু কামের মিলনটা বড় ক্ষণস্থায়ী। দুষ্ট লোকেও ভোগটাকে চক্ষের মধ্যে

রাখিয়া এই কামটাকেই স্থায়ী করিবার জন্য একটা গিল্টি করা সংযম দেখায়। কিন্তু সকল বিষয়ে মনের মিলন না হইলে আনন্দ কি চিরদিন থাকে? আর মনের মিলন হইয়া যাহা হয় তাহাই কিন্তু চিরনূতন, চিরস্থায়ী "অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।"

রাজা—তাই বটে। "সমান চিত্ত বৃত্তির সঙ্গম জনিত যে সুখ" তাহা অপেক্ষা স্থায়ী আনন্দ আর জগতে নাই। সত্যই বলিয়াছ।

রাণী—আমাদের মতন উচ্চ বিষয়ে সমান চিত্ত বৃত্তি, বহু ভাগ্যে ফলে, বহু তপস্যায় লাভ হয়।

রাজা—সংসারে কত লোকত কত লোকের সহিত মিলিত হয়—

রাণী—হয় ত—কিন্তু কদিনের জন্য? শত শত লোক ত মিলন কালে বহু উচ্ছ্বাসের কথা কয়—চিরদিন চিরদিন আমরা পরস্পর পরস্পরের থাকিব এ বচন চোরে চোরে মিলিবার সময়ও হয়, লম্পটে লম্পটে, সংসারী সংসারীতে সকলেরই হয় কিন্তু এ বচনের কোন মুল্য নাই। ভালবাসা যদি যথার্থ হয় তবে ভালবাসার পাত্রকে ত ভাল হইতে হইবে? শত শত দোষ ঢাকিয়া রাখিয়া ভালবাসা হয়না। দোষ দেখাইয়া দিতে গেলে যদি ভালবাসা চটিয়া যায় সেই ভয়ে কখন কেহ কিছুই বলিতে পারে না তখন সে প্রণয়ের মূলে অসৎ কিছু আছেই। অহংকার বেশ রহিল, দাম্ভিকতা বেশ রহিল, রাগ দ্বেষ বেশ রহিল, পবিত্র হইবার জন্য আদর্শের দিকে দৃষ্টি রহিলনা, জ্ঞান লাভে চেষ্টা রহিলনা, চিরস্থায়ী যিনি তাঁহাতে থাকিবার জন্য প্রাণপণ করা হইলনা—এ প্রেমের পরিণাম কোথায় তাহা ত তোমার দেখিতে বাকী নাই? নিত্যইত তোমার দরবারে কত মামলা আসিতেছে, কত খুনাখুনির ব্যাপার হইতেছে—বল দেখি এ সকল কি মনোমিলনের ফল। তাই বলিতেছিলাম—মনোমিলন বহু তপস্যায় লাভ হয় আর যদি মানুষ আদর্শ পথে চলিতে সত্যই সত্যই চায় আর সত্যই সত্যই চেষ্টা করে তবে বহু দিনের তপস্যায় মানুষ প্রকৃত প্রেমে পৌঁছিতে পারে—নতুবা কামের বচন আর স্বার্থ সাধনার সুবিধা—কোথাও বা রূপজ মোহ—ইহার অভিনয় ভিন্ন ভালবাসায় আর কিছুই নাই। সমস্তই কামের অভিনয়। জ্ঞান যার নাই তার আবার ভালবাসা?

রাজা—তুমি ঠিক বলিয়াছ চূড়ালা। এই জন্যই ত তোমাকে এত ভাল বাসি।

রাণী—তাত বাস—কি —

রাজা—কিন্তু আবার কি? তোমারও কি আমার কাছে কিছু কিন্তু আছে?

রাণী—আছে ত দেখিতেছি।

রাজা—কি গো?

রাণী—এই যে তুমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাক, একমাত্র ইহাতেই তুমি আমাকে জব্দ করিয়া রাখিয়াছ। আমার আর কোন কাজে সোয়াস্তি নাই। রাজাগিরিতে যেমন অনেক কাজ রাণীগিরিতেও তাই। শত কাজ পড়িয়া থাকে—তুমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছ—যখন মনে করি—আর এ যে সর্ব্বক্ষণই হয়—তখন বল দেখি কোন কিছু আরম্ভ করিয়া শেষ করা যায় কি? যখনই মনে হয় তুমি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছ তখন আর থাকিতে পারিনা। হাতের কাজ পায়ে ঠেলিয়া দৌড়িয়া আসি দেখিতে। আহা! অপেক্ষা করা—ইহা কি? মানুষ যখন ভগবানের জন্যও অপেক্ষা করে তখন মানুষ ভগবানকেও জব্দ করিতে পারে।

রাজা—তুমি নাকি আমার ভগবান্?

রাণী—হ'তে পারিলে মন্দ কি হয়? আমার ভগবান্ ত তুমি। মুখে ইহা বলি বটে কিন্তু তথাপি একটা আচ্ছাদন যেন আছে। তোমার আদরে সময়ে সময়ে আচ্ছাদনটা সরিয়া যায় সত্য কিন্তু ইহা ত স্থায়ী হয় না। সেই ঘোরের অবস্থাতেও আমি উহা ভাঙ্গিয়া দেখি—স্থায়ী কতটুকু। যতদিন অজ্ঞানটা সরিয়া না যাইবে ততদিন প্রেম স্থায়ী হইবেনা—কামে প্রেমকে গ্রাস করিবে। এই আচ্ছাদনটা সরানই আমার তপস্যা। তোমারও তাই তুমি ত কতবার বলিয়াছ। স্বরূপে দেখাই দেখা—স্বরূপে দেখিলে ভগবানই দেখা হয়। সমান চিত্ত বৃত্তি হইলে আমার স্বরূপ তুমি দেখ আর তোমার স্বরূপ আমি দেখি—ইহা ভিন্ন স্বরা আর কিছুই নাই।

রাজা শিখিধ্বজ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন—শুনিতে শুনিতে চক্ষু কখন ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছে—রাজা যখন চক্ষু চাহিলেন তখন দেখিলেন রাণী নাই।

একক্ষণেই রাজার মনে বহু দুর্লক্ষণের চিন্তা জাগিয়া উঠিল। কখন কি বলিয়া ছিলেন—তাহা মনে পড়িল। অনেক ব্যথার কথা মনে ভাসিল; যে কখন এই নির্জ্জন স্থানে আইসে না, সে আসিল কেন তাহা মনে আসিল—রাজপরিবারে রাজার সমালোচনার কথা মনে জাগিল—লোক নিন্দার পাত্র

পাত্রী আমরা হইতে পারি--ইত্যাদি বহুচিন্তায় রাজার মন ব্যকুল হইয়া উঠিল। একক্ষণেই বহু অশান্ত ভাবনা রাজাকে পাগল করিয়া তুলিল। রাজা বিচারের সাহায্য লইলেন মন ঠিক হইল না—স্বরূপের সাহায্য লইলেন—সব যেন ভাসিয়া যায়—রাণী কি লোকের সমালোচনার বস্তু হইল এই চিন্তা রাজাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। রাণী কি কিছু অসুবিধায় পড়িল? রাজা এক দণ্ডে কত কি ভাবিলেন। এমন সময়ে হাসিতে হাসিতে রাণী আসিলেন।

সে মুখে ভাবনার কোন চিহ্ন নাই। সেই চির প্রসন্ন আদর ভরা মুখ। রাজার কি যেন হারাইয়া ছিল—কি যেন পুনঃ প্রাপ্তি হইল।

রাজা উঠিলেন—রাণীর হাত ধরিলেন—বলিলেন এমন করিলে কেন?

রাণী—একটু রঙ্গ করিলাম বৈ ত নয়।

রাজা তখন তাঁহার মনে কতকি উঠিয়াছিল বলিলেন, রাণী মুখে কিছুই বলিলেন না—ভাবিলেন ইহাও ত আমাকে দেখিতে হইবে। সব দিক দিয়া দেখিলে তবে ঠিক হইবে।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

আপনি আপনি মধুপুরে।

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার)

কি বিষয়ে শোক করিতেছ?

কি—কোথায় শোক করিলাম।

ঐ যে বলিতেছ কিছুই ত ভাল লাগে না?

ইহাও কি শোক?

তা নয়ত কি? ভাল না লাগা শোক বৈ কি। যখন কিছু ভাল লাগেনা তখন বিচার করিয়া দেখ দেখি ইহা কি দেহের ভাল লাগেনা বলিয়া হয়, না মনের ভাল লাগেনা বলিয়া হয়, না আত্মার ভাল লাগেনা বলিয়া হয়? তুমি বলিবে মনের ভাল লাগেনা বলিয়া হয় তাই শরীরও ভাল থাকে না! আচ্ছা বল দেখি এই সময়ে তুমি আপনাকে আপনি ভুলিয়াছ কি না? যে চৈতন্যের উপরে তোমার মন ভাল লাগার—মন্দ লাগার রঙ্গ তুলিতেছে

তাহাতে তুমি চৈতন্য বিস্মৃত হইয়া বিষয় মগ্ন মন লইয়া আছ কি না? চৈতন্য যে নিত্য আনন্দময়, চৈতন্য যে সর্ব্বশক্তিমান্, চৈতন্য যে ভাল লাগার মন্দ লাগার কোন ধার ধারেন না, তিনি যে পূর্ণ পদার্থ, তাঁহার যে কোন অভাব নাই,: ভাল করিয়া দেখ দেখি তুমি তোমার স্বরূপের এই স্বভাব ভুলিয়া মনের সঙ্গে মিশিয়া যাতনা পাইতেছ কি না? এই চৈতন্যই পরম পদ। ইনিই অখণ্ড সীমাতীত। ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্। ইহাঁকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় নিজগুরু চরণ ধ্যান যোগঃ প্রয়াগঃ। ইহাঁকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয়— "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয় তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। বেদাদিতে প্রসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী যে বিষ্ণুই পরমপদ জ্ঞানিগণ সেই পরমপদ সর্ব্বদা দেখেন। কিরূপে দেখেন? যে পরমপদ সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকে দেখিতে হইলে চক্ষুকেও প্রসারিত করিতে হয়। নতুবা ক্ষুদ্র চক্ষু লইয়া তুমি সেই সীমাশূন্য বস্তুর কতটুকু দেখিবে? এই যে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বড়, এই সূর্য্যকে তুমি চক্ষুগোলকের ভিতর থাকিয়া দেখ বলিয়া ক্ষুদ্রই ত দেখ—তার পরে ইনি অতিদূরে আছেন বলিয়াও এইরূপ হয়—আবার যেআত্মার অপরোক্ষানুভূতি তুমি সর্ব্বদা করিতে পার—তুমি সর্ব্বদা অনুভব কর "আমি আছি" সেই আত্মা কিন্তু অখণ্ড অথচ তাহাকে তুমি ক্ষুদ্র আত্মা বলিয়াই দেখ—কেন দেখ? অহং এর গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া দেখ বলিয়া অখণ্ডকে খণ্ডমত দেখা হইয়া যায়। দেখনা কেন অখণ্ড আত্মা যখন আপনি আপনি থাকেন তখন কি অহং থাকে? যখন বলিতে আরম্ভ করিলে "আমি" তখনই অখণ্ডকে খণ্ড মত দেখা হইয়া গেল। জ্ঞানিগণ যে অখণ্ডকে অখণ্ড মত দেখেন তাহার কারণ তাঁহাদের সমাহিত চিত্তে তখন অহং এর স্ফূর্ত্তি থাকেনা। সেই জন্য জ্ঞানপিপাসু বলেন "বিশালদৃষ্টৌ রমতে নস্তৎত্র পতির্ম যেন দৃষ্টি বিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাম্" আমার পতি—আমার দেবতা এই পরম পদ—ইনি বিশাল দৃষ্টিতেই রমণ করেন—ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে নহে। যদি কেহ পার তবে যাহাতে আমার দৃষ্টি বিশাল হয় সেই মন্ত্র আমাকে প্রদান কর আর সেই জন্য বলা হইয়াছে "দিবীব চক্ষুরাততং" দিবি আকাশে সমন্তাৎ প্রসারিত চক্ষু করিয়া জ্ঞানিগণ সেই পরমপদকে দেখেন। যখন সেই পরম পদে মিশিয়া তাঁহারা থাকেন তখন অহং নাই। এই অহংত্যাগকে বলে জ্ঞান লাভ করিয়া অহংশূন্য হওয়া, ইহা সমাধি ভিন্ন হয় না। জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ

সমাধিতেই হয়। কিন্তু যখন সমাধি ভঙ্গ হয় তখন সেই ব্যুত্থান কালে মন যখন ব্যবহারিক কার্য্যে আইসে তখন যাঁহারা বিশেষরূপে বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাদেরও পান ভোজন কালে অহংবুদ্ধির কার্য্য কিছু হইবেই। ইহা নিবারণের জন্য যত্নসাধ্য ধ্যানের আবশ্যকতা থাকিবেই। ধ্যান দ্বারা বাসনা ত্যাগ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ বলা হয়।

জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ ও ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ—বাসনা ত্যাগের এই দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়। আর বাসনাত্যাগ যতদিন না হয় ততদিন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যদি তোমার উপদেষ্টা হয়েন অথবা লোকনাথ দত্তাত্রেয়াদিও যদি শিক্ষা দেন তথাপি সংসার হইতে তোমার মুক্তি কিছুতেই হইবে না।

মন হইতে অন্য সমস্ত বাসনা তাড়াইবার কৌশলই হইতেছে ধ্যান। শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান কর, মন্ত্রধ্যান কর, ইষ্টদেবতা ধ্যান কর, অথবা নামকে সহস্রারে ত্রিকোণে অথবা ভ্রূমধ্যে জ্যোতির মধ্যে জ্যোতির নাম লিখিয়া হৃদয়মধ্যে জ্যোতির নাম লিখিয়া ধ্যান করিয়া করিয়া অনাত্মা চিন্তা ছাড়, ইহাই উন্নতির পথ। পুনঃ পুনং এই বিষয়ে যত্ন কর, ইহাই সাধনা।

নামের সঙ্গে কথা কওয়া বা নামীর সঙ্গে কথা কওয়া—ইহা মনকে শান্ত করিবার সরল সাধনা।

কথা কহিতে বা কথা কওয়া শুনিতে সকলেই ভাল বাসে। যিনি সকল কথা শ্রীভগবানের সঙ্গে কহিতে অভ্যাস করেন, আর কাহারও সঙ্গে কথা কওয়া কৌশল করিয়া ত্যাগ করেন তিনিই ভাল সাধক। যাহা কিছু কর, হৃদয়বিহারী বা কুটস্থবিহারী জ্যোতির্ম্ময় পরমদেবতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিতে অভ্যাস কর--এই অভ্যাস যখন পাকা হয়, কোন কর্ম্মই যখন তাঁহাকে না জানাইয়া আর হয় না তখন সাধনার এক অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ হয়। প্রথম প্রথম সকল অভ্যাসেই ক্লেশ আছে—ভুল অনেকবার হইবেও---তাহাতেও কিন্তু হতাশ হইবার কিছু নাই আবার যত্ন কর--যতদিন না হয় ততদিন কর, হইবেই।

কখন তুমি ভগবানের সঙ্গে কথা কও, কখন শ্রীভগবান তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন এই দুই অভ্যাসই ভাল। যখন সংসার-পীড়নে তোমার বড় ক্লেশ হয় তখন যদি ভগবানের কথা কওয়া শ্রবণ কর---ভগবান্ যেন বলিতেছেন আমি সংসারে আসিয়া দেখাইয়াছি সংসারে কত ক্লেশ, সংসারের স্বরূপই হইতেছে দুঃখ—ইহা আমি বহুপ্রকারে দেখাইয়া দিয়া আসিয়াছি কাজেই ভগবান্ ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তুই অবজ্ঞার বিষয়---এই ভাবে ভগবান্ ভিন্ন

সমস্ত অসৎ বস্তুকে মিথ্যা মিথ্যা জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করার অভ্যাস পাকা করিতে পারিলেই তুমি সর্ব্বদা ভগবান লইয়া থাকিতে পারিলে। কথা কওয়াকে সর্ব্বদার কার্য্য করিয়া ফেল, সহজে সরল ভাবে সংসারসাগর পার হইতে পারিবে। আত্মরতি আত্মকাম, আত্মতৃপ্তির এক পথের কথা কওয়া হইল—ইহাই আপনি আপনি।

শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিতে-সমাজের প্রতি শিক্ষিতের কর্ত্তব্য।

(শ্রীরাম দয়াল মজুমদার)

নানা কারণে প্রথমেই একটু কৈফিয়ৎ দেয়া উচিত মনে করি। ইহাও আমার হইয়া আর একজন লিখিয়া দিয়াছেন।

"উৎসব" পঞ্চ বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিতে যাইতেছে। যাঁহার ইচ্ছায় রবি, শশী, তারকা গগনে স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, যাঁহার ইচ্ছায় জগচ্চক্র চলিতেছে তাঁহার ইচ্ছায় এই পঁচিশ বৎসর বাঙ্গালার সমক্ষে "উৎসব" তাহার আদর্শ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। "উৎসবে"র গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের সংখ্যা আলোচনা করিয়া মনে হয় না যে এই পঁচিশ বৎসরে "উৎসব" বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের যুবক-যুবতীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। যৌবনের ধর্ম্ম আপাতমধুর বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। "উৎসবে" তেমন আপাতমধুর কোন বস্তুরই আলোচনা হয় না—তাই আপাতমধুরমগ্ন যুবক-যুবতী "উৎসবে"র কথায় কর্ণপাত করেন না বলিয়া মনে হয়। "উৎসব", পাঠক-পাঠিকাগণের রুচিকর আহার যোগাইতে পারে নাই—তাহার আদর্শ শাশ্বত, সনাতন, চির পুরাণ। গৃহকে কেমন করিয়া আশ্রম করিতে হয়, এই গৃহস্থাশ্রমে কি প্রকারে শম, দম, শৌচ, আচার, সন্ধ্যা, পূজা, জপ, ধ্যান ধারণা অবলম্বন করিয়া মানুষ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের

সুখ লাভ করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারেন—"উৎসব" এই পঁচিশ বৎসর সেই আলোচনাই করিতেছে। বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী ইত্যাদি শাস্ত্রে এই চতুর্ব্বর্গ লাভের পথের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সেই জন্য "উৎসবে"র আলোচ্য গ্রন্থ—শাস্ত্ররাজি। কোন প্রকার নাটক, উপন্যাস, রসন্যাস, জীবনী—এই পঁচিশ বৎসরে "উৎসব" কখনও আলোচনা করে নাই। গোমুখী হইতে যেমন পূত গঙ্গাজলধারা অবিরাম নির্গত হইতেছে "উৎসব" হইতে তেমনি শাস্ত্র-আলোচনা অবিরাম ঝরিতেছে। এই পথে জীবের কল্যাণ—তাই এই পথে—"উৎসব" চলিয়াছে।

পঁচিশ বৎসর পরে আজি "উৎসব" এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইতেছে। এত কাল সে যাহা করে নাই আজ তাহা করিতে উদ্যত হইতেছে। "উৎসব" আজ "শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিতের" প্রসঙ্গ করিতে যাইতেছে। যে "উৎসব" উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোচনায় রত সে আজ পতিতার প্রসঙ্গ করিতে কেন উদ্যত? এই উদ্যোগের হেতু এই যে "উৎসব" এই পঁচিশ বৎসর যে শম, দম, শৌচ, আচার, সন্ধ্যা, পূজা, ধারণা, ধ্যান অনুষ্ঠান করিবার জন্য বাঙ্গালীকে নিত্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছে সেই অনুষ্ঠানে বিমুখ হওয়ায় বাঙ্গালার তরুণ সমাজে কি বিষাদপূর্ণ,লোমহর্ষণ ঘটনা আজ ঘটিতেছে "পতিতার আত্মচরিতে" জনৈক শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা আপন জীবনের মর্ম্মন্তুদ অধঃপতন সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তাহার এক ভীতিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "উৎসবের" নির্জ্জলা আলোচনায় যে সুফল প্রসব করিতে পারে নাই—ভুক্তভোগীর এই আত্মচরিত পাঠে হয়ত সে সুফল ফলিতে পারে—হয়ত ইহাতে সমাজের চক্ষু ফুটিতে পারে। "উৎসবের" আদর্শ অনুসরণ সমাজ করে নাই বলিয়া আজি ভদ্র ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলা পতিতা—ইহা দেখিয়াও যদি আধুনিক বাঙ্গালী "উৎসবের" প্রদর্শিত প্রাচীন পথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এই আশায় "উৎসব" তাহার পঁচিশ বৎসরের আচরিত রীতি পরিত্যাগ করিয়া "পতিতার আত্মচরিত" আলোচনা করিতে যাইতেছে। বিষে যেমন বিষক্ষয় হয়—আশা করি এই "আত্মচরিতের" বিষে তেমনই সমাজের বিষক্ষয় হইবে।" "আত্মচরিত" আলোচনার এই কৈফিয়ৎ দিয়া আমরা এক্ষণে এই চরিতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ভগবান করুন—যেন ইহাতে মঙ্গল হয়।

যাঁহার প্রেরণায় সমাজে এই ব্যভিচার দেখা দিয়াছে তাঁহারাই প্রেরণায় প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতেছে।

যে খরতর ব্যভিচার স্রোতে সমাজ ভাসিয়া চলিতেছে ইহা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য বুঝি মানুষের নাই। তথাপি ইহাতে নিশ্চেষ্ট থাকাও অতিশয় অধর্ম্ম। কাঁকড়ার বাচ্চা সমুদ্র থামাইতে পারেনা সত্য তথাপি তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টা থাকেই। সমাজ ও পিতামাতা একই—অন্ততঃ কল্যাণপ্রার্থি নর নারীর থাকা উচিত। যদি পিতা বা মাতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েন আর ডাক্তার বৈদ্য জবাব দেন তাহা হইলেও পুত্র কন্যার সেইরূপ পিতা মাতাকে অচিকিৎসায় ফেলিয়া রাখা উচিত নহে—ইহা কেহই করেনা। ইহা পাপ—সাধু হৃদয় মাত্রেই এই কথার প্রমাণ। এই জন্য কঠিন-ব্যাধি-পীড়িত সমাজের প্রতি উদাসীন থাকা কল্যাণ প্রার্থীর উচিত নহে, কারণ ইহা অধর্ম্ম। জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা এবং অধর্ম্ম নিবারণের প্রযত্ন সমকালেই হওয়া আবশ্যক। আধুনিক শিক্ষিতাও যে পতিতা হন ইহার জন্য দায়ী কে?

সমাজের ব্যাধি কোথায়? কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই ব্যাধির প্রশ্রয় দিতেছেন—এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করাও বোধ হয় শ্রীভগবানের অপ্রিয় কার্য্য হইবে না। আমরা ধারাবাহিকরূপে উৎসবে এই পুস্তকের বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিব। এই মাসে আমাদের সময় নাই সেইজন্য কেবল শ্রীমানদা দেবীর কৈফিয়ৎ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিবৃত্ত রহিলাম।

শ্রীমানদা দেবী লিখিতেছেন আমি পাপী কলঙ্কিনী যশের প্রার্থী নহি—সুতরাং আমার জীবনের খাঁটি কথা গুলি আমি যেমন অকপটে বলিতে পারিব, কোন মহৎই তাঁহার জীবনের ঘটনা তেমন অকপটে বলেন নাই। বলিতে পারেন না।"

"পাপের স্বরূপ চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। পাপ জিনিষটা যে কি, কৈশোরে তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমি—আমি কেন—আমার মত সহস্র সহস্র নারী পতিতা।

"এ পৃথিবীতে যদি নরক থাকে তবে তাহা আমাদের জীবন'। "সমাজে আমার স্থান নাই, থাকাও উচিত নহে, কিন্তু যে সকল সাধু বেশী লম্পট আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়াও সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন,

আমার জীবনীতে তাহাদেরও কতিপয় চিত্র দেখিয়া সমাজটা চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। এই ভণ্ডের দল কি প্রকারে অবোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করে তাহার চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন।"

"পতিত গণ যদি বই লিখিতে পারেন তবে পতিতাগণ পারিবেনা কেন?'

কাহারও প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য এই পুস্তক লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান সমাজের খাঁটি চিত্র দেখাইয়া সমাজপতিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাই এক মাত্র উদ্দেশ্য। আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে—সমাজে সাড়া পড়িয়াছে।"

"আমি একুশটি পতিতা ভদ্র মহিলার উক্তি হইতে তাঁহাদের জীবনী লিখিয়াছি"।

শুনিতেছি পুস্তকখানি পতিতার লেখা নহে, কোন পুরুষ ইহা লিখিয়া দিয়াছেন—এই বলিয়া পুস্তকখানি অগ্রাহ্য করার কোন যুক্তি নাই, পুস্তকে অনেক কথা এমন ভাবে লেখা আছে যাহা দেখিয়া মনে হয় স্ত্রীলোক ভিন্ন এরূপ বলা কোন পুরুষে বলিতে পারে না—যদি কোন পুরুষ পারেন তিনি —ইহা আর বলিবনা। হয়ত এই পুস্তকে পুরুষের লেখাও আছে কিন্তু যিনিই লিখুন এই পুকেস্তযাগা লিখিত হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যভিচার যে সমাজে চলিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুস্তকের সমালোচনা কালে আমরা তাহা দেখাইব।

ভাই ও ভগিনী উপন্যাস—সমালোচনা।

আমার পরম স্নেহাস্পদ অন্তরঙ্গ শ্রীবিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় এই ৯০ পৃষ্ঠার উপান্যাস খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বইখানি সুন্দর কাগজে অতি সুন্দর ছাপায় রুচিকর বাঁধায় সুসজ্জিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। পুস্তক প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং ১৬২নং বহুবাজার উৎসব অফিসে পাওয়া যায়। পুস্তকেরবাহিরটি যেমন সুন্দর ভিতরটি তদপেক্ষা সুন্দর। মনোহর ভাষায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিকে মনোরম করিয়াছে। বহুপূর্ব্বে এই পুস্তকখানির সমালোচনার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হই। নানা কারণে

এই অনুরোধ রক্ষা করিতে আমি পারি নাই। তজ্জন্য আমি গ্রন্থকারের নিকট ক্রটী স্বীকার করিতেছি। সম্প্রতি "শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত" পুস্তকখানির সমালোচনা করিতে গিয়া "ভাই ও ভগিনী"র উল্লেখ করা উচিত বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকেরও সমালোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি। কারণ আজ কালকার উপন্যাসলেখকগণ যে বিচারশূন্য অন্ধ হৃদয়ের ছবি আঁকিয়া সমাজকে অবিচার জনিত ব্যভিচারের পথে ভাসাইতেছেন এই পুস্তকে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখান হইয়াছে। শুধু হৃদয় আঁকিলে কিছুই হয় না, যদি অন্ধহৃদয় চক্ষুষ্মতী বুদ্ধির বিচার সঙ্গে মিলিত না হয়। পুস্তকখানির পবিত্র ভাব, যিনিই ইহা পাঠ করিবেন তিনিই অনুভব করিয়া নিজের চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া নিজের ও সমাজের যে বিশেষ কার্য্য সাধিতে পারিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিছু পূর্ব্বে আমি এই পুস্তক সম্বন্ধে বিজয়কে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এই সমালোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি, সমালোচনা পরে করিতেছি।

"বিজয়, তোমার "ভাই ও ভগিনী" উপন্যাস খানি পাঁচ বৎসর হইল ছাপা হইয়াছে কিন্তু যে যুবক যুবতীর জন্য ইহা লেখা তাঁহারা যে ইহার সম্যক্ আদর করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। হইতে পারে ইহার প্রচারের জন্য সেরূপ চেষ্টা হয়নাই, তথাপি যতটুকু চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা দ্বারাও তোমার পুস্তকের উপকারিতা সমাজ স্বীকার করেন নাই— আধুনিক তরল সাহিত্যের বিচার-শূন্য লেখার প্রসারও এই সুন্দর বস্তুর অনাদরের অন্যতম কারণ। যেমন আগাছার উৎপাতে উদ্যানে সুন্দর ফুলের বৃক্ষ স্থায়ী হয় না সেইরূপ উপস্থিত সুখগন্ধী কামাসক্তিপূর্ণ পুস্তকের বহুল প্রচারে সাহিত্যে ভাল পুস্তক চাপা পড়িয়া যাইতেছে। যে অসংযম জনিত ব্যভিচারের স্রোত আজ কালকার উপন্যাস লেখকগণ—কি ছোট কি বড় প্রায় সকলেই—সমাজে ছুটাইতেছেন যাহার ফলে "এই শিক্ষিতা পতিতার" দৃষ্টান্ত সমাজে আজ বড় বিরল নহে—এই ব্যভিচারের সম্যক্ ফল লেখকগণ আপনারা ভোগ না করিলে ইহাঁরা ইহাঁদের নিজকৃত ব্যভিচারের বিরুদ্ধে যে সহজে দাঁড়াইবেন তাহাত বোধ হয় না। যদি লেখকের বুদ্ধি একেবারে নষ্ট হইয়া না থাকে, যদি ইহাঁদের সুবিচার একেবারে অন্তর্হৃত না হইয়া থাকে, যদি ইহাঁদের হৃদয়ে কিছুমাত্র সংযমেরও স্থান থাকে তবে ইহাঁরা দেখিবেন যে ইহাঁদের অসংযম-জনিত ব্যভিচারের উপদ্রব সমাজ মধ্যে এমন উৎকট বিভীষিকা তুলিবে যে

ইঁহারাও ইহাঁদের অবিচারিত পন্থা ছাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন এবং পিতা মাতার মত ইহাঁরাও সমাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। যদি লেখক আপনি আপনার প্রবৃত্তি পথের লেখার অনিষ্ট দেখিয়াও ব্যথিত না হয়েন তবে বুঝিব ইঁহাদের ব্যভিচার ইহাঁদের এত প্রিয় যে উহাতে সমাজ বিধ্বংস হইতেছে দেখিয়াও উহাঁদের কঠিন হৃদয় সংযমের দিকে গলিল না।

বিজয়! তোমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে হৃদয়কে কিরূপে গঠিত করিতে হয় তাহার কথাই সর্ব্বত্র অথচ তুমি আজ কালকার উপন্যাস লিখিয়া তাহা যুবক যুবতীর নিকট ধরিয়াছ। আমার মনে হয় আজ কালকার অসংযম জনিত ব্যভিচারের মুখ ফিরাইবার জন্য তুমি এই পবিত্র পুস্তক লিখিয়াছ। ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্যের জন্য চেষ্টা করাই সাধুপথ।

আগামীবারে আমরা "ভাই ও ভগিনী"র সমালোচনা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—গৌরীপুর কর্ত্তৃক পঠিত মহাকালী পাঠশালার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে অভিভাষণ

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

প্রাচীন ভারতের আদর্শ, তাহার শিক্ষা, তাহার সাধনা, তাহার তপঃপূত দৃষ্টি, সকলই অনন্যসাধারণ, অদ্ভুত। সম্মুখে একটী বালিকা আসিল, বিশ্বমানব দেখিল—তাহার কৃত্রিম বেশ-ভূষা, নৈসর্গিক লাবণ্য, বিকাশোন্মুখ রূপরাশি, সুগঠিত দেহযষ্টি, বিশুদ্ধ হাস্যচ্ছটা; আর ভারতবর্ষ দেখিল, "বালিকা-কালিকা-সাক্ষাৎ"। তাঁহার দৃষ্টি বেশ-ভূষাকে স্পর্শ করিল না, লাবণ্যে ভুলিলনা, রূপ রাশিতে লুব্ধ হইলনা, সুঠাম দেহে মুগ্ধ হইলনা, বিশুদ্ধ হাস্যচ্ছটায় ভাসিয়া গেল

না; সে অণুবীক্ষণী দৃষ্টি সব ছাড়িয়া, অস্থি পঞ্জর ভেদ করিয়া, তাহার চির আরাধ্য বস্তু ধরিল; সে দেখিল, "বালিকা-কালিকা-সাক্ষাৎ"; দেখিল, বালিকার দেহ-কলিকা লইয়া জগজ্জননী কালিকা তাহার সম্মুখে।

ভারতের এই অসাধারণ দৃষ্টি তাহার বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাধনার বিশিষ্ট ফল। প্রাচীন ভারত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝিয়াছিল মানব-স্বভাবের স্তরে স্তরে যে বৈষম্য রাশি বিদ্যমান উহা অশন-বসনের সাম্যে তিরোহিত হয় না। উশৃঙ্খলতায় উপশমিত হইতে পারে না। এই বৈষম্য শিথিলীকৃত হয় সাম্যমুখী শিক্ষা ও সাধনায়, তিরোহিত হয় ভাগবতী দৃষ্টিতে। সুতরাং ভারতবাসী বৈষম্য-বিষের প্রতিষেধককে শত নিয়ম বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও এই অনন্য সাধারণ শিক্ষাই তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিত, এই সাধনালব্ধ এই দৃষ্টিই তাহাকে শক্তিশালী রমণীয় ও মধুর করিয়া রাখিয়াছিল।

মানব অনন্ত শক্তির পরিমিত আধার। আকাশ-প্রতিবিম্ব-মণ্ডিত ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু যে ব্যবস্থা দ্বারা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি-নিচয় স্তরে স্তরে আত্ম প্রকাশ করে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করি। যে শিক্ষা নর নারীর মানস-পটে অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির একটি বিরাট মান-চিত্র অঙ্কিত করে, অন্তর্বহিঃ উভয়বিধ সাধনা দ্বারা উহাকে সজীব করিবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ করে তাহাই মানবের পূর্ণশিক্ষা। এই শিক্ষার পথে বিলাস-ব্যসন-আলস্য-অনিচ্ছা, ভোগ-তৃষ্ণা প্রভৃতি আসুরী বাধা আছে সত্য, এবং ইহা দুরপনেয় তাহাও সত্য, কিন্তু অনপনেয় নহে। যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্বীয় সুব্যবস্থা দ্বারা এই বাধাগুলি হইতে শিক্ষার্থীকে দূরে রাখিয়া বিশুদ্ধ বন্ধনীর মধ্যে তাঁহাকে সুবিকসিত করিবার প্রয়াস করেন, উহাই বিশুদ্ধ ও সফল প্রতিষ্ঠান।

প্রাচীন ভারত এই জন্যই প্রকৃতির অতি নিভৃত ও শান্তিময় প্রদেশে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের সহিত নব্য ভারতের এই যে সুদূর পার্থক্য ঘটিয়াছে; একদিকে শিক্ষাসুব্যবস্থার অভাব, ও অপর দিকে শিক্ষার কুব্যবস্থাই তাহার প্রধান কারণ। অন্যান্য কারণগুলি ইহারই শাখা প্রশাখা মাত্র। সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি শক্তি-সঞ্চয় ও শক্তি-বিকাশের অমোঘ উপায়গুলি যতদিন পর্য্যন্ত জাতি ও ব্যক্তির অনুশীলনে না আসিবে, ততদিন জাতি ও ব্যক্তির উন্নতি সুদূর পরাহত। কীট দষ্ট মূলের চিকিৎসা না করিয়া শাখায় জল সেচন, মমতা সূচক হইলেও যে ব্যর্থ, সে বিষয় সন্দেহ নাই।

নর-নারী-শিক্ষার সাধারণ ধারাগুলি উল্লেখ করা হইল। এইবার আমরা ভারতীয় নারীতত্ত্ব ও নারী-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলিব।

আমাদের শিক্ষায় নারী গৌরীর বিভূতি; যত্র নারী তত্র গৌরী। অধ্যাত্ম রামায়ণ বলেন, "লোকে স্ত্রী বাচকং যদ্ যৎ, তৎ সর্ব্বং জানকী শুভা;" যাহা কিছু স্ত্রী বাচক, তৎসমুদয়ই জগজ্জননীর মূর্ত্তি। উপনিষদে এই তত্ত্ব আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে—"রুদ্রো নর উমা নারী" হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে "রুদ্রঃ পুষ্প মুমাগন্ধঃ" পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ পূর্ব্বক উপনিষদ্ এই নারীতত্ত্ব-রহস্য বিবৃত করিয়াছেন। তন্ত্র শাস্ত্র বলেন—"নারী পদতলং দৃষ্ট্বা স্মর্ত্তব্যা কালিকা সদা"। প্রাচীন ভারত নারীকে কোন্ দৃষ্টি লইয়া দেখিতেন, কতবড় ভাবিতেন, পূর্ব্বোক্ত পুরাণ, তন্ত্র ও উপনিষদের বাক্যে আমরা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম।

নব্য ভারতে নর-সমাজের ন্যায় নারী-সমাজ ও নিজ নিজ রহস্য পরিচয় ভুলিয়া অধিকারের দাবী লইয়া সংঘর্ষের জন্য উদ্যত হইয়াছেন; ইহা যথেষ্ট দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয় হইলেও বিস্ময়কর নহে। কারণ, সুশিক্ষার অভাবে ও কুশিক্ষার প্রভাবে সে শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, সে শিক্ষা ও সাধনা নাই, সে 'অমানী মানদ' ভাব নাই, নর নারীর সব ফুরাইয়াছে; আছে শুধু দাবী, আছে শুধু সম্মানের মানদণ্ড লইয়া পরস্পরের উপর আঘাত।

সম্মান লাভ ও অকপট সম্মান দান, উভয়ই শিক্ষা-মূলক গুণবিকাশের ফল। কবি বলেন—"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চলিঙ্গং ন চ বয়ঃ", গুণ সমূহেই পূজার বস্তু, গুণের আধার স্ত্রীলোকই হউক বা পুরুষই হউক, ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ বিচার বা বয়সের বিচার নাই। যখন শিক্ষা ছিল, গুণের বিকাশ ছিল, গুণের স্পর্দ্ধা ছিলনা, তখন গুণ ভূষিত বালককে দেখিয়া গুণমুগ্ধ বৃদ্ধও স্বাভাবিক সম্মান ভরে অবনত হইতেন, গুণাধিক আচার্য্য শঙ্করের চরণ প্রান্তে বসিয়া বৃদ্ধ শিষ্যগণও স্ব স্ব জীবনকে ধন্য মনে করিতেন। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও সুলভার নিকটে ঋষিগণও ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া আপ্যায়িত হইতেন।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনার ধারা বুঝিতে হইলে ভিতরে ডুবিতে হয়। কারণ, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিগণ বিশ্বমানবের সৃষ্টি ও স্থিতির সূত্র নির্ণয় করিয়া ভারতবর্ষকে সেই সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ফুল স্বীয় সৌন্দর্য্য ও সৌরভে স্থিতিকালকে লোভনীয় করিয়া তুলে

সত্য, কিন্তু স্থিতিকালকে কল্যাণময়, শান্তিময় ও সুদীর্ঘ করিতে হইলে তাহা ফুলের ধারায় হয় না, বীজ ও মূলের ধারাতেই হয়। নব্যভারত কুশিক্ষার প্রভাবে অসংযত-ভোগস্পৃহায় আকুল হইয়া মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত ব্যাপী জাতীয় উন্নতির এই কল্যাণ-সূত্র শতধা ছিন্ন করিয়াছেন। ফলে, নব্যভারতে সৃষ্টির সহিত স্থিতির, প্রতিযোগিতার সহিত প্রতিষ্ঠার, স্বাস্থ্যের সহিত ভোগের, সুখের সহিত কল্যাণের, অর্থকামের সহিত ধর্ম্মের, আত্মদানের সহিত আত্মস্থাপনের, বিশ্বপ্রেমের সহিত রাজনীতির অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বিছিন্ন হইয়াছে; ইহাদের পরস্পর বিরোধ অপ্রতিবিধেয় হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র বলেন, নিয়ন্ত্রিত রজোগুণে জগতের সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে জগতের স্থিতি। পুরুষ-দেহ স্থিতি-শক্তি-প্রধান, স্ত্রীদেহ সৃষ্টি-শক্তিপ্রধান। এই সত্ত্বশক্তি ও রজঃশক্তির সমষ্টি লইয়া যে মহাপুরুষ বিরাট বিশ্বদেহে বিরাজ-মান, ইহাঁকেই প্রাচীন ভারত মনু নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মনু হইতেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে মানব-বংশ উৎপন্ন ও বিস্তারিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের স্বীয় বিরাট দেহে সত্ত্বশক্তি ও রজঃশক্তির যে স্বাভাবিক ভেদ বর্ত্তমান, তদনুসারে ইনি স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে নিজ দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করেন, এবং মিথুন-ধর্ম্মে মানবসন্তান উৎপাদন করেন। এই স্থান হইতেই মানববংশ স্ত্রী পুরুষ ভেদে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। এবং তদবধি নরনারী-সমাজ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। এই সুপরিচালনের ফলেই প্রাচীন ভারতে সতী সাবিত্রী দময়ন্তী অনুসূয়া লোপামুদ্রা অরুন্ধতী সীতা প্রভৃতি স্ত্রী-রত্ন-সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই বিশুদ্ধ পরিচালনের মহিমায়ই বশিষ্ঠ ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য ইক্ষ্বাকু মান্ধাতা ভরত নহুষ রঘু রাম যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন সমাধি বিদুর প্রভৃতি পুরুষ-ধুরন্ধরগণ ভারত-ভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী পুরুষের সাধারণ কার্য্য প্রজনন। ইহাও দ্বিধা বিভক্ত কর্ত্তব্যের একী-ভূত ফল। পুরুষের কর্ত্তব্য আধান, স্ত্রীর কর্ত্তব্য গর্ভধারণ। পুরুষ অষ্টম বর্ষে আদর্শ গুরুর নিকটে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য গুরুশুশ্রূষা ও অধ্যয়ন দ্বারা সংযত বিশোধিত ও জ্ঞান বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল হইয়া আধানের যোগ্যতা লাভ করিতেন; আর স্ত্রী-ধারাও অষ্টম বর্ষে তাহার একমাত্র গুরু স্বামীর কুলে উপনীত হইয়া বা বিবাহিত হইয়া সংযত বিশোধিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল মহাগুরুর 'ছাঁচে' একান্ত অনুবর্ত্তনে নিজকে 'ঢালাই' করিয়া অভিন্ন ভাবে পর্য্যবসিত হইতেন।

ফলতঃ, যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ন্তব, যদেতদ্ হৃদয়ন্তব তদং হৃদয়ংমম (এই যে আমার হৃদয় ইহা তোমার হউক এবং এই যে তোমার হৃদয় ইহা আমার হউক); বিবাহ কালের এই প্রার্থনা-বাক্য সমূহ এই অনুবর্ত্তনের ফলে বর্ণে বর্ণে সফল হওয়া উচিত। প্রেমবিজয়িনী কুলবধূ অনুবর্ত্তনে, সেবায় ও মাধুর্য্যে শ্বশুর শ্বাশুড়ী ননদ দেবর প্রভৃতি সকলের হৃদয়ে সংসার-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হইয়া উঠিতেন; অনুবর্ত্তনের অধীনতা-যন্ত্রে স্বাধীনতা বিনা আড়ম্বরে বিনা সংঘর্ষে গড়িয়া উঠিত।

আজ নব্য ভারতের এই দুর্দ্দিনে, দাম্পত্য-সম্পর্কের এই মাধুরী উপকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কোথাও অশিক্ষার কুহেলিকায় ইহা আচ্ছন্ন, কোথাও বা ভোগোন্মাদিনী কুশিক্ষার উচ্ছৃঙ্খলতায় ইহা উপেক্ষিত, অস্বীকৃত। ফলে, প্রাকৃত ও উচ্ছৃঙ্খল দম্পতি, মূলের সন্ধানে বঞ্চিত ও কুসুম-সৌরভে মুগ্ধ হইয়া যেভাবে মিলিত হয়েন, সে মিলনের ফলে সীতা সাবিত্রীর জন্মভূমি কোন্ দিকে চলিয়াছে, সুধী-সমাজ তাহার সাক্ষী।

একটি অশীতিপর বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, আমার জীবনে আমি ত্রিবিধ নারী-চরিত্র লক্ষ্য করিলাম। প্রথম দেখিয়াছি আমাদের মাতৃ-চরিত্র। তাঁহারা রাত্রির শেষ প্রহরে জাগিতেন, কত দেবতার স্তব পাঠ করিতেন। তাঁহার কোমল করস্পর্শে জাগিয়া আমরা শুনিতাম, মধুর স্বরে মা বলিতেছেন, "যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছা ধন"। বাল্যে এইরূপ ভাবেই আমাদের হৃদয়ে ভগবদ্ ভাবের রেখা পাত হইয়াছিল। যাহা হউক, তার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া গো-গৃহ-মার্জ্জন ও গোবর ছড়ায় মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যের পর মা বস্ত্র ত্যাগান্তে দেবগৃহ মার্জ্জন ও পুষ্প চয়ন করিয়া প্রাতঃস্নান করিতেন। অতঃপর তুলসী-তলা মার্জ্জনপ্রণাম, সন্ধ্যা-আহ্নিকের আয়োজন ও নিজ প্রাতঃক্রিয়া পরিসমাপ্ত করিয়া মা আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিতেন ও তৎপর অন্নপূর্ণারূপে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেন। সন্তান প্রতিপালন, স্বামিসেবা, অতিথি পরিচর্য্যা, গৃহাগত আত্মীয় কুটুম্বগণের যথাযথ মর্য্যাদা দান ও সেবা, এমন কি, গৃহ পালিত পশুপক্ষিগণেরও অন্নজলের ব্যবস্থা যথা সময়ে নির্ব্বাহ করিতে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ থাকিত। আমরা জননীর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি ছিলাম, এতদ্ভিন্ন মায়ের কতগুলি পালিত সন্তানও ছিল; তাঁহার বেগুন লাউ সিম কাপাস প্রভৃতির গাছ এবং নানা ফুল ও ফলের গাছ, ইহারাও আমাদেরই মত আদর যত্ন পাইত; ইহাদের খাদ্যসার, পানীয় জল, রোগের ঔষধ, এ সব

সর্ব্বদাই মায়ের প্রস্তুত থাকিত। আহারের পর অপরাহ্নে আমাদের মুখে রামায়ণ শুনিতে শুনিতে মা কাঁথা শেলাই করিতেন, শিকা প্রস্তুত করিতেন, ডাল-চাল বাছিতেন, চরকায় সূতা কাটিতেন, অথবা যজ্ঞোপবীত নির্ম্মাণ করিতেন। সায়াহ্নে স্বয়ং গাছে জল দিয়া কিংবা আমাদের ভাগ করিয়া জল দিবার আদেশ করিয়া মা গো-মাতার সান্ধ্য ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন; স্বহস্তে বিচালি কাটিতেন, উহা খৈলজলে মিশাইয়া প্রস্তুত করিয়া গোগৃহ পরিষ্কার করিতেন, গোগৃহে ধূম-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এ দিকে মা মাঝে মাঝে আমাদের কার্য্যও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং তারতম্য অনুসারে আমরা মায়ের কাছে পুরস্কৃত হইতাম। এতদ্ভিন্ন মা বহু টোট্‌কা ঔষধ জানিতেন, আমাদের সাধারণ রোগে চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না। আমাদের পল্লীর কোন্ বাড়ীতে কাহার কি অসুখ, কাহার কি ব্যবস্থা আবশ্যক, মা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তাহা ভুলিয়া যাইতেন না। যথা সময়ে নিম্নজাতিগণও তাঁহার সাহায্যে তাঁহার সেবায় বঞ্চিত হইত না। আমাদের সংসারে তখন একটি মাত্র চাকর ছিল, মা একাই এখনকার দাসী দাস পাচক, সকলের কার্য্য করিতেন। ইহারা ছিলেন দেবী।

দ্বিতীয় দেখিলাম, আমাদের সহধর্ম্মিণীদিগকে। তাঁহারাও নিজ দেহ স্বামী পুত্র কন্যা গৃহোপকরণ, এ সকলের মর্য্যাদা বুঝিতেন; কিন্তু এ মর্য্যাদা বোধ ধর্ম্মমূলক নহে, প্রয়োজন মূলক। ইহাঁরা রন্ধনশালার সম্পর্ক সর্ব্বথা ত্যাগ করেন নাই, তবে সে সম্পর্ক কমিয়া গিয়াছে; মাঝে মাঝে পাচকের দায়-সারা সেবাও আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই সময় হইতেই আত্মীয় কুটুম্বগণের যাতায়াত কমিয়া গিয়াছে। তখনও অন্ন-সমস্যার প্রাদুর্ভাব হয় নাই, কিন্তু আত্মীয়গণ জননীর নিকট যেরূপ প্রাণস্পর্শী আদর পাইতেন, স্বভাবতঃ তাহা কমিয়া যাইতেছিল। পত্নীর ব্যবহারে আদর ছিল, কিন্তু সে আদর স্বর্গীয় মাধুরী শূন্য। সে মাধুরী মণ্ডিত সেবার অভাবে বৃক্ষ লতার দানগুলি হইতেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। তখন হইতে আমরা বাজারের ফল ও তরকারী খরিদ করিতে শিখিলাম; সদ্য ও সুপুষ্ট হউক আর না হউক, বাজার হইতে ফল ও তরকারীর অভাব পূরণ হইল বটে, কিন্তু বৃক্ষকে আদর করিয়া মা যে স্বর্গীয় প্রতিদান পাইতেন, সে ক্ষতির আর পূরণ হইল না। জননীর আদরে পল্লী-বাসীর নিকট যে ভ্রাতৃপ্রেম পাইতাম, পত্নীর সময়ে সে স্মৃতি মুছিয়া না গেলেও বেশ হীন-

প্রভ হইয়াছে। তৃতীয় দেখিলাম, পুত্রবধূগণকে। ইহারা আপনাকে লইয়াই সতত ব্যস্ত। পৌত্রটির লালন পালন ভার দাসীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে; তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপরে। বউমার দেহভার সতত রুগ্ন; অপরিপুষ্ট স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং অনাহারে কদাহারে শিশুটি কঙ্কাল-সার হইয়া পড়িয়াছে। বউমা আমার বসন-ভূষণে পরিচ্ছদে সর্ব্বদাই লোলুপ। ভোগাভিলাষ উদ্দামভাবে গতাগতি করিয়া দেহটিকে করকাহত কমলবনের ন্যায় শোচনীয় ও গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় অন্তঃসার শূন্য করিয়াছে। গৃহ-কার্য্য মর্য্যাদা ও স্বাস্থ্যের হানিকর বলিয়া উহার ভার চাকর চাকরাণীর উপর অর্পিত হইয়াছে। রন্ধন-শালায় কুল-লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে পাচক নাম ধরিয়া কদাচারী কুৎসিত রোগগ্রস্ত একটি অলক্ষ্মীর বাহন প্রবেশ করিয়াছে। বাল্যে ও যৌবনে মায়ের পরিবেষিত অমৃত সেবন করিয়া আজ বার্দ্ধক্যে এই পাচকের গন্দধর্ম্ম দূষিত অন্নে উদর পূরণ করিতেছি। পূর্ব্বে জননী কণ্ঠে মধুময় শ্রীকৃষ্ণের শতনাম শুনিতে শুনিতে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত, এখন কাকের কা কা ধ্বনির সহিত শ্রীমতীর চা চা রব মিলিত হইয়া আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করে। আমরা কি ছিলাম, শিক্ষার পরিবর্ত্তনে কোথায় আসিয়াছি, উপরি লিখিত তিনটি চিত্রে তাহা সুব্যক্তরূপে ফুটিয়াছে। অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না করিয়া একের ধারা অপরের উপর প্রয়োগ করিলে এইরূপ দুরবস্থাই ঘটিয়া থাকে।

অস্থি-পঞ্জরে দেহে ও স্বভাবে স্ত্রী-ধারায় ও পুরুষ ধারায় যে মৌলিক প্রভেদ প্রস্ফুটিত, তদনুসারে স্ত্রী জাতির শিক্ষা মূলক বিকাশ ধারাও পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁহারা সাম্য-বাদের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া এই মৌলিক ভেদে প্রণিধান করেন না, ভোগস্পৃহা-মূলক আদরে ও সম্মানে স্ত্রীজাতিকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলেন, পুরুষোচিত শিক্ষা ও অধিকারের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া ত্রিভুবন-পালিনী জননীর জাতিকে সংহার-লীলায় আবাহন করেন, তাঁহাদের অক্লান্ত পুরুষকারের ফলে ভারতবর্ষ হইতে আমাদের আলস্য ও দীর্ঘ-নিশ্বাসের পথে মাতৃত্ব নির্ব্বাসিত হইতে চলিয়াছে। মাতৃজাতির সে কমনীয়তা, স্বভাবের সে সরল সহজ কোমলতা, সুস্থের সেবা, অসুস্থের শুশ্রূষা প্রভৃতি মাতৃধর্ম্ম আজ ধীরে ধীরে লুক্কায়িত হইতেছে। এ কথা শুধু আমাদের নহে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-সমাজও আজ এই চিন্তায় আলোড়িত হইয়াছেন। Saturday Review নামক একখানি বিলাতী-সংবাদ-পত্রের সমালোচনায় দেখিয়াছি এরাবেলা কেনিলী এল, আর, সি, পি নাম্নী জনৈকা মহিলা-ডাক্তার Feminism

and Sex Extinction নামধেয় গ্রন্থে Biology বা জীব-বিজ্ঞান-সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রন্থমূলক শিক্ষা ও ব্যায়াম স্ত্রীজাতির পক্ষে যদি অধর্ম্মজনকও না হয়, অন্ততঃ সম্পূর্ণরূপে যে অনুপযোগী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক স্বর্গীয় সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় প্রমুখ দুই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মুখে শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতির মধ্যে অতিরিক্ত গ্রন্থানুশীলনের ফলে বহুবিধ দুরারোগ্য স্ত্রী রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। তন্মধ্যে বস্তিমুখ (Pelvis) সঙ্কোচন একটি অপ্রতিবিধেয় রোগ, যাহার ফলে প্রসূতির সঙ্কটাপন্ন জীবন রক্ষা পাইলেও প্রসূত সন্তান প্রায়ই রক্ষা পায় না।

সে দিন দেশ হিতপ্রাণ বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস, মহোদয়ের নিকট বিলাতের স্ত্রী-বিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকে দেখিলাম, তথাকার শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের ভারতীয় প্রাচীন আদর্শই বহুল পরিমাণে অনুসৃত হইতেছে। সেই গো-পালন ও গো-দোহন, সেই দুগ্ধ পরীক্ষা সেই রন্ধন, সেই শিশু পালন, সেই শিশু-চিকিৎসা, সেই উদ্যান বিদ্যা সেই গৃহশিল্প প্রভৃতি প্রায় সমস্তই তথায় যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

আজ সে যুগ নাই, সে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নাই, সে শিক্ষা নাই, সে সাধনা নাই, পুরুষ পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া ইতস্তত ছুটিতেছে, আজ সে আত্ম-বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাশ্চাত্য বিলাস-বিভ্রান্তির অনুকরণে জলাঞ্জলি দিয়া হৃত সর্ব্বস্ব ভগ্নস্বাস্থ্য ও দীনহীন। আর স্ত্রীজাতি অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কর্ম্মশূন্য রোগজীর্ণ দেহভার বিলাসের স্রোতে ঢালিয়া দিয়াছেন। কাহারও অবসর নাই, যোগ্যতা নাই, ইচ্ছাও নাই! কিন্তু প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেশের কথা, জাতীর অভ্যুদয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই অন্ন-সঙ্কটের দিনে সন্তানসন্ততি সুশিক্ষিত না হইলেও পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের যে দারুণ অভাব আসিয়াছে ও আসিবে, তাহার প্রতীকার-কল্পে আমাদের অভিভাবকবর্গের অবহিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা বিদ্যালয়ের উপর বালক বালিকার শিক্ষাভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত, তাঁহাদের এই নিশ্চিন্ততার জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়। এই জন্যই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে ছাত্রাবাস ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া স্যার গুরুদাস ও রামেন্দ্র সুন্দর প্রমুখ বরেণ্য সুধী মণ্ডলী বলিয়াছিলেন, যে বালক বালিকার সুকুমার-হৃদয়ে পিতা মাতার সস্নেহ প্রভাব পতিত হয় না, তাহা শুধু শিক্ষা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুবিকসিত হইতে পারে না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বালক বালিকার কৌমার শিক্ষার ভার

পিতা-মাতার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, আর যৌবন-শিক্ষার ভার গুরু ও স্বামীর উপরে অর্পিত হইয়াছিল। অবস্থার নিষ্পেষণে আমরা যখন এই ভার-বহনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন আমাদের অনুচিকীর্ষু হৃদয়ের আরাম বিধান করিয়া এই ভার মিশনরীগণ গ্রহণ করিলেন। তাহারা এই মন্ত্র মুগ্ধ-জাতিকে অন্তঃপুরেও পরাধীন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া সফল মনোরথ হইলেন। আর আমরা সব হারাইয়াও যাহাদের স্নেহচ্ছায়ায় জুড়াইতাম তাঁহাদেরও হারাইতে বসিয়া হৃত সর্ব্বস্ব হইলাম। এই সময়ে দূরদর্শিনী তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের প্রতিকার কল্পে কলিকাতায় ও বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশে "মহাকালী-বিদ্যালয়" স্থাপন করেন, এবং অবস্থানুসারে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া এই প্রতিষ্ঠান গুলি সুনিয়মে পরিচালন করেন। শুনিতে পাই, তপস্বিনীর তিরোভাবের পর বিদ্যালয় সমূহে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আমরা পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনের মূলে যেন প্রাচীন ধারাগুলি ভুলিয়া না যাই। আজ গুণগ্রাহী পাশ্চাত্য-সমাজও আমাদের আদর্শ গৃহিনী-চর্য্যার অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন মাতৃত্ব বরণ করিয়া লইলেন, আর স্ত্রীরত্ন-মণ্ডিত ভারতের সন্তান আমরা স্বদেশের বিশ্ববরণীয় শিক্ষা ও সাধনা পরের কথায় পরিত্যাগ করিব?

শীতের রৌদ্রতপ্ত সুকোমল শয্যা আরামদায়ক হইলেও উহা তামসিকতার আশ্রয়। ভারতের বালিকা-মণ্ডলী আমাদের ভাবি জননীগণ তোমরা মহাকালীর সজীব বিগ্রহ, তোমরা জগদ্গুরুর জ্ঞানশক্তিরূপিণী, তোমাদের মোহে জগৎ আজ তমসাচ্ছন্ন; তোমরা জাগরিত হও, তোমাদের জ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত হউক, পতিত ভারত-সন্তান ত্রিনয়নাকে জননীরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক, তপস্বিনীর "মহাকালী-পাঠশালা" নাম সার্থক হউক!

পুরাণ প্রসঙ্গ।

(পুরাণের উপযোগিতা বর্ণন।)

"পুরাণ"-শাস্ত্র পুরাণ (পুরাতন) বলিয়া উপেক্ষার বস্তু নহে। পুরাণকে বাদ দিয়া নবীন গঠিত হয় না, নবীনের মধ্যে পুরাণের মাল মসলা দেখিতে পাওয়া যায়,ইহা ঐতিহাসিক সত্য। জগতে সভ্যনামধেয় এমন জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার পশ্চাতে অতীত অবদান-কাহিনী নাই। সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবের আলোক রাত্রিতে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তিনি অস্তমিত হইয়াই চন্দ্রকে আলোকিত করেন, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সুবিদিত; অতীত-জীবন-দানের দ্বারাই নবীন জীবন-প্রভাতের লোহিতালোক নয়নগোচর হইয়া থাকে। যে জাতির পুরাণ কাহিনী নাই, সে জাতি সভ্য-সমাজ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? বিশেষতঃ আমাদের "পুরাণ" পুরাণ নহে, উহা চির নবীন, দধীচির আত্মত্যাগ, হরিশ্চন্দ্র শিবি প্রভৃতির দাতৃত্ব, কর্ণার্জ্জুন দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতির বীরত্ব, শ্রীরামচন্দ্র পরশুরাম প্রভৃতির পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরত প্রভৃতির ভ্রাতৃভক্তি, ভীষ্মদেবের পিতৃভক্তিমূলক অপূর্ব্ব ব্রহ্মচর্য্য, সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির সতীত্ব, পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য, * বিশ্ববারা মৈত্রেয়ী

---

*পরপুরুষে অনাসক্তিই "সতীত্ব", পতির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসার নাম "পতিপ্রেম"। পতিকে ভাল বাসে না, অথচ পরপুরুষে স্পৃহা নাই এরূপ দৃশ্য অনুসন্ধানে দেখা যায়, সুতরাং সতীত্ব থাকিলেই পতিপ্রেম থাকিবে ইহা বলা যায় না। কিন্তু পতিপ্রেম থাকিলে সতীত্ব থাকিবেই, কারণ যে পতিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে পরপুরুষে তাহার আসক্তি একান্তই অসম্ভব। কিন্তু "পাতিব্রত্য" এই দুই বস্তু হইতে পৃথক্ পদার্থ, পতিকে যে পরমদেবতা পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিবোধে জীবনের "ব্রতস্বরূপ" করিয়াছে, তাহারই জীবনে পাতিব্রত্যের বিমলভাতি দৃষ্ট হয়। সুতরাং পাতিব্রত্য থাকিলে সতীত্ব এবং পতিপ্রেম থাকিবেই, কিন্তু সতীত্ব এবং পতিপ্রেম থাকিলে পাতিব্রত্য থাকিবে এ কথা বলা যায় না। সতীত্ব এবং পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত অন্য দেশ দেখাইতে পারে, কিন্তু পাতিব্রত্যের একচ্ছত্র সম্রাট এই পবিত্র ভারতবর্ষ, মৃতপতির পুনর্জীবনদান,

গার্গী আত্রেয়ী প্রভৃতির ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ব্ব-নারীত্ব জগতে চিরদিনই নবীন থাকিবে, কোন দিনই ঐ সব পুরাণ কাহিনীর মৃত্যু হইবে না! কবি যথার্থই গাহিয়াছেন—

"গেছে যদি সব, সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্,
চারণের মুখে সান্ত্বনাসুখে শূন্য মেবার ধ্বনিয়া যাক্।"

কিন্তু কবির ঐ করুণ সঙ্গীত এখন আর আমি শুনিতে পাই না, কারণ আমি নবীনের মোহে বধির হইয়াছি, সেইজন্য বাল্মীকি-কোকিল-কণ্ঠ কূজন, পঞ্চম বেদ মহাভারত, গীতার পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করে না, সুতরাং ঋষি-চারণ-গীত পুরাণ-বাণীতে আমার সান্ত্বনাসুখ কোথায়? কিন্তু চিরদিনই আমার এমন দুর্দ্দিন ছিল না, এমন এক দিন আমার ছিল, যে দিন জাহ্নবীযমুনা-বিগলিত-করুণা পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনীরূপিণী রামায়ণ-মহাভারত-পূতচরিত-গাঁথা আমার জাতীয় জীবনকে হিমালয়ের মত উচ্চ এবং সুদৃঢ়, পৃথিবীর মত সর্ব্বসহিষ্ণু, অগ্নি সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ, সাগরের মত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, এবং গঙ্গার মত পবিত্র করিত, সে দিন গ্রামবৃদ্ধগণ তাস পাশায় পরচর্চ্চায় অবসর বিনোদন না করিয়া, কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" কাশীদাসের "মহাভারত" পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেন, দেশীয় ধনিগণ বিলাসব্যসনে বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া, "কথকতা" দ্বারা "পুরাণের" পূত-চরিত-কথা শুনিতেন, যে দিন ভক্ত কথকগণের মুখে "অহল্যা-উদ্ধার," "ধ্রুবচরিত্র", "প্রহ্লাদচরিত্র" শুনিয়া অশ্রুপাত করিত না, এমন পাষাণহৃদয় শ্রোতা খুব কমই দেখা যাইত, আজ্

অগ্নির দাহিকাশক্তি-লোপ, পতিনিন্দায় স্বহস্তে শিরচ্ছেদপূর্ব্বক নিজ রক্ত পান, এ সব ঈশ্বরজ্ঞান ভিন্ন অসম্ভব। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ৺চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "সাবিত্রীতত্ত্বে" দ্রষ্টব্য।

৺চন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের উক্ত বাক্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে "যে নারী পতীকে অবজ্ঞা করে, বা ভয় করে না, এবং শ্বশুর শ্বাশুরী প্রভৃতিকে দ্রোহ করে সে ভ্রষ্টা"—"স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা ভর্ত্তবজ্ঞান নির্ভয়াঃ। শ্বশুরদ্রোহকারিণ্যঃ" অধ্যাত্ম রামায়ণ ১ম অধ্যায়। সুতরাং পতিকে ভাল বাসিয়া তাহার স্বগণকে দ্রোহ করিলে শাস্ত্রমতে সে সতী নহে। অতএব সতীত্ব পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যের তাদৃশ ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত সুধীগণ বিচার করিবেন।

যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াও অতীত বঙ্গের সেই স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই। আবার কি আমার সে দিন আসিবে? আবার কি আমি এই কথা বিশ্বাস করিব যে,

"তুলসী-কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥"

সর্ব্বগন্ধময় শ্রীভগবানের অঙ্গগন্ধ লইয়াই তুলসীকানন ও পদ্মবন ভূতলে বিরাজিত সুতরাং নিজগন্ধ গ্রহণ তাঁহার বড়ই লোভনীয়, জীবদেহের বিদ্যুৎ-গ্রহণের জন্য বৈজয়ন্ত ধামের বিদ্যুৎ-প্রবাহ বজ্ররূপে আবির্ভূত হন, সুতরাং স্বগন্ধীকে আলিঙ্গনের জন্য তিনি নিজে আসিয়া থাকেন। পবিত্র পুরাণ পাঠের সময় শ্রীভগবানের শুভ আগমন ভক্ত তুলসীদাসের জীবনে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পবিত্র পুরাণ প্রসঙ্গ যাঁহারা আলোচনা করিবেন, ভক্তবৎসল তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত না হইবেন কেন? তিনি ত নিজেই বলিয়াছেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে তথা।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

পুরাণ ত তাঁহারই লীলাকীর্ত্তন, সুতরাং তৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় জগদভিরতি-বিরতি হইয়া তাঁহাতে পরমা রতিও আসিতে পারে। সুতরাং বহির্মুখ জীবের পক্ষে পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচন বিশেষ উপকারী। পুরাণ আলোচনায় বহু উপকার; আমাদের দেশে একটি প্রাচীন গাথা শ্রুত হয়—

"পুরাণান্তে, রতিশ্রান্তে, শ্মশানান্তে চ যা মতিঃ।
সা যদি স্থিরতাং যাতি কো নু স্বর্গং ন গচ্ছতি?"

ঠিক কথা, পবিত্র পুরাণ-বাণী-পীযূষপান, স্ত্রীসম্ভোগ এবং নশ্বর-মানব-দেহ-দাহ দর্শন সত্যই বৈরাগ্যের উদ্দীপক, যে ব্যক্তি ঐ বৈরাগ্যকে আদরে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারে, যথার্থই সে পরম সৌভাগ্যশালী। পুরাণ হিতকারী বন্ধুর মত বলিয়া দিতেছেন—

"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ"

"রাম যুধিষ্ঠিরাদির মত হও, রাবণ দুর্য্যোধনাদির মত হইও না"—ইহাই পুরাণের

উপদেশ। রামের মত পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, আশ্রিতজনবাৎসল্য জগতে দুর্লভ, সুখে থাকিলে এখনও এ দেশে বলিয়া থাকে "রাম-রাজ্যে বাস করিতেছি।" সাগরকে লক্ষ্য করিয়া যেমন সমস্ত নদী প্রবাহ ছুটিয়াছে, তেমনই দশরথের সত্য-সন্ধাত্ব, কৌশল্যার পুত্রস্নেহমুগ্ধতা, কুব্জা ও কৈকেয়ীর ক্রূরতা, ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সুগ্রীবের মৈত্র্য,হনুমানের ভক্তি-বীরত্ব, জাম্ববানের বুদ্ধিকৌশল, রাবণের অত্যাচার, সিদ্ধ·বরী ও গুহকের ভক্তি, সর্ব্বোপরি সীতার পাতিব্রত্য রামকে লক্ষ্য করিয়াই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; তাই রামায়ণের ভক্ত-ব্যাখ্যাতা রামানুজ বলিতেছেন—

"বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা
শ্রীমদ্‌রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।"

বাল্মীকি-হিমালয়নির্গতা রাম সিন্ধুসঙ্গতা রামায়ণী-গঙ্গা ভুবনকে পবিত্র করিতেছে, কথা অতীব সত্য। ধর্ম্মের জন্য জীবনব্যাপী অশ্রুবিসর্জ্জন যুধিষ্ঠিরাদির মত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই তাঁহার নাম "ধর্ম্মরাজ" ও পুণ্যশ্লোক। পুরাণের এই সব চরিত্র কত উপকারী তাহা বর্ণনার অতীত, তাই বলিতেছেন— "রাম যুধিষ্ঠিরাদির মত চলিও, রাবণ দুর্য্যোধনাদির মত চলিও না।" পাপের কি ভীষণ পরিণাম! "দেবদানবগন্ধর্ব্ব-কণ্টক দশাননে"র স্বর্ণলঙ্কা ভস্মীভূত! পাপের শক্তিতে সকলের অজেয় তাদৃশ মহাবীরও ভীত হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

লঙ্কা দগ্ধা, বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ
যৎকৃতং রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি?"
(বাল্মীকি রামায়ণ)

হনুমান লঙ্কা দাহ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই দগ্ধ লঙ্কার দশা দেখিয়া মন্ত্রণাসভা আহ্বানপূর্ব্বক ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণও বলিতেছেন, "সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমার স্বর্ণলঙ্কা দাহ করিয়া প্রমোদবন ভঙ্গ করিয়া রামের দূত চলিয়া গেল। যাহার দূত এইরূপ করিল, না জানি সে রাম কি করিবেন? পাপী যত বড়ই হউক, তাহার চিত্ত ভয়শূন্য হইতেই পারে না। যুদ্ধের সময় হতবান্ধব হতপুত্র পৌত্র রাবণ বলিতেছেন—

"এক লক্ষ্য পুত্র মোর সোয়া লক্ষ্য নাতি
কেহ না রহিল হায় বংশে দিতে বাতি!" (কৃত্তিবাস)

পাপী ঐরূপেই ধ্বংস হয়। একাদশঅক্ষৌহিণী চমূপতি মহামানী কুরুপতি দুর্য্যোধনের কি পরিণাম! অত সৈন্য সেনাপতি, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। উর্ব্বীতলকে নির্বীর করিয়া ১৮ দিনেই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে! "একাদশচমূভর্ত্তা" "ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম" মহামানী দুর্য্যোধন "হতসবলবাহন" ভগ্নউরু হইয়া "পাংশুষু রুধিরং বমন্" ধুলিশয্যায় রক্ত বমন করিতেছেন! তাই বিচিত্রসংসাররহস্যদ্রষ্টা ঋষি-কবি বলিতেছেন—

"পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্।" (মহাভারত)

অসার-সংসার-গর্ব্বিত মানব! কালের ক্রীড়া দর্শন কর; জীব! তুমি যত বড়ই হও না কেন, তুমি সেই মহাকালের ক্রীড়ার ক্রীড়নক মাত্র। ঋষি আবার বলিতেছেন--

"মানব। ঐ দৃশ্য দেখিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, কারণ, জানিয়া রাখ—

"প্রাণিনাং গতিরীদৃশী।" (মহাভারত)

প্রাণিগণের ঐরূপই গতি—উহাই তাহার পরিণাম, যে পর্য্যন্ত তুমি অমৃত-বিষ্ণুপদবিলীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত তোমাকে ঐ অনাদি জনন-মরণ-প্রবাহে ভাসিতেই হইবে। ঋষিতপস্তপ্ত পবিত্র ভারতের সনাতন বেদব্যাখ্যামূর্ত্তি পুরাণশাস্ত্র ভিন্ন অন্তস্তলদর্শী-সত্যের উলঙ্গমূর্ত্তি এমন করিয়া জগতে আর কেহই দেখাইতে পারে নাই, সতত জীবনসংগ্রামবিপর্য্যস্ত ভগবানের অবোধ সন্তান অশান্ত মানবকে এমন করিয়া করুণার কথা কেহ কোন কালে কহিতে পারে না।

সপ্তরথিপরিবেষ্টিত অবস্থায় অন্যায় যুদ্ধে মহাবীর স্ফুটনোন্মুখযৌবন অভিমন্যুর পতন হইয়াছে, পাণ্ডবশিবিরে শোকের সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে, পঞ্চপাণ্ডব শোকে ম্রিয়মাণ, অপারস্নেহবতী জননী সুভদ্রা ও পতিগতপ্রাণা উত্তরার দশা বর্ণনার অতীত, এই অবস্থায় ঋষি বলিতেছেন—

"মাতুলো মাধবো যস্য পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোহভিমন্যুরণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥"

জীব! বুঝিয়া রাখ—"নিয়তির নিয়ম অনতিক্রমণীয়"; ঐ দেখ স্বয়ং ভগবান্ যাঁহার মাতুল, দ্রোণাচার্য্যশিষ্য বিশ্বজয়ী ধনঞ্জয় যাঁহার পিতা, তেমন মহাবীর অভিমন্যুরও যুদ্ধে পতন হইল। এমন সান্ত্বনা "পুরাণ" ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ। নিয়তির নিয়ম ধ্যান করিলে সংসারচক্রবধির অশান্ত মানবজীবনের অনেক

কোলাহলই নিবৃত্ত হইতে পারে; তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি "পুরাণ কথা শুনিয়া যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা স্থায়ী হইলে জীবের পরমগতি লাভ হইতে পারে।"

বেদরামায়ণের ব্যাখ্যাতা পরমভক্ত রামানুজ যথার্থই বলিয়াছেন—

"বাল্মীকের্মুনিসিংহস্য কবিতাবনচারিণঃ।
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্।"

কবিতাকাননচারি-বাল্মীকি-মুনিসিংহের "রাম"নাদ সিংহনাদ শ্রবণ করিলে কাহার পরমগতি লাভ না হয়? রামমন্ত্রদ্রষ্টা শব্দব্রহ্মবিৎ পরমর্ষি আশা করিয়া গিয়াছেন—

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥"

রামায়ণ।

"যে পর্য্যন্ত সৃষ্টি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমার রামায়ণকথা জগতে প্রচারিত হইবে"; সুতরাং সেই পুরাতন পরমর্ষির হৃদয়ের সাধ পরিপূরণের জন্য পুরাণ-প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি; যদি ইহা শ্রবণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ক্রমে আরও চেষ্টা করা যাইবে, আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীশরৎকমল ভট্টাচার্য্য

অহল্যার বিলাপ।*

(১)

এ ঘোর কাননে প্রভু পাষাণী হইয়া
আর কতকাল আমি রহিব পড়িয়া॥

(২)

প্রাণারাম প্রভুরাম! আসিবে কি তুমি?
দিন গণি কত যুগ কাটাইব আমি?

(৩)

ছিলে সুখে এই বুকে "পতিরূপ" ধরি
"বিরাট"! "স্বরাট" সাজি, আহা মরি মরি!

* সাধনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা ভাবনা করিলে ভাল লাগিবে। অহল্যা পতিকে ভুলিয়া দেবরাজের সঙ্গে পাপ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে পাষাণী হইয়া কাননে পড়িয়াছিলেন, পরে ত্যাগপূত ক্ষমাশীল পতির আদেশে দিবানিশি তারকব্রহ্ম রামনাম জপিয়া উদ্ধার পাইয়াছিলেন। সতীর চক্ষে এই এই দৃশ্যমান পতির সঙ্গে সেই জগৎপতির তত্ত্বতঃ কোনই ভেদ নাই, তাই পতি জগৎপতির নাম জপিতে বলিয়াছিলেন। অনাদি জীব প্রকৃতির সঙ্গে এই ভাবের খুব ঐক্য আছে, জীবও জগৎপতিকে ভুলিয়া পাপের সঙ্গে মিলিয়া কতই না ব্যভিচার করিতেছে! তাহারই ফলে এই সংসারে সে প্রেমহীন পাষাণদেহে পড়িয়া রহিয়াছে! এ পাষাণে এতটুকু কর্দ্দমও নাই! তাই তাহার চক্ষু সর্ব্বদাই বহ্নিকণাদীপ্ত অশ্রুশূন্য, সে দিনান্তেও তাঁহার নাম করিয়া এক ফোটা জলও ফেলে না! কিন্তু জীব যদি অহল্যার মত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে সর্ব্বদা রাম রাম করিতে পারে, তবে সেই "সর্ব্বভূতাভয়প্রদ" দয়াল প্রভু অবশ্যই আসিবেন এবং সেই পদধূলিদানে এই সংসার কাননে পতিত, পতিত পাষাণ দেহকে সোণা করিয়া দিবেন। এই ভরসার কথাই অহল্যার বৃত্তান্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুধী-সাধক পাঠক পরমর্ষির বেদরামায়ণ পাঠ করিলে এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবেন।

(৪)

সে রূপের কত ভাতি বলা নাহি যায়!
তাহারই ক্ষুদ্রকণা মাখি নিজ গায়—

(৫)

অগ্নি সূর্য্য সুধাকর তারকামণ্ডল
হয়ে জ্যোতিষ্মান্ তারা ভ্রমে ভূমণ্ডল।

(৬)

(কিন্তু) ক্ষুদ্রবুকে ব্রহ্ম জ্যোতি ধরিতে না পারে,
তাই তারা বিশ্বদ্বারে পরিবেষ করে।

(৭)

এমন অলোকময় তব রূপরাশি
হৃদয়ের অন্ধকারে দেখিল না দাসী!

(৮)

হায়! একি বিড়ম্বনা! জ্যোতির আধার!
বুকে জড়াইয়া ছিলে তবু তা আঁধার!

(৯)

বিশ্ব আলোকিতরূপ ঐ দিবাকরে
নিজের করম দোষে পেচকী না হেরে।

(১০)

তাই সে আধাঁরে পথে ভুলিনু যখন,
ভোগের দেবতা ইন্দ্র ধরিল তখন।

(১১)

ত্যাগের দেবতা তুমি সেই অপরাধে
চলে গেছ অভিমানে, তাই দাসী কাঁদে।

(১৩)

(নাথ!) বলেছিলে—"হে পাষাণি! কাননে পড়িয়া
পতি ব্রহ্ম রাম নাম জপিয়া জপিয়া

(১৩)

মুখে বুকে অশ্রুধারা বহাবে যখন
রামরূপ ধরি আমি আসিব তখন।"

(১৪)

(এই) "দগ্ধদেহে দিয়ে ঐ চরণের ধূলি
উদ্ধারিবে এ দাসীরে," গিয়াছিলে বলি ॥

(১৫)

প্রাণেশ্বর! পতি! ওগো হৃদয়ের মণি!
বুঝিয়াছি এবে তুমি রাম-নীল মণি।

(১৬)

তব রূপে রাম-রূপ দেখি একাকার
আজ) পাষাণ ফাটিয়া উৎস উঠে অনিবার।

(১৭)

তাই ডাকি সদারাম! প্রভু প্রাণারাম!
আত্মারাম! গুণধাম! রাম! রাম! রাম!

(১৮)

দেখ আসি সেই দাসী এ ঘোর কাননে।
অবিরাম তব নাম জপে প্রাণপণে।"

(১৯)

নাম ব্রহ্ম জপ জ্যোতি লহরী শিখায়
পুড়িয়া পাষাণী তব নবদেহ পায়।

(২০)

দেখ আসি এ দাসীর প্রতি রোমকূপে
তব নামরূপ-জ্যোতি ভাতিছে ঝলকে।

(২১)

পুলক সঞ্চার দেহে কদম্বের ফুল!
প্রাণারাম! এস রাম! পরাণ আকুল।

(২২)

তোমার বিরহজ্বালা সহিতে না পারি
সদয়ে উদয় হও রামরূপ হরি!

(২৩)

কাঁদিতে কাঁদিতে জল উঠেছে পাষাণে
তবু তুমি প্রাণেশ্বর ! আছ সংগোপনে।

(২৪)

তব নামসুধারসে পাষাণী গলিয়া
(সুধু) উৎস রাশি বুকে করি রহিবে পড়িয়া ?

(২৫)

তাহা কি হইতে পারে ? ক্ষমা সার রাম !
তাই ডাকি এস এস প্রভু প্রাণারাম।

(২৬)

আসি পদধূলি নাথ ! দেহ এ পাষাণে
হইবে কাঞ্চন তনু পদরজোগুণে।

(২৭)

পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূরে পলাইবে।
কোটি জন্ম অপরাধ কিছু না থাকিবে ॥

(২৮)

দীপ্ত-বহ্নি শিখা যদি অঙ্গারেতে পশে
স্ব-রূপ ধরায় তার আপন পরশে।

(২৯)

তাই ডাকি প্রাণেশ্বর রামরূপ হরি !
উদ্ধারহ এ দাসীরে করুণা বিতরি।

শ্রীশরৎ কমল ভট্টাচার্য্য।

শেষ পাথেয়।

চলিলে পথিক এসংসার দীর্ঘপথ ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া সংসার হইতে এবারকার মত চলিলে সংসারের শোক দুঃখ অভাব জ্বালা যন্ত্রণা সব এখানে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যাইলে? এইত তোমার কথা শুনিতে ছিলাম এইত রাম রাম সীতারাম বলিলে তোমার মুখের নাম মুখে রহিল তোমার আত্মীয় স্বজনের কথা একবার ভাবিবার অবসরও পাইলে না নীরবে চলিয়া যাইলে, যাও তুমি যাও, আমিও যাইব তোমার আত্মীয় স্বজন শত্রু মিত্র সকলেই যাইবে কবে কোন দিন যাইতে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। তোমার শেষ পাথেয় দিবার জন্যই তোমার আত্মীয়েরা আমায় তোমার অন্তিম সময়ে আহ্বান করিয়াছেন যাও রাম রাম সীতারাম।

এরাজ্য ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত রাজ্যে যাইতে হইলে পাথেয়ের প্রয়োজন সে পাথেয় সংসারের কোন জড় বস্তু নয় সে পাথেয় নাম। যাঁহারা চতুর তাঁহারা সারাজীবন সেই পাথেয়ই সংগ্রহ করেন প্রাণের সহিত নামকে মাখাইয়া ফেলেন প্রাণের সঙ্গে নাম অহর্নিশি যাতায়াত করিতে থাকে প্রাণ নামময় হইয়া যায়। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ঘুমাইয়া পড়ে সুষুপ্তি জননী যখন আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে জীবকে টানিয়া লইয়া তাহার সব ব্যথা দূর করিয়া দেন জাগ্রত রাজ্য এবং স্বাপ্ন রাজ্য যখন থাকে না তখন ও সেই প্রাণ আপনভাবে কাজ করে একক্ষণও বিশ্রাম করে না সেই প্রাণকে নামময় করিতে পারিলে আর শেষের দিনের পাথেয়ের জন্য ভাবিতে হয় না। প্রাণের সঙ্গ করিতে পারিলে সহস্র লোকের সঙ্গে থাকিলেও নিঃসঙ্গ থাকিতে পারা যায় বহিঃপ্রাণে নাম করিলে কিছুদিনের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাণের সংবাদ পাওয়া যায় সূক্ষ্মপ্রাণ অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণ অর্থাৎ সুষুমনায় জপে মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত জীব জাগিয়া উঠিয়া শ্রীরাধারমত প্রিয়তমের নিকট যাইবার জন্য অভিসার করে শ্রীরাধার মত প্রিয়তমের স্পর্শে সব ভুলিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে জীব তখন শিব হইয়া যায়, যাইবার সময় সুষুম্না অবলম্বনে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যায় তাহার যাতায়াত নিবৃত্তি হয়।

বন্ধু তুমি কি এইরূপ অভিসার করিতে শিখিয়াছ—না তাহাত শিখ নাই. তুমি যে এখনও স্থূলেই ডুবিয়া আছ, প্রাণপূন কর সদাসর্ব্বদা প্রাণের

সঙ্গে থাকিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, এই বারেই তোমার লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে তোমার জনম-মরণ থাকিবে না।

পথের মাঝে বাধা পাইয়া যেন ধাঁধাঁ না লাগে, তোমার হৃদয়ে একজন তোমার আপনার জন আছেন তুমি যখন যে বাধা পাইবে তখন তাঁহাকে জানাইয়া দিও তিনি তোমার সকল বাধা দূর করিয়া দিবেন কোন সংশয় করিওনা। তিনি তোমার সমস্ত অসুবিধা দূর করিবেনই। জানাও তাঁহাকে তোমার আবেদন অভিযোগ জানাও।

হাঁ পাথেয়ের কথা হইতেছিল আমাদের শেষ পাথেয় মন্ত্রটী বড় সুন্দর—

গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম

এই মহা মন্ত্রটীর সম্বন্ধে সাধুগণ এই কথা বলেন, ইহার তিনটী স্তর আছে প্রথম জড়, দ্বিতীয় সাকার চেতন, তৃতীয় নিরাকার ব্রহ্ম—মরণ যাত্রী কোন স্তরের উপাসক তাহাত জানা যায়না—সেইজন্য গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম তিনটীই বলা হয়, জানা যায় না যদি মরণ যাত্রী প্রথম স্তরের সাধক হন অর্থাৎ বৃক্ষ লতা নদ নদীকেই ঈশ্বর বোধে আজন্ম উপাসনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে সর্ব্ব নদ নদী শ্রেষ্ঠা সুরধনী পতিত পাবনী শিব শির বিহরিনী গঙ্গার নাম তাঁহার শেষ সময়ে কর্ণমূলে উচ্চারণ করিয়া তাঁহার আজন্ম সাধনার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তিনি গঙ্গা স্মরণে দেহত্যাগ করিয়া উর্দ্ধগতি লাভ করেন। আর যদি মরণযাত্রী সাকার উপাসক হন তাহা হইলে তাঁহার কর্ণমূলে গঙ্গা নারায়ণ উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সরসিজাসনে আসীন কেয়ূর ও কনককুণ্ডলবান্ হিরণ্ময় বপু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণকে স্মরণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

আর যদি মরণযাত্রী শেষ স্তরের সাধক হন তাহা হইলে এই গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম উচ্চারণে তাঁহার চিত্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের কথা স্মরণ করে না যে চিৎ সমুদ্রে এই দৃশ্য তরঙ্গ উঠিয়াছে সেই চিৎ সমুদ্রে সেই অনাম নামীতে সেই অরূপ রূপের রূপ সাগরে ডুবিয়া যায় তাঁহার সংসার ভ্রমণ শেষ হয়।

সেই জন্যই মরণ যাত্রীকে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম এই মহা পাথেয় দান করা হয়। এই মন্ত্রটী সার্ব্বজনীন মন্ত্র, সাধক যে স্তরের সাধক হউন না কেন যাইবার সময় এ মন্ত্র শ্রবণে তিনি কৃতার্থ হয়েন।

"যং যং বাপি স্মরন্‌ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং" যে যে ভাব স্মরণে জীব দেহ ত্যাগ করে সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

প্রাণ উৎক্রমণকালে যখন জীবের কর্ম্মচক্র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়—যে চক্রে তাহার আজীবনের সমস্ত পাপপুণ্যের চিত্র কর্ম্ম কত ভাবে অঙ্কিত আছে তাহা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠে জীবনে তাহার যদি পাপ অধিক থাকে তাহা হইলে কেবল পাপ দেখিতে দেখিতে পাপযোনী প্রাপ্ত হয়।

আর যদি তিনি পুণ্যবান্ নামকারী হন তাহা হইলে কর্ম্মচক্রের মধ্যে কেবল নাম কেবল নাম দেখিয়া নামীর সহিত মিলিত হয়েন।

সে স্থলেও ফাঁকি চলে না—পাপী আজন্ম পাপ করিয়া মরণ মুহূর্ত্তে নাম শুনিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবে এমনটী হয়না। নাম শুনিবার যোগাযোগ তাহার হয়না—নাম স্মরণ করিবে কি মুগুর হাতে যমদূতকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়।

আর ত সময় হইয়া আসিল এতদিন যদি পাথেয় সংগ্রহ না হইয়া থাকে আজ হইতেই আরম্ভ করিয়া দাও কেবল কতকগুলা বড় বড় শাস্ত্রবাক্য শিখিলে কোন লাভ নাই। তুমি যদি অবিরাম নাম করিবার জন্য প্রাণপন না কর তাহা হইলে সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। রাম রাম সীতারাম। স্বর্গীয় অগ্রজ ৺বঙ্কিম চন্দ্রের শেষ পাথেয় কবিতা মনে পড়িল—

হে বিষয় বিমূঢ় মরণ যাত্রী।
তোমার—বৃথা গত কত দিবস রাত্রি॥
কত বর্ষ মাস গত বিফল রঙ্গে।
পিতা মাতা পুত্র রমণী সঙ্গে॥
বিত্ত চরণ সেবি অতৃপ্ত চিত্তে।
কত দণ্ড মুহূর্ত্ত পল যাপিলে মিথ্যে॥
হে ভ্রান্ত কৃতান্ত এবে আগত দ্বারে।
প্রস্তুত হও মহা প্রস্থান তরে॥
পরিহর ধনজন যৌবন দম্ভ।
বল অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম॥
অদূরে মুমূর্ষু তব অজ্ঞাত দেশ॥
আসন্ন এবে তব মুহূর্ত্ত শেষ।
মুহূর্ত্তে উড়িবে প্রাণ বিহঙ্গ বন্য।
লুণ্ঠিবে ধূলিমাঝে পিঞ্জর শূন্য॥

এ অন্তে আর কেন ধনজন চিন্তা।
কে মাতা কে পিতা কে তব কান্তা॥
শেষ সম্পদ তব মৃত্তিকা কুম্ভ।
জপ অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম॥
(দেখ) তোমার কণ্ঠ ঘড় ঘড় কম্পিতকায়।
নাভিস্থলোত্থিত নিশ্বাস বায়॥
স্থির নয়ন তব দর্শন হীন।
আজি তব ভবলীলা অবসান দিন॥
শিথিল বিফল তব দেহ যন্ত্র।
তাই বলি একবার জপ সেই মন্ত্র॥
পরজন্মে আপন মঙ্গল চাও।
এ অন্তে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম গাও॥
বলিতে না পার শুন সময় কই।
তব শিয়রে শমন দাঁড়ায়ে ওই॥
অনন্তে মিশিছে জীব জীবন বিম্ব।
শুন অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম॥

জয় সীতারাম রাম রাম।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ।

সিদ্ধসাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের উপদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রাহ্মণকুমার! এখন একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এই সকল দোষ বাদ দিয়া যদি পিতা তোমার যথাশাস্ত্র পিতা হইয়া থাকেন, তবেই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন কাম্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তুমি প্রত্যবায়-ভাগী; তাহাতেও নিত্য কর্ম্মের সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। প্রতিদিন যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হইবেই হইবে, তাহারই নাম নিত্যকর্ম্ম।

যাহার যাহা স্বধর্ম্মোচিত নিত্যকর্ম্ম স্বয়ং ধর্ম্মও তাহাতে বাধা দিবার অধিকারী নহেন, অন্যে পরে কা কথা। অনেকে বলিয়া থাকেন, উপনয়নের পর আচার্য্য গুরুর মতানুসারে চলিতে হইবে, পিতাই যখন আচার্য্য তখন পাপ পুণ্য ভাল মন্দের জন্য তিনি দায়ী, তিনি যাহা আদেশ করিয়া যাইবেন, পুত্রের তাহাই কর্ত্তব্য। এই আচার্য্যের নাম শুনিয়া আমাদের কিন্তু আজকালকার গ্রহাচার্য্যের কথা মনে পড়ে। তবে বিশেষ এই যে, তাঁহারা গ্রহের আচার্য্য, আর এ সকল পিতা, পুত্রের পক্ষে একাধারেই গ্রহ ও আচার্য্য। পিতৃত্ব ও প্রকৃত—আচার্য্যগুরুত্ব একাধারে অধিষ্ঠিত হইলে তাহা যেমন অতি মহা মহা গুরুত্ব হইয়া দাঁড়ায়; তেমনই আবার একাধারে না পিতৃত্ব না আচার্য্যত্ব পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষণে দুইই যদি উড়িয়া যায়, তাহা হইলে সেই গুরুত্বই আবার অতি মহা মহা লঘুত্ব হইয়া দাঁড়ায়। আচার্য্য কথাটা আজকাল শুনিতেই সহজ; কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাক্, মনে ভাবিতেও ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রকারগণ আচার্য্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান আচারে স্থাপয়েচ্চ যঃ।
স্বয়মাচরতে যস্মাত্বমাচার্য্যং বিদুর্বুধাঃ॥"

শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রীয় নিগূঢ়তত্ত্ব) সমূহকে যিনি সম্যক্ চয়ন অর্থাৎ উদ্ভাবন করেন এবং সেই সকল শাস্ত্রীয় তত্ত্ব যিনি লোকাচারে ব্যবস্থাপিত করেন এবং স্বয়ংও যেহেতু সেই সকল শাস্ত্রানুমোদিত তত্ত্বের আচরণে নিরত থাকেন, সেই হেতু জ্ঞানিগণ আচার্য্য গুরুকে আচার্য্য বলিয়া জানেন।

এখন একবার ভাবিয়া দেখিবার কথা—এই আচার্য্য কার্য্যের প্রকৃত অধিকারী কে? পিতা, জন্মদাতা, পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা শিক্ষাদাতা, গুরু অপেক্ষাও পরম গুরু, এ কথা অবনতমস্তকে সহস্রবার স্বীকার করিতে বাধ্য আছি; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে যথাশাস্ত্র আচার্য্য গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণে যাহা উল্লিখিত হইল, তদনুসারে দেখিতে গেলে—"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান্" শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সমূহের যিনি সম্যক্ চয়ন করেন, শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সম্যক্ চয়ন, সে কথা দূরে থাক্, শাস্ত্রীয় তত্ত্বের উদ্বোধনা অভিজ্ঞান যাঁহার আছে, এমন পিতা আজ সমাজে কয়জন মিলে? তারপর—"আচারে স্থাপয়েত্ যঃ" লোক সমাজকে যিনি শাস্ত্রীয় আচারে অধিষ্ঠিত করেন, লোকসমাজকে অধিষ্ঠিত করিবেন, সে কথা সুদূরপরাহত,

নিজগৃহের পরিজন পরিবারবর্গকেও যিনি [illegible] স্বীয় [illegible]চারে অধিষ্ঠিত রাখিতে পারেন না, তিনি সমাজের আচার সংস্থাপক হইবেন, ইহা অসম্ভব। তারপর —"স্বয়মাচরতে যস্মাৎ" স্বয়ং যিনি সেই আচারের অনুষ্ঠান করেন। পুত্রের প্রতি যাঁহাদিগের এই সকল শাসন ও শিক্ষা, তাঁহাদিগের স্বয়ং আ[illegible]ণের কথা আর তুলিয়া কাজ কি? তাই বলিতেছিলাম, ভাল মন্দ যা[illegible]ই হউক, পিতা আচার্য্যগুরু, তাঁহার কথা অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতে হইবে, ধর্ম্মের চক্ষে এ ধূলী নিক্ষেপের দিন এখন আর নাই। আইনের বলে বিচারক—বিচারক কিন্তু অভিযোগক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদীর পক্ষ-মীমাংসায় সেই বিচারক যদি আইনের অবজ্ঞা করেন, তবে তিনি বিচারক থাকেন, কোন্ আইনের বলে তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠি না? পিতা পরমগুরু, ইহা শাস্ত্রেরই আজ্ঞা। শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করি বলিয়াই পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া মনে করি এবং পিতাও সেই শাস্ত্রবলেই নিজ দেবত্ব সন্তানকে শিক্ষা দেন, কিন্তু সেই পিতা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়ে যদি স্বার্থে অন্ধ হইয়া সেই শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করেন, তবে পিতাকে কেবল জন্মদাতা না বলিয়া যথাশাস্ত্র আচার্য্যগুরু বলিব আজ কাহার বলে? পিতা যদি যথাশাস্ত্র আচার্য্য হইতেন, তবে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আজ আর অন্যের আজ্ঞা বা অনুরোধ শুনিতে হইত না। ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র দেখিলে যে পুত্র আপনা হইতেই গুরু বলিয়া অন্যের চরণে প্রণত হইতে পারে সে কি কখনও আপন পিতাকে তাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র দেখিলে তাঁহার চরণে প্রণত হইতে কুণ্ঠিত হইত?

কাঙ্গাল ফিকিরের মুখে দক্ষযজ্ঞ বর্ণনে একদিন শুনিয়াছিলাম—

"দক্ষবেটা বড় গোঁড়া, আগেতে কাটিয়া গোড়া, গাছের আগায় ঢালে জল।
যজ্ঞে নাই শিবস্থান, শৈবগণে হতমান, করে বেটা এত ধরে বল!"

(ক্রমশঃ)

(১) **যতমান সংজ্ঞা বৈরাগ্য**—বিষয়ে অনুরাগ ও দ্বেষ যতদিন থাকে ততদিন মলিন চিত্ত বিষয়েই ধাবিত হয়। রাগ দ্বেষ রূপ চিত্ত মল দ্বারা ইন্দ্রিয় আর বিষয়ে না যাইতে পারে এই বিষয়ে যত্ন করিলে যতমানসংজ্ঞা বৈরাগ্যের উদয় হয়।

(২) **ব্যতিরেক সংজ্ঞা বৈরাগ্য**—পরে দেখ কোন্ কোন্ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিবৃত্ত হইয়াছে—কোন্টিই বা অবশিষ্ট আছে ইহা পৃথক্‌রূপে নিশ্চয় করার নাম ব্যতিরেক সংজ্ঞা।

(৩) **একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা বৈরাগ্য** বাহিরের বিষয়ে আর চিত্ত যায় না—কেবল চিত্তকেই যখন ঔৎসুক্য সহকারে দেখা যায় তখন একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা বৈরাগ্য জন্মে।

(৪) **বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য**—শেষে এই ঔৎসুক্যেরও যখন নিবৃত্তি হয়—চিত্তের ভিত্তি যে চিৎ তাহা লইয়াই যখন স্থিতি লাভে চেষ্টা হয় তখন বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য জন্মে।

এই সমস্ত অপর বৈরাগ্যের অভ্যাসের পর—**পর বৈরাগ্য**—

"তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্" সমাধি পাদ ১৬। অর্থাৎ "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ" প্রকৃতি হইতে আত্মাভিন্ন—এই আত্মসাক্ষাৎকার হেতু জায়মান যে গুণ বিতৃষ্ণা—জড়বিষয়ে অননুরাগ সেই বৈরাগ্যই **পর বৈরাগ্য**। পর বৈরাগ্য হইলেই জীবন্মুক্তি হয়। অপর বৈরাগ্যে রজঃ ভাগ কিছু থাকে কিন্তু পর বৈরাগ্যে রজঃ ও তমঃ আদৌ থাকে না। সেইজন্য চিত্ত স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায়।

দেহই আত্মা ইহার যতদিন বোধ থাকে তত দিন রাগ দ্বেষ থাকিবেই। কিন্তু আত্মা দেহ নহেন ইনি চৈতন্য এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে রাগ দ্বেষ থাকে না। বিষয় দোষ, বস্তুবিচার এবং আত্মদৃষ্টি—এই সকলেই বিষয় বৈরাগ্য জন্মে।

এই জন্যই বলা হইতেছে প্রথমেই সৎশাস্ত্র, পর বৈরাগ্য এবং সৎসঙ্গ এই তিনটি উপায় দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করিতে হইবে।

এই সমস্ত দ্বারা চিত্ত নিরভিমানী হইয়া যখন বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে তখন বিজ্ঞান-গুরু অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্র রহস্য জানিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন তাঁহাদের অনুগমন করিবে ; তথায় গুরূপদিষ্ট— মার্গে সগুণ ঈশ্বরের ধ্যান ও পূজা করিয়া ঈশ্বর অনুগ্রহে বিচারক্রমে পরম পবিত্র পরম-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রুতিও বলিতেছেন—

উমাসহায়ং পরেশ্বরং বিভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥

ইতি শ্রুতিঃ

পুনঃ পুনঃ বিচার কর : আমি কি, জগৎ কি ; ইহা নিশ্চয় করাই বিচার ; আমি নির্ম্মল চৈতন্য ; জগৎটা বা দেহটা—মিথ্যা সঙ্কল্পের প্রতিবিম্ব ; এই বিম্ব রহিত মিথ্যা কাল্পনিক প্রতিবিম্ব, চৈতন্য-দর্পণে অবভাসিত হইয়া দর্পণকে মলিন করিয়াছে কারণ অহং অভিমানও এই চৈতন্যে ভাসিয়া ইহাকে অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা করিয়াছে। পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ কর—করিলে চিত্তের সত্বা যে চিৎ তাহাই অবশিষ্ট থাকিলেন—ইহাই হইতেছে চিত্তের ভিতরে আত্মার দর্শন। আত্মাই চিত্ত রূপে ভাসিয়াছিলেন—চিত্ত—সরোবরে সর্ব্বদাই আত্মসূর্য্যপ্রতিবিম্ব ভাসিতেছে। চিত্ত রজোগুণে চঞ্চল বলিয়া এবং তমতে স্ফুরণ রহিত হইয়া বিমূঢ় থাকে বলিয়া আত্মসূর্য্য— প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। চিত্তের চঞ্চলতা ও চিত্তের অন্ধকার সরাইতে পারিলেই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া নির্ম্মল হয়। তখন আত্ম প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর রূপে ধরা যায় পরে চিত্ত লয় হইলে দেখা যায় প্রতিবিম্বাদি কিছুই নাই শুধু ব্রহ্মই আছেন—ইহাই স্বরূপস্থিতি। ইহা যখন হয় তখন শীতল ইন্দুকিরণে উদ্ভাসিত নির্ম্মল সীমাশূন্য সুনীল আকাশ যেমন পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায় সেইরূপ সমস্তই নির্ম্মল চিতিরূপেই প্রকাশ পায়।

তাবত্তবমহাম্ভোধৌ জনস্তৃণবদুহ্যতে।
বিচারতটবিশ্রান্তিমেতি যাবন্ন চেতসা॥ ১৮

মানুষ যতদিন না বুদ্ধিপ্লব দ্বারা বিচারলক্ষণতটভূমিতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেছে—স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে ততদিন ইহারা সংসার সাগরে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইবেই। বিচার দ্বারা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে এই মানুষের বুদ্ধি, সমস্ত আধিকে—সমস্ত মানস-দুঃখকে অধঃপাতিত করে; যেমন জল স্থির হইলে বালুকা অধঃপতিত হয় সেইরূপ। ভস্মাচ্ছাদিত সুবর্ণকে যেমন স্বর্ণকার জানিতে পারে সেইরূপ বিচার দ্বারা যিনি জানিয়াছেন, ইহা আত্মা, ইহা অনাত্মা তাঁহার আর আত্মবিষয়ে মোহ প্রাপ্তির অবসর কোথায়? তত্ত্ব যিনি না জানিয়াছেন তাঁহারই মন মোহপ্রাপ্ত হয়, যিনি সত্যবস্তু জানিয়াছেন তাঁহার মোহ কোথায়, হে সভাসদগণ আত্মাকে না জানাই তোমাদের দুঃখের কারণ, আত্মাকে জান তবেই অনন্ত সুখ পাইলে এবং সর্ব্বদুঃখের উপশমের উপায় পাইলে। এই দেহের সঙ্গে আত্মা এক হইয়া গিয়াছে—আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ বিচার দ্বারা ইহা জানিয়া সুস্থ হইয়া যাও, বিলম্ব করিও না। (২৪) নির্ম্মল আত্মার সহিত দেহের কোন সম্বন্ধ নাই; সুবর্ণ পঙ্কলিপ্ত হইলে যেমন পঙ্কের মলিনতা সুবর্ণের ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় সেইরূপ আমি দেহ আমি দেহ এইভাবে আমিকে দেহে মাখাইয়া ফেলায় আমাতেও দেহের ধর্ম্ম যে দুঃখাদি তাহার আরোপ হয়।

পৃথগাত্মা পৃথগ্‌দেহী জলপদ্মলবোপমৌ।
ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে ॥ ২৬

আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং দেহী অর্থাৎ জীব পৃথগ্ মত বোধ হয়, যেমন জলাশয়ের উপরে যে পদ্ম ভাসিতেছে সেই পদ্মাধার জল এবং পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু পৃথগ্‌বোধ হয় সেইরূপ। কিন্তু পদ্মাধার জলরাশি ও পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু—এই জল এক হইয়াও পৃথগ বোধ হইতেছে পদ্মপত্ররূপ উপাধি দ্বারা। সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা এবং দেহী জীবাত্মা এক হইয়াও পৃথগ্ বোধ হইতেছে উপাধিদ্বারা—মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার রূপ উপাধি যোগে। আমি ঊর্দ্ধে বাহু

তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই সত্য ঘোষণা করিলেও কেহ আমার কথা শুনিতেছে না।

জড়ধর্ম্মি মনো যাবৎ গর্ত্তকচ্ছপবৎ স্থিতম্।
ভোগমার্গবদামূঢ়ং বিস্মৃতাত্মবিচারণম্॥ ২৭
তাবৎ সংসার-তিমিরং সেন্দুনাপি সবহ্নিনা।
অর্কদ্বাদশকেনাপি মনাগপি ন ভিদ্যতে॥ ২৮
সম্প্রবুদ্ধে হি মনসি স্বাং বিবেচয়তি স্থিতিম্।
নৈশমর্কোদয় ইব তমোহার্দ্দিং পলায়তে॥ ২৯

দুর্ব্বাসনাপঙ্কগর্ত্তে কচ্ছপবৎ নিলীনং কঠোরঞ্চ ভোগপ্রাপ্তৌ মার্গবৎ দ্বারভূতৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বামূঢ়ং মনো যাবৎ স্থিতং তাবৎ সংসারতিমিরং সেন্দুনা সবহ্নিনা অপিশব্দাৎ নক্ষত্রমণ্যাদি সর্ব্বতেজঃ সহিতেন অর্কদ্বাদশকেনাপি মনাক্ ঈষদপি ন ভিদ্যতে ইতি পরেণ সহান্বয়ঃ। ২৭।২৮।

কচ্ছপ পঙ্কগর্ত্তে জড়ের মত পড়িয়া থাকে। মনও যতদিন ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বিষয়ে আসিয়া পড়িয়া বিষয় ভোগ করিতে করিতে দুর্ব্বাসনা পঙ্কগর্ত্তে লীন হইয়া জড়ধর্ম্মী হইয়া থাকিবে অর্থাৎ আত্মবিচারে বিমুখ হইয়া ভোগমার্গে অবস্থিতি করিবে ততদিন ইন্দু বহ্নি নক্ষত্র মণি প্রভৃতি সর্ব্বতেজঃ পদার্থের সহিত দ্বাদশ সূর্য্যের দ্বারাও এই ঘোর সংসার অন্ধকার ঈষৎ মাত্রও বিনষ্ট হইবে না।

মন চঞ্চল ভোগবাসনারূপ জড়ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মবিচারে স্থিতিলাভ করিলে অর্থাৎ স্বাং কি না পারমার্থিকী স্থিতি বিবেচনা করিয়া অন্য সমস্ত ক্ষণিক স্থিতিকে মিথ্যা বোধ করিলে এই হৃদয়গত অজ্ঞান অন্ধকার সূর্য্যোদয়ে জগদন্ধকারের ন্যায় হৃদয় হইতে পলায়ন করিবে।

নিত্যমুত্তমবোধায় যোগশব্যাগতং মনঃ।
বোধয়েৎ ভবভেদায় ভবো হ্যত্যন্তদুঃখদঃ॥ ৩০

প্রতিদিন উত্তম বোধ প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাভ্যাস রত মনকে সংসার ভেদ করিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিবে কারণ সংসার অত্যন্ত দুঃখ-প্রদ। যোগশয্যাগত মন—ইহার অন্য অর্থও হয়। মন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে যে যোগ হয় তাহাই প্রকৃত যোগ। কিন্তু মন বিষয় ভোগে যুক্ত হইলেও যোগ হয়। যোগ হইতেছে দেহের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য অধ্যাস। ইহাতে আত্মাকেই দেহ বলিয়া বিশ্বাস হইয়া যায়। এই তাদাত্ম্যলক্ষণ শয্যাতে মন যখন সুপ্ত হইয়া থাকে তখন ঐ মনকে বলে যোগশয্যাগত মন। মনে রাখিতে হইবে সূক্ষ্ম মনই এই স্থূল দেহ। মনটা আত্মার দীপ্তিতে চেতন হইয়া নানাকার্য্য করে আর মনে হয় আত্মাই সব করিতেছেন—এইভাবে আত্মাই যখন মন হইয়া যান এবং দেহ হইয়া যান তখন মন এই অজ্ঞানশয্যাতে—এই ভোগ শয্যাতে ঘুমাইতে ভাল বাসে। এই মনকে সংসার বা ভোগছিন্ন করিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। কিরূপে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে তাহাই বলা হইতেছে—

দেখ ধূলিকণা আকাশে উড়িয়া আকাশের সঙ্গেই থাকে, অথবা কমল অম্বুরাশির সহিত মিশিয়া থাকে—সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকিলেও লিপ্ত হয় না, সেইরূপ দেহ ও আত্মা একসঙ্গে থাকিলেও আত্মা দেহের সহিত লিপ্ত হন না। কর্দ্দমাদি স্বর্ণের সহিত জড়িত হইলেও যেমন উহা পৃথক্ স্থিত—অর্থাৎ কর্দ্দম কদাচ হেম হইয়া যায় না, সেইরূপ এই জড়দেহও কদাচ আত্মায় পরিণত হয় না।

রাম—ভগবন্! আত্মা ত আনন্দস্বরূপ আর দেহটাও জড়—তবে সুখ দুঃখ কার হয়? মানুষ ত এই সুখ দুঃখ লইয়াই সংসারে বদ্ধ হয়। সুখ দুঃখ লাগিবে না ইহার উপায় কি?

বশিষ্ঠ। সুখ দুঃখের তত্ত্ব বুঝিলেই সুখ দুঃখ জয় করিতে পারিবে। শ্রবণ কর কিরূপে ইহা হইবে।

মন বা দেহের সহিত আত্মার একত্ব হইয়া গেলে একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ হইয়া যায়। চিৎ ও জড়ের মিশ্রণ হইলে (অজ্ঞানেই ইহা হয়) মনে হয় আত্মাই সুখ দুঃখ ভোগ করেন। আত্মার স্বরূপটি

জান তবেই সুখ দুঃখ আর তোমায় অভিভূত করিতে পারিবেনা। আত্মা মন হইতে স্বতন্ত্র হইলেই সুখদুঃখ বোধ থাকে না। শ্রবণ কর—

সুখ দুঃখানুভাবিত্বমাত্মনীত্যববুধ্যতে।
অসত্যমেব গগনে বিন্দুতাম্লানতে যথা ॥ ৩৩
সুখদুঃখেন দেহস্য সর্ব্বাতীতস্য নাত্মনঃ।
এতে হ্যজ্ঞানকস্যৈব তস্মিন্নষ্টে ন কস্যচিৎ ॥ ৩৪

আত্মা সুখদুঃখের অনুসরণ করেন ইহা মূঢ়গণের অনুভবেই হইয়া থাকে। আকাশে বিন্দুসংপ্রকারতা রূপ মালিন্য যেমন অসত্য সেইরূপ আত্মাতে সুখদুঃখানুভবও অসত্য। সুখ দুঃখ দেহের, সর্ব্বাতীত আত্মার নহে। সুখদুঃখ অজ্ঞান থাকিলেই হয়—অজ্ঞান নষ্ট হইলে সুখদুঃখ কোথাও নাই।

ন কস্যচিৎ সুখং কিঞ্চিদ্দুঃখঞ্চ ন চ কস্যচিৎ।
সর্ব্বমাত্মময়ং শান্তমনন্তং পশ্য রাঘব ॥ ৩৫

কাহারও কিঞ্চিৎমাত্র সুখ বা দুঃখ নাই। হে রাঘব! সমস্তই আত্মার বিবর্ত্ত; আর আত্মা শান্ত, অনন্ত ইহাই তুমি দেখ। এই যে সর্ব্বত্র বিস্তৃত সৃষ্টি দেখা যাইতেছে ইহা জলে তরঙ্গের মত অথবা সূর্য্যের অভিমুখে অর্দ্ধনিমীলত শয়ান পুরুষের ভ্রান্তি দর্শনের মত; এই সৃষ্টিভ্রম আত্মাতেই দেখা যাইতেছে। মণি যেমন অকারণেই আপনার তেজোময়ী ছায়া স্বয়ং দান করে, সেইরূপ আত্মাও স্বভাবতঃ আপনার তেজোময়ী কান্তিতে এই সৃষ্টিব্যাপার প্রসারিত করিতেছেন। হে সুমতে! আত্মা এবং জগৎ এক নয় এবং ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন ইহাও বলা যায় না কারণ জগৎটা অসৎ। জগৎটা আভাস মাত্র। সম্প্রতি অর্থাৎ অজ্ঞানকালে মাত্র ইহা বিস্তৃত হইয়া থাকে। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম—আত্মাই সর্ব্বত্র প্রসারিতরূপে

অবস্থিত। আমি একরূপ এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অন্যরূপ ইহা ভ্রান্তি মাত্র। রাঘব! এই ভ্রান্তি তুমি ত্যাগ কর। সমন্তাৎ প্রসারিত ব্রহ্মঘন নিত্য (বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ রহিত; কাল কৃত পরিচ্ছেদ রহিত, বস্তুতে দ্বিতীয় কোন কিছুর কল্পনা সম্ভব নয়; জল রাশিতে লহরী কল্পনা যেমন মিথ্যা সেইরূপ। সর্ব্বব্যাপী এক পরমাত্মায় দ্বিতীয় কোন কিছু কল্পনা নাই যেমন বহ্নিতে হিমকণা আদৌ থাকিতে পারেনা সেইরূপ।

ভাবয়ন্ আত্মনাত্মানং চিদ্রূপেণৈব চিন্ময়ম্।
ঋজুজ্জলময়ে হ্যাত্মা স্বয়মাত্মনি জৃম্ভতে ॥ ৪২
ন শোকোঽস্তি ন মোহোঽস্তি ন জন্মাস্তি ন জন্মবান্।
যদস্তীহ তদেবাস্তি বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৩
নির্দ্দন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগ ক্ষেমআত্মবান্।
অদ্বিতীয়োবিশোকাত্মা বিজ্বরোভব রাঘব ॥ ৪৪

চিৎরূপাপন্ন মনের দ্বারা আপনাকে চিন্ময় ভাবনা করিয়া আত্মা, মায়াকৌটিল্যমালিন্য রহিত হয়েন সেই আত্মা স্বয়ং আপনাতেই বিস্তার লাভ করেন। এই জন্য করিতে হইবে কি জান? আপনার স্বরূপটি পরোক্ষজ্ঞানে জানিয়া এইটির সাক্ষাৎকারের জন্য—অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্য আপনাকে তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া আমিই সেই ইহা ভাবনা করিয়া চিন্ময়ের বা পরাচিতির উপাসনা কর। কারণ উপাসনা দ্বারা দেবতাকে প্রসন্ন না করা পর্য্যন্ত বুদ্ধির মালিন্য কিছুতেই যায় না। আত্মা এইভাবে মায়াকৌটিল্য মালিন্য রহিত হইলেই আপন স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করেন। হে রাম! পরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে গুরুমুখে বা শাস্ত্র মুখে আত্মা কি ইহাই জানা। গুরু ও শাস্ত্র জানাইয়া দিতেছেন আত্মার শোক নাই, মোহ নাই, জন্ম ও নাই। তিনি জন্মবানও নহেন; যাহা আছে তাহাই আছে—অর্থাৎ আত্মা পূর্ব্বেও যেরূপ, পরেও সেইরূপ এবং মধ্যেও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ চৈতন্য। রাঘব ইহা শুনিয়া এবং নিরন্তর মনন করিয়া তুমি বিজ্বর হও। তুমি নির্দ্দন্দ্ব, (শীতোষ্ণাদি শারীর দ্বন্দ্ববিক্ষেপ

রহিত) নিত্য সত্ত্বস্থ নিত্য সত্ত্বগুণে থাকা জন্য রজঃ রহিত নির্যোগ ক্ষেম, আত্মবান্ অদ্বিতীয়, শোক শূন্য—ইহা জানিয়া বিজ্বর হও। তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শী আপনাতে আপনি সর্ব্বদা অবস্থিত স্থিরমতি মননশীলের ন্যায় শান্ত শোক মনা, মৌনী হইয়া, উৎকৃষ্ট মণির মত স্বচ্ছ হইয়া বিগতজ্বর হইয়া যাও। তুমি নির্জ্জনস্থান সেবী, সঙ্কল্পশূন্য, ধীর বুদ্ধি, বিজিতাশয় বা স্বাধীনচিত্ত, যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হওয়া অভ্যাস করিয়া বিগত জ্বর হইয়া যাও। তুমি আত্মা ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে অনুরাগ রাখিওনা—আয়াসশূন্য হও, রজস্তমরূপমলা শূন্য হও, পাপ শূন্য হও, আদান প্রদান বুদ্ধি না রাখিয়া বিগত জ্বর হইয়া যাও। বিশ্বাতীত পদ প্রাপ্ত হইয়াও প্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্য—সর্ব্বপূর্ণ হইয়া পরিপূর্ণ সমুদ্রের মত অক্ষুব্ধ হইয়া বিগত জ্বর হইয়া যাও। সঙ্কল্প বিকল্প আর তুলিও না, আমি আমার রূপ মায়ার কালিমা বিবর্জ্জিত হও, আপনাতে আপনি তৃপ্ত হইয়া বিজ্বর হইয়া যাও। হে আত্মবিৎগণের শ্রেষ্ঠ রাম! তুমি সীমাশূন্য, পারশূন্য পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া—আপনাকে তাহাই ভাবনা করিয়া পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ সুমেরুর মত ধীর হইয়া বিগতজ্বর হইয়া যাও। যথা প্রাপ্ত বিষয়ের অনুভব হইতে সর্ব্বত্র বাঞ্ছারহিত হইয়া, ত্যাগ ও গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া বিজ্বর হইয়া যাও। আপনাতে আপনি পূর্ণকামতা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ সমুদ্রের মত পূর্ণতা ভজন কর; পূর্ণেন্দুবিম্বের মত আপনাতে আপনি পূর্ণ আনন্দ ভজন কয়। অপরিচ্ছন্ন আর থাকিও না—অভাব বোধ আর করিও না তবেই পূর্ণ হইয়া থাকিবে। হে রাঘব! বিশ্ব প্রপঞ্চ রচনা মিথ্যা। যে ইহাকে মিথ্যা জানিয়াছে সে কখন অসত্যের অনুধাবন করে না। তুমি ইহা জানিয়াছ, তুমি শান্ত কলন হইয়াছ, তুমি নিরাময় হইয়াছ, তুমি নিত্য উদিত হইয়াছ—সর্ব্বদা আত্মরূপে অবস্থিত রহিয়াছ হে সুন্দর তুমি শান্তশোক হইয়াছ।

হে রাম! একটি সত্যস্বরূপ বস্তুই আছেন, সর্ব্বদা ছিলেন, সর্ব্বদা থাকিবেন ইহা তুমি জানিয়াছ; এখন পিতার নিকট হইতে লব্ধ এক ছত্র জগৎ রাম তুমি উত্তমরূপে পালন কর। যদি বল আত্মা ভিন্ন এই

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৴০ আনা। নমুনার জন্য ।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 543

২৪শ বর্ষ।] মাঘ, ১৩৩৬ সাল। [১০ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতিব পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীচন্দ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৪শ বর্ষ। } মাঘ, ১৩৩৬ সাল। { ১০ম সংখ্যা

বাতুলের মত আশা করিবে— না আর কিছু করিবে?

যখন শেষের দিন আসিবে, যখন সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইতে থাকিবে, যখন মন পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবানকে ভুলিতে থাকিবে আর এলোমেলো বকিতে আরম্ভ করিবে, যখন শয্যা কণ্টকবৎ লাগিবে, মাথার যাতনায় উপাধানে মস্তক রাখিতে পারিবে না, যখন যাতনায় অস্থির হইয়া ক্ষণে ক্ষণে এপাশ ওপাশ করিতে থাকিবে, আহা! বল দেখি তখন কি তুমি—সমস্ত জীবনে এমন কি আশা পাইলে যাহাতে মনে মনেও বিশ্বাস করিতে পার ভগবান্ তোমায় সেই সময়ে অনুগ্রহ করিবেন? তিনি সেই সময়ে কৃপা করিবেন কোন্ প্রাণে ইহা তুমি বিশ্বাস করিয়া প্রাণকে শীতল করিতে পার? যাঁহারা সুস্থশরীরে প্রতিদিনের সাধনায় ইহার আভাস পান তাঁহাদের চরণের রেণু হইবার যোগ্যতাও ত আমার নাই। কচিৎ কখন প্রাণ যেন কি স্পর্শ করিয়া কণ্টকিত হয়, চক্ষে অশ্রু আইসে কিন্তু সে ত কচিৎ কখন; সে ত সুস্থ শরীরে; কিন্তু অসুস্থ শরীরে যখন বহুপ্রকারের যাতনা পাই তখন কি হয়? সুস্থশরীরে প্রতিদিনের সাধনায় "ভাব" কি আইসে? যদি ভাব আনা আয়ত্ত না হইল তবে ত শেষের দিনে তুমি ঈশ্বরকে ছুঁইবে বা ঈশ্বর তোমায় স্পর্শ করিবেন এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে

কি পার? এত বাতুলের আশা? তবে কি করিব? এখনও ত কিছুদিন সাধনা করিবার অবসর তুমি দিয়াছ? এখনও ত কিছু পুরুষার্থ করিতে তুমি সামর্থ্য দিতেছ—এই কটা দিন ধরিয়া কি করিব তবে?

প্রথমে বুঝিতে হইবে প্রত্যহ আমার মন তোমাকে ছুঁইতে পারে না কেন? কেন মন তোমার চরণ স্পর্শ করিতে পারে না? কোথায় বাধা পাই?

আহা! যখন তোমাকে ডাকিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করি তখনও যে আমার মন পাগলের মত আরও কিছু ভাবিয়া মরে? আহা! পড়্‌তা কোন কিছুর সাড়া পাইলে তুমি থাক না।

ইহাত হয় বুঝিলাম—কিন্তু পড়তা কোন কিছুর সাড়া মন আর পাইবে না ইহা করা যাইবে কিরূপে?

আছে—উপায় আছে—শুধু উপাসনায়, বা শুধু জপে বা শুধু ধ্যানে ইহা যতক্ষণকে ততক্ষণ কিন্তু মনকে আমাতে স্থায়ীভাবে লগ্ন করিবার জন্য মনকে আরও কিছু দিতে হইবে। কি দিবে জান? বৈরাগ্য। শুধু অভ্যাসে তোমার কৃপা আয়ত্ব হইবে না কিন্তু বৈরাগ্য না আনিলে মন সেই চরণে লগ্ন হইবে না। বৈরাগ্যঅনলে মনকে পুড়াইতে না পারিলে মন বহুদিন ধরিয়া যে বিষয়-রস সংগ্রহ করিয়াছে তাহার জাওর কাটা ছাড়িবে না। সব বৃথা সব বৃথা যদি বৈরাগ্য দিয়া মনকে কাতর করিতে না পার। যদি বৈরাগ্য না আইসে তবে ধর্ম্মের বক্তৃতায়, বা ধর্ম্মের বই লেখায়, বা ভাবের কবিতা লেখায় বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া কি তোমার মনে হয়? না না বাতুলের আশা করিও না। প্রতিদিন বৈরাগ্য বিশেষ করিয়া অভ্যাস করিতে থাক—সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার অভ্যাস বা নামের অভ্যাস, বা ধ্যানের অভ্যাস বা বিচারের অভ্যাস রাখিতে চেষ্টা কর। সাধনার প্রথম অবস্থায় অগ্রে অভ্যাস পরে বৈরাগ্য আর শেষে শেষ সময়ে প্রথমে বৈরাগ্য শেষে অভ্যাস অথবা বৈরাগ্য আনিতে পারিলেই আপনি অভ্যাসের বস্তুতে মন লাগাইতে পারিবে। অন্য বাসনা থাকে বলিয়া ঈশ্বরের স্মরণে প্রাণ কণ্টকিত হয় না। বাসনা ত্যাগ করিতে চেষ্টা কর—যখন ত্যাগ হইবে তখন তাহাকে পাইবে। বাসনা ত্যাগ জ্ঞান দ্বারাও হয় আবার ধ্যানের দ্বারাও হয়। ধ্যেয় বাসনা ও জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগের কথা এখানে আলোচনা করিব না—বলিব বৈরাগ্য অভ্যাসের কথা, প্রথমে অপর বৈরাগ্য অভ্যাস কর, পরে পর বৈরাগ্যে যখন আসিবে তখন যাহা চাও তাহাই পাইবে। তাঁহার নিকটে খুব কাঁদ—হইতেছে না বলিয়া প্রাণ ছট্‌ফট্ করুক।

খুব প্রার্থনা কর—আমায় উদ্ধার কর—উদ্ধার কর বলিয়া বলিয়া যে যাহা করিতেছ তাঁহাতে মন লাগাইবার জন্য—তাহাই করিতে থাক—প্রাতে শয্যাতে পদ্মাসনে একবারে বসিয়া মন হইতে অপর চিন্তা বাহির করিয়া দিবার জন্য অগ্নিক্রিয়ার জপ কর—শেষে শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া নাম কর—শেষে পুনঃ পুনঃ বলিতে থাক, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম—পতিতপাবন সীতারাম নাম করায় কোন দোষ হয় না—যে নামই লও সকলেই হয়, আহা সে যে আমার আত্মা—সে যে আমার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী—সে যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্রই যে তারে স্মরণ করা যায় আবার সবই যে তাতে এই স্মরণে পতিতপাবন তুমি আর "জগবাহির নই মুইছার" ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতে থাক—সব শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছ ক্রন্দন ত আসে না, তবুও তার সঙ্গে কথা কও—অগতির গতি যে সে—দেখ তোমাকে অধিকার করিয়া যে আছে সে রাবণ—সে ভোগলালসা—এই রাবণ তোমাকে তার সুখময় আনন্দময় ক্রোড় হইতে চুরী করিয়া আনিয়াছে তুমি উদ্ধার গো উদ্ধার বলিয়া লুটিয়া লুটিয়া তার জন্য কাঁদ আর অপেক্ষা কর—বল এস প্রভু কবে আসিবে আমি যে তোমার পথ চাহিয়া চাহিয়া কোনরূপে জীবন রাখিতেছি—তুমি আসিয়া আমায় উদ্ধার করিবে বলিয়া সকল কষ্ট সহ্য করিতেছি। এই করিতে করিতে যখন ক্ষিপ্ত—পাগল মন—একটু তাহার দিকে ফিরিল তখন তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া বল—ঠাকুর ৮৪ লক্ষ বার কখন উড়ুম্বরে মশক হইলাম, জলাশয়ে মৎস্য হইলাম, বনে বৃক্ষ হইলাম, লতা হইলাম, ব্যাঘ্র হইলাম, সিংহ হইলাম, মানুষ হইলাম, চণ্ডাল হইলাম, রাজা হইলাম, স্ত্রীলোক হইলাম, শঙ্খ হইয়া সাগরের অতল তলে কত দিন কাটিল, কতদিন আবার জলশূন্য স্থানে বাগানে মাঠে শস্যক্ষেত্রে শামুক হইয়া পড়িয়া রহিলাম, কত পক্ষী হইলাম, তিত্তির হইলাম—আহা ৮৪ লক্ষ যোনি কত বাসনা কত সঙ্কল্প এই মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল—মন ত আকল্পস্থায়ী ৮৪ লক্ষ জন্মের বাসনা কামনা ভিতরে পুরিয়া—এখন এই হইয়া কামনার জ্বালায় জ্বলিতেছি—প্রভো! আমি ত ইহাদের সহিত বল করিতে পারি না—এই অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার—এই পুরাতন কর্ম্ম কোথায় আমাকে ভাসিয়া লইয়া যায়—এই জন্মে নূতন কর্ম্ম—যাহা তোমার কাছে যাইবার জন্য তুমি দিয়াছ—পুরাতন সংস্কারের প্রবলবেগে নূতন কর্ম্ম কোথায় পড়িয়া থাকে তাই বলি ঠাকুর তুমি আমায় কৃপা কর—তুমি আমায় তোমার ভৃত্য বলিয়া স্বীকার কর—প্রাণকে কাতর করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কও, কহিয়া বল হে শ্রীহরি, হে নন্দনন্দন আমাকে নটের মত এই রঙ্গালয়ে আনিয়া অভিনয়

করাইতেছ—৮৪ লক্ষ বার—আমার অভিনয় কি ৮৪ লক্ষ বারেও শেষ হইল না? যদি ভাল অভিনয় করিয়া থাকি যদি তোমাকে অভিনয়ে তৃপ্তি দিয়া থাকি, তবে পুরস্কার দাও—আমাকে তোমার কাছে বিশ্রাম করাও আর যদি অভিনয় করিতে না পারিয়া থাকি তবে আমাকে তোমার রঙ্গালয় হইতে বাহির করিয়া দাও আর আমার দ্বারা অভিনয় করাইও না। ঐ শুন কে গাহিয়া গেল—

> ব্যোমাকাশ খ খাম্বরাব্ধি বসুভি স্তৈস্তাদৃশৈর্জন্মভি
> রানীতা নটকময়া নিজতনু স্তত্তুষ্টয়েঽস্থাবধি।
> তুষ্ট শেচন্ময়ি নন্দনন্দন তদা বাঞ্ছাফলং দেহিমে
> নো চেদ্ ব্রূহি কদাচিদানয় পুনর্নৈতাদৃশীং ভূমিকাম্॥

বসু ৮+অব্ধি ৪+অম্বর (আকাশ) ০+খ (আকাশ) ০+খ আকাশ ০+আকাশ ০+ব্যোম ০—এই ৮৪০০০০০ লক্ষ শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বলিতেছিলাম প্রথমে অপর বৈরাগ্য অভ্যাস কর। বিষয়ের দোষ দর্শন করিলে বৈরাগ্য জন্মে। চিত্তে যতদিন রাগ ও দ্বেষ থাকে অর্থাৎ ভাল লাগালাগি ও মন্দ লাগালাগি থাকে ততদিন চিত্তের মলা থাকে। চিত্তের মল দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ধাবিত হয়।

(১) রাগ দ্বেষ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ধাবিত না হয় এমন উপায় অবলম্বনে যত্নশীল হইতে হয়। ইহাই বৈরাগ্য প্রাপ্তির প্রথম ভূমিকা। একমাত্র ঈশ্বরই প্রাপ্তির বস্তু ঈশ্বর ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহাই ক্ষণধ্বংসী, তাহাই কষ্টদায়ী—এই সত্য বস্তু অবলম্বনে চেষ্টা এবং অসত্য বস্তুর দোষ দেখিয়া তাহা বর্জ্জন, ইহাই বৈরাগ্যের প্রথম ভূমিকায় যাইবার উপায়।

(২) কিছুদিন সত্যগ্রহণ ও অসত্য অগ্রাহ্য করার অভ্যাস করিবার পর দেখিতে হইবে কোন্ ভোগেচ্ছা হইতে মন নিবৃত্ত হইল, কোন প্রকার ভোগেচ্ছাই বা থাকিয়া গেল—ইহা অবধারণ করা এবং সতর্ক থাকাই হইল বৈরাগ্যের দ্বিতীয় ভূমিকা।

(৩) বাহিরের ইন্দ্রিয়গণ আর বিষয়ে ধাবিত হয় না কিন্তু এখনও ঔৎসুক্য সহকারে মনে মনে বিষয় চিন্তা হয়—বিষয়ে না পড়িয়া যখন মানুষ নিজের চিত্তকেই দেখে, তখন বৈরাগ্যের ৩য় ভূমিকা।

(৪) চিত্তকে দেখিতে দেখিতে যখন চিত্ত দেখার ঔৎসুক্যও আর থাকে না তখন অপম বৈরাগ্যের ৪র্থ ভূমিকা লাভ হয়। এই চারি প্রকার অপর বৈরাগ্যের শাস্ত্রীয় নাম (১) যতমান সংজ্ঞা (২) ব্যতিরেক সংজ্ঞা (৩) একন্দ্রিয়সংজ্ঞা (৪) বশীকার সংজ্ঞা।

ইহার পরে পর বৈরাগ্য। এই পর বৈরাগ্যের বিচার জীবনে যিনি বিশেষ ভাবে অবলম্বন করেন তিনিই মনপাগলকে তাহার বিষয় পাগলামী ছাড়াইয়া ভগবৎ চরণে লগ্ন করিতে পারেন। মনের অসম্বদ্ধ প্রলাপ না ছাড়াইতে পারিলে এবং ইহার আলস্য অনিচ্ছা জড়তা না দূর করিতে পারিলে ইহাকে প্রার্থনাই করাও বা জপই করাও, বা ধ্যানই করাও বা আত্মবিচারই করাও—এই সমস্ত যতক্ষণকে ততক্ষণ। মনকে কাতর করাযায় মনের ভোগেচ্ছার আসক্তি দেখিয়া, ইহার লয় বিক্ষেপ দেখিয়া। এই দোষ সমস্ত হইতে চিত্তকে মুক্ত কর তবে এ শান্ত হইবে। মনকে শান্ত করিবার প্রধান অস্ত্রই হইতেছে পর বৈরাগ্য। এই পর বৈরাগ্যে বিচার করিতে হইবে ঈশ্বরের মায়াই জগতের জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার সাধারণ নরনারী মোহে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়াই জীবনটাকে নিষ্ফল করিতেছে। এই দুঃখকে প্রবল করিয়া পুনঃ পুনঃ ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইবে। ইহাই প্রথম। অনুগ্রহ প্রার্থনা তখনই ঠিক ঠিক হইবে যখন নিজের ও অপরের নানাবিধ দুঃখ দেখিয়া ইহা কাতর হইবে, এবং সেই জন্য মন ভগবানের আজ্ঞামত চলিতে প্রাণপণ করিবে। কারণ অনুগ্রহ প্রার্থনা এবং আজ্ঞামত চলা ভিন্ন মৃত্যুসংসারসাগর পার হইবার অন্য উপায় নাই। ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে রাগ দ্বেষযুক্ত বিষয়াভিমুখী চিত্তকে শুদ্ধ করা যাইবে না।

মন সর্ব্বদাই তোমাকে কর্ম্ম করাইতে চায় কিন্তু এটা যখন ভোগবাসনা তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করে তখনই এটা বিষম কষ্টে পড়ে। এই ভোগবাসনা নিজের জন্যই কর বা জগতের জীবের জন্যই কর অর্থাৎ জগতের জীবকে ভোগেচ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য কর্ম্ম দিয়াই ইহাদের উপকার করা—এই উপকারও প্রকৃত উপকার নহে, ইহাতেই মানবের যথার্থ কল্যাণ হয় না। গীতাতে অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবেন না যখন বলিলেন, আর কারণ দেখাইলেন যুদ্ধে জগতের অনিষ্টই হইবে ভগবান তখন ইষ্ট অনিষ্ট বিচারকে গ্রাহ্যই করিলেন না, বলিলেন ইহা তোমার অশুদ্ধমনের বিচার মাত্র। তুমি এভাবে কর্ম্ম করিও না। তুমি কর্ম্মকর আমি ঈশ্বর তোমাকে কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া। তোমার ইচ্ছামত তুমি কর্ম্ম করিও

না—আমার ইচ্ছামত কর্ম্ম কর। তুমি তোমার কর্ম্মকালে কর্ম্মের ফলাফল, সুখদুঃখ, লাভ অলাভ বিচার না করিয়া শুধু আমাকে ভালবাসিয়া আমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিয়া চল—তোমার কর্ম্মের দোষ ভাগ যে ইহার কামনা অংশ ইহাতেই ইহা যাইবে। তোমার কর্ম্মকে সকাম অবস্থা হইতে নিষ্কাম অবস্থায় আনিবার ইহাই প্রথম কৌশল। দ্বিতীয় কৌশল হইতেছে পর বৈরাগ্য। ইহাতে তুমি দেখিবে কর্ম্ম যাহা কিছু হয় তাহা করেন প্রকৃতি। বিনাশক্তিতে কোন কর্ম্ম হয় না। শক্তিও প্রকৃতি একই। এই শক্তি কিন্তু আমার শক্তি। মানুষ আমার শক্তি লইয়াই কর্ম্ম করে। এই শক্তিকে কুপথে চালাইতে আমিই নিষেধ করিয়াছি। এই জন্য তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিও না। আমার আজ্ঞা মত কর্ম্ম করিবার সময়ও বিচার করিও শক্তি আমার—তুমি আমার শক্তিতে অহংবুদ্ধি রাখিয়া বৃথা অভিমান কেন কর—কেন বল তোমার শক্তিতে এই কর্ম্ম হইতেছে—লোকের কাছে বড়াই করিয়া বক্ষে অঙ্গুলি ঠুকিয়া কেন বল এই সব কর্ম্ম—শর্ম্মা এই শর্ম্মা করিয়াছেন—তোমার এই বৃথা অহংকারে তুমি বড় দুর্গতি মুখে ছুটিতে থাক। আহা তুমি কাতর হইয়া যখন বল ঠাকুর তোমার শক্তিতেই কর্ম্ম হইতেছে আমি তোমার হস্তের অস্ত্র মাত্র আমি তোমার দাস তুমি আমাকে দিয়া করাইতেছ এই ভাবে যখন তুমি কর্ম্ম কর তখন তোমার অহংকর্ত্তা এবং অভিমান ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। তোমার সকাম কর্ম্মকে নিষ্কাম পথে লইবার ইহাই দ্বিতীয় উপায়। প্রথম অবস্থায় তুমি কর্ম্মী, এই দ্বিতীয় অবস্থায় তুমি ভক্ত। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় তুমি বিচারপরায়ন জ্ঞানী। তুমি দেখ মানুষ যাহা কিছু করে তাহা সে করে না কর তুমি। তুমিই মানুষের মধ্যে থাকিয়া কর্ম্ম কর—মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া এবং অহংকর্ত্তা অভিমানে কর্ম্ম করিয়াই মোহে আচ্ছন্ন হয়—যখন বলিতে পারে "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি"—কর্ম্মী, ভক্ত ও জ্ঞানী হইয়া যখন এই অবস্থায় পৌঁছে তখনই দেখে সে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—সে সর্ব্বদা শান্ত সর্ব্বদা আনন্দময় জ্ঞানময়। অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য সাধনায় আমি তোমার, তুমি আমার, তুমিই আমি ক্রম অনুসারে এই তিন অবস্থা লাভ হয়। ইহাই জীবনকে সফল করিবার উপায়।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য—২য় প্রবন্ধ।

২য় প্রবন্ধে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য কি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হইবে? হইবে। বিষয়টি ব্যক্তি, জাতি, সমাজের বিশেষ উপকারী। ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্যের অর্থ ত বুঝিয়াছ?

কেহ বলেন ঈশ্বরের প্রিয় হইবার জন্য কর্ম্ম। কেহ বলেন ঈশ্বর জগতের হিতের জন্য যে সমস্ত কর্ম্মকে কল্যাণজনক বলিয়া প্রচার করেন এবং যে সকল কর্ম্ম তিনি আপনি আচরণ করিয়া জীবকে সাধ্যমত তাহারই অনুসরণ করিতে বলেন তাহাই তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম।

মন্দকর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় হওয়া যায় না। মন্দকর্ম্ম করিতে তিনিই নিষেধ করিয়াছেন।

তবে লোকে যে বলে একটি বৃক্ষের পত্রও, একগাছি তৃণ পর্য্যন্তও ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না—মানুষ মন্দ কর্ম্ম করিলেও ঈশ্বরই তাহা করান?

দুষ্ট বুদ্ধির দোষে—অবিচারে মানুষ ইহা বলে। মিথ্যা কহিও না, পরদার সুরাপান করিও না,—এই সমস্ত নিষেধপথ করিয়াছেন কিন্তু লোকে ঐ সমস্ত কুৎসিৎ কর্ম্ম করিয়া বলে ঈশ্বর আমাকে ঐ প্রবৃত্তি দেন কেন আর তিনি না করাইলে আমার সাধ্য কি আছে যে ইহা আমি করিব? এইরূপ বলিলে কি বলা হইলনা করিওনা আবার কর? এ সমস্ত পাগলের উক্তি মাত্র। পাপকর্ম্ম কিরূপে হয় ইহার মীমাংসা এখানকার আলোচ্য নহে। আচ্ছা এখন বল কোন্ কর্ম্ম জগতের হিতের জন্য ঈশ্বর করেন?

দেখ সমাজ যখন নিতান্ত হীন অবস্থায় আসিয়া পড়ে, তখন সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, এবং তজ্জন্য সমাজে অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। এইরূপ দুর্দ্দশায় সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত কর্ম্মকারীর বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন ইহা ভগবান্ করিয়া থাকেন। এই কর্ম্মই ঈশ্বরের প্রিয়কর্ম্ম।

ধর্ম্মের গ্লানি কাহাকে বলিতেছ?

গ্লৈ ধাতুর অর্থ ম্লান হওয়া। শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসন্নতা এবং অস্বাস্থ্য এইগুলি গ্লানি শব্দের অর্থ। সমাজের নরনারী যখন অবিচারকে বিচার সঙ্গত মনে করে, চরিত্র হীন হওয়ার পক্ষপাতী হয়, অসতী হওয়াকে সতী থাকার উপরে স্থান দেয়, এক নিষ্ঠাকে বহুনিষ্ঠার কাছে হেয় প্রমাণ করে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মের

উপরে স্থান দেয়, রাজা দুর্য্যোধনকে রাজা যুধিষ্ঠিরের বহুউপরে আসন দেয়, লক্ষ্মণ অপেক্ষা ইন্দ্রজিতের বীরত্বের প্রসংসা করে, রাম অপেক্ষা রাবণের গৌরব দেখায়, মনকে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে সংযমিত করাকে উন্নতির প্রতিকূল মনে করে তখন জানিও ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে এবং এই জন্যই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে।

ধর্ম্মই বা কোন্ বস্তু এবং ধর্ম্মের গ্লানিই বা কেন হয়?

জগৎটা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন শীল। জগতের সকল বস্তুরই নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। সর্ব্বদা গতিশীল জগৎ কিন্তু একটি অপরিবর্ত্তনীয়, সর্ব্বপ্রকার-কম্পনশূন্য, সদা স্থির, সদা শান্ত, সদা একরূপ বস্তুর উপর দাঁড়াইয়াই গতিশীল। স্থিতিভিন্ন গতি হইতেই পারে না। যে স্থির বস্তুর উপর জগৎ দাঁড়াইয়া সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সর্ব্বাত্মা। আর ধর্ম্ম হইতেছেন ঈশ্বরের বিভূতি ঈশ্বরের প্রভা, ঈশ্বরের শক্তি। এই জন্য ধর্ম্মই ঈশ্বর। সমস্ত ধারণ করেন যিনি তিনিই ধর্ম্ম। * ধর্ম্ম বিশ্বধারণ করিতেছেন এবং বিশ্বরক্ষা করিতেছেন এবং বিশ্বরক্ষা করিতেছেন বলিয়া ইনিই ঈশ্বর। ধর্ম্মই মানুষের সঙ্গে যায়—অন্যসমস্ত এইখানে পড়িয়া থাকে। "সহ্যেক পরলোকগতস্য বন্ধু" একমাত্র ধর্ম্মই পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধু। যত নিপুণ হইয়াই কামিনী ও কাঞ্চন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করনা কেন—পাইলেই জানিলে এসকলে বিশ্বাসও নাই আর ইহারা স্থায়ীও নহে। ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদামুনে। ধর্ম্ম এব পরোবন্ধুঃ পিতা মাতা পিতামহঃ। ধর্ম্ম সনাতন। সকলেরই সর্ব্বদা ধর্ম্মসেবা করা উচিত। ধর্ম্মই পরম বন্ধু পিতা মাতা পিতামহ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও কত উক্ত আছে—ধর্ম্মই আত্মা, ক্রিয়া, ধর্ম্মই সমস্ত দেবতা "সর্ব্ব দেবো ধর্ম্ম এব ন সংশয়ঃ। বলিতেছেন "ধর্ম্মরাহিত্যং ব্যর্থজীবনম্" যাহার ধর্ম্ম নাই তার জীবনই বৃথা। আবার বলিতেছেন "সদসৎ কর্ম্মণাং দ্রষ্টা ধর্ম্মএব সনাতনঃ" সৎ অসৎ কর্ম্মের দ্রষ্টা এই সনাতন ধর্ম্ম।

সা চাতুরী চাতুরী যা ধর্ম্মরক্ষাকরী ভবেৎ।
সহস্রোপ দ্রবৈ যুক্তো যোনধর্ম্মং জহাতিহি।
স ধীর উচ্যতে সদ্ভি ধর্ম্মহা ত্বাত্মহা মতঃ॥

---

* ধর্ম্ম চতুষ্পাৎ সম্পূর্ণো বৃষরূপ ধরশ্চরন্
পাতি লোকানিমান্ মূর্ত্ত তস্মৈধর্ম্মায় বৈনমঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

সেই চাতুরীই চাতুরী যে চাতুরীতে ধর্ম্মরক্ষা হয়। সহস্র উপদ্রবেও যিনি ধর্ম্মত্যাগ না করেন সাধুরা তাঁহাকে বলেন ধীর। ধর্ম্ম ত্যাগী যিনি তিনি আত্মঘাতী।

বুঝিলাম ধর্ম্ম কি—কিন্তু এই ধর্ম্মের গ্লানি হয় কিরূপে?

ধর্ম্মকে মানুষ যখন হৃদয়ে আনয়ন করে তখন হৃদয়ের প্রসারতা বা সঙ্কীর্ণতা অনুসারে ধর্ম্মও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। যে কারণে, দিনের পর রাত্রি আইসে যে কারণে, ঋতু পরিবর্ত্তিত হয় যে কারণে যুবা বৃদ্ধ হয় সেই কারণে মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়! হীনবুদ্ধিতে ও অন্ধ হৃদয়ে প্রবিষ্ট ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত হয়। ফলে ধর্ম্ম ধর্ম্মই থাকেন, যে ভাবে মানুষ এই সনাতন বস্তুকে ধারণ করে তাহাই কলুষতা প্রাপ্ত হয়। যেমন কালে কালে ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অন্যরূপ হয় অথচ ঈশ্বর ঈশ্বরই থাকেন, সেইরূপ।

ধর্ম্মের গ্লানি কেন হয় বুঝিলাম কিন্তু ধর্ম্মের অঙ্গসকল কি কি?

পূর্ণধর্ম্মের অঙ্গ চারিটি। সত্য, দয়া, শান্তি ও অহিংসা পূর্ণধর্ম্মের এই চারি পাদ। সত্যযুগে ধর্ম্মের পূর্ণতা দৃষ্ট হয়, ক্রমে ইহার ক্ষয় হইতে থাকে—ত্রেতায় তিন পাদ দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র। হৃদয় ও বুদ্ধি যেমন যেমন নীচে নামিতে থাকে ধর্ম্মেরও সেইরূপ পাদভঙ্গ হইতে থাকে।

চারিপাদ ধর্ম্মের কিছু কিছু নাম উল্লেখ করিলে ভাল হয়।

(১) সত্যের অঙ্গ হইতেছে মিথ্যা কথা না বলা, অঙ্গীকার প্রতিপালন করা, প্রিয়বাক্য বলা, পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা, বাহিরে ভিতরে শৌচরক্ষা, লজ্জা, কৃপণতা না করা;

(২) দয়ার দৃষ্টান্ত হইতেছে পরোপকার করা, দান করা, হাসিয়া কথা কওয়া, বিনয়, নম্রতা; সমদর্শিতা।

(৩) শান্তি হইতেছে হিংসা না করা, সন্তোষ, ইন্দ্রিয়সংযম, নিঃসঙ্গ থাকা, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস ভাবনা, আতিথ্য, জপ, হোম ইত্যাদি।

(৪) অহিংসা হইতেছে হিংসা না করা, পরপীড়ন না করা, সর্ব্বত্র আত্মীয়তা, অপরাত্মাতেও আত্মবুদ্ধি ইত্যাদি।

এখন দেখিতে হইবে যাঁহারা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন শত অসুবিধাতেও—শত উপদ্রবেও তাঁহারা ধর্ম্মপথ ছাড়েন না। তাঁহারাই সাধু। ভগবান্ এই সাধু-

দিগকে পরিত্রাণ করেন এবং দুষ্কৃত কর্ম্মকারীকে বিনাশ করেন এবং ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া দিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন।

তবেই হইল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য হইতেছে বুদ্ধিকলিল বা বুদ্ধিকালুষ্য দূর করা, হৃদয়কে নির্ম্মল করা। আপনার বুদ্ধির কলুষতা দূর করিতে হইবে, আপনার হৃদয়কে রাগদ্বেষশূন্য করিয়া নির্ম্মল করিতে হইবে; এবং সমাজের নরনারী যাহাতে এইপথে চলিতে পারে তাহা যাহার যেমন সাধ্য সেইরূপ আচরণ করিয়া সমাজকে শিক্ষা দিতে হইবে; ইহাই হইল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। তবেইত হইল আপনি ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মপথে লইবার চেষ্টাই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। এই কার্য্য কত কঠিন তাহা যাঁহারা এইপথে চলিতেছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। শুধু পরোপকার পরোপকার বলিয়া চীৎকার করিলে ইহা হইবে কি? আপনি ধর্ম্মাচরণ না করিলে ইহা হয় কি? জগতের যাহাতে উপকার হয় তাহা, আমাদের কর্ম্ম হইতে কামনা বা ভোগেচ্ছা বিগলিত না করিতে পারিলে হইতেই পারে না। ইহার জন্য ঈশ্বরের দাস হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া ঈশ্বরের প্রীতিজন্য কর্ম্ম করা চাই। নিজের সকাম কর্ম্ম সকলকে কামনা বিগলিত করিয়া নিষ্কাম পথে লইতে হইবে তবেত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য হইবে? এইজন্যই স্বধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে এবং অন্যকেও এই পথে লইতে হইবে। যদি ব্রাহ্মণ হও তবে নিজে তপস্যা করিতে হইবে অন্যকে করাইতে হইবে, ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে, বৈশ্যকে ধনোপার্জ্জন করিতে হইবে এবং শূদ্রকে তিনবর্ণের সেবা করিতে হইবে ইহাই স্বধর্ম্ম রক্ষা। তবে বল সন্ধ্যাবন্দনাদি বাদ দিলে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য হয় কি? না ইহাতে স্বধর্ম্ম রক্ষা হয়? আমরা এইজন্য বলিতেছি নিজে জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য নিজের হৃদয় শুদ্ধ করিতে হইবে এবং নিজের বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিতে হইবে তবেই ঈশ্বর প্রীত হইয়া আমাদিগকে এমন শক্তি দিয়া দিবেন যাহাতে আমাদের আচরণ দেখিয়া অন্যেও এই সাধুপথ আশ্রয় করিতে পারে।

বলিতেছিলাম জ্ঞান উপার্জ্জন জন্য কর্ম্ম করা ও করান এবং অজ্ঞানকে বিনাশ জন্য চেষ্টা করাই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য।

অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জগতের অনিষ্ট দেখাইতেছিলেন আর ভগবান্ উপদেশ করিলেন তুমি ফলাফল দেখিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না। যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম্ম—এখানে লাভ অলাভ বিচার করিয়া কর্ম্ম করিও না আমি বলিতেছি বলিয়া আমাকে ভালবাসিয়া কর্ম্ম কর। ইহাই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য।

পুরাণ-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পুরাণের উপযোগিতা বর্ণন)

(১)

ইতঃপূর্ব্বে পুরাণের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, বর্ত্তমান সন্দর্ভে ঐ বিষয়েই অন্যান্য কথা বলিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্ব প্রবন্ধের সারকথা এই যে পুরাণ আমাদের পুরাতন ইতিহাস, উহাতে বর্ণিত চরিতাবলী দ্বারা জাতীয় জীবন আদর্শভাবে গঠিত হয়, এমনকি পুরাণার্থভাবনাদ্বারা মানব জগদভিরতি-বিরতিরূপ বৈরাগ্য লাভ করতঃ ভগবদ্ভক্তি সম্পদে ভূষিত হইয়া কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হয়, তখন এই অতীব বিচিত্র সংসার-নাটক-রহস্য তাহার নিকটে সম্পূর্ণরূপেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, পুরাণপ্রদর্শিত এই উপযোগিতা জাতির জীবনের অতীব অমূল্য সম্পদ, ইহা ধীরচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

(২)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি আমি নবীনের মোহে পুরাণে বধির হইয়াছি। এই বধিরতা আমার পক্ষে অতীব মারাত্মক। ঐ ভীষণ বধিরতার জন্যই বর্ত্তমানে আমি আত্মবিস্মৃত জাতিরূপে পরিণত হইয়াছি, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না, সেইজন্য আমার যুগাতীত কালের অমৃত-সাধন-মঞ্জুষাস্বরূপ পুরাণ-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টি পতিত হয় না, মনে মনে ভাবি, এবং অনেক সময়ে সভা-সমিতিতেও বলি --'সনাতন বেদ থাকিতে আবার পুরাণ কেন? উদার বেদশাস্ত্রে সার্ব্বজনীন সভ্যতার মূল ভিত্তির পত্তন হইয়াছিল, বিশ্বমানবতার বিজয়-সঙ্গীত বেদশঙ্খনাদেই প্রথমতঃ জগতের বদ্ধকপাট দ্বারে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, জাতির জীবনের সে এক অমৃতময় স্বর্ণ যুগ চলিয়া গিয়াছে! পরবর্ত্তী কালে পুরাণশাস্ত্র রচনা দ্বারা উক্ত বেদবর্ণিত সার্ব্বজনীন সভ্যতাকে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে,উদার বিশ্বমানবতাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গণ্ডীদ্বারা সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে, বেদকীর্ত্তিত সুগভীর আধ্যাত্মিক রহস্যকে বিবিধ অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাহিনীদ্বারা আবৃত করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করা হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ

অর্ব্বাচীন (আধুনিক) পুরাণশাস্ত্র শ্রদ্ধেয় নহে ইত্যাদি ইত্যাদি'—ইহাই আমার বর্ত্তমান মনোভাব। আমার এই ভাবের অগ্নিতে ঐতিহাসিকগণ সতত ইন্ধন যোগাইতেছেন, তাঁহারা ভূতভবিষ্যদ্‌বর্ত্তমানকালাতীতনিত্য বেদেরও বয়স নিরূপণে অগ্রসর! তাঁহারা সর্ব্বথা একার্থপ্রতিপাদক বেদকেও শ্লেষার্থব্যঞ্জক-গ্রন্থরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। * অর্থাৎ "বেদ যেমন আর্য্য জাতির আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, তেমনি উহা উক্ত জাতির ইতিহাসও বটে"—ইহাই ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদকে সম্মানিত (অর্থাৎ অবমানিত) করিয়া স্বীয় কল্পনা কজ্জলে পুরাণ শাস্ত্র সম্বন্ধেও বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ

---

* "বেদ শ্লেষার্থব্যঞ্জক গ্রন্থ নহে, অর্থাৎ উহার একটিমাত্র অর্থ; দুই বা ততোহধিক অর্থ বেদের হইবে না," ইহাই বেদার্থতাৎপর্য্যবিৎ পরমর্ষিগণের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত; "বেদের একটি শব্দ বা বর্ণও নিরর্থক হইবে না" ইহাও আর্যঘোষণা। উক্ত মতের সম্যগ ব্যাখ্যা বর্ত্তমান স্থলে অসম্ভব, যাঁহারা ঐ আর্য সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত, তাঁহারা পূজ্যপাদ শবর স্বামী কৃত "মীমাংসাদর্শনভাষ্য," একনিষ্ঠ বেদভক্ত বিপন্ন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা, প্রদীপ্ত প্রতিভার বরপুত্র, বৌদ্ধবিদলনকারী ভট্টপাদ কুমারিল প্রণীত (১) "মীমাংসা বার্ত্তিক" বা "তন্ত্র বার্ত্তিক" (২) "টুপ্‌টীকা" (৩) মহামহোপাধ্যায় পার্থ-সারথি মিশ্র কৃত "শাস্ত্র-দীপিকা," পূজ্যপাদ মহীধরাচার্য্য উবটাচার্য্য এবং সায়ণাচার্য্য কৃত "বেদভাষ্য" দুর্গাচার্য্য কৃত ভাষ্য সমেত মহামুনি যাস্ক প্রণীত বৈদিক অভিধান "নিরুক্তগ্রন্থ" ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কৃত শারীরক সূত্র ভাষ্য, ষড়্‌দর্শন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ভামতী টীকা প্রভৃতি বেদব্যাখ্যান দেখিবেন; শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্তছন্দো জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গবিদ্ উক্ত আচার্য্যগণ, বর্ণিত আর্য্যসিদ্ধান্তকে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। বেদ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এই সব গ্রন্থে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। দেশীয় বিদ্যা সম্পদ দরিদ্র হইয়া পাশ্চাত্য বিদ্যার বলে, বেদ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ অত্যন্ত ধৃষ্টতা। বর্ত্তমানে দুর্ভাগ্য হিন্দু জাতি ভিন্ন, স্বীয় অবদানসম্পদে এরূপ বীতশ্রদ্ধ, আর কোন দিন কোন জাতিকে দেখা যায় নাই। জাতীয়তা মন্ত্রের উপাসক বলিয়া বর্ত্তমানে আমি অভিমানী, সুতরাং আজ একথা আমার ভালরূপেই বুঝা কর্ত্তব্য।

করিয়াছেন। ইহলোক সম্বন্ধ ঐতিহাসিক স্থূলদৃষ্টি প্রভাবে অলৌকিক আর্য সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস আসায়, উক্ত পণ্ডিতগণ পুরাণ শাস্ত্রে "প্রক্ষিপ্ত-বাদ" "অতিরঞ্জন" প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন, যদি অবসর হয়, তবে ক্রমশঃ আমরা সে সব কথার আলোচনা করিব। এখন মূলতঃ কথা এই যে পূর্ব্বোক্ত ভাবে নানাদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া, জাতীয় বিদ্যা পরিশীলনে পরাঙ্‌মুখ অলস আমি পরের মুখে ঝাল খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছি, ও পুরাণ শাস্ত্রে বিশ্বাস হারাইতেছি; সেই সঙ্গে সঙ্গে সহসা পরম বেদভক্তও হইয়া উঠিয়াছি। আমি বর্ত্তমানে মায়ের "কানা" ছেলে হইলেও "পদ্মলোচনের" বেশ একটু স্পর্দ্ধা আমার আছে! কবি দুঃখ করিয়াছেন—

"কোথায় তোমার ব্রহ্মচর্য্য? অসীম স্থৈর্য্য অসীম ধৈর্য্য?
কৈবা উগ্র সে তপস্যা ইন্দ্রে লাগে ভয়?"

ঐ সব কিছুই আমার নাই; বেদধারণোপযোগী আহার বিহার, শিক্ষা দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য তপস্যাদি কিছুই করিব না, অথচ মুখে "বেদ বেদ" করিব, ইহা কি আত্মপ্রবঞ্চনা নহে? সায়ণ শঙ্কর প্রভৃতির সঙ্গে দেখাই করিব না, ম্যাকডোন্যাল ম্যাক্সমুলারের মুখেই বেদ উপনিষদ্ শুনিব, ইহা অপেক্ষা জাতীয় বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? কালে যে আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে, তাহা সর্ব্বভেদ ঋষি-চক্ষুর অবিদিত ছিল না; সেইজন্য পরহিত পরায়ণ পরম কারুণিক পুরাণর্ষি বাল্মীকি করুণার্দ্র কণ্ঠে বলিতেছেন—

"রামায়ণং বেদসমং; শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ॥"

বাল্মীকিরামায়ণ---উত্তরকাণ্ড—১২৪।৫।

ঋষি বলিতেছেন "আমার রামায়ণ; বেদের সমান; পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধকালে ইহা পাঠ করিয়া শুনাইবেন। যে ব্যক্তি ইহার অধ্যায়মাত্রও পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন।" বর্ত্তমানে আমি "পুরাণে" অবিশ্বাসী হইলেও বেদের পরমভক্ত ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং এই "রামায়ণ" পুরাণ যদি "বেদ সমান" হয়, তবে কেন উহা আমি পাঠ করিব না? অতএব "রামায়ণং বেদ সমম্"---এই ঋষিবাক্য বর্ত্তমানে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

(৩)

বেদে আছে "শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে"। * পরমাত্মা ভগবানেরই নামান্তর।

পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে গুরুমুখে বা শাস্ত্রমুখে প্রথমতঃ পরমাত্মার স্বরূপ কি তাহা ভাল করিয়া শুনিতে হইবে, পরে যে ভাবে তাঁহাকে শ্রবণ করিব সেইভাবেই তাঁহাকে যুক্তিপ্রমাণ সাহায্যে মনন অর্থাৎ চিন্তা, শেষ কথা ধ্যান করিতে হইবে, ঐ চিন্তা বা ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থা বিশেষের নামই নিদিধ্যাসন, এই নিদিধ্যাসনের পরই পরমাত্মা সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বেদোক্তসাধনার প্রথম ভূমিকা "শ্রবণ," দ্বিতীয় ভূমিকা "মনন" তৃতীয় ভূমিকা "নিদিধ্যাসন, চতুর্থ ভূমিকায় তাঁহার দর্শন লাভ হয়। তাঁহার নাম রূপ স্বরূপ প্রভৃতি শ্রবণ করিলেই তাঁহার উপর প্রেমোদয় হইবেই, প্রেমোদয় হইলেই সেই হৃদয়দয়িত প্রেমাস্পদের চিন্তা না করিয়া কিছুতেই থাকা যায় না, এই চিন্তাকে বেদশাস্ত্র মনন বা ধ্যান বলিয়াছেন, ঐ চিন্তা বা ধ্যান পরিপক্ক হইলেই নিদিধ্যাসন বা ধ্যান ধারা আসিবেই, ইহাকে কবির ভাষায়--- "শয়নে স্বপনে হৃদয়-রতনে তিলে তিলে প্রাণে জাগে"---বলা যাইতে পারে, যোগশাস্ত্রের ভাষায় ধ্যেয়াকারাকারিত চিত্তবৃত্তি" বলা যাইতে পারে, "আত্মতত্ত্ব বিবেক" (১) ন্যায় কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ভগবদভক্ত দার্শনিক

---

* আত্মা বারে দ্রষ্টব্যোঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ
শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ! ২।৪।৫ মন্ত্র

১। "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ "ভাগবত। ১ স্কন্ধ। ২ অধ্যায়। ১১

"ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি, হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি, সাত্বতৈর্ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে॥"—শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা। তত্ত্বদর্শিগণ যাঁহাকে অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ব বলেন উপনিষদবাদি-ঋষিগণ তাঁহাকেই "ব্রহ্ম", যোগিগণ তাঁহাকেই "পরমাত্মা" এবং ভক্তগণ তাঁহাকেই "ভগবান্" বলেন; একই পরমপদার্থের ঐ তিন নাম। "হৈরণ্যগর্ভ" শব্দে যোগিগণ, যোগশাস্ত্রে আছে "ভগবান্ হিরণ্যগর্ভই (সূক্ষ্মশরীরোপহিত ব্রহ্ম) প্রথমে যোগশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন" "হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ যোগশাস্ত্র প্রবর্ত্তকঃ"।

আচার্য্য উদয়নের ভাষায় এই মনোবৃত্তিকে "ধ্যানাভ্যাসরস" বলা যাইতে পারে। উক্ত দার্শনিক আচার্য্য এই বৈদিক সাধনত্রয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার জন্য নিম্নকথিত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণকে আশ্রয় করিয়াছেন—

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥"
(ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি ধৃত স্মৃতি-বাক্য)

"সাধক উত্তমযোগ (ভগবৎসাক্ষাৎকার) কোন সময়ে লাভ করেন? যে সময়ে তাঁহার প্রজ্ঞা (মনোবৃত্তি) আগম (গুরু বা শাস্ত্রমুখে শ্রবণ), অনুমান (পূর্ব্বোক্ত মনন) এবং ধ্যানাভ্যাসরস (পূর্ব্বোক্তনিদিধ্যাসন), এই তিনটী শ্রুত্যুক্ত সাধনে প্রকৃষ্ট সামর্থ্য লাভ করে"—ইহাই উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যের অর্থ। "অভ্যাস" শব্দের অর্থ "পৌনঃ-পুন্য" যাহাকে সাধারণ-ভাষায় বলে "বারম্বার," ঐরূপ বারবার ধ্যানের ফলে চিত্তের ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মূঢ়ভাব দূরীভূত হইয়া "দেশবন্ধরূপ ধারণা"র উদয়ে "প্রত্যয়ৈকতান"রূপ ধ্যান সুদৃঢ় হয়; ইহকেই উক্ত আচার্য্য "ধ্যানাভ্যাস" বলিয়াছেন, সুদৃঢ়াভ্যস্ত তাদৃশ ধ্যানের ফলে সাধকের মনোবৃত্তি সুনির্ম্মল-জ্যোৎস্নার মত বিশুদ্ধ হইয়া মুরারিচরণামৃত-গাঙ্গবারির মত দ্রবীভূত অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন-নদীজল ধারার মত ভগবদ্রূপ রসাকারে বহিতে থাকে, ইহারই নাম "ধ্যানাভ্যাসরস" বা বেদকথিত পূর্ব্বোক্ত "নিদিধ্যাসন"; আমার ঐরূপ অবস্থা হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয় রসায়ন ভগবান্ আর থাকিতে পারেন না, শিবরূপী রসসিন্ধু জীবরূপী বিন্দুতে মিলিত হয়েন, অখণ্ড চৈতন্য খণ্ডচৈতন্যে মিশিয়া যান, ইহারই নাম 'উত্তমযোগ'—বা "আত্ম-সাক্ষাৎকার" অথবা "ভগবদ্দর্শন," ইহাকেই বেদ বলিয়াছেন—

১। "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ।"

২। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

এই অবস্থাকেই—গীতা গাহিয়াছেন—

৩। "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা"।

৩। আত্মান্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।"

এই অবস্থাকেই কবি ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন—

"ক্রিয়ালোপ, আত্মা সুশীতল,
নিবৃত্তি জাহ্নবীধারা বহে কল কল।
এক, নাহি দুই আর
আদরিণী থেমেছে এবার॥"

বেদবর্ণিত এই অবস্থা সাধনগম্য ; অন্তর্মুখী-বৃত্তি লইয়া নীরবে ভজন না করিলে ইহার গভীর রহস্য ধারণ করা একান্তই অসম্ভব, ইহা লিপিকৌশল দ্বারা প্রকাশের বস্তু নহে, আজ বহির্মুখ আমরা অন্তর্মুখভাবে এই অপূর্ব্ব জাতীয় সম্পদ্ অধিকারের চেষ্টা করিব কি ? যাহা হউক, এখন প্রকৃত কথা এই যে, পূর্ব্ববর্ণিত বেদোক্ত সাধনত্রয় (শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন) এবং তাহার ফল ভগবদ্দর্শন বা তাঁহার সহিত একত্বানুভূতিই জীবের চরম চরিতার্থতা, সর্ব্বভূত-সমদর্শি-ঋষিগণ ইহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। * যিনি সাধনোপযোগী মানবদেহলাভ করিয়াও উক্ত ধর্ম্মলাভ চেষ্টায় বিরত, পক্ষান্তরে সর্ব্বদা ভোগবিলাসে রত তিনি প্রকারান্তরে আত্মহত্যাই করেন। এখন মূলকথা এই যে, ঐ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বীয় আত্মাতে কিরূপে পরমাত্মানুভূতি উদিত হয়, তাহাই ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীরামায়ণচরিতাবলীদ্বারা, জগজ্জীবকে বুঝাইয়াছেন, এই জন্যই "রামায়ণং বেদসমম্"—রামায়ণ বেদের সমান। হিন্দুজাতির ইহা বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামায়ণাদি পুরাণবর্ণিত চরিতাবলী কেবল কাব্যকল্পনাকল্পিত চরিত্রাখ্যান নহে, উহা সনাতন বেদবর্ণিত সাধনার বিশদ ব্যাখ্যা-বিশেষ, উহাই হিন্দুজাতির অক্ষয় রক্ষা-কবচ, আজ আমি ঐ রক্ষাকবচে বঞ্চিত হইয়াছি, এজন্য মহাবীর কর্ণের মত সংসার-কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ শয্যায় শায়িত হইয়া প্রতিপলে মৃত্যুর করাল ছবি দর্শন করিতেছি, আমার পিতা সূর্য্যতুল্য পরমর্ষিগণ স্নেহাস্পদ সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য ঐ রক্ষাকবচ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবাধ্য অশান্ত অবোধ পুত্র আমি কলি-উপহত জীবনে পাপ-ইন্দ্রের ছলনায় হেলায় তাহা বিলাইয়া দিতেছি, সেইজন্য অমৃতের পুত্র হইয়াও আজ মৃতের মত অবস্থান করিতেছি। তাই বলিতেছি, এস ঋষিতপস্তপ্ত পুণ্য ভারতের হিন্দুজাতি ! আমরা তোমার সনাতন বেদ-মহিম-মণ্ডিত পৌরাণিকপূত চরিত-কাহিনী ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি।

শ্রীশরৎকমল ন্যায়তীর্থ।

---

* "অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদেযাগেনাত্মদর্শনম্" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

শ্রীশ্রীশিবরাম শরণং।

শ্রী১০৮ গুরুচরণ সরোরুহেভ্যো নমো নমঃ॥

পূজ্যপাদ ৺ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামিপদকমলের জীবনীবর্ণনে প্রয়াস।*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

ভ্রান্তির নিরসন যথাসম্ভব শীঘ্রই বিধেয়। বিশেষতঃ, এ সম্বন্ধে আলোচনার যোগ্য কাল স্বামীজীর জীবনের শেষভাগে আসিবে। এতদিন ইহার স্থিতি ও প্রচারের অবসর দেওয়া বোধ হয় উচিত হইবে না। ভ্রান্তজ্ঞানের প্রচার দ্বারা জগতে যত ক্ষতি হয়, তত ক্ষতি বোধ হয় আর কোন রূপে হয় না। তাই এ সম্বন্ধে দুই এক কথা এই স্থলেই বলা উচিত বিবেচনা করিলাম।

আমরা বলিয়াছি, স্বামীজীর জীবন সাধারণের পক্ষে কোন কোন স্থলে দুর্ব্বোধ্য হইবার কথা। কথাটার অর্থ আর একটু পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিব। 'সুবোধ্য,' 'দুর্ব্বোধ্য' ইত্যাদি কথার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে 'বোধ' এই শব্দের অর্থের দিকে একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কাঁহার কোন্ বস্তুর 'বোধ' হইয়া থাকে? কে কি বুঝিতে পারেন? যাঁহার যে বিষয়ের পূর্ব্বসংস্কার আছে, যিনি যে বিষয় ইতঃপূর্ব্বে কখন অনুভব করিয়াছেন, যিনি বোধ্য বস্তুর ভাবে আপনাকে ভাবিত করিতে পারেন তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন। অতএব ব্যক্তিমাত্রেরই যে সকল বিষয় সুবোধ্য হইবে, তাহা আশা

---

*এই প্রবন্ধের উৎসবের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, প্রকাশিত অংশে সন্নিবিষ্ট মুখ্য ভ্রমগুলির পাঠকগণ নিম্নলিখিতরূপ সংশোধন করিয়া লইবেন :—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯৩	১১	কাঁহার হইতে পারে,	কাঁহার হইতে পারে?
"	১৬	লক্ষীভূত	লক্ষ্যীভূত
২৯৫	৫	সর্ব্বকল্যাণ বিধান	সর্ব্বকল্যাণ নিধান
২৯৮	৪	নিমিত্ত কারণগুলি	নিমিত্তকারণগুলি
"	১২	আবরগণ	অবরগণ

করা যাইতে পারে না। আমা হইতে যিনি উচ্চতর কোটিতে অবস্থিত, তাঁহার সকল কথা, সকল ব্যবহার আমার পক্ষে সুবোধ্য হওয়া সম্ভব নহে। আমার পক্ষে বস্তুতঃ দুর্ব্বোধ্য বস্তুকে আমি যদি সুবোধ্য মনে করিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে ঝটিতি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলি, তাহা হইলে তাহা সুবিবেকোচিত কর্ম্ম হইবে না। অপেক্ষাকৃত নূতন বা প্রাগনমুভূত বস্তুতত্ত্ব বুঝিতে হইলে তদ্বিষয়ে একটু যত্ন বিধেয়, ভাল করিয়া তত্ত্বের একটু অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। স্বামীজী এক গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালেই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনী, সন্ন্যাসী ও অতিবর্ণাশ্রমী এই পঞ্চ অবস্থার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। একাধারে চতুরাশ্রমের মুখ্যবৃত্তিসকলে স্থিত থাকিলেও তাঁহার জীবনের এক একটী বিশিষ্ট কালে বা পর্ব্বে এক এক আশ্রমের কর্ত্তব্যের আদর্শ বিশেষতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে সর্ব্বোপরি তাঁহার সমগ্র জীবনে সন্ন্যাসী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্যবহারই আধিক্যতঃ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ইহা তাঁহার সহজ ভাব ছিল। তিনি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও সন্ন্যাসী ছিলেন তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্বামীজীর ব্যবহারে সংকল্প বিকল্পের রূপ অল্পই দৃষ্ট হইত, স্বেচ্ছায় কোন কার্য্য করিতে (তত্ত্বচিন্তা, জ্ঞানচর্চ্চা, যোগাবলম্বন প্রভৃতি ব্যতীত—কারণ ইহারা ঈদৃশ পুরুষগণের স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়) তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত না। অতিমাত্র বৈরাগ্যযুক্ত, জনসঙ্গে একেবারেই রুচিহীন, সর্ব্বদা তত্ত্বচিন্তনে ব্যাপৃত পুরুষের অবস্থা সাধারণের যথার্থতঃ বোধগম্য হইবে কিরূপে? তাই স্বামীজীর জীবনের অপেক্ষাকৃত শেষ ভাগের অবস্থা, সকলের পক্ষে সুবোধ্য হয় নাই, তাই স্বামীজীর এই সময়ের ব্যবহারবিষয়ে অনেকে অনেকবিধ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন, তাই সাক্ষাৎ—করিতে আসিয়া সাক্ষাৎকার না পাইয়া ফিরিয়া গিয়া অনেকে অনেক প্রকার কথা ভাবিয়াছেন বা বলিয়াছেন। স্বামীজীর তাৎকালিক অবস্থাটা একটু হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়া যদি তাঁহারা বিষয়টা একটু বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে আর অসন্তোষ বা খেদের কোনই কারণ প্রাপ্ত হইতেন না। তথাপি স্বামীজী অনেক সময়েই (প্রথম ও মধ্যম বয়সের ত কথাই নাই, চরম বয়সেও) হৃদয়ের সহজকারুণ্যবশতঃ নিজ অন্তর্মুখ অবস্থার প্রতিকূলেই কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন, অসুবিধা বোধ করিলেও, পাছে কেহ হৃদয়ে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় এই নিমিত্ত দর্শনার্থ আগত ব্যক্তিগণকে দর্শন দিতেন, এবং (যাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া পড়িত) তাঁহাদের (রোগি-চিকিৎসা প্রভৃতি) কোন-না-কোনরূপ জাগতিক

ইচ্ছাপূর্ত্তিবিষয়ে যত্নবান্ হইতেন। ইহাতে তাঁহার কার্য্যে বিঘ্ন এবং জগতের বিশেষ ক্ষতি হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহাও যে সকল সময়ে সম্ভব হইতে পারেনা, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সাধারণজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষও বুঝিতে পারিবেন। স্বামীজী জীবনে যত সংখ্যক ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বামীজীকে স্মরণ করিতে যাইলেই দেখিবেন যে,তাঁহাদের হৃদয়ে স্বামীজীর চরণের পবিত্র স্মৃতি সাধারণতঃ কোন না কোন (সাধারণ দৃষ্টিতে) অসাধ্য বা দুঃসাধ্য রোগের আরোগ্যের সহিত বিজড়িত, কোন না কোন দুস্তার বিপদের সন্তারণের সহিত সম্বন্ধ, কোন না কোন হৃদয়ভেদী শোক-শল্যের অপনয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট। কখন কখন কেহ কেহ তাঁহার সকাশ হইতে একটু তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, স্বামীজীর তিরস্কার কত করুণা ও প্রেমমূলক ; কারণ আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি যে, তিরস্কৃত ব্যক্তির অসাক্ষাতে (হয়ত তিনি চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই) স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে বহু প্রশংসাসূচক বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহাকে ভাল বাসা যায় তাহার প্রকৃতিতে যদি দুই একটা দোষ লক্ষিত হয়, তাহাকে তাহা দেখাইয়া দিয়া তাহাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া শুভানুধ্যায়ীর পক্ষে প্রাকৃতিক, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সকলেই সম্মানদান করিবে, মিষ্টবচনে তুষ্ট করিবে, কিন্তু তাঁহার দোষ সহজে কেহ দেখাইয়া দিবেনা বা দিতে সাহস করিবেনা, তাই ঈদৃশ ব্যক্তিগণের কল্যাণার্থ স্বামীজী কখন কখন তাঁহাদিগকে একটু তিরস্কার করিতেন। কোন সময়ে এলাহাবাদ হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম, এ, মহাশয় স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ৺কাশীধামে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে বেদ-শাস্ত্র সম্বন্ধে সংশয়নিরসনার্থ এবং যোগাদি সাধন সম্বন্ধে উপদেশ লাভার্থ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। শাস্ত্রপ্রসঙ্গ হইতে হইতে কোন কারণবশতঃ স্বামীজী তাঁহার প্রতি সামান্য একটু তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। পরক্ষণেই তাঁহাকে এইরূপ বলেন—আপনাকে এরূপ কথা বলা বোধ হয় আমার অন্যায্য হইয়াছে। তাহাতে সেই যথার্থবিদ্যালঙ্কৃত, মহানুভব, মুমুক্ষু পুরুষটী ঈষৎ হাসিয়া এই মর্ম্মে উত্তর করিয়াছিলেন—আদিত্যরামকে এরূপ কথা বলিবার লোক আর যে এখন কেহ নাই, আপনি যদি না বলেন, তবে আর কে বলিবে ? এ উপকার আর কে করিবে ? পরমপদলিপ্সুর পক্ষে,

প্রকৃত সুখেপ্সুর পক্ষে অভিমান যে মহাশত্রু ইহা সকলের হৃদয়গত করিয়া দিবার নিমিত্ত স্বামীজী সদাই চেষ্টিত থাকিতেন, বিদ্যার উচ্চ পর্ব্বেস্থিত হইলেও, যোগসম্পদের অনেকতঃ লাভ হইয়া থাকিলেও, অভিমান যে মুমুক্ষুকে তাঁহার প্রকৃত লক্ষ্য হইতে দূরে রক্ষা করে তাহা সর্ব্বদাই বুঝাইয়া দিতে প্রয়াসী হইতেন।

ধনী হউন, দরিদ্র হউন, পণ্ডিত হউন, মূর্খ হউন, যে কেহ একবার স্বামীজীর চরণ সন্নিধানে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অলৌকিক কারুণ্য ও প্রেম উপলব্ধি করিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং তত:পর চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইয়া থাকিয়াছেন। কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বামীজীর সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে প্রায়ই(৺কাশীধামে) তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহার করুণার আতিশয্য দেখিয়া তিনিও বিস্মিত হইয়াছিলেন, অপিচ ইহা যে অনেক সময়ে তাঁহার বিঘ্ন ও ক্লেশের কারণ হয় তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। স্বামীজীর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি একদিন তাঁহার উদ্দেশে একটি স্তব রচনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে পাঠ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ংই স্তবটীর ব্যাখ্যাও করিয়া দিয়াছিলেন। সহজ কবিত্ব শক্তিবিশিষ্ট পণ্ডিতপ্রবরের স্তুতিতে তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার, এবং ভাষার লালিত্য, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও শব্দের গূঢ়ার্থপ্রয়োগ ইত্যাদির বিশিষ্টতার কথা সকলই এই সুদীর্ঘ কালের পর ক্ষীণভাবে হইলেও, আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, তবে তাঁহার একটী শব্দের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার কথা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিশেষতঃ মনে পড়িতেছে। এক স্থলে তিনি স্বামীজীকে 'দয়াময়' এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন—তুমি সকলের সকল প্রকার রোগ বিদূরিত করিয়া থাক, কিন্তু তুমি স্বয়ং রোগী, কারণ তুমি 'দয়াময়', 'দয়াই' তোমার 'আময়' বা রোগ; আমি দেখিতেছি, এই দয়ারোগগ্রস্ত হইয়া তুমি অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছ এবং করিতেছ।

স্বামীজীর এইরূপ সহজকারুণ্য ও কোমলচিত্ততাবশতঃ পাছে তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নাদিরূপ জগদুপকারক মহৎ কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয় এই নিমিত্ত তাঁহার পার্শ্বস্থগণ অনেকতঃ আশঙ্কাযুক্ত থাকিতেন এবং যাহাতে তাঁহার বিক্ষেপকর জনসঙ্গ অধিক না হয় তজ্জন্য সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতেন, কারণ, স্বামীজীর হৃদয় স্বভাবতঃ এতই প্রেম-প্রবণ ছিল যে, কাহার কোনরূপ ক্লেশ বা অভাবের বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না, তৎক্ষণাৎ

তাহার প্রতীকার বিষয়ে যত্নবান্ হইতেন। প্রাগুক্ত কারণে স্বামীজীর পার্শ্বচরগণ অনেকের সমীপে অল্পাধিক অপরাধী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; তবে, আশা করা যায়, প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া তাঁহারা এখন তাঁহাদিগের সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

স্বামীজীর জীবনের একটী বিশিষ্টতা এই যে, জীবনে তিনি কখনও, নিতান্ত অসম্ভব না হইলে, কাহারও মনে কোনরূপ আঘাত দেন নাই, একেবারে অসম্ভব না হইলে কাহারও প্রার্থণা অপূর্ণ রাখেন নাই, অহিংসা ধর্ম্মপালনের সার্ব্বভৌমরূপ ("সর্বথা সর্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ" *) তাঁহার জীবনেই দেখিয়াছি, জ্ঞানতঃ কোন প্রাণীকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহরূপ ব্রাহ্মণের উত্তম বৃত্তির দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, (অদ্রোহেণৈব ভূতানাং" †), যতিধর্ম্মপালনের প্রকৃষ্টরূপ ("সত্যবাক্ শুচিরদ্রোহী" §) তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারেই লক্ষ্য করিয়াছি। যে বিষয়ে তাঁহার পূর্ণ অধিকার, যদি কোনরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, যে অধিকারের ব্যবহার করিতে যাইলে অন্য কোন ব্যক্তি, শরীরের কথা ত দূরে থাকুক, মনেও বিন্দুমাত্র বাধা অনুভব করিবে, তাহা হইলে সে অধিকার তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। কোন অর্থার্থী আসিয়া অর্থ প্রার্থনা করিলে তৎপরিমাণ অর্থ যদি তাঁহার নিকটে থাকিত (তাহা দুই হউক, দশ হউক, শত হউক বা সহস্র মুদ্রা হউক), তাহা হইলে সেই সমস্ত অর্থই তাঁহাকে দান করিয়া দিতেন। গ্রন্থমধ্যে এ বিষয়ের বহু দৃষ্টান্ত পাঠকগণের জ্ঞানগোচর হইবে। এ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল, এ আদর্শ জগতে দুষ্প্রাপ্য। এ বিষয়ে পুত্র, মিত্র, শত্রু, উদাসীন সকলের প্রতি তাঁহার সমান ব্যবহার লক্ষিত হইয়াছে। যতির প্রশস্ততর আদর্শ আর কোথায় দেখিতে পাইব? সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি, বিশ্বজগৎকে আত্মবোধে দেখা—এ উপদেশ বেদ-শাস্ত্রে, এবং ইহার ছায়া বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ব্যবহার দ্বারা এই চরম বিদ্যাকে উপযুক্ত করার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক বলা আবশ্যক বোধ

---

* যোগসূত্রভাষ্য।

† মনুসংহিতা।

‡ নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ।

করি না, কালান্তরে নিবেদন করিব। এখন স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রদান করাই বিশেষতঃ প্রয়োজন মনে করিতেছি। এই বিষয়ে যথার্থ সংবাদ না পাইয়া বা শ্রুত সংবাদও ভাল করিয়া বিবেচনা বা পরীক্ষা না করিয়া অনেকেই স্ব স্ব প্রতিভানুরূপ এক এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন, এবং ক্রমে তাহা অন্য পুরুষেরও হইয়াছে। কেহ কেহ এজন্য শাস্ত্রবাক্যে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ বা সরল হৃদয়ে ইত্যাকার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন—'এতাদৃশ মহাত্মার শেষে রোগে মৃত্যু হইল, ইঁহার সম্বন্ধে ভৃগুসংহিতার 'যোগমার্গে মৃতির্নং' ইত্যাদি বাক্য মিথ্যা হইল!' ৺কাশীধামস্থ অনেকে এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—'ঈদৃশ মহাপুরুষের ঈদৃশ আজীবন অক্ষুণ্ণধর্ম্মবৃত্তি পুরুষের, ঈদৃশ জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের যদি এইরূপ অন্ত্য পরিণাম হয়, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে, আমরা কোন্ আশাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কালাতিপাত করিব, অন্তিম দিনের অপেক্ষা করিব? বঙ্গদেশে সাধারণ ভাবে কেহবা এইরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন,—ইঁহার বাহিরেই নামটা খুব শুনা যাইত, বাহিরে যেরূপ শুনা যাইত প্রকৃত উন্নতি সেরূপ হয় নাই, তাহা হইলে ফল অন্যরূপ দেখা যাইত।' এইরূপ অনেকবিধ কথা কর্ণগোচর হইয়াছে; ফলে, বুঝিয়াছি, অনেকটা ভ্রান্ত জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে। নিজ জীবনের সকল ব্যাপার সাধারণতঃ গুপ্ত রাখাই যাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, পার্শ্বস্থগণের প্রতি যাঁহার ইহাই আদেশ ছিল, আগন্তুকগণের প্রতি যাঁহার ইহাই অনুরোধ ছিল (তাঁহার কেন এরূপ ইচ্ছা ছিল তাহা পাঠকগণকে পরে নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব), তাঁহার দেহ-ত্যাগের ব্যাপার (যাহা অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশিত ভাবেই ঘটিয়াছিল) সম্বন্ধে ও যে ঈদৃশ অনেকগুলি অতথ্যভূমিক উক্তির প্রচার হইয়া পড়িবে, তাহা একেবারে অপ্রাকৃতিক নহে। এ জন্য কাহাকেও দোষ দিতেছি না। প্রাগুক্ত নানা কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে। এই সকল উক্তির পূর্ণভাবে উত্তর প্রদান করার ইহা উপযুক্ত স্থল নহে, পরে গ্রন্থমধ্যে এতদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয়কে এতদ্বিষয়ক সত্যে উপনীত হইবার নিমিত্ত কিছু সাহায্য করা আবশ্যক মনে করিয়াছি।

স্বামীজীর যোগেই দেহত্যাগ হইয়াছিল, রোগে নহে। কাঁহারও রোগে দেহত্যাগ হইল, কি যোগে দেহত্যাগ হইল, তাহা বুঝিতে হইলে, 'রোগ' 'যোগ' এবং 'দেহত্যাগ' এই তিনটি বিষয়ের তত্ত্ব জানা থাকা আবশ্যক, নচেৎ, দেহ-

ত্যাগকারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেও তিনি বুঝিতে পারিবেন না যে যোগে দেহত্যাগ হইল কি রোগে দেহত্যাগ হইল। 'রোগ' নামক পদার্থের সহিত সাধারণের অল্লাধিক পরিচয় আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু 'যোগ' কোন্ পদার্থ, দেহত্যাগের স্বরূপ কি, এবং যোগে দেহত্যাগ কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় সকলেই বিদিত নহেন। বিষয়টী বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে, এস্থলে তাহা সম্ভব নহে, যথাস্থানে যথাশক্তি নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব, এখন সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

দেহত্যাগের কিছু কাল (প্রায় এক বৎসর তিন মাস পূর্ব্বে স্বামীজী এক দিবস তাঁহার অনুজকে) পূজ্যপাদ শ্রীরামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে এই মর্ম্মে বলিলেন,—আমি আর কিছু কাল মাত্র গৃহস্থাশ্রমে আছি, তৎপরেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, অতএব আমাকে এই কালের উপযোগী এই কয়টী যজ্ঞসূত্র গ্রন্থি দিয়া দাও, ইহার অধিক আর আবশ্যক হইবেনা। তাঁহার অনুজ তাহাই করিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তৎসংখ্যাধিক যজ্ঞসূত্রের তাঁহার আর আবশ্যক হয় নাই, তিনি নির্দ্দিষ্টকালের অন্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামীজীর অনুজ মহাশয় প্রার্থিতসংখ্যা অপেক্ষায় দুইটী যজ্ঞসূত্র অধিক গ্রন্থি দিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর দেখা যায়, দুইটী যজ্ঞসূত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ব্যবহৃত হয় নাই।

সন্ন্যাস সন্ন্যাসী গুরুর সকাশ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। যথাকালে যোগ্য গুরু অপ্রাপ্য হইলে স্বয়ংও গ্রহণ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে এরূপ বিধিও আছে। কাল সমুপস্থিত হইলে কাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন স্বামীজী এই কথা ভাবিতে লাগিলেন। ইতঃ-পূর্ব্বেও এ কথা অনেকবার ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু যোগ্য গুরুর অভাব সর্ব্বদাই লক্ষ্যভূত হইত। কাঁহাকেও গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে যথার্থ ভক্তি করিতে না পারিয়া পাছে পাপে লিপ্ত হইতে হয়, যখনই সন্ন্যাস গ্রহণের কথা তাঁহার মনে উদিত হইত, তখনই দুই একটী অন্য আশঙ্কার সহিত এই আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিত।

স্বামীজীর দেহত্যাগের প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একবার বৈধ সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবৃত্তি হয়। সেই অবসরে মুক্তিপ্রদ সন্ন্যাসরূপ শ্রেষ্ঠ আশ্রমের প্রতি লোকের কিরূপ প্রীতি হওয়া উচিত, শাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাসাশ্রমোচিত বিধি-নিষেধ বিষয়ে কিরূপ নিষ্ঠা বিধেয়, আশ্রমোচিত কর্ম্মচ্যুতিবিষয়ে কিরূপ ভীতি থাকা কর্ত্তব্য, বৈধভাবে মোক্ষাশ্রম প্রবেশের পূর্ব্বে কি কি বিষয়ে বিবেচনা ও কি

কি বিপদের আশঙ্কা করণীয়, বর্ত্তমানকালের সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্রশাসনানুবর্ত্তনেচ্ছুর পক্ষে সাধারণতঃ কিরূপ ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য ৺কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে* যে দুইখানি পত্র* লিখিয়াছিলেন, তাহার কতিপয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে পারিব্রাজ্যরূপ তুরীয় আশ্রমের প্রতি স্বামীজীর বাল্যকাল হইতেই কিরূপ আকর্ষণ ছিল, শাস্ত্রবাক্যে কিরূপ নিষ্ঠা ও শাস্ত্রমর্য্যাদালঙ্ঘনে কিরূপ বলবতী অপ্রবৃত্তি ছিল, পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

'* * *। শ্রুতিতে আছে, "যে ব্যক্তি পারিব্রাজ্য (সন্ন্যাস) গ্রহণপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অবস্থান করিতে পারেন, বৈষ্ণবী নিষ্ঠাকে অদূষিত করিয়া জীবন যাপন করিতে পারগ হয়েন, তিনি বশী হয়েন, তিনি পুণ্যশ্লোক হয়েন, তিনি লোকজ্ঞ হয়েন, তিনি বেদান্তজ্ঞ হয়েন, ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, তিনি স্বরাট্ হয়েন, তিনি পরব্রহ্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, তিনি পিতৃগণকে, সম্বন্ধিবর্গকে, বন্ধুসমূহকে, মিত্রমাত্রকে হস্তর

---

*ইনি তখন কুমিল্লায় কর্ম্ম ('সবজজ') করিতেন। ইনি তখনও স্বামীজী দ্বারা দীক্ষিত হন নাই; ইং ১৯০৭ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে আগমন করিবার কিছুকাল পরে স্বামীজী ইঁহাকে দীক্ষিত করেন।

*প্রথম পত্র খানি ইংরাজী ১৯০৬ সালের ৯ই বা ১০ই অক্টোবর তারিখে লিখিত, দ্বিতীয় খানি তাহার কিছু দিন পরেই। স্বামীজী তখন ৺কাশীধামে (সোণারপুরা পল্লীতে) বাস করিতেছিলেন।

৺কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়ে জীবনের শেষভাগে সন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা বীজভাবে বর্ত্তমান ছিল। পরে তিনি এই বিষয়ে স্বামীজীর নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকটী বিষয় তাঁহার বৈধসন্ন্যাস গ্রহণপক্ষে অন্তরায় হইবে বিবেচনা করিয়া স্বামীজী তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি দেন নাই, তবে অবসর উপস্থিত হইলেই সন্ন্যাসের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, অন্তরে সন্ন্যাসী হইবার উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ইঁহার জীবনের অন্ত্যভাগে, স্বামীজীর অমোঘ উপদেশ-শক্তিতে হৃদয়ের প্রকৃত বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-পরিণাম সংঘটিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামীজী ইঁহাকে কালোচিত উপদেশ দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কালীন মুখ্য ক্রিয়া সকল শিষ্যের নিমিত্ত স্বয়ংই মানসভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই ক্রিয়া সমাপ্ত হইবামাত্রই ইঁহার দেহত্যাগ হয়। গুরুকৃপায় ইনি দুর্ল্লভ গতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রব্রজ্যার ফলই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সদ্গুরু কৃপায় ইনি যোগযুক্ত পরিব্রাটের যে গতি সেই পরমা গতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহার ভৃগুসংহিতা প্রয়াণকুণ্ডলীতে এবং অন্যান্য কুণ্ডলীতেও

ভবার্ণব হইতে উত্তারণ করিতে সমর্থ হয়েন। বাল্যকাল হ'তেই আমার সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা, ক্রমশঃ সেই ইচ্ছা বলবতী হইতেছে। কিন্তু অবস্থার প্রতিকূলতা এবং নিজ যোগ্যতার অভাববশতঃ ইচ্ছা ফলবতী হইতেছে না।"

ইঁহার মরণোত্তর গতিসম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—" সূর্য্যং ভিত্বা গতঃ কবে।" শাস্ত্র বলিয়াছেন—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥" সদ্গুরুকৃপার কি মহীয়সী শক্তি! শ্রুতি যথার্থই বলিয়াছেন, সদ্গুরুকটাক্ষলেশ লাভ করিতে পারিলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তাহার সকল সিদ্ধিই সিদ্ধ হয় ("তস্মাৎ সদ্গুরু কটাক্ষ-লেশবিশেষেণ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি। সর্ব্ববন্ধাঃ প্রবিনশ্যন্তি। * * * তস্মাৎ সদ্গুরুকটাক্ষলেশবিশেষেণ অচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি * * * ততো হৃদয়স্থিতাঃ কামাঃ সর্ব্বে প্রবিনশ্যন্তি। তস্মাৎ হৃদয় পুণ্ডরীককর্ণিকায়াং পরমাত্মাবির্ভাবো ভবতি।" ত্রিংমং উপনিষৎ)। শ্রুতি বলিয়াছেন,—বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ কাহারও সম্বন্ধে যে-যে লোকের ভাবনা করেন (অর্থাৎ, ইহার এই এই লোকপ্রাপ্তি হউক এবম্প্রকার ইচ্ছা করেন), তাহার যে যে কল্পনার পূর্ত্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করেন, তাহার সেই সেই লোকে গমন হইয়া থাকে, তাহার সেই সেই কামনার পূর্ত্তি হইয়া থাকে।

"যং যং লোকং মনসা সংবিভর্ত্তি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তি তাংশ্চ কামান্ তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ"॥

ইং ১৯০৬ সালের যে মাসে লিখিত একখানি পত্রে ৺কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিম্নলিখিত রূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন আমার বিশ্বাস, প্রাণসম প্রিয় গোপী যে লোকে গিয়াছে, যে লোকে পুণ্যবান্, ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ ব্যতীত অন্যে যাইতে পারে না, যে লোকে দুষ্কৃতের প্রবেশাধিকার নাই, আহা, যে লোকে আধিকর্তৃক ব্যথিত হইতে হয় না, দুঃসহ শোকানলে দগ্ধ হইতে হয় না, ব্যাধির তীব্র যাতনা সহিতে হয় না ("যত্র যন্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃতঃ"। "যত্র সুহার্দ্দঃ সুকৃতো মদন্তে বিহায় রোগং তন্বাং স্বায়াম্) * * * * * সেই সর্ব্বজনকমনীয় পবিত্র লোকে গমন করিবেন। সেইখানে সকল অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইবেন।" "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াংক্রিয়া ফলাশ্রয়ত্বম্" এই পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন—"ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গং প্রাপ্নোতি অমোঘাঽস্য

[স্বামীজীর জীবন অনেকতঃ শাস্ত্রোক্ত বিদ্বৎ সন্ন্যাসীর তুল্য ছিল। শিখা, সূত্র ত্যাগ না করিলেও ইনি চিরজীবন সন্ন্যাসীই ছিলেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন, শিখা, সূত্র ত্যাগ না করিলে যে সন্ন্যাস হয় না, তাহা নহে। তথাপি স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, মরণের কিছুদিন পূর্ব্বে দণ্ড গ্রহণ করিবেন। এই পত্র লিখিবার কিছু দিন পূর্ব্বে স্বামীজী একদিন তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত একজন দণ্ডীর সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন। "আপনি 'সন্ন্যাসীর বাবা'; তবে আর কিছুদিন যাউক না।"]

"* * আমি দেখিতেছি, সংসারের তাড়না হইতে আত্মরক্ষার্থ বাহ্যলিঙ্গধারণ মন্দ নহে। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি ঠিক সন্ন্যাসী হইব, ভণ্ড হইব না,

---

বাগ্ভবতি" অর্থাৎ, 'সত্য' নামক যোগাঙ্গের প্রতিষ্ঠা যাঁহার হইয়াছে, তাদৃশ যোগী 'তুমি ধার্ম্মিক হও' কোন পুরুষকে এই কথা বলিলে সে (অধার্ম্মিক হইলেও) ধার্ম্মিক হইয়া থাকে, 'তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হও' কোন পুরুষকে এইরূপ বলিলে সে (স্বর্গপ্রাপ্ত্যুচিত ক্রিয়াহীন হইলেও) স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাঁহার বাক্য সর্ব্বথা অমোঘ হইয়া থাকে। স্বামীজী যাঁহাকে যাহা বলিয়াছেন, যাহাকে যাহা আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার তাহা হইতে দেখিয়াছি, সেই আশীর্ব্বাদ তাঁহাতে ফলিতে দেখিয়াছি, তাঁহার বাক্য, তাঁহার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বত্র ফলিয়াছে বা ফলিবেই; তবে একের অপেক্ষায় অন্য ব্যক্তিতে ফলিতে যদি বিলম্ব হয়, বুঝিতে হইবে, প্রারব্ধের কিছু প্রতিকূলতা আছে; ক্ষেত্র সরল হইলে আশীর্ব্বাদ আরও শীঘ্র ফলিয়া থাকে।

এস্থলে এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য—পাঠকগণকে স্বামীজীর স্বরূপের, তাঁহার প্রেম ও যোগশক্তি, তাঁহার 'সত্য' নামক যোগাঙ্গের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সম্বাদ প্রদান করা, শাস্ত্র যে সত্য, সাধনহীনেরও যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব, সদ্গুরুর কটাক্ষলেশ দ্বারা পরমা গতির লাভ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাপন করা। পাঠকগণ ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ যোগশক্তিসম্পন্ন পুরুষের দেহত্যাগানন্তর শাস্ত্রীয় গতি সম্বন্ধে যে জনগণের ভ্রান্ত ধারণার ও তন্মূলক আক্ষেপ ও শাস্ত্র সন্দেহের উৎপত্তি হইয়াছে, স্বামীজীর স্বরূপের অনভিজ্ঞতা এবং তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে স্থূলদর্শী প্রাকৃতজনবাহিত অসম্পূর্ণ ও অতথ্যভূমিক সংবাদের বিনা বিচারে গ্রহণই তাহার কারণ।

শাস্ত্রকে যথাশক্তি পালন করিব। এখন হ'তে সন্ন্যাসের পূর্ব্বে অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সমূহ শেষ করিতে চাই। তাহা করিতে হইলে, একান্ত দেশে, বিশেষ নিয়মের সহিত থাকা প্রয়োজন হইবে।"

স্বামীজী যাদৃশ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে ভাবে (অর্থাৎ, অনুপক্রুত হইয়া যোগাভ্যাস, তত্ত্বচিন্তা ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা) জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিতেন, গৃহস্থাশ্রমে নানা কারণ বশতঃ তিনি সেভাবে থাকিতে পারিতেন না, প্রায় নিত্যই বিঘ্ন ঘটিত। তাই তাঁহার বাহ্যলিঙ্গধারণের আবশ্যকতা না থাকিলেও তিনি বাহ্যলিঙ্গধারণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অতিমাত্র ধীর হইলেও, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সানন্দভাবে সহ্য করিবার সামর্থ্য থাকিলেও, কতকগুলি বিশিষ্ট প্রকার—যেগুলি ধর্ম্মলোপ সংসৃষ্ট, বৈদিকছন্দোতিক্রমকারী বিঘ্ন ও দুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তাদৃশ বিঘ্ন ও দুঃখ আপতিত হইলে তিনি বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতেন, ইহারা তাঁহার সহজ সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটাইত, তাঁহার মুখ্য কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। তখনই তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেন। জগৎ হইতে যাঁহার কোন বস্তু গ্রহণীয় নাই, ভোগাকাঙ্ক্ষা যাঁহার নিবৃত্ত হইয়াছে, তত্ত্বচিন্তা এবং জ্ঞানার্থী প্রভৃতিকে জ্ঞানদানাদিরূপ কর্ম্মই যাঁহার মুখ্য কর্ম্ম, সে কর্ম্ম করিতে সংসার যদি বাধা দেয়, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগের ইচ্ছা হওয়া সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। শাস্ত্রেও এইরূপ উপদেশ আছে। স্বামীজী যাবজ্জীবন কিরূপ বিঘ্ন ও দুঃখ সহ্য করিয়া আসিয়াছিলেন তাহার কতকটা পরিচয় এই পত্রের এক অংশে লিখিত উক্তিগুলি হইতে পাঠক প্রাপ্ত হইবেন। এই অংশের ভাব ও তদ্ব্যঞ্জক ভাষা কি মধুর, গভীর ও হৃদয়স্পর্শী! ভক্তির অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত তত্ত্বজ্ঞানের কি অপরূপ মিলন! কি সুন্দর কবিত্ব! তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক উক্তিসমূহে এরূপ চিত্তবিনোদক কবিত্ব সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। মধুর, প্রাণপ্রদ বিশ্বাসের কি দৃঢ়তা! এরূপ বৈরাগ্যবান্ জ্ঞানী একান্তী ভক্তের ছবি মানবনেত্রে অল্পই পতিত হইয়া থাকে। আহা! এহেন ভক্তকে কি প্রয়াণকালে ভগবান্ অঙ্কে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন!*

---

* ভৃগুসংহিতা সত্যেরই জ্ঞাপক, তাই বলিয়াছেন :—

"মৃত্যুকালে মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্রঃ সমাগতঃ।
বিমানে পার্ষদৈঃ সাকং জগ্রাহ চাঙ্ককে কবে॥
রামচন্দ্রেন সাকং রামলোকে গতঃ কবে।"

—ভৃগুসংহিতোক্ত স্বামীজীর প্রয়াণকুণ্ডলী—

পত্রখানির উদ্দিষ্ট অংশ এইরূপ :—

"* * * পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি বশতঃ আমার বর্ত্তমান জীবন অতিমাত্র বাধাবিশিষ্ট, আমি জ্ঞানোদয় হইতেই বাধনালক্ষণ দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেছি, কোন দিন বিনা দুঃখে কাটাইয়াছি ব'লে মনে হয় না, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ আমাকে যেমন ইহাদের যোগ্য লীলাভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, আর কাহাকেও সেইরূপ যোগ্য লীলাভূমিরূপে গ্রহণ করেন নাই। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর আবার দুঃখ, শুনিয়াছিলাম, সংসারে দুঃখ ও সুখচক্র এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, এ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচারিস্থল আছে, আমিই যেন এই নিয়মের ব্যভিচারপ্রতিপাদক দৃষ্টান্তভূমি। কেহ কি পরের দুঃখের কথা শুনিতে ভালবাসেন? নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের জীবন কি কাহারও প্রিয় হইতে পারে? বিনা পাপে কেহ কখন দুঃখ ভোগ করেন না, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখানলে দহ্যমান আমি যে মহাপাপী, আমি যে সর্ব্বজনের ঘৃণার্হ, তাহা নিঃসন্দেহ। পাপীকে সকলেই ঘৃণা করেন, এবং তাহা করাই সাধারণ সাংসারিক নিয়ম। কিন্তু আপনি বা আপনারা অসাধারণ পুরুষ, আপনারা আমাকেও দয়া করেন, এই নরাধমও আপনাদের নিকটে সাধূচিত আদর পায় * * *।"

"'দুঃখ'! তুমি আমার পরমবন্ধু, তোমার মত বন্ধু আমি আর কোথাও পাবোনা। আমি মহাপাপী বলেও, জাগতিক দৃষ্টিতে দুর্ভাগা হলেও, অন্য পক্ষে—অন্য দৃষ্টিতে মহাপুণ্যবান, পরম সৌভাগ্যবান্। বাল্যাবস্থা হ'তে অসহ্য দুঃখের তাড়না সহ্য করিলেও, সর্ব্বজনের ঘৃণিত অবস্থায় অবস্থাপিত হ'লেও, আমি যে সর্ব্বক্লেশহারি হরিচরণ ভিন্ন আর কিছু (জ্ঞানপূর্ব্বক) চাহি নাই, আমি যে সংসারের সকল অবস্থাকেই সমান, অনিত্যতাদোষযুক্ত বলিয়া সকল অবস্থাকেই হেয়রূপে জানিয়াছি, আমি যে দয়াময়কে সকল অবস্থাতেই 'দয়াময়!' বলে ডাকিতে পারি, তাই আমি মহাপুণ্যবান্, তাই আমি পরমসৌভাগ্যবান্। * * *। দুঃখ পাপরূপ মলের নিবর্ত্তক—শোধক, দুঃখ সুতরাং চিত্তপ্রসাদহেতু, অতএব দুঃখ কল্যাণজনক, দুঃখ সুখপর্য্যবসায়ী, দুঃখ পরমবন্ধু। দুঃখ পাইলেই খেদ হয়, খেদ হইলেই ভয়ের উৎপত্তি, হয়, ভয় পুণ্যকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, অভয়পদের অনুসন্ধানে নিয়োজিত করে, অতএব 'দুঃখ' পরমবন্ধু। আমি এই দেহে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করিলাম, তাইত আমার কিসে আর শরীর ধারণ করিতে না হয়, তাহা জানিবার জন্য

অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে, তাইত আমি নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশা করিতেও পারগ হইয়াছি, তাইত আমি ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পথ দেখিতে পাইয়াছি। প্রাক্তন নিতান্ত বিরোধী হইলেও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি দেহান্তে আমার প্রাণের প্রাণকে পাইব।"

ইহার কয়েক দিবস পরে যে পত্রখানি লেখেন তাহার একাংশে সন্ন্যাস সম্বন্ধে এবং তাঁহার তাৎকালিক মনোভাব সম্বন্ধে আমরা এইরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হই।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিতে-সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পিতা বা মাতা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেও পুত্রকন্যা যেমন পিতা বা মাতাকে বিনা ঔষধে ফেলিয়া রাখেন না সেইরূপ সমাজের ব্যাধি অত্যন্ত কঠিন হইলেও পুত্র কন্যার উচিত যথাসাধ্য ঔষধ প্রদান করা। স্বয়ং ভগবান্ যেমন ধর্ম্মের গ্লানি বা অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এবং পাপীর বিনাশ ও প্রকৃত ধর্ম্মস্থাপন এই দুই কার্য্য সমকালে আচরণ করিয়া সাধুর রক্ষা করেন সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আছেন তাঁহাদের কার্য্য হইতেছে অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান সমকালে ঈশ্বর অনুসরণে আচরণ। ইহা না করিয়া যাঁহারা কেবল মাত্র ধ্বংস ব্যাপারে সহায়তা করেন, ধর্ম্ম সংস্থাপনের সহায়তা করেন না তাঁহারা ঈশ্বরের অনুসরণ না করিয়া এই যুগের অধিপতি কলিরই অনুসরণ করেন। শাস্ত্রে কলিকে পাপ পুরুষ বলা হইয়াছে। সকল নরনারীর মধ্যে এই খণ্ড পাপ পুরুষও আছেন আবার সমষ্টি পাপ পুরুষও আছেন; যেমন অখণ্ড,আত্মাও আছেন আবার প্রতিজীবেও খণ্ড মূর্ত্তিতে তিনিই আছেন সেইরূপ। এই পাপ পুরুষের মূর্ত্তি কি ভয়ঙ্কর!

ব্রহ্মহত্যা শিরোযুক্তং স্বর্ণস্তেয় ভুজদ্বয়ম্।
মদিরাপান হৃদয়ং গুরুতল্প কটিদ্বয়ম্॥
তৎসংসর্গি পদদ্বন্দ্বমঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাতকম্।
উপপাতক রোমাণং রক্ত শ্মশ্রু বিলোচনম্।
খড়্গাচর্ম্ম ধরং ক্রুদ্ধমধোবক্তুং সুদুঃসহম্॥

ব্রহ্ম হত্যা (ব্রাহ্মণ বিদ্বেষও) যাঁহার মস্তক, স্বর্ণ চুরী যাঁহার হস্তদ্বয়, হৃদয় যাঁহার মদ্যপানাসক্তি, (অন্য ভোগাসক্তিও) কটিদ্বয় গুরু-শয্যা, গুরুদার-গামীর সংসর্গকারী পুরুষ সকল যাঁহার পদদ্বয়, নানা প্রকার পাপ যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উপপাতক সমূহ যাঁহার রোমরাজি, যাঁহার শ্মশ্রু রক্তবর্ণ, নয়নদ্বয় ও রক্তবর্ণ, যাঁহার হস্তে খড়্গা ও ঢাল, যিনি সদা ক্রুদ্ধ, সদা অধোমুখ এবং যিনি অতি দুঃসহ তিনিই এই পাপপুরুষ কলি। কলি যে ভাবে গমনা-গমন করেন তাহা এত বীভৎস যে তাহা বলাই যায় না। যাঁহারা ধ্বংস লীলার অনুসরণ করেন তাঁহারা কলির পশ্চাৎ গমন করেন। আর যাঁহারা গঠন লীলার অনুসরণ করেন তাঁহারা ভগবানের আচরণেরই পশ্চাৎ গমন কবেন।

এই ঘোর কলিযুগে অধিকাংশ নরনারীই কি এই পাপ পুরুষের অনুকরণ করিতেছেন নতুবা সমাজ এই ঘোর ব্যভিচার পথে ছুটিতেছে কিরূপে?

বলিতেছি প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে পাপ পুণ্য উভয়ই আছে। কালে কালে পাপের প্রসার ও পুণ্যের অল্পতা ঘটিয়া থাকে। সত্যযুগে পুণ্য অধিক—ক্রমে পুণ্য কম হইতে হইতে ঘোর কলিযুগে পাপ গুরুতর হইয়া উঠে। ভগবান্ যুগে যুগে আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়া থাকেন পুণ্যপুরুষই অবলম্বনীয় আর পাপ পুরুষই বর্জ্জনীয়। শত অসুবিধা হইলেও—শত বিঘ্ন পাইলেও কল্যাণপথ ত্যাগ করা উচিত নহে আর পাপপথের প্রশ্রয় দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিতে পাপের ভীষণ মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে। আমাদের জানাছিল না শিক্ষিত নামধারী-ব্যক্তিগণও এইরূপ কদর্য্য কার্য্য করিতে পারেন! এই পুস্তকে দেখিতেছি এই পাপপথে উকিল ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত বেশ্যার দালালী করেন পৃ ১৫৬।

এই নরকে রাত্রি যাপন ক ন যাঁহারা এই পুস্তকে তাঁহাদের যে তালিকা দেওয়া আছে তাহাতে দেখা যায় কবি, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, নামজাদা উকিল, স্কুলের মাষ্টার, কলেজের প্রফেসার, রাজনৈতিক নেতা উপনেতা, গবর্ণমেণ্ট অফিসের বড় কর্ম্মচারী, ব্রাহ্ম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বিদ্যাভূষণ, তর্কবাগীশ প্রভৃতি উপাধিধারী অধ্যাপক, পুরোহিত, মহান্ত, গুরুগিরি ব্যবসায়ী, হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল—যিনি এই পতিতার ঠাট্টা পূর্ণ হইতে দেখিয়া হাইকোর্টের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং "খুসী হ'য়ে ঘর সাজান জিনিষপত্র কিনে দেন" পতিতা লিখিয়াছেন 'আমারই এই দামী আংটীটি তাঁহারই উপহার' এই পুস্তকে আরও অনেক সম্প্রদায়ের নাম আছে; রায় বাহাদুর, জমিদার, ঔষধব্যবসায়ী, ভলাণ্টিয়ার, দেশকর্ম্মী, নবাব বাদসার বংশধর ইত্যাদি। কি ভয়ানক কথা—সমাজের একি অবস্থা? তবে কি শিক্ষায় কিছুই হয়না—উচ্চবংশে জন্মিলেও কিছু হয় না? এই পুস্তকে ৭৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "কিন্তু আমার মত পাপরতা পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মান, মর্য্যাদা, অর্থ সম্পত্তি, দেহ, মন বিক্রয় করেছে, তাদের সমাজ মাথায় তুলে রেখেছে—তাহারা কবি, সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত—রাজনীতিক ও দেশ সেবক বলিয়া বিখ্যাত, ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া সম্মানিত। এমন কি অনেক ঋষি মহান্তও গুরুগিরী ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন।" ইত্যাদি

পুস্তকের এই সমস্ত কথা পড়িয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। যে সমাজ এইরূপ অধঃপাতে গিয়াছে সে সমাজকে এক ভগবান্ ভিন্ন কোন মানুষে বুঝি পবিত্র করিতে পারেনা। তথাপি মুমূর্ষুর মুখে পবিত্র গঙ্গাজল দেওয়ার মত—সমাজের কর্ম্ম করাও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য। পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপীর পাপ প্রবৃত্তির প্রেরক যে পাপপুরুষ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যেমন কর্ত্তব্য সেইরূপ পাপীর হৃদয়ে যে পুণ্যপুরুষ আছেন তাঁহার সম্বাদ দেওয়াও আবশ্যক।

ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি—ইহা ভোগভূমি নহে। যাঁহারা এই পবিত্র কর্ম্মভূমিকে ভোগভূমিতে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষা দিতেছেন—শিক্ষা দিতেছেন ইন্দ্রিয় যাহা চায় তাহাই দাও—ইন্দ্রিয় সংযমে প্রকৃত উন্নতি হয় না—সমাজের ধ্বংস লীলার অভিনেতা এই সকল পুরুষকে ঋষিগণের পবিত্র উপদেশ শুনাইবার জন্য দেশে এমন কেহই কি নাই যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ইহাদের শিক্ষার দোষ

প্রদর্শন করেন এবং সমাজকে বুঝাইয়া দেন ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে ছাড়িয়া দেওয়া স্বাধীনতা নহে—ইহা ব্যভিচার, ইহাতে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়? আজ এই অধঃপতিত সমাজকে পবিত্রতার দিকে জাগ্রত করিবার এমন দলবদ্ধ যুবক সম্প্রদায় কি নাই যাঁহারা হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া লোককে দেখাইয়া দিতে পারেন—উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির কর্ম্ম করিয়াও মানুষ অনুতপ্ত হইতে পারে, হইয়া ভগবানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে? কেহ কি সমাজকে বলিবার নাই যে অহল্যা পাপ করিয়াও রাম রাম করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, রত্নাকর সকল প্রকার দুষ্ক্রিয়া করিয়াও উল্টা রাম নাম জপিয়াও আজ মহর্ষি বাল্মীকি এবং পৃথিবীর পরম পবিত্র গ্রন্থ রামায়ণের রচয়িতা। যে যেমন অবস্থায় অধঃপতিত হউক না কেন সৎ সঙ্গ দ্বারা ও নাম জপিয়াই সে আবার উঠিতে পারে এ শিক্ষা ভারতের অস্থিমজ্জায় যেমন মিশিয়াছে এমনটি আর কোথাও আছে কি? "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে গীতাতে ভগবান্ এই আশ্বাস বাণী দিতেছেন।

পতিতার আত্মচরিতে পতিতা হইবার সমস্ত কারণগুলি দেখান হইয়াছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অভিভাবকের অসাবধানতা এবং অভিভাবকের অধীন না হওয়া, তরুণ সাহিত্যিকগণের গল্প উপান্যাস পড়া, স্কুলের ঈশ্বর শূন্য শিক্ষা, থিয়েটার, সিনেমা, অতিশয় বিলাসিতা, রিয়ালিষ্টিক আর্টে যোগ দেওয়া, অসংযমী যুবকের হাতে কিশোরী ও যুবতীর শিক্ষা ভার; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত কার্য্যে মানুষের প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। গ্রন্থে ৮২, ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে "গল্প, উপন্যাস পাঠ করিবার ফলে সমাজ-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবই কেবল আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজনার বশে কার্য্যের পরিণামের দিকে দৃষ্টি যায় নাই।"

পুরুষের চরিত্র, স্ত্রীলোকের সতীত্ব, সকল নরনারীর মনকে একাগ্র করিবার কৌশল—ইহা যে সমাজে থাকে না সে সমাজ কখন উন্নত হইতে পারে না। আমরা এই পুস্তক সম্বন্ধে অধিক আর বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যে সমস্ত রোগ সমাজে দেখা দিয়াছে তাহা হইতে আত্মরক্ষা যাঁহারা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের একমাত্র কর্ম্ম হইতেছে ঈশ্বরকে ভজনা করিবার অনুষ্ঠান অভ্যাস করা, এবং ঈশ্বরকে ভাবনা করিতে শিক্ষা করা। এইজন্য সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সেবা করা কর্ত্তব্য। পুরুষেরা যদি এই সৎসঙ্গ ও সৎ শাস্ত্র আশ্রয়

করেন এবং যাঁহারা শাস্ত্রের উপর অশ্রদ্ধা জন্মান দলান্ধ হইয়া তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া লোকের শ্রদ্ধা শাস্ত্রের দিকে আকর্ষণ করেন তবে ভ্রষ্টপথে যাঁহারা সমাজকে টানিতেছেন তাঁহাদিগকে সমাজ অগ্রাহ্য করিয়া আত্মরক্ষা ও জনরক্ষার দিকে আবার প্রবর্ত্তিত করিতেও পারেন। শেষ ফল শ্রীভগবানের হস্তে।

এই পুস্তক সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার থাকিলেও আমরা এইখানে বিরত হইলাম—যদি আবশ্যক হয় পরেও ইহা দেখান যাইতে পারে। উপসংহারে অপবিত্রতার মূল যাহা আমরা তাহারই আলোচনা করিয়া এবারকারমত ক্ষান্ত রহিতেছি। এই মূলটি হইতেছে স্বাধীন প্রণয় বা অবৈধপ্রণয়। এই স্বাধীন প্রণয় হইতেছে মধুর প্রলেপ দেওয়া বিষবটিকা। স্বাধীন প্রণয় স্বাভাবিক হইলেও কর্ম্মভূমি ভারতে ইহার আদর ছিল না। ভোগলম্পট মানুষেরই ইহা সম্পত্তি, এবং ভোগভূমিতেই ইহার সম্যক্ প্রচার। স্বাধীন প্রণয়ের মূল উচ্ছেদ করিয়াছেন শ্রুতি। "পরাঞ্চি খানি" বেদমন্ত্র ইহাকে বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন। ইহা কিন্তু আধুনিক ধর্ম্মেও প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম্মজগতে ইহার নাম পরকীয়া প্রণয় বা সহজিয়া ভাব। ইহার প্রতিকূলে চৈতন্যদেব দাঁড়াইয়া ইহা দূর করিবার চেষ্টা করেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেবের পথে তোমরা যাইওনা কারণ "নিত্যসিদ্ধ, কৃষ্ণনাম", নাম কর সব হইবে, পরকীয়ায় যাইও না। তিনি আরও প্রচার করেন "বহিরঙ্গ সনে কর নাম সংকীর্ত্তন, অন্তরঙ্গ সনে কর ভাব আস্বাদন" চৈতন্যদেবের কথাও ভাসিয়া গেল। পবিত্র পরমহংসদেবও কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। শুধু উপদেশ নহে আপনি আচরণ করিয়াও দেখাইলেন। কিন্তু লোকে কামিনী কাটিয়া করিল কাম কাঞ্চন অর্থাৎ কামিনী বর্জ্জন না করিয়া কাম বর্জ্জন করা, কামিনীর সঙ্গে দোষ নাই, কাম বর্জ্জন করিলেই হইবে। ইহার স্পষ্টভাব হইতেছে যেন কাম বর্জ্জন করিয়া কামিনী সঙ্গ করা অতি সহজ। এই সমস্তই ভাবের ঘরে চুরীমাত্র। যাহারা যথার্থ ভাবে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সাধন ভজন করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা কিন্তু হিন্দুস্থানী কোন সাধকের কথায় বলেন "কয়লাকোঘরমে যেত্তা সেয়ানা হায় থোড়া বুদ লাগে পর লাগে—কামিনীকো সঙ্গমে যেত্তা সেয়ানা হায় থোড়া কাম জাগে পর জাগে"। ইহাও কিন্তু লোকে মানে না। সকলেই প্রেম প্রেম করে অর্থাৎ প্রেমের নামে আজকাল কামই বিকাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাই বহুল প্রচার হইতেছে। এতদিন সে দেশে শুনিতাম কিশোরী

ভজন এখন ইহার উপরেও চলিতেছে যুবতী বিধবা ভজন—তা যে ভাবেই হউক। এই ভজনকারীরা ভাবের মানুষ—ভাবের চোটে কখন কি করেন তাহা ঠিক না থাকিলেও ইহারা বড় ভাল—ইহারা, যে লোকাপবাদ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আপনি আচরণ করিয়া বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন সেই লোকাপবাদকেও অমান্য করেন আর ইহাদের প্রণয়িণীদিগকেও ইহা বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষায় আজকালকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা এই বাহিরে ভিতরে পতিতার মত ভিতরে পতিতাও হইতেছেন আর তাঁহাদের প্রশ্রয়দাতা যাঁহারা—তাঁহারা বৃদ্ধ গ্রন্থকারই হউন বা যুবক স্বাধীন প্রণয়ী গল্প কর্ত্তাই হউন, কবিই হউন বা নভেল লেখকই হউন—ইঁহারা পবিত্রতা, সতীত্ব, মনের একাগ্রতা এই সমস্তই উড়াইয়া দিতে চাহেন। হিন্দুসমাজে যে সতীত্ব রক্ষার জন্য বিবাহ ব্যাপার এত ধর্ম্মমূলক ছিল তাহাও আজকালকার সভ্যতা আইন দিয়া রোধ করিতে প্রাণপণ করিতেছেন। স্বর্গীয় রমেশ মিত্র মহাশয়কে বলিতে শুনিয়াছি, 'চিড়িয়াখানার বাঘ ভল্লুক বানরকে ছাড়িয়া দিলে যাহা হয় সংযমশূন্য যুবক যুবতীকে এক সঙ্গে ছাড়িয়া দিলে তাহাই হইবে।' পতিতার আত্মচরিতে, স্পষ্টভাবে তাহাই দেখান হইয়াছে। পবিত্র হিন্দুর বিবাহ প্রথায় কামের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য স্বকীয়াকে পরকীয়া করিবার যে সাধনা রহিয়াছে—যাহার ফলে হিন্দুবালিকা যাহার সহিত বিবাহ হয় তাঁহা অপেক্ষা সুন্দর কাহাকেও দেখেনা—যদি ভাগ্যক্রমে পতি, দেবতার মত আচরণ না করিয়া বিপরীত আচরণও করেন তথাপি বালিকাকে সাধনা করিতেই বলা হয়—ইহাদ্বারা শেষে সুফলই ফলে। হিন্দু বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হয়—লোকের স্বামী দেবতা, আর তোমার স্বামী যে তাহা নয়, তাহা তোমার পূর্ব্ব দুস্কৃতির ফলে হইয়াছে তুমি সাধনা দ্বারা, সেবা দ্বারা সুকৃতি অর্জ্জন কর, ইহা থাকিবে না। হিন্দুমহিলা শিক্ষা পান মনোমিলন সাধনার ফল, সেবার ফল—আর প্রথম দর্শনেই যে মনোমিলন তাহা কামেই হয়। ইহা ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকিলেও ভোগ হওয়া মাত্র, ইহার বিকৃত স্বরূপ দেখায়। ইহার ফলেই বিচ্ছেদ আইন আনিতে হয়। আজকাল শিক্ষিতা বি এ পর্য্যন্ত পাশ করা স্ত্রীলোক মাসিক সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন সতীত্ব কাহার নাম তাহা আমরা জানি না—আমরা বলি যে সতীত্ব হিন্দুনারীর অস্থিমজ্জায় ঋষিগণ মিশাইয়া দিয়া গিয়াছেন, যে সতীত্বের কথা রামায়ণ মহাভারতে এত সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে বি এ এম এ, পাশ করিলে কি সেই

রামায়ণ মহাভারতও গল্পকথা বলিয়া অবিশ্বাস করিতে হয়? আর আজ কালকার কল্পিত গল্প কথায়—যাহার ফলে সমস্ত পবিত্রতা নষ্ট হয় তাহাই কি এত আদরের বস্তু হইতে হয়? এই সমস্ত ব্যভিচারের শিক্ষার প্রতিক্রিয়া যাহাতে হয় তাহার জন্যই এই প্রবন্ধ লেখা হইল। যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা পবিত্র, যাঁহারা স্বেচ্ছাচার নিবর্ত্তিত করিয়া সমাজ ও পরিবারকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া যদি এই অজ্ঞানের সঙ্গে মসি সংগ্রামও করেন তাহা হইলেও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যই করা হয়। আর অমরা এ বিষয়ে কি বলিব? তবে ধ্বংসলীলাকারী মহাশয়গণকে এই মাত্র বলি তাঁহাদের ধ্বংসলীলার অভিনয় অনেক হইয়াছে, এখন তাহার প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হইয়াছে—এখন ইহারা ইহাদের ধ্বংসাভিনয় বন্ধ করিয়া যদি তাঁহাদের গঠনক্রিয়া কিছু থাকে সেই বিষয়ে যেন তাঁহাদের বচনবিন্যাস করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ভগবান্ আমাদের মঙ্গল করুন। ইতি।

ভাই ভগিনীর সমালোচনা এবং অন্যান্য গ্রন্থপরিচয়।

১। "আমরা প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি "ভাই, ভগিনী" পুস্তক খানি উপন্যাস আকারে অন্ধ হৃদয়কে চক্ষুষ্মতী বুদ্ধির বিচারে কিরূপে সংযমিত করিতে হয় তাহারই পুস্তক। এই পুস্তকের পবিত্রতার কথাও পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি। ইহার বিস্তৃত সমালোচনা আমরা এবারেও করিতে পারিলাম না। পরমাসে আমরা ইহা চেষ্টা করিব।

২। রত্ন পিটক গ্রন্থাবলী—সম্পাদক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক শ্রীবিপিনচন্দ্র মল্লিক এ্যাড ভোকেট হাইকোর্ট কলিকাতা। আমরা সমালোচনার জন্য এই গ্রন্থাবলীর তিন খানি পুস্তক পাইয়াছি।

১। জীবন্মুক্তি বিবেক মূল অন্বয় বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালায় টীকা ও ব্যাখ্যা সহ। (বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত) মূল্য ৩৲। কাশীধাম ১৮নং কামাখ্যালেন কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রাপ্তব্য।

২। দৃগদৃশ্য বিবেক মূল অন্বয় বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালায় টীকা ও ব্যাখ্যা সহ (বিদ্যারণ্যগুরু ভারতীতীর্থ বিরচিত) মূল্য ।১০ ঐ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

৩। বোধসার (নরহরি প্রণীত) মূল অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গলায় টীকা ও ব্যাখ্যা সহ মূল্য ৪৲। (ঐ ঠিকানায়)

উপরের লিখিত তিনখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বেদান্ত চর্চ্চার যে কতদূর উপযোগী তাহা যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন তাঁহারাই জানেন। এই সমস্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ছিল না। গ্রন্থকার মহাশয় এই অভাব মোচন করিয়া সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে পথের পথিক সেই পথে নিজের এবং যাঁহারা ঐ পথে যাইবেন তাঁহাদের সমকালে এই উভয়ের—যে উপকার করিতেছেন তজ্জন্য সমাজের কল্যাণেচ্ছু সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী। এইরূপ পুস্তকের সমালোচনা করিতে হইলে যে এত পরিশ্রম করিতে হয় যাহাতে বহুবৎসর লাগে। যে সমস্ত পুস্তক অল্প অল্প করিয়া নিত্য পাঠ করা উচিত তাহার সমালোচনা সাধারণ ভাবে করা যায় না। আমরা পুস্তকগুলি অল্পে অল্পে পড়িয়া থাকি কাজেই পুস্তকের বিস্তারিত সমালোচনা আমাদের সাধ্যাতীত তবে যাঁহারা সাধক এবং আত্ম-পর-কল্যাণেচ্ছু তাঁহাদের নিকট এই প্রকারের পুস্তক যে সর্ব্বদাই আদরের বস্তু তাহার সংশয় মাত্রও নাই। রত্ন পিটকে অপরোক্ষানুভূতি এবং পঞ্চদশী ও মূল অন্বয় ও বঙ্গানুবাদের সহিত বাহির হইবে ইহারও আশ্বাস পাওয়া যায়। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুস্থশরীরে এই সমস্ত আত্ম ও পর হিতকর কর্ম্ম করিয়া এই পতিত জাতির উদ্ধারের দিকে চেষ্টা করিয়া ধন্য হইয়া যান। এই সঙ্গে আমরা এই সকলের প্রকাশক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মল্লিক হাইকোর্টের এড্যাভোকেট মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলি এই দিকে তাঁহার অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। ভগবান গ্রন্থকার ও প্রকাশক মহাশয়ের প্রতি করুণাবর্ষণ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৩। ভারতের সাধনা, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা। পৌষ ১৩৩৬ সাল। সমাজে যে ব্যভিচার চলিতেছে তাহার প্রতিক্রিয়ার আরম্ভেই এই মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত এবং সময়ের উপযোগী। এই মাসিকে জ্ঞানের প্রচার এবং অজ্ঞানের পরিবর্জ্জন সমকালেই যে হওয়া উচিত সেই নীতিই অবলম্বন করা হইয়াছে। শ্রীবিধুভূষণ দত্ত এম, এ মহাশয় দ্বারা ইহা সম্পাদিত। এই মাসিকের বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি।

ভাব ও ভগবান।

তীব্র ব্যাকুলতা আসিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই ব্যাকুলতার মূলে যে ভাবই থাকুক না কেন। এই ভাব ভক্তি হইতে আসিতে পারে, ভালবাসা হইতে আসিতে পারে, ভয় হইতে আসিতে পারে, বিদ্বেষ অথবা ক্রোধ প্রভৃত হইতে পারে, অথবা অন্য কিছু হইতেও আসিতে পারে। সবেরই এক ফল দাঁড়ায়, যখন এই ভাব উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তা স্মৃতিপথে জাগরিত থাকে।

ভক্তবীর প্রহ্লাদ ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। তৎপিতা হিরণ্যকশিপু ক্রোধ ও বিদ্বেষবসে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তদ্‌গতি লাভ করে। কালান্তক সদৃশ নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিয়া মহাবিক্রমশালী দৈত্য হিরণ্যকশিপু ও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। সেই লোক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট যাইতে বিরত হন, এবং বালক প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে তাত প্রহ্লাদ, শ্রীভগবানের এই সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা কেহই তাঁহার নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না, তুমিই নিকটে গিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান কর। বালক নির্ভয়ে তাঁহার নিকটে গিয়া যুক্তকরে স্তব আরম্ভ করেন। স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান নৃসিংহদেব স্নেহবশে তাঁহার গাত্রলেহন করিতে আরম্ভ করেন। হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীরণ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন, 'এই দুষ্ট দানব হইতে আমার গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই, তবে ইহার নাড়ী হইতে আমার প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদের জন্ম হইয়াছে, অতএব ইহা আমার বড়ই প্রিয়'। এই বলিয়া সযত্নে তাহা কণ্ঠী মাল্যবৎ ধারণ করিলেন।

শ্রীগীতা বলিতেছেন,

> যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় যদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

অন্তকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, হে কুন্তিপুত্র! মৃত্যুরপর তিনি সেই ভাব অনুযায়ী স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, রোগে, শোকে, আনন্দে, উচ্ছাসে সব অবস্থাতেই তাঁহার চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে হইবে, তাহা হইলে মরণমূর্চ্ছায়ও বিস্মৃতি ঘটাইতে পারিবে না; সব অবস্থাতেই

নাম স্মরণ হইতে থাকিবে। জলন্ত অঙ্গারের সংস্পর্শে লৌহখণ্ড রাখিলে তাহা যেমন অগ্নিময় হইয়া যায়, সর্ব্বদা স্মরণেও মানুষ তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়।

'মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ 'শ্রীভগবান বলিতেছেন', যাঁহারা চিরজীবন আমাকে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, মৃত্যুকালে তাঁহাদের স্মৃতিতে স্বতই আমার চিন্তা উপস্থিত হইবে'।

সুস্থশরীরে ভগবচ্চিন্তা সহজ মনে হইতে পারে, কিন্তু সেটী স্থায়ীভাব কিনা দারুণ রোগযন্ত্রণায় তাহার কিঞ্চিৎ পরীক্ষা হয়, এবং অগ্নিপরীক্ষা হয় সেই সময় যখন মরণ মুর্চ্ছায় ও তাঁহার স্মৃতিলোপ না ঘটায়, সাধক সমস্ত জীবনব্যাপী যে তাঁহার চিন্তা লইয়া থাকিতে অভ্যাস করেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য যে মৃত্যুরূপ মহাবিপদেও যেন সেই চিন্তা স্থির থাকে। মৃত্যুরূপ মহাবিপদ মানুষের আর নাই। একটি পুকুরের জল আপাত দৃষ্টিতে অতি স্বচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু সেই জল একটী দণ্ড দ্বারায় আলোড়িত করিলে যেমন তলদেশের সমস্ত আবিলতা উত্থিত হইয়া সমস্ত জলরাশিকে অতি পঙ্কিল করিয়া তোলে, মৃত্যুকালেও সেইরূপ আজীবনের কর্ম্মগুলি যেন মূর্ত্ত হইয়া মৃত্যুগ্রস্থ ব্যক্তির সম্মুখে ভাসমান হইতে থাকে এবং তদ্রূপ স্মৃতি লইয়া তাহাকে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়। অন্য পরে কা কথা, মহাসাধক রাম প্রসাদের পর্য্যন্ত একটু বিচলতা আসিয়াছিল। যমরাজের মহিষগণের ঘণ্টা ধ্বনিতে যেন তিনি একটু বিচলিত হইয়াই গাহিয়াছিলেন, 'তিলেক দাঁড়াওরে সমন, আমি বদন ভ'রে মাকে ডাকি'রাম প্রসাদের এই দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের এই শিক্ষালাভ হইতে পারে যে ভীতি বা চঞ্চলতা আসিলেও, আবার তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া মনের অবস্থা জানাইতে হয়, তবেই তিনি ভার লন।

শ্রীভগবানের জন্য গোপিকাদের উন্মত্ততা আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ভগবান্ ভাবিয়া তাঁহার ভজনা করে নাই। রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে প্রশ্ন করেন যে গোপিকারা 'জার' বুদ্ধিতে উপাসনা করিয়াও তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইল কিরূপে? শুকদেব কহিলেন, 'রাজন্' শ্রীভগবানের জন্য যদি উন্মত্ততা আসে তবে তাহা যে ভাব প্রসূতই হউক না কেন ফল একই দাঁড়াইয়া থাকে। শ্রীগোপিকারা তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্বামী, পুত্র, লোক লজ্জা ইত্যাদি সমস্ত ভয় জলাঞ্জলি দিয়া বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাহাদের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল। তাই না তিনি তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ইতি।

শ্রীভবেশ চন্দ্র শর্ম্মা মুন্সী। রেঙ্গুন।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

আমাদের অনুরোধে একদিন সাধুবাবা তাঁহার জীবনের অতীতাংশের একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেন। সে সময় তিনি আসামে ছিলেন। একদিন তিনি গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া একাকী পথ অতিক্রম করিয়া পরশুরাম কুণ্ডে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বিশেষ কোন লোকজন কিম্বা নিকটে কোন বাড়ী ঘর দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এই ভাবে চলিতে চলিতে ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। নিকটে কোন বাড়ীঘর না থাকায় ও সঙ্গে কোনরূপ আহার্য্য দ্রব্য না থাকায় সেদিন তিনি উপবাসী ছিলেন। একে সমস্ত দিবস অনাহার, তাহাতে বহুপথ অতিক্রমজনিত পরিশ্রমে তাঁহার দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি মনকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন যে 'একে এই গভীর অরণ্য, তাহাতে আবার রাত্রিকাল, কোথা হইতে আহার মিলিবে? সুতরাং অন্তকার ইহাই ব্যবস্থা বুঝিয়া তুমি শান্ত হইয়া থাক।' যখন তিনি স্বীয় মনকে এই প্রকারে বুঝাইতেছিলেন সেই সময় অনতিদূরে একটী ক্ষীণ আলোকরশ্মি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উহা দর্শনে ঐ স্থানে নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি বাস করিতেছে অনুমান করিয়া সাধুবাবা উক্ত আলোক-রশ্মি লক্ষ্য করিয়া সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন বাস্তবিকই কোন কার্য্য উপলক্ষে সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে তাম্বু খাটাইয়া দুই চারি দিবসের নিমিত্ত দুই তিনটী ব্যক্তি ঐস্থানে অবস্থান করিতেছেন। সাধুবাবা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়ায় এবং তিনি সমস্ত দিন অনাহারে আছেন শ্রবণে তাঁহারা কিছু চাউল আনিয়া সাধুবাবাকে ভিক্ষা দিলেন। তিনি সেইগুলি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া উহা ভিজাইয়া রাখিয়া দিয়া নিকটস্থ ঝরণায় স্নানাদি সমাপনান্তে ঐ ভিজা চাউল দ্বারা পরম সন্তোষের সহিত সেদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। সাধুবাবা বলিলেন যদিও তিনি ঐ সব সময় সঙ্গে অর্থ কিম্বা কোনরূপ আহার্য্য দ্রব্য রাখিতেন না কিন্তু পরম করুণাময়ের কৃপায় এইভাবে কিছু না কিছু আহার্য্য প্রত্যহই মিলিয়া যাইত। সাধুবাবার কথা শুনিয়া মনে পড়িতেছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে বলিতেছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" ৯॥২২॥ গীতা।

১৩৩৩ সালে পূজার পর জসিডিতে গিয়া যেমন সাধুবাবার বারান্দার উপর খোলার আচ্ছাদন দেওয়া দেখিলাম, তেমনি পাহাড়ের উপর যে প্রকাণ্ড একখানি পাথর ছিল তাহার তিনদিকে মাটীর দেওয়াল দেওয়া একখানি বাবার পাকের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলাম। এতদ্ব্যতীত ঐ কুটীরের সন্নিকটে ক্ষুদ্র একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সাধুবাবার সেবক ব্রহ্মচারি হরিহরানন্দ ঐ পাহাড়েই তখন রাত্রিযাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গৃহ দুইটীর কবাট না থাকায় উহা ঝাঁপ দিয়া বন্ধ রাখা হইত এবং উহার চতুর্দ্দিকে হরিহরানন্দ বাঁশ দ্বারা সামান্য মত বেড়া দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে লাউ, বেগুন ও লঙ্কার গাছ লাগাইয়াছিল। হরিহরানন্দই প্রয়োজন মত বাজারে গিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া লইয়া আসিত ও বাবার দ্বিপ্রহরের আহার্য্য সেই প্রস্তুত করিয়া দিত। আমরা পাহাড়ে থাকা কালীন যদি কোন দিন হরিহরানন্দ বাবার নিমিত্ত আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিত, তবে আমরা ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার রন্ধনাদি কত অল্পের মধ্যে যে সম্পন্ন হয় তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম। একদিন হরিহরানন্দকে সুন্দররূপে খিচুড়ী প্রস্তুত করিতে দেখিয়া আমরা সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে এরূপ রন্ধন কে ইহাকে শিক্ষা দিল? তদুত্তরে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন তিনিই। ইহাতে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, যাহারা গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হয় তাহাদের নিজ হস্তে আহার্য্য প্রস্তুত এবং সামান্য কিছু সূচিকার্য্য ও লেখাপড়া জানা নিতান্তই আবশ্যক হয়। কারণ প্রায় অনেক সময়ই তাহাদের নিজের খাদ্যদ্রব্য নিজেদেরই প্রস্তুত করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়। আর নিজের ব্যবহারের আল্‌ফি বা আল্‌খেল্লটী অন্তত মধ্যে মধ্যে নিজেকে সেলাই করিয়া লইতে হয়। আর লেখা-পড়া জানা থাকা ত সর্ব্বদিক দিয়াই বিশেষ আবশ্যক।

একদিন আমরা কৈলাসপাহাড়ে সাধুবাবার নিকট গিয়া বসিলে তিনি একটী গল্প বলিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। সে গল্পটা এইরূপ:—একদা এক রাজা তাহার মন্ত্রী এবং অন্যান্য লোকজন সমভিব্যাহারে বনের মধ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন! গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রী একটী বন্য জন্তুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে সঙ্গের লোকজন হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। যখন তিনি সঙ্গিগণের উদ্দেশে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন, তখন অদূরে একটী আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন একব্যক্তি একটী উচ্চ বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট

থাকিয়া একখানি লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রদ্বারা বৃক্ষশাখা কর্ত্তন করিতেছিল; তাহার হস্ত হইতে হঠাৎ সেই অস্ত্রখানি বৃক্ষনিম্নে ভূমিতে পতিত হইল। কিন্তু সেজন্য সেই উচ্চবৃক্ষ হইতে ঐ ব্যক্তির অবতরণ করিবার প্রয়োজন হইল না। ঐ ব্যক্তি কোন শক্তি বলে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট রহিয়াই পুনরায় অস্ত্রখানি স্বীয় হস্তে প্রাপ্ত হইল ও তদ্দ্বারা পূর্ব্বমত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

মন্ত্রী উহা দর্শনে প্রথমে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি বহু বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিলেন যে এই বিদ্যাটী যে প্রকারেই হউক তাঁহার শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। কারণ কখনও রাজ্যরক্ষার্থ এই বিদ্যার প্রয়োজন হইতে পারে। যদি অদ্য আমি বিদ্যাটী আয়ত্ব করিতে পারি, তবে ইহার সাহায্যে প্রয়োজন হইলে রাজ্যের শত্রুর হস্ত হইতে লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রাদিও এই প্রকারে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই বৃক্ষতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও অতি বিনীত ভাবে সেই ব্যক্তির নিকট উক্ত বিদ্যার প্রার্থী হইলেন। রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবে ঐ ব্যক্তি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। সে বলিল, "একে আপনি অর্থশালী ব্যক্তি এবং নিশ্চয়ই উচ্চ বংশোদ্ভব হইবেন, আর আমি জাতিতে মেথর, সকলের মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া আমার কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আমার নিকট আপনি যে মন্ত্র শিক্ষা করিতে চাহিতেছেন, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? আর যদি নিতান্তই আপনি মন্ত্রটী আমার নিকট হইতে শিক্ষা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তবে আমি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে আমি আপনার গুরু হইব। আমি যাহা দক্ষিণা চাহিব কিম্বা আমি যদি কোনরূপ পরীক্ষা চাই, তাহা কি আপনি দিতে সম্মত হইবেন?" এইরূপ নানাবিধ বাক্য বলা সত্ত্বেও মন্ত্রী নিজ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ ঐ বিদ্যাটী শিখিয়া লইবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত ঐ ব্যক্তিকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে অর্থাদি এবং পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইয়া ঐ বিদ্যাটী উহার নিকট হইতে শিক্ষা করিলেন। বিদ্যা ঠিকমত আয়ত্ব হইয়াছে কি না পরীক্ষা করণাভিলাষে মন্ত্রী তাঁহার হস্তস্থিত লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি বহু দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে ঐ মন্ত্র প্রভাবে তাহা অতি সত্বর আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তদ্দর্শনে মেথর মন্ত্রীকে বলিল, "গুরুদক্ষিণা যদি উপযুক্ত সময় না পাই তাহা হইলে এই বিদ্যা পুনরায় আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।" মেথরের বাক্যে রাজমন্ত্রী সম্মত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে ঐ মেথর নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় পত্নীর নিকট এই সকল ঘটনা বলিলে সে বলিল, "তুমি বড় ভাল কাজ কর নাই, কারণ, সে ব্যক্তি যখন রাজার প্রিয় পাত্র এবং বহু অর্থ শালী, তখন নিশ্চয়ই সে দাম্ভিক প্রকৃতির হইবে। যদিও সে তৎকালে গুরুদক্ষিণা দিতে সম্মত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যকালে হয়ত আমাদের অবজ্ঞা করিবে ও দক্ষিণা দিতে অসম্মত হইবে।" মেথর বলিল, "সে আশঙ্কা নাই, কারণ, পূর্ব্বেই তাহাকে বলা হইয়াছে যে, সেরূপ হইলে ঐ মন্ত্র ফিরাইয়া লওয়া হইবে।" তৎশ্রবণে ঐ মেথরাণী মন্ত্রীকে পরীক্ষা করিবার জন্য মনে মনে একটী মতলব স্থির করিয়া বলিল, "তুমি কল্য মন্ত্রীর নিকট গিয়া বলিয়া আসিও যে উপযুক্ত সময়ে আমার স্ত্রী আপনার নিকট দক্ষিণার প্রার্থী হইবে।" পত্নীর বাক্যে মেথর সম্মত হইয়া পরদিন মন্ত্রী সকাশে উপস্থিত হইয়া সে কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া আসিল।

এই ঘটনার পর কয়েক মাস গত হইয়াছে। একদিন ঐ রাজ বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে খুব ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে। উৎসব দিবসে মহামুল্য বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া রাজা স্বয়ং গিয়া সভায় বসিয়াছেন এবং রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ নানাবিধ সুপরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সজ্জিত হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ী উপযুক্তরূপ সজ্জিত করা হইয়াছে এবং নানাবিধ যান বাহনে বিশিষ্ট বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগতের তথায় আগমন হইতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে বহুব্যক্তির আগমন জনিত উৎসবে স্থানটী যেমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তেমনি সকলেরই প্রাণের আনন্দ উল্লাসের চিহ্ন তাহাদের মুখের ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সময়ে ঐ মেথরাণী বিষ্ঠা পূর্ণ একটী পাত্র মস্তকে লইয়া দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "তোমরা কে কোথায় আমার স্বামীর শিষ্য আছ? আমার মস্তক হইতে এই ভার নামাইয়া লইয়া আমার উপকার কর। এই গুরুভার আমার মস্তক হইতে নামাইয়া লইলে আমার খুব সাহায্য করা হয়।" এই প্রকার বাক্য সে পুনঃ পুনঃ অতিশয় উচ্চরবে সকল ব্যক্তিকে শুনাইয়া উচ্চারণ করিতে লাগিল। এদিকে যথায় বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবান্ পরিচ্ছদে ভূষিত রাজমন্ত্রী উপবিষ্ট ছিলেন তথায় ঐ কাতর আহ্বান পৌছিল। উহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে মেথরের শিষ্য ত এক ইহার মধ্যে আমিই রহিয়াছি; সুতরাং ঐ বাক্য তবে আমার উদ্দেশ্যেই বলা হইতেছে। মেথরাণীর বাক্য মন্ত্রীর কর্ণে কয়েক বার প্রবেশ করিলে

তাঁহার কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন যে যদি এই অন্ধকার বিরাট সভামণ্ডপ হইতে তিনি উঠিয়া গিয়া বহুজনসমক্ষে ঐ বিষ্ঠা পূর্ণ পাত্রটী মেথরাণীর মস্তক হইতে নামাইয়া স্বীয় মস্তকোপরি গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার সম্মানের পক্ষে যেমন বিশেষ ক্ষতিকর হইবে, তেমনি রাজারও যে বিশেষ বিরক্তি ভাজন হইবেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এমনকি হয়ত তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুতও করিতে পারেন। কিন্তু আবার তিনি ইহাও চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অদ্য যদি এই কার্য্যে তিনি অগ্রসর না হন, তাহা হইলে স্বীয় অঙ্গীকারচ্যুত হন এবং যে বিদ্যাটী লাভ করিয়াছেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে পারেন। বিশেষতঃ একটী বিদ্যা আয়ত্বে আসায় যাহাকে গুরু বলিয়া মানিতে হইয়াছে তাহার নিকট সত্যের অপলাপ না করিয়া বরং এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হইবে। মন্ত্রী মনে মনে এই প্রকার বিচার করত অবশেষে ঐ বহুজনপূর্ণ সভা মধ্য হইতে উঠিয়া গেলেন এবং মেথরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মস্তক হইতে বিষ্ঠাপূর্ণ পাত্রটী নামাইয়া স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং বহনের প্রস্তাব করিলেন। মন্ত্রীর এই ব্যবহারে মেথরাণী যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "বাছা! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এ পাত্র তোমাকে বহন করিতে হইবে না। ইহা বহন করিতে আমার কিছুই কষ্ট হইতেছে না; একার্য্যে আমরা অভ্যস্ত। তবে যে ঐপ্রকার বলিতেছিলাম তাহা কেবল তোমাকে পরীক্ষার নিমিত্ত; সেই জন্যেই আজ আমার এখানে আসা।

এদিকে রাজা, মন্ত্রীর ঐরূপ আচারণে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "দেশে কি মেথর ছাড়া তোমার আর গুরু মিলিল না? এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি আমার এ রাজসভার উপযুক্ত নয়।" এইরূপ অপমান করিয়া রাজা তাহাকে বিদায় দিলেন এবং অপর এক ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজার ভুতপূর্ব্ব মন্ত্রী রাজার এবং রাজ্যের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন, তিনি রাজার এরূপ আচরণে ও তিরস্কারে সাতিশয় ব্যথিত হইলেন সত্য কিন্তু মনকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তিনি ত রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই এরূপ কার্য্য করিয়াছেন। শুভ উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিয়া যদিও সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল কিন্তু তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইলেন না; বরং তিনি যে সত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ওদিকে নূতন মন্ত্রীর সর্ব্ববিধ অনুপযুক্ততার জন্য রাজার বহু ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল। এমনকি অনেকের সহিত বিরোধের সৃষ্টি হইতে লাগিল। অনেকে রাজার বিপক্ষ হইল ও অবশেষে এক দুষ্ট রাজা কর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইল সে তাহার সৈন্য দ্বারায় রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিল। এইসব বিপদে রাজা মহা চিন্তিত হইয়া নূতন মন্ত্রীকে পরামর্শ নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আমিত আর কোনই উপায় দেখিতেছি না। শত্রুসৈন্য এরূপ ভাবে রাজ্য ঘিরিয়া বসিয়াছে, যে আমাদের অন্যান্য স্থানে যে সকল সৈন্য রহিয়াছে তাহারাও এ সময় আসিয়া আমাদের সাহায্য করিতে পারিবেনা।" মন্ত্রীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণে রাজা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। দুর্ভাবনার নিমিত্ত রাত্রে রাজার নিদ্রা হইল না। চিন্তা করিতে করিতে রাজার তখন পূর্ব্ব মন্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন ও রাজা কোন বিষয় পরামর্শ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি তাহার কিরূপ সদুত্তর প্রদান করিতেন; এবং তিনি রাজ্যের কতবড় হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহা রাজার একে একে মনে পড়িতে লাগিল। যদিও রাজা তাঁহাকে একদিন হঠাৎ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সদগুণাবলী স্মরণ হওয়ায় তিনি নিজ ব্যবহারের জন্য অন্তঃকরণে বিশেষ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইলেন। তিনি এখনও এই রাজধানীতেই বাস করিতেছেন, যদি রাজা স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তবে তিনি হয়ত কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন ইহা মনে হওয়ায় রাজা গোপনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রাজাকে দেখিয়া খুব সন্তোষের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। রাজা তাঁহার নিকট রাজ্যের বিপদের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী সকল কথা শুনিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন ও বলিলেন, "আপনার কোনই চিন্তার কারণ নাই। আমি এখনই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।" পরে সেই মন্ত্রটীর সাহায্যে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজ শত্রুদের নিকট হইতে লৌহ নির্ম্মিত সমস্ত অস্ত্রাদি আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিলেন ও অবশেষে শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে বন্দী করত অনতিবিলম্বে রাজসকাশে আনয়ন করিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া রাজা যারপর নাই আশ্চর্য্য ও মহা সন্তুষ্ট হইলেন ও মন্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে তাঁহার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন মন্ত্রীও রাজার নিকট সকল কথা অকপটে

ব্যক্ত করিয়া রাজাকে বলিলেন "মহারাজ! যদি সেই দিন আমি আপনার সভা হইতে এই বিদ্যার যে গুরু, তাঁহার স্ত্রীকে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে সাহায্য করিতে না উঠিয়া যাইতাম, তবে আজ আমার এই বিদ্যা কখনই আয়ত্ব থাকিত না। সুতরাং এই গুরুতর কর্ম্ম এত অল্পায়াসে কখনই সিদ্ধ হইত না। আমি এই বিদ্যাটী শিক্ষা করিবার সময়ই প্রতিশ্রুত ছিলাম যে যখনই গুরুদক্ষিণা প্রয়োজন হইবে, কিম্বা গুরু বা গুরুপত্নী কোনরূপ সাহায্য চাহিবে, তখনই আমি তাহা প্রদান করিব।" মন্ত্রীর কতখানি ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং তিনি রাজার ও রাজ্যের কতদূর হিতাকাঙ্ক্ষী, ইহা মনে করিয়া রাজা মন্ত্রীর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এমন মন্ত্রীর প্রতি তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার মনে করিয়া মনে মনে তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন এবং মন্ত্রীকে পূর্ব্ব হইতে আরও অধিক সমাদর করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এইরূপ সত্যপালনে দৃঢ় অনুরাগ দর্শনেও রাজা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

এই গল্পের দ্বারা এই উপদেশ হইতেছে যে যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় ও অপরের কল্যাণ কামনায় কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফল কখনও অশুভ হইতে পারে না এবং তাহার জন্য কখন কাহারও দুর্গতি হয় না শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

ক্রমশঃ

রাজসাহী।

সরস্বতী পূজায়।

যখন মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় মোহ-কলিল পরিত্যাগ করে তখন মানুষ বুঝিতে পারে বিশ্বের নরনারীর কাঁহার অঙ্ঘ্রিপদ্ম বন্দন করা উচিত। রূপ ও অরূপের প্রকাশ করেন কে, নির্গুণ হইয়াও সকল গুণময়ী কে; আহা! শুদ্ধচিত্ত না হইলে মানুষ কি বলিতে পারে কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে কোথায় তুমি নাই; তুমি বিশ্বময়ী আবার বিশ্বের অন্তরালেও তুমি, তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন কে তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে; তুমি বিদ্যাস্বরূপিণী, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র তোমার চরিত্র গান করিয়া থাকেন, শ্রুতি তোমারই মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। তোমার আজ্ঞা-পালনে চেষ্টা না করিয়া কে কবে বুঝিতে পারে তুমি কখনও নবীনা, আবার কখনও তুমি প্রাচীনা। ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে যে তোমার শরণাপন্ন না হয় সে কেমন করিয়া বুঝিবে তুমিই—সকল মানুষকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া থাক —জগদ্ধাত্রী তুমিই; হৃদয় যায় কলুষিত, বুদ্ধ যাহার মোহাচ্ছন্ন সে কি তোমায় মা বলিতে পারে, না তোমায় ক্ষমাশীলা বলিয়া বুঝিতে পারে, না সে কখন ধরিতে পারে "ত্বয়া বিনা জগৎসর্ব্বং মৃততুল্যঞ্চ নিষ্ফলম্" তুমি না থাকিলে সমস্ত জগৎমৃততুল্য—সমস্তই নিষ্ফল? সে কখন কি জানিতে পারে তুমিই মহালক্ষ্মী, তুমিই মহাসরস্বতী তুমিই মহাকালী? যে তোমার কৃপা না পাইয়াছে সে কি কখন প্রার্থনা করিতে পারে "জিহ্বাগ্রে বসতে নিত্যং ব্রহ্মরূপা সরস্বতী" হরি! হরি! সকল দেবতা যে ব্রহ্মই—মূঢ়বুদ্ধিতে ইহার কি ধারণা হয়? একমাত্র সূর্য্যদেবই অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন। কালবশে কখন অন্ধকার কখন প্রকাশ আসিবেই। ইহা সকলেই দেখিতে পায়। কিন্তু হৃদয়ের অন্ধকার সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহাও দেখাইতে হয়। সমকালে অজ্ঞান দূর করা ও জ্ঞান প্রকাশ করা—ইহাই ভগবান্ আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়া থাকেন। যথাশক্তিতে মানুষের ইহাই অনুকরণীয়।

ভগবানের মূর্ত্তি হয় না ইহা অজ্ঞানের উক্তি মাত্র। ব্রহ্মসর্ব্বশক্তিমান্। যন্ত্র না হইলে যেমন শক্তির বিকাশ সকলে দেখিতে পায় না সেইরূপমূর্ত্তি না হইলে ঈশ্বরের শক্তি দেখা যায় না। অন্ধকার নাশ করিবার জন্য তিনিই সূর্য্যমূর্ত্তি

ধারণ করেন, ঈশ্বরের বিঘ্নবিধ্বংসিনী শক্তির নাম গণপতি আর পরমাত্মার জ্ঞান প্রকাশিকা এবং স্বয়ং জ্ঞানরূপা শক্তিই এই সরস্বতী। পরমব্যোম পরমব্রহ্মে সমস্ত দেবতা শক্তিরূপে বাস করেন "যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" ইহা শ্রুতিবাক্য "ইদংবিষ্ণুর্বিচক্রমে" বেদেই এই বামন অবতারের কথা বলা হইয়াছে।

মা! তুমিই জ্ঞানশক্তি। পশু কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান মতই কার্য্য করে কিন্তু মানুষের জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপরেও প্রতিষ্ঠিত; ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। এই দেবীর অন্য নাম বাগ্বাদিনী স্থূলসূক্ষ্ম কারণ ভাবে এই বাক্ই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। সমস্ত জগৎ বৈখরী বাকেই প্রতিষ্ঠিত। জগতে যত জীব আছে তাহারা কোন না কোন শব্দ উচ্চারণ করিতেছে সমস্ত বাকের দেবতা এই দেবী। ভারতের বিজ্ঞান এই দেবতার মূর্ত্তি দেখাইয়া দিতেছে তাই মায়ের উপাসনা, এই বাসন্তী পঞ্চমীতে বহু অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। অতি স্থূলবুদ্ধি হইতে অতি সূক্ষ্মবুদ্ধির ঋষি পর্য্যন্ত ইহাঁরই উপাসনা করেন। এই পূজা ব্যাপারে বালকেও যেমন আমোদপ্রাপ্ত হয়—ইহা দিয়া বালককেও যেমন সহজে ধর্ম্মপথে চালিত করা যায়, যেমন সহজে বালকের মধ্যেও ভক্তিশ্রদ্ধা আনয়ন করা যায় তেমনি এই দেবতার পূজা করিয়া জ্ঞানপথের অনুষ্ঠাতাও জ্ঞানলাভ করিয়া নিত্যানন্দে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হন। কি জ্ঞানী কি ভক্ত কি যোগী কি কর্ম্মী কে কবে ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিয়াছেন? তাইত দেবতার পরিচয় পাইয়া দেবতার পূজা করা আবশ্যক আর দেবতার কাছেই প্রার্থনা করা নিত্য আবশ্যক।

এস এস আমরা এই বাসন্তী পঞ্চমীতে ব্যাকুলপ্রাণে মায়ের মণ্ডপে যাই এস। শত প্রকারের দুঃখ শত ভাবে আজ ভারতকে আক্রমণ করিতেছে। সকল কুসংস্কার ছাড়িয়া মায়ের উপাসনা করি এস। সর্ব্বশুক্লা এই দেবীর চরণে চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পরাশি দিয়া দুঃখের কথা মাতাকেই জানাই এস। বলি এস মা আমাদের যে আর কেহই নাই—আমাদের যে সমস্তই কলুষিত হইয়া যাইতেছে—তুমি আমাদিগকে কৃপাকর—তুমি আমাদিগকে তোমার পূজার অধিকার দাও—তুমি আমাদিগকে তোমার সমাজ সেবায় অধিকার দাও—আমরা তোমার পূজা করিয়া—বিশ্বনরনারী বিজড়িত তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইয়া যেন যাই। তুমি যেমন সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ সেইরূপ আবার তোমাতে তোমার এই খণ্ডমূর্ত্তিতেও সর্ব্বজীবজন্তু পরিপূরিত এই দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষের

সমস্তই বিরাজমান রহিয়াছে। সকল দেখিয়া যেমন তোমাকে স্মরণ করিতে হয় সেইরূপ তোমাকে দেখিয়া তোমার মধ্যে সকলকেই পাওয়া যায়। আহা! এস আমরা ধ্যান করি। মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবনা করি এস—

তরুণ শকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নমঃ॥

নূতন চন্দ্রকলা মা তুমি কপালে ধারণ করিয়াছ, শুভ্রকান্তি তোমার, তুমি স্তনভারে নমিতাঙ্গী, শ্বেতপদ্মের উপরে তুমি উপবিষ্টা, তোমার করকমলে লেখনী ও পুস্তক শোভা পাইতেছে। তুমি বাগ্‌দেবতা—তোমাকে প্রণাম করিতেছি। মা! সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভে অধিকারী করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। তিনবার চন্দনচর্চ্চিত পুষ্প লইয়া ভক্তিভরে অঞ্জলি দাও! শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর আর প্রার্থনা কর মা বীণাপুস্তকধারিণি! মুরারিবল্লভা দেবি! সর্ব্বশুক্লাসরস্বতী—মা আমার জিহ্বাগ্রে বাস কর "জিহ্বাগ্রে সন্নিবেশ্যতাম্"; "মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী" মা আমাদিগকে বিদ্যাদান কর! যামিনীনাথ লেখালঙ্কৃত কুন্তলে—ভবসন্তাপ নির্ব্বাপণ সুধানদী ভবানি বিধিবল্লভা বাগ্‌দেবি! আজ অবিদ্যায় জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে—তুমি আমাদিগকে বিদ্যাদান কর; তোমার সাহায্যে আমরা যেন আত্মতত্ত্বের সহিত শিবতত্ত্বের মিলন দেখিয়া জীবন সফল করিতে পারি।

———

দেহ, এই রাজত্ব সমস্তই ত মিথ্যা—রাজত্ব করিতে গেলে ত মিথ্যার অনুধাবন করিতে হইবে—ইহার উত্তরে বলি ? তেমোর গুণে রাজা প্রজা সকলেই তোমাতে অনুরক্ত। প্রারব্ধবশে আগত অবশ্য ভোক্তব্য কর্ম্ম ও তৎফল—ইহা ত্যাগ করাও যুক্তিযুক্ত নহে এবং ইহাতে আসক্ত হওয়াও উচিত নহে। "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্য তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" এই ভাবে কর্ম্ম করিয়া যাও তুমি সব করিয়াও—কিছু করিলে না। তুমি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, তুমি কর্ম্মে কখন বদ্ধ হইবে না।

উপশম ৬

উপশম প্রাপ্তির প্রথম উপদেশ।

বশিষ্ঠ— ইমং বিশ্বপরিস্পন্দং করোমীত্যস্তবাসনম্।
প্রবর্ত্ততে যঃ কার্য্যেষু স মুক্ত ইতি মে মতিঃ ॥১

বিশ্বং—কৃৎস্নং। পরিস্পন্দং—শ্রুতিস্মৃতি সদাচারপ্রাপ্তব্যবহারং (অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ করোমি ইতি অস্তবাসনম্)

মানুষ ত কত কর্ম্ম করে—কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্ম আমি করি—এই বাসনা যাঁর অস্তমিত হইয়াছে—কিছু কর্ম্মই আমি করি না এই দৃঢ় প্রত্যয়ে যিনি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন তিনি মুক্ত ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।

মানুষ লৌকিক বৈদিক উভয়বিধ কর্ম্মই করে। কিন্তু কর্ম্ম করে ত প্রকৃতি। যে প্রকৃতি লৌকিক কর্ম্ম করেন তিনি মোহকরী প্রকৃতি; আর যিনি বৈদিক কর্ম্ম একাগ্রমনে করেন তিনি মোক্ষদাত্রী প্রকৃতি। আবার লৌকিক বা বৈদিক এই উভয়ের যাহাই করুন না—সেই কর্ম্মের দ্রষ্টা যিনি তিনি পুরুষ, তিনি আত্মা তিনি প্রকৃতি নহেন। হরি হরি ইহা একাগ্রমনে জপ যিনি করেন তিনি শুদ্ধাপ্রকৃতি আর ইহাও যিনি দেখেন তিনি পুরুষ, আত্মা এই তত্ত্ব—এই একমাত্র সত্য সিদ্ধান্ত যিনি

বুঝিয়াছেন—শাস্ত্রও গুরুমুখে শুনিয়া যাঁহার পরোক্ষজ্ঞান আসিয়াছে, তিনি আহার, ভ্রমণ বা বৈদিক কর্ম্ম যাহা কিছু করুন না তাহাতে তাঁহার আমি করি এই ভ্রম আর থাকে না। সকল কর্ম্ম করিয়াও আমি এই সমস্ত কিছুই করি না করেন প্রকৃতি আমি প্রকৃতি হইতে [illegible] ইহার দৃঢ় ধারণা যাঁহার হইয়াছে তিনিই মুক্ত।

রাম—প্রকৃতি হইতে আত্মা যে পৃথক ইহার অনুভবই মুক্তি। ইহার জন্য কর্ম্মগুলি প্রকৃতি দ্বারা কৃত হয়—আত্মা দ্রষ্টা—তিনি কাহারও সহিত মিশেন না। প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছেন আমি কিছুই করি না—এই তত্ত্বটি দৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়া যখন যে কর্ম্ম পড়িবে তাহাই করিয়া যাইতে হইবে—কর্ম্ম না করাও উচিত নহে এবং কর্ম্মে আসক্তি করাও উচিত নহে। বৃক্ষ যেমন বায়ু আসিলে নড়ে আবার বায়ু প্রবাহিত না হইলে স্তব্ধভাবে থাকে সেইরূপ কর্ম্ম আসিলে আসক্তি শূন্য হইয়া—ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর—আবার কর্ম্মপ্রবাহ থামিয়া গেলে আপন স্বরূপে থাক ইহাই ত আপনি উপদেশ করিতেছেন?

বশিষ্ঠ—হাঁ ইহাকেই উপশমের প্রথম উপদেশ বলিতেছি। কিন্তু মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া কোন কোন লোক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত নানাবিধ কর্ম্ম করে, এবং স্বর্গ হইতে নরকে আবার নরক হইতে স্বর্গে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। কেহ কেহ অকর্ম্মে বা নিষিদ্ধকর্ম্মে রত থাকে, কেহ বা সৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে, ইহারা নরক হইতে নরকে, দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে এবং ভয় হইতে ভয়ান্তরে পতিত হয়।

স্মৃতিও বলেন "বিহিতস্যানমুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ"
"অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি"।

কেহ কেহ বাসনাজালে জড়িত হইয়া স্বকর্ম্মানুসারে নরকোপভুক্ত দুষ্কর্ম্ম ফলে পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যকযোনি হইতে বৃক্ষলতাদি স্থাবর যোনিতে, আবার স্থাবর হইতে তির্য্যক দেহ প্রাপ্ত হয়। কোন কোন আত্মবিদ্ ধন্য পুরুষ মনের সাক্ষী যে আত্মা সেই আত্মবিচারপরায়ণ

হইয়া সংসারতৃষ্ণা বাসনা ছেদন করিয়া সেই পরম কৈবল্যরূপ পরমপদ লাভ করেন। রাঘব! পূর্ব্বে কতিপয় উৎকৃষ্ট জন্ম ভোগ করিয়া যাঁহারা এইজন্মে মুক্ত হন তাঁহারা রাজস-সাত্ত্বিক। ইহাঁরা জন্মগ্রহণ করিয়া শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং প্রাবৃট্‌কালীন কূটজ কুসুমের ন্যায় সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েন। সৌভাগ্য এখানে আত্মা-অনাত্মা বিচার, ইহামূত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই সাধনচতুষ্টয়। যিনি এইরূপ জন্ম পান, নির্ম্মলা ব্রহ্মবিদ্যা, বেণুতে মুক্তার ন্যায় তাঁহাতে আবির্ভূত হয়। শ্রেষ্ঠজনের ভাব, মনোহারীত্ব, সকলের সঙ্গে মিত্রতা, দুঃখীর উপর করুণা এবং পরোক্ষজ্ঞান তাঁহাকে আশ্রয় করে যেমন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা অন্তঃপুরে বাস করে সেইরূপ।

যঃ কুর্ব্বন্ সর্ব্বকার্য্যাণি পুষ্টে নষ্টেথ তৎফলে।
সমঃ সন্ সর্ব্বকার্য্যেষু ন তুষ্যতি ন শোচতি ॥১০
তমাংসীব দিবা যান্তি তত্র দ্বন্দ্বানি সংক্ষয়ম্।
শারদীব ঘনাস্তত্র গুণা গচ্ছন্তি শুদ্ধতাম্ ॥১১

যিনি সমস্ত কার্য্যই করেন কিন্তু সুফলের বৃদ্ধি বা ফলহানীতে লক্ষ্য থাকে না, সকল কার্য্যেই যাঁহার সমান ভাব, তজ্জনিত হর্য বা শোক যাঁর না হয়, দিবাগমে অন্ধকারের ন্যায় বা শারদাগমে মেঘের ন্যায়, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব তাঁহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বে মলিন থাকিলেও ধৃতিশ্রদ্ধালজ্জা ইত্যাদি সত্ত্বগুণ তাঁহাতেই শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। মারুত-পূর্ণ রন্ধ্র দ্বারা মধুর ধ্বনি বিশিষ্ট বেণু বা কীচক যেমন মৃগগণের আনন্দ-দায়ক সেইরূপ সদাচার পরায়ণ সাধুব্যক্তির সঙ্গ সকলেরই বাঞ্ছনীয় হয়। সাত্ত্বিক জন্মামনুষ্যগণকে সমস্ত সদগুণ আশ্রয় করে। বলাক ইব বারিদম্—বকপংক্তি যেমন মেঘের অনুগমন করে সেইরূপ জাতমাত্র সমস্ত দৈবীসম্পদ ঐরূপ ব্যক্তির অনুগমন করে। গুণসম্পূর্ণ ঐরূপ ব্যক্তি তখন গুরুর আজ্ঞাকারী হন, গুরু তখন পরম পবিত্র আত্মানাত্ম-বিবেক পথে তাঁহার বুদ্ধিকে নিয়োগ করেন। বিবেকবৈরাগ্যবান্ যিনি তিনি আপন গুণসম্পূর্ণ চিত্ত দ্বারা আত্মদেবকে একরূপ অর্থাৎ আনন্দ-

করস এবং দুঃখশূন্য অবস্থাতে দর্শন করেন। এইরূপ পুরুষ সুন্দর শান্তচিত্তে বিচার সহকারে প্রবোধ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমে মনকে আন্তরপুরুষ যে আত্মা তাঁহার মননে নিযুক্ত করেন। যাঁহারা সাত্ত্বিক—জন্মা তাঁহারা সুপ্ত মনোমৃগকে—অজ্ঞান নিদ্রায় সুপ্ত চিত্ত বালককে প্রথমেই প্রবুদ্ধ করেন, গুণবান্ পুরুষ যেমন গুণহীনকে প্রবুদ্ধ করেন সেইরূপ।

প্রথিত গুণান্ সুগুরূন্নিষেব্য যত্না
দমলধিয়া প্রবিচার্য্য চিত্তরত্নম্।
গতিমমলামুপযান্তি মানবাস্তে
পরমবলোক্য চিরং প্রকাশমন্তঃ ॥১৮

"তে" উক্তগুণসম্পন্নাশ্চরমজন্মানো "মানবাঃ" "প্রথিত গুণান্" প্রখ্যাতজীবন্মুক্তলক্ষণগুণান্ "সুগুরূন্" "যত্নাৎ" "নিষেব্য" তদ্দর্শন-যুক্তিভি"রমলধিয়া" "চিত্তান্তর্গতং রত্নং" প্রত্যগাত্মানং "প্রবিচার্য্য" পুনঃ রত্নপরীক্ষাবৎ মননেন পরীক্ষ্য "অন্তঃপ্রকাশম্" চিত্তান্তপ্রকাশং "পরং" প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্ম "চিরমবলোক্য" সাক্ষাদনুভূয় তৎসাক্ষাৎকারমাত্রেণ তদ্ভাব লাভ লক্ষণাং "অমলাং" মায়াতৎকার্য্য সর্ব্বমলনির্ম্মুক্তাং পরমপুরুষার্থ লক্ষণাং "গতিং" "উপ" সমীপে স্বস্থান এব "যান্তি" লভন্তে নোপাসকবৎ উৎক্রম্য লোকান্তরং গত্বেত্যর্থঃ ॥

পরমজন্মা সেই সমস্ত মানুষ জীবন্মুক্ত গুরুগণকে যত্নপূর্ব্বক সেবা করিয়া তৎপ্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা যে বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে তদ্দারা চিত্তের ভিতরে যে রত্ন আছেন যে প্রত্যগাত্মা আছেন রত্নপরীক্ষার মত মননের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া চিত্তের অভ্যন্তরে প্রকাশমান প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া এবং সাক্ষাৎমাত্রে তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া মায়া এবং মায়ার সমস্ত ব্যাপার রূপ মলিনতা নির্ম্মুক্ত গতিকে সমীপবর্ত্তী আপন বিশ্রামস্থান বলিয়া লাভ করেন—উপাসনা দ্বারা উপাসকেরা যেমন লোকান্তরে গমন করিয়া মুক্তিলাভ করেন সেরূপে নহে কিন্তু এই জগতেই স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন।

উপশম ৭

আকাশ ফল পাতবৎ জ্ঞান সম্প্রাপ্তি।

বশিষ্ঠ—গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে এক বা বহু জন্মে সিদ্ধি লাভ হয় ইহা হইতেছে মোক্ষের সাধারণ ক্রম। কিন্তু মোক্ষের আরও একটি বিশেষ ক্রম আছে। অল্প ব্যুৎপন্ন কেহ কেহ আপন বুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আকাশ হইতে ফল পতনের মত সহসা জ্ঞান প্রাপ্তিও হয়। রাম ইহার কথা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। চরম জন্মা মহাপুরুষেরা আকাশ ফল পাতবৎ সহসা যে আত্মজ্ঞান লাভ করেন তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি শ্রবণ কর।

——

উপশম ৮

সিদ্ধগীতা।

বিদেহ নগরে জনক নামে এক বীর্য্যশালী রাজা ছিলেন। তিনি উদার বুদ্ধি, তাঁহার আপদ সমূহ অস্তমিত এবং সম্পদ সমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি যাচকজনসঙ্ঘের নিকটে কল্পবৃক্ষ, মিত্ররূপ পদ্মের দিবাকর, বন্ধুলক্ষণ বিশিষ্ট পুষ্পসমূহের বসন্তকাল এবং নারীবৃন্দের কন্দর্প। দ্বিজরূপ কুমুদগণের নিকটে চন্দ্র, শত্রুরূপ অন্ধকাররাশির সূর্য্য, সৌজন্যরত্নের জলধি এবং পৃথিবীতে তিনি বিষ্ণুর ন্যায় অবস্থিত ছিলেন। বসন্তকাল-নবলতিকা সকল কুসুম বিকাশে প্রফুল্ল, মঞ্জরী-পুঞ্জের পিঞ্জরে মত্তবৎ বিজৃম্ভমান অতএব কোকিলালাপে যেন নৃত্য করিতেছে—এইরূপ বসন্তকালে রাজাজনক একদা সুবিলাসবতী কুসুমিতা লতারূপিণী অঙ্গনা সকলের লীলাবিলাস উপভোগ করিবার জন্য বাসবের নন্দনকানন প্রবেশের ন্যায় কোন এক রমণীয় উপবনে প্রবেশ

করিলেন। পুষ্পকেসর হইতে রজঃ সৌগন্ধ্যমকরন্দ কণাপহরণে সমর্থ —মন্দ মলয় সঞ্চারে সুশীতল সানুকুঞ্জে ক্রীড়াশৈলস্থিত লতাগৃহে— স্বীয় অনুচরবর্গকে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়া রাজা একাকী তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা তমালবন প্রদেশ হইতে তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই যেন অদৃশ্য সিদ্ধগণের আলাপ শ্রবণ করিলেন। হে কমললোচন! যে গাথা শ্রবণে শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ইতিহাস গীত পরমাত্ম ভাবনা স্বতঃই জাগিয়া উঠে আমি সেই নিত্য শৈল কন্দরচারী, নিজ্জন স্থানসেবী সিদ্ধগণের গীতা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

কতিপয় সিদ্ধ বলিলেন—

দ্রষ্টৃদৃশ্যসমাযোগাৎ প্রত্যয়ানন্দনিশ্চয়ঃ।
যস্তং স্বমাত্মতত্ত্বোত্থং নিঃস্পন্দং সমুপাস্মহে ॥ ৯

দ্রষ্টুশ্চক্ষুরাদিদ্বারা বিষয়প্রমাতুর্দৃশ্যেন স্রক্চন্দনবনিতাবিষয়েণ সমাযোগাৎ সন্নিকর্ষাৎ জাতে প্রত্যয়ে বিষয়াকারবুদ্ধিবৃত্তৌ স্বয়ং প্রথমানো য আনন্দরূপো নিশ্চয়স্তং তৎ স্বভাবমেব আত্মতত্ত্বপরিশোধনেন উত্থং নিরতিশয়ভূমাত্মনাবির্ভূতং স্বমাত্মানং নিঃস্পন্দং নির্ব্বিকারসমাধি নিরস্তবাহ্যান্তঃকরণ স্পন্দং যথাস্যাৎ তথা সমুপাস্মহে নিরন্তরমনুভবামঃ। অয়ম্ভাবঃ বিষয়াকারবৃত্তৌ স্বয়ং প্রথমান আনন্দো ন বিষয়কোটৌ জড়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি কর্ত্তৃকরণ বৃত্তি কোটৌ তেষাং কারকত্বেন তচ্ছেষতানুভববিরোধাৎ। তস্মাৎ সাক্ষি কোটাবেব। সাক্ষ্যেব হ্যবিদ্যাবরণ মন্দীকৃত চিদানন্দস্বভাবোঽস্যমহঙ্কারাত্মানং কল্পয়িত্বা তচ্ছেষতামিবাপন্নো বিষয়াকারবৃত্ত্যাবির্ভূতং স্বানন্দং তচ্ছেষতামিব নয়ন্ ন স্বাত্মানং নিরতিশয়ানন্দং প্রতিবুধ্যতেঽতস্তমেব স্বতত্ত্ববিচারোত্থ নিরতিশয়ানন্দ স্বভাবং সমাহিতেন মনসা বয়মুপাস্মহে। "এতস্যৈ বানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেব্রর্হ্মানন্দস্যৈবাবিদ্যয়া বিষয়াকার বৃত্তিপরিচ্ছেদেন বিষয়ানন্দত্ব বিভাবনাদিতি ॥

দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যবস্তুর যোগে একটা প্রত্যয় জন্মে। প্রত্যয় বলে

বিষয়াকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিকে। দ্রষ্টা তখন বিষয় আকারিত আপন চিত্তকেই দেখেন। যে চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বৃত্তিরূপে—ভিন্ন ভিন্ন বিষয়রূপে পরিণত হয় বলিয়া অতি চঞ্চল সেই চিত্ত কোন একটি দৃশ্য, বিষয়ের আকারে আকারিত হইলে. যখন স্থির হয় তখন তাহাতে একটা আনন্দের ছায়া পড়ে। এই যে আনন্দরূপ নিশ্চয় ইহা চিত্তের স্বভাব। আত্মতত্ত্বপরিশোধের দ্বারা উত্থিত নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ভূমা যে আত্মা তাহা দ্বারা প্রকাশিত নিজ আত্মা তখন নিঃস্পন্দ হইয়া যান—কোন সঙ্কল্প তখন থাকে না বলিয়া তাঁহার যে নির্ব্বিকল্প অবস্থা তাহাতে মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ স্পন্দ কিছুই থাকে না। চিত্তের এই সঙ্কল্পশূন্য অবস্থাতে প্রতিবিম্বিত যে ভূমানন্দের প্রকাশ আমরা তাঁহারই উপাসনা করি—নিরন্তর অনুভব করি।

ইহার ভাব হইতেছে—বিষয় আকারে আকারিত যে চিত্ত তাহাতে স্বয়ং প্রথমান হে আনন্দ—সে আনন্দ জড়বিষয় কোটিতে নাই আবার আনন্দ, ইন্দ্রিয় কোটিতেও নাই—ইহা আছে সাক্ষি কোটি সাক্ষিস্বরূপ যে আত্মা তাঁহাতে। সাক্ষি যিনি তিনি অবিদ্যা আবরণে মন্দীকৃত চিদানন্দ স্বভাব অন্য অহঙ্কার আত্মাকে কল্পনা করিয়া অহঙ্কারের শেষতা প্রাপ্ত হইয়াই যেন বিষয়াকার বৃত্তিতে আবির্ভূত আপনার আনন্দকে ঐ শেষতাতে আনয়ন করিয়া আপনার আত্মাকে নিরতিশয় আনন্দে পৌঁছাইতে পারে না। এই হেতু আত্মতত্ত্ব বিচার জন্য উত্থিত যে নিরতিশয় আনন্দ—আমরা আত্মতত্ত্ব পরিশোধ করিয়াছি বলিয়া ঐ নিরতিশয় আনন্দ স্বভাবকে সমাহিত মনে সর্ব্বদা উপাসনা করি—অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দই অবিদ্যা দ্বারা বিষয়াকারে আকারিত পরিচ্ছিন্ন চিত্ত-বৃত্তিতে বিষয়ানন্দরূপে ভাবিত হয়—এই তত্ত্ব জানিয়া আমরা ব্রহ্মানন্দ-কেই নিরন্তর অনুভব করি।

অন্যে উচুঃ।

দৃষ্টৃ দর্শন দৃশ্যানি ত্যক্ত্বা বাসনয়া সহ।
দর্শন প্রথমা ভাসমাত্মানং সমুপাস্মহে ॥ ১০

তমেবাত্মানং নিষ্কৃষ্য করতল—আমলকবৎ দর্শয়ন্ত ইবান্যে প্রাহুঃ।

দ্রষ্টৃ দর্শনেতি দ্রষ্ট্রাদি ত্রিপুটীত্যাগেনাবস্থাদ্বয় নিরাসঃ। বাসনয়া সহেত্যনেন তু তদুভয়বীজ বাসনা সম্ভৃত সৌষুপ্তাজ্ঞানস্যাপি নিরাস উক্তঃ। দর্শনাচ্চাক্ষুষ মানসাদিবৃত্তেঃ প্রথমং পূর্ব্বমেব তদুৎপত্তি সাক্ষিতয়া ভাসমানমিত্যনেন পূর্ব্বসিদ্ধস্ত্রিপুটীসাক্ষী সর্ব্বানুভবসিদ্ধো বিবিচ্য দর্শিতঃ। তমেব সবীজ ত্রিপুটীত্যাগবৎ তুরীয়মাত্মানং সমুপাস্মহ ইত্যর্থঃ॥ ১০

অন্য সিদ্ধগণ আত্মাকে করতলগত আমলকবৎ দর্শন করেন কিরূপে তাহাই বলিতেছেন। আমরা বীজের সহিত ত্রিপুটী ত্যাগ করিয়া তুরীয় আত্মার উপাসনা করি। দ্রষ্টৃ দর্শন ও দৃশ্য—ইহা হইল ত্রিপুটী। এই ত্রিপুটী ও ইহার সংস্কার ত্যাগ করা যায় সাক্ষী চৈতন্য আত্মাকে ধরিতে পারিলে। আমরা এই সাক্ষী চৈতন্যে তন্ময়তা লইয়া উপাসনা করি।

অন্যে উচুঃ।

> দ্বয়োর্ম্মধ্যগতং নিত্যমস্তি নাস্তীতি পক্ষয়োঃ।
> প্রকাশনং প্রকাশ্যানামাত্মানং সমুপাস্মহে॥ ১১

দর্শন প্রথমাভাসে সাক্ষিণি যে অস্তি নাস্তীতি বিপ্রতিপদ্যন্তে তান্ প্রত্যপি তদুভয়পক্ষাবিরুদ্ধং সাক্ষিণং দর্শয়ন্তোঽন্যে প্রাহুঃ দ্বয়োরিতি॥ যে তাবদস্তি দর্শন প্রথমাভাসঃ পরন্তু সোপি জন্য এব ন নিত্য ইত্যাহুস্তেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বতদাভাসানাং স্বপ্রকাশত্বে স্ববিষয়ত্বে বা স্বমাত্রভান পরিক্ষীণত্বাৎ পূর্ব্বোত্তর বিজ্ঞানাস্পর্শিত্বাচ্চ ন তদুৎপত্ত্যাদি সাক্ষিতা নির্ব্বহতীতি তৎ সাক্ষী অন্য আবশ্যক ইতি তৎপক্ষ মধ্যগতং তদবিরুদ্ধং যেপি নাস্তীত্যাহুস্তেষাং নাস্তিতায়া অপি নিঃসাক্ষীকায়া অসিদ্ধেস্তৎ পক্ষ সাধকত্বেন তন্মধ্যগতমিত্যর্থঃ। অথবা জগতঃ অস্তিত্বং আবির্ভাবাবস্থা-কার্য্যম্। নাস্তিত্বন্তু তিরোভাবা বস্থা কারণম্। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত" ইতি শ্রুতেঃ। তয়োরুভয়োরযৌগপদ্যাৎ পক্ষয়োঃ পাক্ষিকয়োরনুগত সন্মাত্ররূপেণ মধ্যগতমিত্যর্থঃ। অথবা অস্তি নাস্তীতি পক্ষয়োঃ কল্পিতবিরুদ্ধ কোট্যোর্দ্বয়োরপ্যধিষ্ঠানতয়া মধ্যগতমিত্যর্থঃ। অতএব কল্পিতনাস্তিত্বস্যাধিষ্ঠানাস্পর্শাৎ নিত্যং প্রকাশ্যানাং ভাবা-ভাবানাং প্রকাশকম্॥ ১১

“উৎসবের” নিয়মাবলী।

১। “উৎসবের” বার্ষিক মূল্য শহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৶০ আনা। নমুনার জন্য ।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে “উৎসব” প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে “উৎসব” “না পাওয়ার সংবাদ” না দিলে বিনামূল্যে “উৎসব” দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। “উৎসব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই-কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। “উৎসবের” জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. [illegible]

২৪শ বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩[illegible] সাল। [১১শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

১৩৩৬ সাল প্রায় শেষ হইল। "উৎসবের" চাঁদা এখনও অনেকের নিকট বাকি আছে। আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন দয়া করিয়া চৈত্র মাসের পূর্ব্বেই তাঁহাদের দেয় চাঁদা পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত এবং বাধিত করেন।

বিনীত—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

④ উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৪শ বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩৩৬ সাল। { ১১শ সংখ্যা

যৌবন।

দুই ধারে দুইজন: সায়াহ্ন-প্রভাত ;
তরুণ-স্বপনে মগ্ন সুখদ সুন্দর,
স্থবিরত্ব জীর্ণদেহ লভিয়া অপর,
দারুণ বেদন-ব্যথা অশ্রু একসাথ্।
প্রমত্ত অনল-তপ্ত লালসা-সমীর,
বিষম কটাক্ষ-তীক্ষ্ম সঘন নিশ্বাস,
তাণ্ডব নর্ত্তন,ঘোর তীব্র,শুষ্ক-হাস,
প্রলয় হুঙ্কার—নাদ প্রচণ্ড-গভীর।
মাঝখানে সবা'ল'য়ে খেলে অনুক্ষণ ;
ভীষণ মধ্যাহ্ন সেই—দুরন্ত যৌবন॥

শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ রায়,
নূরনগর, (খুলনা)

———

ভারতের জীবন-প্রবাহে—"ভাই ও ভগিনী"।

(১)

উপস্থিত সময়ে ঘরে ঘরে দুঃখ। দুঃখ দেখাইয়া বিশেষ কি হইবে যদি দুঃখের প্রতীকারের চেষ্টা না করা যায়? দুঃখ সকলেই ত দেখিতেছেন এবং ভুগিতেছেন। যাঁহারা নিজের উপরে না পড়িলে অন্যের দুঃখ দেখিয়াও দেখিবার অবসর পান না তাঁহারা মনুষ্য-স্বভাবের কোন্ স্তরে নামিয়াছেন তাহার বিশ্লেষণ করা আমরা এখানে আবশ্যক বোধ করি না।

"পতিতার আত্মচরি"তে দুঃখের ছবি দেখান হইয়াছে। ইহার প্রতীকার জন্য যাহাতে সমাজে সম্পূর্ণ চেষ্টা চলে গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহাই। নরনারী চরিত্রহীন হয় কেন, এই পুস্তকে তাহার প্রায় সকল কারণগুলিই উল্লেখ করা হইয়াছে। যুবক যুবতীর অবাধ মিলন-মিশ্রণ, প্রেমের নামে স্বাধীন প্রণয় বা কামের অভিনয়ে উন্মত্ততা, নরনারীর নিম্ন প্রবৃত্তির উত্তেজক যে সমস্ত অসার কাল্পনিক গল্পের উপন্যাস নাটকাদি সমাজে ছাইয়া পড়িতেছে তাহার অবাধ প্রচার—এবং অভিভাবকগণের এই সমস্ত সর্ব্বনাশকর অপবিত্র বস্তুর মধ্যে বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া—এই সকলের বিষময় ফল সমাজবৃক্ষে পুষ্পিত ফলিত হইতেছে। "পতিতার আত্মচরি"তে শিক্ষিতা পতিতা বলিয়াছেন, "সৎগ্রন্থ আমার চক্ষে পড়ে নাই।" অভিভাবক সেরূপ পুস্তক কখন পড়িতে বলেন নাই বা জানেনও না, শুধু তাই কেন, আমরা কোন বিদুষী মহারাণীর কথাও শুনিয়াছি—তাঁহাদের মনে এবং অধিকাংশ শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের প্রাণে ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, "বাঙ্গালা ভাষায় কোন পড়িবার মত পুস্তকই নাই—তার আর পড়িব কি"? অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় চরিত্রহীন, স্বাধীন-প্রণয়-লোলুপ মানুষেরা কথার ছলনায়, কোথাও গানের প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া, অল্পবুদ্ধি থিয়েটার-বায়স্কোপ-গামিনী, উপন্যাস নাটকাদি এবং ঐ ভাবের ইংরাজী গল্পের বই পড়িয়া বৃথা গর্ব্বিতা সমাজ-বিদ্বেষিণী, মদগর্ব্বে গুরুজন অবজ্ঞাকারিণী কিশোরী ও যুবতীগণকে উত্তেজিত করিয়া এমন অবস্থায় আনিতেছেন যেখানে ইহারা অভিভাবকগণের দৃষ্টি

হীনতায় এই সমস্ত ব্যক্তির প্রলোভনে পড়িয়া পরিবার ও সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। অভিভাবকগণের মনেই যখন ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয় "পড়িবার মত পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই, সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা আছে তাহাও তাঁহাদের পাঠের সীমার বাহিরে", তখন এই মিথ্যা প্রচার যে ভ্রষ্টবুদ্ধি মানুষের দ্বারা তাহাদের স্বার্থ সাধনোদ্দেশে সংঘটিত হইয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহাই ভারতবাসীর জাতীয়তা ত্যাগ করা—মুখে স্বদেশ স্বদেশ করিলেও পূর্ণ মাত্রায় বিদেশী হইয়া স্বদেশকে উৎসন্ন দেওয়া। নতুবা যে জাতির মধ্যে রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্টমহারামায়ণ এবং নিত্য নূতন মহাভারতাদি গ্রন্থ বঙ্গভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে, শুধু অনূদিত নয় কিন্তু, আজকালকার উপন্যাসের মত রামায়ণ মহাভারতও লিখিত হইয়াছে সে জাতির শিক্ষিত নরনারী কেমন করিয়া বলেন যে "বাঙ্গলা ভাষায় পড়িবার মত কোন পুস্তক নাই" ইহা বুঝা যায় না। অথবা যাঁহাদের ব্রত সমাজকে ধ্বংস করা তাঁহারাই যে রামায়ণ ও মহাভারতও যে অসার মিথ্যা গল্পের পুস্তক তাহা চারিদিকে প্রচার করিয়া মানুষকে একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিতেছেন। ভক্তি, শ্রদ্ধা, গুরুজন-সেবা এই সমস্তে অভক্তি উৎপাদন করিয়া মানুষকে একবারে উচ্ছৃঙ্খল করা যাঁহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাঁহারাই সমাজের এই পাপের বোঝায় যে উপযুক্ত সময়ে নিষ্পেষিত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই। পুস্তক লেখা যাঁহাদের ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে শুধু নিম্নপ্রবৃত্তির ভাব আঁকিতে গিয়া তাঁহারা যদি বিচারশূন্য গল্পই লেখেন, তাঁহারা যদি এই জাতির কোন কিছুই ভাল না দেখেন—আর তাঁহাদের বিচারবিহীন হৃদয়ের উদ্গারমাত্র সমাজে ছড়াইয়া সমাজকে দুর্গন্ধে ভরিত করিতে ক্রুটী না করেন তবে তাঁহাদেরও জানা উচিত—তাঁহাদের লেখা পড়িয়া যদি একটী মানুষও চরিত্রহীন হয়, একটি স্ত্রীলোকও অপবিত্রা হয় তবে এই সমস্ত গ্রন্থকারের জন্য এমন একস্থান খোলা আছে যাহাতে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। শুধু মানুষের নিম্নপ্রবৃত্তি উত্তেজনা করা তাঁহাদেরই স্বভাব যাঁহারা কোন সৎ গ্রন্থ বা সৎসঙ্গ সাহায্যে আপনাদের হৃদয় ও বুদ্ধিকে পবিত্র করিতে চেষ্টা না করেন। আমরা এই সমস্ত নষ্টবুদ্ধির কার্য্য উল্লেখ করিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ করি তথাপি আমাদের পবিত্র সমাজকে পিতামাতা মনে করিয়া সমাজের শেষ অবস্থাতেও যথাসাধ্য সমাজসেবা দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে চেষ্টা করিতে যাওয়াকেই আমরা কর্ত্তব্য মনে করি।

এখন আমরা "ভাই ও ভগিনী" পুস্তকখানিকে সাধু উপন্যাস বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। উপন্যাস আকারে না লিখিলে যখন লোকে পড়িতেই চায়না তখন এইভাবে উপন্যাস লিখিলেও সমাজের কল্যাণ হইতে পারে ইহাই আমরা বলিতে চাই, যদিও ভারতে সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গের অভাব এখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে না—হইতেও পারে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাহারা সত্যসত্যই অসৎ নিম্নপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ছাড়িয়া কল্যাণ পথে যাইতে চান তাঁহাদের জন্য সমস্ত উপাদান ভারতে এখনও আছে এবং চিরদিনই থাকিবে।

(২)

কোনও পুস্তক ভাল কি মন্দ ইহার বিচার হইবে তখন, যখন পুস্তকখানি পড়িয়া পবিত্রভাবে হৃদয় ভরিত হয়, আত্মদোষের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং হৃদয় জয় করিয়া দোষ সংশোধনের জন্য সৎবিচার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। শুধু মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেও সুন্দর পুস্তক লেখা যায় না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপায়ও মহৎ হওয়া চাই। দেশের ও দশের উপকার করিবার জন্য চেষ্টা, মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচায়ক সত্য কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য পতিত বা পতিতার সাহায্য গ্রহণ-রূপ উপায় অবলম্বন করিলে সেই শুভ উদ্দেশ্যের কখন সুফল ফলিতে পারে না এবং ঐ কার্য্য ক্ষণকালের জন্য চমৎকারিত্ব দেখাইলেও কখনও তাহা স্থায়ী হয় না।

"ভাই ও ভগিনী" পুস্তকখানিতে অন্ধ হৃদয়কে জয় করিতে হয় কিরূপে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া পুস্তকখানি পবিত্র ও সমাজহিতকর। কালের স্রোতে ইহার প্রধান চরিত্র উমাপতির হৃদয়ে বিপরীত তরঙ্গ উঠিলেও উমাপতি বিচার দ্বারা হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, গ্রন্থকার ইহা নিপুণভাবেই দেখাইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানিতে ঘটনার বিচিত্রতা নাই সত্য কিন্তু সাধারণ জীবনে যাহা ঘটে তাহাই গ্রন্থকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মানুষ যখন দুঃখ করে, বহিঃপ্রকৃতির কোন কিছুই আর আমার ভাল লাগে না—কোন কিছুই আর আমাকে রস দিতে পারে না—মনের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে হইবে রসের একমাত্র বস্তু যে ভগবান্ সেই ভগবানও এইরূপ ব্যক্তির চক্ষের অন্তরালে সরিয়া গিয়াছেন। ভগবান কোন কালেই

প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন না সত্য কিন্তু দুর্ভাগ্য মানব এত কলুষিত সামগ্রী দিয়া হৃদয় ও বুদ্ধিকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলে যে "সবই যে তিনি" তাহাও বিস্মৃত হইয়া একবারে নিরস হইয়া পড়ে। এই পুস্তকে বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং অন্তঃপ্রকৃতির বিচার সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। আবার বলি বিচার আছে বলিয়াই এই পুস্তককে আমরা পবিত্র বলিতেছি।

(৩)

"পূর্ণ যৌবনের দুকুলপ্লাবী উচ্ছ্বাসের মাঝে ইন্দ্রধনুনিভ রঙ্গিল আশায় নিরাশ হইয়া শরবিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় শেলাহত উমাপতি হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা জুড়াইবার জন্য সন্তাপহারিণী বারাণসীতে আসিয়াছেন"। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার গ্রন্থের একমাত্র নায়ক উমাপতিকে এইভাবে সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

প্রথম ছত্রেই যাহা লেখা হইয়াছে তাহার বিবৃতির জন্যই এই পুস্তক। ইহাই উৎকৃষ্ট নিপুণতা।

উমাপতি যুবক—সুন্দর পুরুষ। বিধাতা উমাপতিকে আনন্দময় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি সকলের সহিত মিশিতেন। "তিনি যেমন আপনি হাসিয়া সুখী হইতেন তেমনি অপরকে হাসাইয়া আনন্দলাভ করিতেন। কাহারও মনে বেদনা লাগিলে তাঁহার মুখ আঁধার হইবে এই ভয়ে তিনি কখনও কাহাকেও বেদনার কথা বলিতেন না। উমাপতি আঁধারমুখ ভালবাসিতেন না।" মোটামুটি উমাপতির স্বভাব এইরূপ। গ্রন্থারম্ভে এই স্বভাবের যুবক যৌবনের ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রধনুনিভ রঙ্গিল আশায় নিরাশ হইয়াছেন। হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে আসিয়াছেন বারাণসীতে। এই কয়টী কথার বিবৃতি করিতে গিয়া গ্রন্থপ্রণেতা দেখাইয়াছেন মানুষ যাহা ভুলিবার জন্য চেষ্টা করে তাহাই অন্য আকার ধরিয়া তাহার সম্মুখে আইসে। পূর্ব্বানুভূত সংস্কার লইয়া যিনি নবাগত অবস্থার বিচার করিতে পারেন তিনি জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারেন, গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র উপন্যাস খানিতে ইহাই দেখাইতেছেন।

কিন্তু এই যুবকের জ্বালা কিসের জ্বালা? এই জ্বালা জুড়াইবার জন্য বারাণসী প্রশস্ত কিরূপে? জ্বালা জুড়াইতে মানুষ কত কি করে, এই যুবক বারাণসীতে আসেন কেন?

নর নারীর জীবনের অত্যন্ত জটিল সমস্যা হইতেছে, মানুষকে এই সংসারে লইয়া আসে কে? কেন মানুষ সংসারে ভ্রমণ করে? কি করিতে আইসে, কিই বা করিয়া যায়?

মানুষের মনে প্রবিষ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব কামনা মানুষকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর ধরায়—আর মানুষ শরীর ভোগার্থ অহর্নিশ কর্ম্ম করে। স্থূল শরীর রূপ রসাদি ভোগের জন্য, সূক্ষ্ম শরীর সংস্কার ভোগের জন্য এবং কারণ শরীর যে "আমাকে আমি জানি না রূপ অজ্ঞান বা জ্ঞানের বিস্মৃতি" তাহা দিয়া অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি দিয়া সমস্ত ভোগ জন্য মানুষ সংসারে আসে—আর সর্ব্বকর্ম্মফল-দাতা ভগবান্ এই ভোগের সহায়তা করেন—কারণ ইহা ভোগ না করিয়া—প্রারব্ধ ক্ষয় না করিয়া মানুষ কখন আপন স্বরূপে যাইতে পারে না। সংসারে আইসে পূর্ব্ব সংস্কার ক্ষয়ের জন্য—বহুবিধ ঘটনা যাহা জীবনে ঘটে তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কামনা ক্ষয়েরই জন্য। কিন্তু মানুষ আপন আপন বুদ্ধিকে শাস্ত্রোজ্জ্বলা করিবার সুবিধা পায় না—অথবা সুবিধা পাইয়াও কুবুদ্ধি বশতঃ তাহা করে না বা তাহার বিকৃতি করিয়া ফেলে বলিয়া—কর্ম্মক্ষয় করিতে গিয়া অনেক নূতন কর্ম্ম বাড়াইয়া যায়, আবার পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিয়া কষ্ট ভোগ করিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়া যায়। এই পুনঃ পুনঃ গতাগতির সহায়ক হইতেছে বুদ্ধির বিচারের অভাব এবং জ্ঞানাঙ্কুশ প্রহারে মদোন্মত্ত গজেন্দ্র স্বরূপ মানুষের হৃদয়কে কুপথ ছাড়াইয়া সুপথে আনিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার অভাব।

যৌবনের দু'কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস উমাপতির হৃদয়কে অতি ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রধনুর মত শত আশায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। যৌবনে ইহা না হয় কার? বহু বহু জন্ম ধরিয়া মানুষ মিলনের জন্য বহু কর্ম্ম করে, বহু লোকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। হৃদয় কাহাকেও না দিতে পারিলে এই হৃদয় কিছুতেই জুড়ায় না। কিন্তু হৃদয় গ্রহণ করিবার পাত্র কে? অপাত্রে হৃদয় দিতে গেলে হৃদয় ব্যথা ত পাইবেই। হৃদয়ের বেদনাই ত মানুষের জীবনকে বিফল করিয়া ফেলে। গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থ যে অমর হইয়া রহিয়াছে আর যতদিন জগৎ থাকিবে ততদিন অমর হইয়া থাকিবে তাহার কারণ হইতেছে—এই সমস্ত অমর গ্রন্থে শোকগ্রস্ত হৃদয়ের কথা আছে এবং এইরূপ হৃদয় জয় করিতে হয় কিরূপে তাহারও সকল কৌশল প্রদর্শন করা হইয়াছে। শুধু হৃদয়ের উচ্ছাস আঁকিয়া গ্রন্থ লেখা—বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শিশু গ্রন্থকারের বৃথা ধূলা খেলা মাত্র। বালকের খেলা অতি ক্ষণস্থায়ী চিত্তবিনোদনের জন্য হইলেও ইহাতে কোন উপকার নাই। কল্পনা লইয়া মানুষ সদাই বিব্রত। নিজের কল্পনা যখন মানুষ দূর করিতে পারে না তখন যার তার অসার কল্পনায়

বোঝা হৃদয়ে চাপাইয়া অন্ধ হৃদয়কে আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া মানুষকে দুঃখী করা—সাধু পুরুষের কার্য্য নহে। হৃদয় জয় করিতে হয় কিরূপে তাহা যদি দেখাইতে পার পুস্তক লেখ নতুবা নিজের হৃদয় গঠনের চেষ্টা কর—বই লিখিয়া নিজে মজিও না, অপরকে মজাইও না।

বলিতেছিলাম উমাপতি কলিকাতার কোন বালিকা বা কিশোরী বা যুবতীকে হৃদয় দিতে গিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছেন। নারীর কপটতা, নারীর হাতে-রাখা-ভালবাসা, নারীর বিশ্বাসঘাতকতা, একনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বহু নিষ্ঠায় ভালবাসার ব্যবসা, উমাপতির কোমল হৃদয়কে শরবিদ্ধ কুরঙ্গের মত শেলাহত করিল। গ্রন্থকার লিখিতেছেন "হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে হইল দেখিয়া উমাপতি স্থির করিলেন যে জীবনে আর কখনও এমন করিয়া হাসিবেন না এবং যতদূর সম্ভব আর কাহারও সঙ্গে—বিশেষ কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে, আর মিশিবেন না—কোন বালিকার সঙ্গেও না। তাঁহাকে তাঁহার স্বভাবের প্রতিকূলে চলিতে হইত।" যিনি হৃদয় জয় করিতে চেষ্টা করেন, যিনি ভাল হইতে চান তিনিই জানেন ইহা কত কষ্টকর। উমাপতির এমনই স্বভাব যে বালক বালিকার প্রফুল্ল আনন দেখিলেই তাঁর প্রাণ নিমিষেই বাহির হইয়া তাহাদের প্রাণে মিলিত ও খেলিত। উমাপতি প্রতিবারেই সতর্ক হইতেন এইরূপ আর হইতে দিবেন না। যিনি কাহাকেও ব্যথা দিতে চাহেন না তিনি ঐ ভাবে সমাজে থাকিবেন কিরূপে? পাছে পরিচিত জনসমাজে অবস্থিতি করিলে তাঁহার এই নবীন সঙ্কল্প অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এই শঙ্কায় তিনি অপরিচিত পুণ্যভূমিতে যাইবেন। নিত্য এতদিন যাহাদের সহিত অকপটে হাসিয়াছেন, খেলিয়াছেন এক্ষণে হঠাৎ তাহাদের সহিত হাসি খেলা বন্ধ করিতে পারিবেন কিনা এই ভয়ে কুসুম কোমল যুবক পরিচিত স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অপরিচিত প্রদেশে পরিচিতের প্রিয়মুখ আর নয়নে পতিত হইবে না, এবং নূতন কাহারও সহিত তিনি আর পরিচয় করিবেন না,—তাহা হইলেই কালে তাঁহার সৌহার্দ্দ্য প্রবণ হৃদয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিবে, তখন তিনি একপ্রকার নূতন মানুষ হইয়া পুনরায় পরিচিত প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ইহাই উমাপতির স্থির ছিল।

ইহাই হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম। এ সংগ্রাম যাহার নাই সে কি কখন ভাল লোক হইতে পারে? হয়ত বিচারে দোষ থাকিতে পারে—হয়ত বিচার ঠিক মত ধরা হয় নাই—সে কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাহাতে একবার ঠকিয়াছি সে

কাজ আর করিব না—এই যাঁহার সঙ্কল্প তাঁহার সহায় "স্বয়ং তিনি"। প্রাণ ত কতই পাগলামী করিবে কিন্তু এই পাগল প্রাণকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতেই হইবে—উমাপতি এই নিশ্চয় করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন।

উমাপতি সাধুসঙ্গও করিতেন। তাঁহার পরিচিত কোন সাধু উমাপতিকে ভালবাসিতেন! সাধু তাঁহার কোন শিষ্যকে বলিয়াছেন সেইজন্য উমাপতি ৺কাশীধামে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন।

উমাপতির মধুর স্বভাবে উমাপতি সকলেরই প্রিয় হইলেন। আর কাহারও সহিত মিশিবেন না—কিন্তু উমাপতি শত চেষ্টা করিয়াও নিজের সঙ্কল্প ঠিক রাখিতে পারিলেন না।

ইহাই ত নিয়তির পরিহাস। ভিতরে পুঞ্জীকৃত আকাঙ্ক্ষা পোরা আছে—ভোগ না হইলে আকাঙ্ক্ষার শেষ ত হইবে না, সেইজন্য সেই স্ত্রীলোক সঙ্গ অন্যরূপে আসিল। ইহাতেও যে হৃদয় বিচারবান সেই হৃদয়ের সহায় আর একজন। নিয়তির পরিহাসও আর একজনের কাছে শুভ। গৃহস্থের দুই কন্যা—ছোটটির বয়স ৯ বৎসর নাম মেনকা; বড়টি কিশোরী বা যৌবনের সীমায় পা দিয়াছে নাম সরযু। গ্রন্থকার উমাপতি ও সরযুর হৃদয় মিলনে মধ্যস্থা বা দূতী পাইলেন এই মেনকাকে। গ্রন্থকার কৌশলে এই নয় বৎসরের বালিকাকে দূতী সাজাইয়াছেন। কোথাও অস্বাভাবিকতা নাই—সহজ ভাবে এই দূতীগিরি হইয়াছে—বালিকা জানে না তথাপি দূতী সাজিয়াছে। সকল কথা বলিবার অবসরও আমাদের নাই আর বলিবার স্থানও নাই। যাঁহারা পুস্তক পাঠ করিবেন তাঁহারা দেখিবেন চমৎকার ভাবে—প্রকৃতির বর্ণনার রসান দিয়া—মেনকা ও সরযুর হৃদয় আঁকা হইয়াছে।

যাহা মন হইতে সরাইবার জন্য উমাপতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহারই অভিনয় বারাণসীতেও বিশেষ ভাবে হইতে চলিল।

উমাপতি ৺কাশীতে আসিলেন—হৃদয়ের পাগলামী ছাড়াইবার জন্য। কিরূপে ছাড়িবে? "বারাণসীধামে ত্রিসন্ধ্যা নিয়মিত ভাবে করিবেন; বারানসীর ঈশ্বর বিশ্বেশ্বর ও ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা এই কার্য্যে সহায়তা করিবেন আর —আর সপ্তপাতক সংহন্ত্রী, সপ্তোদুঃখবিনাশিনী শিবমৌলী বিহারিণী, পতিত পাবনী জাহ্নবী তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করিবেন এই জন্যই উমাপতি আসিয়াছিলেন ৺কাশীধামে। উমাপতি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা কিন্তু হইল না। "যে নারী হইতে হৃদয়ে আঘাত লাগিল সেই নারী জাতির কাহাকেও তিনি

কখনও ভালবাসিবেন না"—কিন্তু সরযূর অকপট ভালবাসায়—উমাপতির মনে অন্যভাব আসিল। উমাপতি নির্জ্জন পাইলেই ভাবিতেন "কেন এমন হইল? তিনি ত স্ত্রীজাতিকে জীবনে ভালবাসিবেন না স্থির করিয়া রমণীর মুখ বিস্মৃত হইবার জন্য দূরে এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়াছেন। তবে আজ এই প্রভাতে এই মুখখানির স্পর্শে স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিতেছে কেন? তবে কি রমণীর হৃদয় আছে? যদি রমণীর হৃদয় থাকিবে তাহা হইলে সে এমন করিবে কেন? যাহাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন সে কেন এমন করিবে? হইতে পারে সে মন্দ, হইতে পারে তাহার নিজের হৃদয় কপট, তাহা বলিয়া সমগ্র নারী জাতিই কপট হইবে কেন? রাজা দশরথ দেবী কৈকেয়ীর ব্যবহারে ভীষণ কপটতা দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে কপট বলিয়াই পরক্ষণে কৌশল্যা দেবীকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন আমি সকল স্ত্রীলোককে কপট বলি না কিন্তু ভরতের মাতাকেই বলিতেছি। ইহাই ত প্রায় মনুষ্যের হয়। কি জানি যৌবনে নর নারীর শোণিতে কোন এক কীট বসতি করে যাহার জন্য রূপজ মোহে এবং গুণজ মোহে মানুষ অভিভূত হইয়া স্বরূপ দেখিতে ভুলিয়া যায়। তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান যাঁহারা সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সাহায্যে স্বরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া যথায় তথায় সেই এককেই স্মরণ করিয়া অন্য সমস্ত সৌন্দর্য্যকে সেই একের অঙ্গে ভাসিতে দেখিয়া—সব সরাইয়া সেই একের মাধুর্য্য, সেই একের বিভূতি লইয়াই থাকিতে পারেন। বিনা সাধনায় ইহা হইতেই পারে না। আপনি এক লইয়া থাকিয়া যথাপ্রাপ্ত অপরকে সেই একের সাধনায় নিয়োগ করা—ইহাই ভালবাসার ভিত্তিভূমি। যেখানে ইহা নাই সেখানে অনুরাগ যেমন হইয়াই আসুক না কেন এ অনুরাগের পর্য্যবসান কামে—কামেই অনুরাগকে বা প্রেমকে গ্রাস করিয়া হৃদয়কে হাহাকারে ভরিত করিবেই। এই জন্য হৃদয়কে জয় করিতে চেষ্টা যিনি না করেন তিনি প্রেমিক নহেন কামুক—তা স্ত্রীলোকই হউক বা পুরুষই হউক। ভাই ও ভগিনীতে এই হৃদয় জয়ের কথাই আছে। গ্রন্থকার উপন্যাসপ্লাবিত এই বঙ্গ নর নারীর মধ্যে কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য—মদোন্মত্ত গজেন্দ্র তুল্য অন্ধ হৃদয়কে শুভ পথে ফিরাইবার জন্য—এই একপ্রকার নূতন পন্থা ধরিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা জানি না কোন গ্রন্থকার এইরূপ পন্থা ধরিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন কিনা। ভাই ও ভগিনী প্রণেতা সরযূ ও উমাপতির কথা বার্ত্তায় উমাপতির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "দেখ সরযূ! যদি জীবন-

প্রভাতেই বুঝিতাম যে ভাই ও ভগিনী সম্বন্ধে পুরুষ ও রমণীর যে আনন্দ তাহার তুলনায় প্রণয় ও প্রণয়িনী সম্বন্ধের আনন্দ অকিঞ্চিৎকর তাহা হইলে যে যাতনা বিস্মৃত হইতে তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলাম সে যাতনা কখনও ভোগ করিতে হইত না।”

হৃদয় জয়ের কথা আমরা লক্ষ্মণে পাই—অর্জ্জুনেও পাই। লক্ষ্মণের কথা এখানে উল্লেখ করিব না—অর্জ্জুনের কথা একটু বলিব। স্বর্গ সুন্দরী উর্ব্বশী অভিযাচিকা হইয়া অর্জ্জুনের নিকট আসিয়াছেন—অর্জ্জুনের রূপে অর্জ্জুনের গুণে লুব্ধা হইয়া আসিয়াছেন। একে উর্ব্বশী তাহার উপরে মনোহর বেশ। আর কেহ নাই। অর্জ্জুন আপন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে। অর্জ্জুন কিন্তু হৃদয় জয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন—উর্ব্বশীকে বলিয়াছিলেন আমি আপনাকে যে ইন্দ্রসভায় পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছিলাম সে কেবল আপনি আমাদের কুলের জননী বলিয়া; শেষে বলিলেন “কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রানী” আমি আপনাকেও সেইরূপ জানি। “কুলের জননী ক্ষমা করিবে আমারে।” যা বলিয়া অর্জ্জুন উর্ব্বশী হইতে ফিরিলেন—উর্ব্বশীকেও ফিরাইলেন। হৃদয় জয়ের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায়?

আর একবার বিরাট অন্তঃপুরে উত্তরা বৃহন্নলার রূপে গুণে মুগ্ধা হইয়া অর্জ্জুনকে ভালবাসিয়া ছিলেন। অর্জ্জুন এক বৎসর ধরিয়া উত্তরার সঙ্গ করেন। বিরাট রাজা অর্জ্জুনকে উত্তরা দিবেন—রাজা যুধিষ্ঠিরও মত দিলেন কিন্তু অর্জ্জুন উত্তরাকে বিবাহ করিলেন না। লোকে ভাবিতে পারে এক বৎসর এত মেশামিশির পরে অর্জ্জুন কি ঠিক ছিলেন—যাঁহারা কখন সংযম কি তাহার ধার ধারেন না—তাঁহারা ত ইহা বিশ্বাস করিতেই পারেন না কিন্তু এই মহাপুরুষ সকল প্রকার লোক নিন্দার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য যাহা করিলেন আর আপনার ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ যেরূপে রাখিলেন তাহা আর কোথায় দেখা যায়? যে যুবতী একবৎসর ধরিয়া আপন প্রাণ অর্জ্জুন চরণে লুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন—শত সহস্র ভাবে দেখাইয়াছিলেন অর্জ্জুন না হইলে উত্তরা বাঁচিবেনা—এই পুরুষ আপনাকে রক্ষা করিলেন উত্তরাকে পুত্রবধূ করিয়া। ভাই ও ভাইভগিনীতে যে আদর্শ ধরা হইয়াছে তাহা আজকালকার দিনে সম্পূর্ণ নূতন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য জয় যুক্ত হউক।

যাহা হউক—সমস্ত গ্রন্থ ধরিয়া যে প্রণয় ফুটিতেছিল তাহার পূর্ণতা আসিল অষ্টম পরিচ্ছেদে, কবি বলিতেছেন—

"আজি রাস-রজনী। গভীর মধুযামিনী। অনন্ত বিস্তৃত, মেঘস্পর্শ পরিশূন্য গগনে সুধাংশু ষোলকলার রূপরাশিতে সমুদিত। সেই রূপরাশি বেষ্টন করিয়া, সুনীল গগনতল উজ্জ্বল করিয়া, সুখস্বপ্নে বিভোর সংখ্যাতীত নক্ষত্র নিকর। নিশাকরে ও নক্ষত্র নিকরে নীলিমাময়, নভোমণ্ডল এক অব্যক্ত সৌন্দর্য্যে ও ভাব সম্পদে পরম মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে।" এই রাস-রজনীতে রাস রসোল্লাস কল্লোলে আজ বারাণসী কেমন এক অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে। ক্রমে রজনী নিস্পন্দ হইল—এমন সময়ে কে গাহিয়া গেল।

"ন সো রমণ ন হাম রমণী,
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি"

উমাপতি ও সরযূ উভয়ের প্রাণে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিল এই সঙ্গীত। কবি ইহার পর অধ্যায় গুলিতে প্রণয়ের আর যাহা অবশিষ্ঠ ছিল সমস্তই নিপুণ তুলিকায় আঁকিয়াছেন। উভয়েই উভয়ের হৃদয় চিনিয়াছেন—উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট। মধুরে মধুরে মিলন হইলেই হয়। উভয়েই অন্তর্গূঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে চঞ্চল। শেষে নির্জ্জন স্থানও মিলিল।

উমাপতি সরযূকে বলিলেন আমাদের বিবাহ হইতে পারে না, গ্রন্থকার যে কয়েকটি বিচার দেখাইছেন—সেই দিকে যাঁহাদের দৃষ্টি আছে—যাঁহারা যৌবনের উচ্ছ্বাসে সমাজের পবিত্রতা, গুরুজনের উপর ভক্তিশ্রদ্ধা ইত্যাদির জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে না শিখিয়াছেন—যাহারা সকলের সম্মান রক্ষা করিয়া নিজেকে সকলের জন্য বিকাইতে না শিখিয়াছেন তাঁহারা উমাপতির বিচার কে গ্রহণ করিতে পারিবেন কি? না পারুন ক্ষতি নাই। গ্রন্থরচয়িতা কিন্তু দেখাইয়াছেন—এই পথই পবিত্র পথ—ইহাই হৃদয় জয় করিয়া পবিত্র হইবার কৌশল। এই পুস্তক আজ কালকার অপবিত্র চিত্র অঙ্কনের প্রতি প্রতিক্রিয়া। সংযম শিক্ষা না করিলে সমাজ ক্রমে আরও অধোদিকে নামিবে—এবং শত শত ব্যাভিচারে নর নারীর হৃদয়ে বিষম হাহাকার তুলিবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানির বিদায় দৃশ্যেও কিছু নূতনত্ব আছে। পুস্তক কি বিয়োগাত্মক না মিলনাত্মক? ইহা বিয়োগাত্মকও নহে, মিলনাত্মক ও নহে—উভয়াত্মক। বাহিরে বিয়োগ কিন্তু ভিতরে প্রধান চরিত্রের মিলন আদর্শে, ও তজ্জনিত আনন্দ অনুভূতিতে।

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিদায় দৃশ্য। যে বাড়ীতে উমাপতি স্থান পাইয়াছিলেন, বিদায় কালে সকলেই শোকমগ্ন। শান্ত হৃদয় অশীতিপর বৃদ্ধ এবং মহিমময়ী বর্ষীয়সী বৃদ্ধা—উভয়ের চক্ষে অশ্রুজল। সরযূর অবস্থা বর্ণনাতীত। মেনকা ধুলায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। আর উমাপতি? কোমল হৃদয় উমাপতিও সকলের দুঃখে উদ্বেল-হৃদয়। কিন্তু সে হৃদয়ের অতি গভীরতম প্রদেশে একটা বিজয় উল্লাসের মধুর ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়টি চারিছত্রে। গ্রন্থরচয়িতা লিখিতেছেন "চলিষ্ণু বাষ্পীয়শকটের উন্মুক্ত গবাক্ষ কক্ষে কৃষ্ণপক্ষের গভীর-নীল গগনভালে যখন ইন্দুলেখা নয়নগোচর হইল তখন নির্ম্মল-নভসম হৃদয় গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া উমাপতি দেখিলেন সেই গগনেও মধুর, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ চন্দ্রকলার দ্যুতি খেলিতেছে।"

হৃদয় গগনে চন্দ্রকলার দ্যুতি খেলে তখন যখন মানুষ আপনার হৃদয় জয় করিতে পারে। বাঙ্গলা দেশে এই পুরাতনের নূতন অভ্যুদয় দেখাইতেই এই গ্রন্থ। পুরাতনের এই সময়োপযোগী মহিমাময়ী নূতন ঘোষণা তরুণ সমাজে সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হউক, গ্রন্থপ্রণেতার সহিত সমালোচকের ইহাই প্রার্থনা।

ভগবানের অনুগ্রহ।

অনেক জীব ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে না, অনেক মানুষও করে না—আবশ্যকতাও মনে করে না। এইরূপ মানুষ মনের জ্বালা জুড়াইবার জন্য বহু কুকর্ম্ম করে। স্ত্রী-বিয়োগে, কিম্বা সম্পত্তি বিনাশে যখন মন অতিশয় অস্থির হইয়া উঠে, যখন মনের যন্ত্রণা—মনের উৎকট ভাবনা—কিছুতেই দূর করিতে পারে না—তখন এইরূপ মানুষ বহুবিধ কুকর্ম্ম সাহায্যে মনের তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করে; কামিনী-কাঞ্চনের বিয়োগে কতলোক মদ্য-পানাদি পাপ কর্ম্ম দ্বারা মনকে ক্ষণিক দুঃখ ভুলাইতে চেষ্টা করে। এই সকল

মানুষ যদি জানিত—বা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিত—যদি জীবনে সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সাহায্যে এবং উপাসনা করিয়া করিয়া মনকে যে শান্ত করা যায়—ইহা কখনও অনুভব করিত—তবে এই সমস্ত মানুষ পাপপথে নিজের শত দুর্গতিকে ডাকিয়া না আনিয়া—ভগবানের অনুগ্রহ মাত্রই অবলম্বন করিতে প্রাণপণ করিত। যাঁহারা নিজের সকল পুরুষার্থ প্রয়োগ করাকেও ভগবানের অনুগ্রহের ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে পারেন—বা সকল কার্য্যে সকল বাক্যে সকল ভাবনাতে প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করিয়াও ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছেন। হায়! যিনি ভিন্ন আত্তিহর প্রভু আর কেহই নাই, তাঁহাকে না ভজিয়া কে কবে এই সদা দুঃখময় সংসারসাগর পার হইতে পারে? হায়! মানুষ অবিরত সংসার ভাবনাই ভাবে, কিন্তু সংসার ভাবনা ছাড়িতে না পারিলে তাঁহাকে ত দেখা যায় না তাই শাস্ত্র বলেন—

"অবিরত ভব ভাবনাতিদূরং।
ভব বিমুখৈর্মুনিভিঃ সদৈব দৃশ্যম্॥"

অবিরত সংসার ভাবনা যাদের তাদের নিকটে অতিদূরে তিনি আর সংসার ভাবনা মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া যে সমস্ত মননশীল তাঁহাকেই ভজেন তাঁরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখেন আহা! এই সমস্ত লোক তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে আর কি কোন উপায় আছে? ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন মানুষের কোন কিছুই যে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না কারণ জীবচৈতন্যের পূর্ণতাই ঈশ্বর চৈতন্য।

ভ্রান্তলোকে বলে—লোকে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী না হইয়াও ত কত কর্ম্ম করে এবং উন্নতি লাভও করে দেখা যায়। দেখা যায় সত্য, কিন্তু যাঁহারা অহং অভিমানে কার্য্য করেন তাঁহাদের শেষ রক্ষা কখন হয় না কখন হইতেই পারে না।

লৌকিক জগতেই বল বা ধর্ম্ম জগতেই বল ভারতের ধর্ম্ম ছিল সকল কার্য্যে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করা। এতদ্ভিন্ন মানুষ কখন আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিবে না। যাঁহারা স্বভাববাদী শাস্ত্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনাদর করিয়াছেন বলিয়া আমরা স্বভাববাদীর কোন কথাই এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করিনা। ইন্দ্রিয় যাহা চায়, মন যাহা ভোগাকাঙ্ক্ষা করে তাহাই তাহাদিগকে দাও এই উপদেশ যাহাদের তাহারাই স্বভাববাদী।

শাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায় যদি কেহ দ্বেষভাবেও ঈশ্বরের চিন্তা করিতে পারেন তিনিও ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হয়েন। একজন অতি পাপিষ্ঠ সকলের উপর বড় দ্বেষ করিত। সে কেবল ভোগ লইয়াই উন্মত্ত ছিল। শেষে তাহার পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে এমন হইল যে কোন কিছু ভোগ করিতে গেলেই মনে হইত যেন কেহ তাহাকে শরবিদ্ধ করিত। শেষে তাহার মনে প্রতিভাত হয় কোন কিছু ভোগ করিতে গেলেই ঈশ্বর যেন তাঁহাকে শর লইয়া তাড়া করেন। এই দুর্বৃত্ত ইহাতেই সমস্ত ভোগ ছাড়িয়া সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে ঈশ্বরের ভাবনাই করিত। ইহাতেই তাহার সদ্গতি হয়।

ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন যখন জীবন কিছুতেই চালান যায় না তখন প্রসন্নতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলিতেছেন তাহাই অগ্রে দেখান উচিত। ভগবানের অনুগ্রহ ভগবানের প্রসাদ সম্বন্ধে সূতসংহিতা জ্ঞানখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

প্রসাদেন বিনা দেবাঃ প্রসাদেন বিনা নরাঃ।
প্রসাদেন বিনা লোকা ন সিধ্যন্তি মহামুনে॥ ১৩
প্রসাদাৎ দেবদেবস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমাগতঃ।
বিষ্ণুর্বিষ্ণুপদং প্রাপ্তো রুদ্রোরুদ্রত্বমাগতঃ॥ ১৪
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ মহেশ্বরঃ।
আরাধ্যতে প্রসাদার্থং ন দুর্বৃত্তৈঃ কদাচন॥ ১৫
যস্মিন্ প্রসন্নে সর্ব্বেষাং পুষ্টির্জায়তে পুষ্কলা।
অহো তেন বিনা লোকশ্চেষ্টতেঽন্যত্র মায়য়া॥ ১৬
বর্ণাশ্রম সমাচারাৎ প্রসন্নে পরমেশ্বরে।
সাক্ষাৎ তদ্বিষয়ং জ্ঞানমচিরাদেব জায়তে॥ ১৭
জ্ঞানাদজ্ঞান বিধ্বস্তি ন কর্ম্মভ্যঃ কদাচন।
অজ্ঞানে সতি সংসারো জ্ঞানে স কথমুচ্যতে॥ ১৮

ভগবানের প্রসন্নতা ভিন্ন দেবতা সকল, প্রসাদ ভিন্ন মনুষ্য সকল, প্রসাদ ভিন্ন লোক সকল—হে মহামুনে কখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সেই দেবদেবের প্রসাদে ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন; বিষ্ণু বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন এবং রুদ্র রুদ্রত্ব লাভ করেন। বর্ণাশ্রম আচার পালনকারী পুরুষেরা মহেশ্বরের প্রসাদ-লাভ জন্য তাঁহার আরাধনা করেন—দুর্বৃত্তেরা কখন তাহা করে না। যিনি প্রসন্ন হইলে সকলের শ্রেষ্ঠ পুষ্টি লাভ হয়, আহা! তাঁহার প্রসন্নতা লাভে চেষ্টা না করিয়া মানুষ মায়াবশে অন্যত্র উন্মত্ত চেষ্টা করে। বর্ণাশ্রম পালনে পরমেশ্বর

যখন প্রসন্ন হন তখন পরমেশ্বর সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান শীঘ্রই উৎপন্ন হয়। জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নাশ হয়, কর্ম্মদ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় না। অজ্ঞানেই সংসার, জ্ঞানে সংসার কিরূপে থাকিবে?

ভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য যাহারা চেষ্টা করে না—কর্ম্ম করে না, তাহারাও ত কত কর্ম্ম করে—সে সব কর্ম্ম কিন্তু অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার বা মায়াদ্বারা তাড়িত হইয়াই কৃত হয়। অহো মায়া নিতান্ত দুরত্যয়া। এই মায়া সকল প্রাণীকে মোহে নিপাতিত করে। এই মায়াই অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মবশে মানুষকে সর্ব্বদা অহং অহং—মম মম করাইয়া পাপপঙ্কেনিমজ্জিত করে। এই আমি আমি—আমার আমার হইতে মুক্ত হইতে মানুষের সাধ্য নাই, এই জন্য ভগবানের আশ্রয় লইতে হয়; তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কিছুতেই মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

এখন ভগবানের প্রসন্নতা কি উপায়ে লাভ করা যায় গীতা শাস্ত্র হইতে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হউক।

ইহার আলোচনার পূর্ব্বে আর একটী কথার অবতারণা করা যাইতেছে।

সংসারে গুরু আচার্য্য পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি প্রভৃতি গুরুজন আছেন। তুমি কি কখন কাহাকেও প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছ? প্রসন্ন করিতে হইলে কি করিতে হয় তাহা কি তুমি জানিয়াছ? শুধু জোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি কাহাকেও প্রসন্ন করা যায়? না—প্রসন্ন করিতে হইলে তাঁহাদের অভিলষিত কর্ম্ম করিতে হয়? আজ্ঞা পালন না করিয়া কখন কোন গুরুজনকে প্রসন্ন করা যায় না। আজ্ঞাপালন—আনন্দের সহিত পালন ইহাই হইতেছে প্রসন্নতার ভিত্তি। জীবনে যিনি গুরুকে—গুরুজনকে কর্ম্ম দ্বারা প্রসন্ন না করিয়াছেন তিনি ভগবানের প্রসন্নতার আনন্দ জানিবেন কিরূপে? সকলকে অসন্তুষ্ট করিয়া কার্য্য করিলে হৃদয়ে যে পাপরাশি জাগরুক হয় সেই পাপে মানুষ ঈশ্বরের প্রসন্নতা জন্য চিত্তত্তৃপ্তি অনুভবকরিতে পারে না।

ভগবান্ বলিতেছেন যাহারা পাপযোনি—নিকৃষ্টজন্মা—অসৎবংশজাত—এমন কি স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি আমাকে আশ্রয় করে তাহারাও পরাগতি লাভ করে। যাঁহারা পুণ্য কর্ম্ম করেন যাঁহারা ভক্ত এইরূপ ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের কথা আর কি বলা যাইবে?

আমাকে আশ্রয় করিতে হইলে এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে ভজিতে হইলে জানা চাই কোথায় মানুষ পড়িয়াছে? জানা চাই এই সংসার

কিছুতেই থাকিবে না এই সংসার নিতান্ত অসুখকর, এখানকার শত শত উৎপাত শত শত বিঘ্ন, শত শত লোক ব্যবহার মানুষকে সর্ব্বদা পীড়া দিতেছে। এই বোধ যাহার নাই সে কেন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে? সে কেন ভগবানকে ভজিবে? তাই ভগবান বলিতেছেন "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌" ॥

আবার যে ভগবানকে ভজিবে তাহাকে ভগবান বলিতেছেন মন্মনা হইতে হইবে, মদ্ভক্ত হইতে হইবে, আমার পূজনশীল হইতে হইবে, সর্ব্বত্রই আমি আছি জানিয়া আমাকে নমস্কার করিতে হইবে—এই ভাবে ঈশ্বর পরায়ণ যিনি হন তিনি তাঁহার মনকে আমাকে যুক্ত করিতে পারিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

কি করিলে ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যাইবে—যাঁহারা কর্ম্মমার্গী তাঁহাদের কর্ম্ম দিয়া ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমেই বেশ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি। ভাল করিয়া দেখিতে হইবে—আমি কি করিতেছি। জ্ঞানীর আপনি আপনি পূর্ণ হইবার কথা শুনিয়া কি জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠানে ছুটিতেছি আর উপনিষদ্‌ দেখিতে ব্যস্ত হইতেছি? কর্ম্ম করিয়া করিয়া কোন কালে কি ভগবানের অনুগ্রহ অনুভব করিয়া আসিয়াছি—সকল কর্ম্মে কি বৈদিক কি লৌকিক সকল কর্ম্মে ভগবান প্রসন্ন হও ভগবান প্রসন্ন হও ইহা ভিক্ষা করিয়া প্রসাদ লাভ করিয়া আসিয়াছি কি? চিত্তকে শুদ্ধ করিবার জন্য রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত করিবার জন্য সদাচার পালন করিয়া আসিয়াছি কি? না, সন্ন্যাস লওয়ায় খাওয়া দাওয়ার বড় সুবিধা ইহা দেখিয়া সন্ন্যাস লইয়াছ? যদি কর্ম্মদ্বারা ভগবানের প্রসাদ লাভের অনুভব না হইয়া থাকে তবে বচনে জ্ঞানমার্গের চালমারা যে আত্ম প্রতারণা এবং লোক প্রতারণা ইহা যিনি না বুঝিয়াছেন তিনি জগতের অহিতের জন্যই যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা নিশ্চিত; এইরূপ আত্মপ্রতারক ও লোক প্রতারক মানুষ জ্ঞানীর সাজ পারিলেও ধর্ম্মধ্বজী হইয়া জিহ্বা লাম্পট্য ছাড়িতে পারিবেন না, লৌকিকাচার আদৌ মানিবেন না। শাস্ত্রের বিধি নিষেধ যে ভগবান্‌ও লঙ্ঘন করেন নাই ইহা গ্রাহ্য করিবেন না, লোকাপবাদ—তাহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক লোকাপবাদ যে সকলকেই গ্রাহ্য করিতে হইবে জ্ঞানীও যে লোকাচার এবং লোকাপবাদে লক্ষ্য রাখেন ইহা লোক শিক্ষার জন্য; ইহা তিনি কোন কালেই অমান্য করিয়া—লোককে চমক লাগাইবার জন্য কখন

মুখেও আনিবেন না—আমার সব হইয়া গিয়াছে আমার আবার লোকাচার কি, আমার আবার আহারের বিচার কি—আমি মুক্ত, আমি তোমাদিগকে মুক্তি দিবার জন্যই আসিয়াছি, আমি নিত্য সমাধিতে থাকি আমি আবার গ্রাহ্য করিব কি—ইত্যাদি। ভগবান নিজেও বলিতেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥৩য় ২১ গীতা

ইহার পূর্ব্বেই বলিলেন "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। লোক সংগ্রহ মেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি" অর্থাৎ জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বলিয়াই মনে কর তথাপি তোমার কর্ম্মাচরণই মঙ্গলকর এই জন্য বলিতেছেন লোক সকলের স্বধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করা উচিত।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন অন্যান্য লোকও তাহাই করে। তিনি যাহা প্রমাণ করেন লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

প্রকৃত সাধু যিনি তাঁহাকেও লোক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—আচরণ করিয়া লোককে স্বধর্ম্মপথে রাখিতে হইবে—নতুবা ভেল্কি দেখাইয়া লোকমুগ্ধ করা যেখানে আছে সেখানে সাধুত্বের আচরণে অতি দুষ্ট লোক রহিয়াছে জানিতে হইবে। সেই জন্য ভগবান নিজেই বলিতেছেন—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪"

লোকাচার যে মানিতে হইবে—ভগবান বলিতেছেন তাহার দৃষ্টান্ত আমিই। অর্জ্জুন তুমি দেখ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। কেননা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন লোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তি যোগ্য কিছুই নাই। তথাপি আমি

কর্ম্ম করি। যদি আমি আলস্য শূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করিবে। আমাকে কর্ম্মহীন দেখিয়া—আচার হীন দেখিয়া—সর্ব্বভুক্ দেখিয়া—তাহারাও কোন কর্ম্ম করিবে না। ইহার ফলে কি হইবে দেখ? আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে লোক সকল উৎসন্ন যাইবে—ধর্ম্ম লোপ হইবে, আচার লোপ হইবে—আমি তখন বর্ণসঙ্করের সৃষ্টিকর্ত্তা হইব আর এই প্রজা সকলকে নষ্টই করিব। এই বিষয়ের উপসংহারে ভগবান বলিতেছেন—

ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।

যোজয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬

অজ্ঞানী—কর্ম্ম করিয়া সংসার পথে চলিতে হইবে যাহা দিগকে—তাহাদিগকে এমন আচার দেখাইবে না যাহাতে তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মায়। জ্ঞানী যাঁহারা সন্ন্যাসী যাঁহারা তাঁহারা যুক্ত হইয়া স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞদিগকে কর্ম্ম করাইবেন।

আজকাল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও যে ভ্রষ্টাচারী ভান-সন্ন্যাসীর বা জ্ঞানীর বা সাধুর কর্ম্ম দেখিয়া ভুলিয়া ভ্রষ্টপথে চলেন তাহা দেখাইবার জন্যই এই সমস্ত কথা বলা হইল। আজকালকার সাধুরা নাকি ভগবান দেখাইয়া দেন তাঁহাদের এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া ভাল ভাল লোকও মোহ প্রাপ্ত হয়েন। ইহা ভেল্কী মাত্র। কারণ ভগবানকে দেখাইলে ভগবান কথা কহিয়া বলিবেন বর প্রার্থনা কর। আমার দর্শন কখন বৃথা হয় না। সাধু ভেল্কী দেখান না যথার্থ বিশ্বাস যোগ্য কিছু দেখান তাহার পরীক্ষা জন্য শাস্ত্র ইহাই দেখাইয়াছেন। এখন মানুষ সাবধান হউক ভগবানের নিকট প্রার্থনা তিনি লোকের শাস্ত্রশ্রদ্ধা গুরুশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া এই ধর্ম্মবুদ্ধি প্রদান করুন—আর ভেল্কী বিশ্বাস বিনষ্ট করুন।

ধর্ম্মপথে চলিবার প্রধান বিঘ্ন দূর করার কথা বলিয়া এখন আমরা এই প্রবন্ধের শেষ করিতে যাইতেছি।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬অষ্টম

আমার কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর—শুধু প্রার্থনা নহে নিজের অবস্থা বুঝিয়া সর্ব্বদা আমার আশ্রয়ে থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম কর তবেই আমার প্রসন্নতা অনুভব

করিতে পারিবে আর আমার প্রসাদেই সেই নিত্য সুখময় আনন্দময় পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।

এই ভীষণ কলিযুগে নাম জপিয়া জপিয়া মন হইতে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর করিতে হইবে—আর সর্ব্বদা কাতর প্রাণে আমায় উদ্ধার কর উদ্ধার কর বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—নিত্যকর্ম্মত কর কিন্তু তৎকালেও কাতর প্রাণে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে করিতে কর—সর্ব্ববিধ কর্ম্ম তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে কর—নাম করাই তোমার বিশ্রাম স্থান হউক—অন্য প্রকার কোন বিশ্রামের পথে যাইও না—সর্ব্বদার কার্য্য নাম বিশ্রামেই চলুক—ভাল হইবেই নিশ্চয় ইতি।

সিদ্ধসাধক ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের উপদেশ।

বর্ত্তমান আর্য্যসমাজের সংসারযজ্ঞ দেখিয়াও আমাদিগের সেই দক্ষযজ্ঞের কথাই মনে পড়ে। যজ্ঞে নাই শিবস্থান, এখন ভূতপ্রেতের অধিষ্ঠান। সে যজ্ঞের পরিণামে যে, যজ্ঞেশ্বরী অন্তর্হিতা হইবেন, ইহা আর একটা বিচিত্র কি? কিন্তু তথাপি আর্য্যসমাজের প্রতি জগদম্বার ইহাই অতুলনীয় করুণা কটাক্ষ যে মা অন্তর্হিতা হইলেও আর্য্য হৃদয়ে ছায়ামূর্ত্তি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, কৌশলচক্রে তুমি আমি আজ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া দিগদিগন্তে ফেলিলেও প্রাণের বেদনায় সাধকের সাধনা দেখিলে মহাশক্তিস্বরূপিণী করুণাময়ী মা আপন শক্তিতে আপনি আবার সে আপন মহাপীঠে জাগিয়া উঠিবেন। এ দক্ষযজ্ঞের পরিণামেও যজ্ঞেশ্বরীর করুণালীলা আবার এ যজ্ঞক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া লব্ধ ধনে বঞ্চিত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে, ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ করিয়া তাহাতে সহানুভূতির জলসেক করা স্বধর্ম্মবৎসলতার লক্ষণ নহে, নিজে ধর্ম্মাচরণ না করিয়া অন্যের ধর্ম্মাচার্য্য হওয়াও ধর্ম্মসঙ্গত

কার্য্য নহে। অনেকে মনে করিতে পারেন, অসময়ে আমাদের এ অপ্রসঙ্গের প্রসঙ্গ কেন?

এখন সেই প্রসঙ্গ সঙ্গতির জন্য আরও দুই একটী কথা বলিব। জানি, যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ আর শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছে না, মুনি ঋষি মহর্ষি—যোগিজুষ্ট সে তপোবনও আর এখন আর্য্যাবর্ত্তে ইতস্ততঃ দেখিবার উপায় নাই, সহস্র সহস্র বটু বালখিল্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মানবক অন্তেবাসী শিষ্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সংসেবিত, রাজন্যরাজগণ পরিরক্ষিত, নিয়ত তপোনুষ্ঠান—পরম্পরা ব্যাপৃত সে আশ্রম সে তপোবন সে গুরুকুল আর নাই, তবে আর এখন সে ব্রহ্মচর্য্যের কথা তুলিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করা কেন? ইহা আমরাও বুঝি, কিন্তু বুঝিয়াও বুঝি না, প্রাণ থাকিতে তাহা বুঝিতেও পারিব না। গুরুকুল নাই, আশ্রম নাই, তপোবন নাই তাহা জানি; বেদবেদান্ত বেদাঙ্গের অধ্যয়ন নাই, তাহাও জানি; কিন্তু এত জানা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যশাস্ত্র আর্য্যাচার, আর্য্য সন্তান আর্য্য সমাজ আর্য্যজাতির বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, ইহা যখন আজ ও জানিতে পারিনাই, বাণপ্রস্থ ভিক্ষু, এই দুই আশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থাশ্রম ও একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, ইহা যখন আজও জানিতে পারি নাই, তখন সকল আশ্রমের মূল ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা আজ ভুলিব কোন প্রাণে? বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এ দুই আশ্রম, গার্হস্থাশ্রমের পরবর্ত্তী; সুতরাং তাহার উল্লেখ এস্থলে নিস্প্রয়োজন, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবে আজ আর্য্যসমাজে গার্হস্থাশ্রমের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহাই আজ দেখাইব।

ব্রাহ্মণসন্তান! ভিক্ষা যাহার স্বধর্ম্মরক্ষার একমাত্র উপায়, অসৎ প্রতিগ্রহ যাহার জীবনান্তক ব্যাধি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, সেই ব্রাহ্মণের যে আজ ম্লেচ্ছ যবনের দাসত্ব করিয়া মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াও গার্হস্থাশ্রমের অভাব ক্রমাগত বাড়িতেছে বই আর কমিতেছে না, ইহার কারণ কি, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি? যে ব্রাহ্মণের সংসারে অকাল-মৃত্যু স্বপ্নেরও অতীত, তাঁহারই গৃহে যে দুঃসহ রোগে জর্জ্জরিত বালকবালিকার মৃতদেহ লইয়া নিত্য নিশীথে হাহাকার আর্ত্তনাদ, ইহার কারণ কি তাহা ভাবিয়াছ কি? যে পূর্ব্বপুরুষগণ নিরাহারে নীরাহারে বা বাতাহারে ফলাহারে দিন মাস বর্ষ শতাব্দ অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই সন্তানগণ যে আজ একসন্ধ্যা অনাহারে উত্থানশক্তি রহিত হয়, ইহার কারণ কি, তাহা ভাবিয়াছ কি? ফল জল পত্র কুসুম কুশ সমিধ—আহরণে, তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে নিয়ত

দেশদেশান্তর পর্য্যটনে, অতিবৃদ্ধ অবস্থাতেও যাঁহাদের গতিবিধি প্রতি-নিয়ত অব্যাহত ছিল, তাঁহাদিগেরই সন্তানসন্ততি যে আজ ক্রোশান্তর ব্যবহিত ভূমিকে দ্বীপান্তর বলিয়া মনে করে, ইহার কারণ কি, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি?

ব্রাহ্মণ্যভাব শিক্ষিত শমদমবিনয়সম্পন্ন বালকবালিকা যাঁহাদিগের গৃহপ্রাঙ্গণ নিয়ত পবিত্র ও অলঙ্কৃত রাখিত, তাঁহাদিগের সেই সকল গৃহে আজ দানববৃত্তি সুলভ দৌরাত্ম্যের প্রতিমূর্ত্তি বালকবালিকার অনার্য্য আচারে কলুষিত ঔদ্ধত্য-নৃত্যের প্রশ্রয় কেন, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি? গুরুজনের নিকটে আর সে নম্রতা নাই, আত্মীয়স্বজন কুটুম্ববর্গে আর সে স্নেহ মায়া মমতা নাই, অতিথি আগন্তুকের প্রতি আর সে শ্রদ্ধা বিশ্বাস আগ্রহ ও সৎকার নাই, দীন দুঃখী দরিদ্রের প্রতি আর সে দয়া নাই, প্রতিবেশীর প্রতি আর সে সদ্ভাব সৌজন্য নাই; দেবতা ধর্ম্মশাস্ত্র গুরু ও পরলোকে আর সে বিশ্বাস নাই; অন্যে পরে কা কথা—নিজের সহোদর ও সহোদরাতে আর সে প্রাণগত সম্বন্ধ নাই, পিতামাতার চরণে আর সে আত্মসমর্পণ নাই, স্ত্রীতে সে প্রেম নাই, পুত্রকন্যায় আর সে বাৎসল্য নাই, আছে কেবল—আমি খাইব, আমি পরিব, আমিই কেবল সর্ব্বাপেক্ষা সুখে থাকিব, আমার সেই সুখ-সম্ভোগ নির্ব্বাহের জন্য যে যতটুকু সাহায্য করিবে সে কেবল আমারই সে ভোগের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ততটুকু পাইয়া যতটুকু পারে সুখী হইবে; আছে কেবল এই রাক্ষসবৃত্তিসুলভ আত্ম-ম্ভরিতা! কেন এ সকল ঘটিয়াছে, তাহার কারণ কিছু ভাবিয়াছ কি? পিতামাতা আর যে তোমাকে প্রাণ দিয়া স্নেহ করেন না, সহোদর সহোদরা আর যে তোমায়—সর্ব্বান্তঃকরণে স্নেহ আশীর্ব্বাদ সেবা করে না; স্ত্রী যে আর তোমায় প্রাণ দিয়া ভাল বাসেন না,—পুত্রকন্যা যে তোমায় আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা আর করে না, ইহার কারণ কি, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি?

যত টাকাই আনিয়া দাও, যত কাপড়ই কিনিয়া দাও, যত অলঙ্কারই গড়াইয়া দাও, সোহাগের পর যত সোহাগ কর, নিজের প্রাণ দিয়া খাটিয়া মরিয়া যত কেন মনস্তুষ্টির চেষ্টা না কর, কিছুতেই যে তোমার পরিবার পরিজনের মন উঠে না, ইহার কারণ কিছু বুঝিয়াছ কি? দিনে দিনে মাসে মাসে ঘরে ঘরে যত কেন দ্রব্যসম্ভার আনিয়া না দাও, দেব পূজা ব্রত নিয়ম অতিথি সৎকার ও দীন দরিদ্রের দানের সময় হইলে আর যে তাহার কিছুই খুঁজিয়া পাও না, নিত্য নিয়ত ঋণের পর ঋণ শোধ করিতেছ, তথাপি যে সে ঋণ দিন দিন

বাড়িতেছে বই আর কমিতেছে না, নিজে অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়াও পরিবার পরিজনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাণ দিয়া যতই চেষ্টা করিতেছ, ততই যে তাহারা নিত্য নূতন অশান্তির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া নিজেরা জ্বলিয়া তোমাকে জ্বালাইয়া সোনার সংসার ছারখার করিয়া দিতেছে, ইহার কারণ কিছু ভাবিয়াছ কি? ডাক্তার বৈদ্যের চিকিৎসার কল্যাণে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পরিবার পরিজনের রোগভোগ কমাইবার জন্য যত চেষ্টা করিতেছ, ততই যে তাহা নিত্য নূতন শতগুণে বাড়িয়া উঠিতেছে, না বাঁচিতেছে না মরিতেছে, অথচ তাহাদিগের ভাবনা চিন্তায় তোমাকে ও না বাঁচা না মরা করিয়া রাখিয়াছে, ইহার কারণ কিছু ভাবিয়াছ কি? নিত্য নিয়মিত দেবপূজা, ব্রতনিয়ম নৈমিত্তিক মাঙ্গলিক কার্য্যাদির অনুষ্ঠানে সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দের কোলাহলে, যে সংসার প্রতিনিয়ত উল্লাসের তরঙ্গে উদ্বেলিত ও শান্তির সাগরে নিমগ্ন ছিল, আজ তোমার সেই সংসার যে, অশান্তি অবসাদ, বিষাদ, মালিন্য বিদ্বেষ অসূয়া কুৎসা গ্লানি, নিন্দা গঞ্জনে হাহাকার আর্ত্তনাদ ক্রন্দন ভূলুণ্ঠন, শিরোঘাত করাঘাত ইত্যাদির বিষময় সংমিশ্রণে নিত্য জর্জ্জরিত, ইহার কারণ কিছু বুঝিয়াছ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কারণ কেবল গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ও গার্হস্থ্য আশ্রমে তোমার অনভিজ্ঞতা। সে অনভিজ্ঞতারূপ কারণের কারণ কেবল একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। সেই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই তোমার আত্মসংযম শিক্ষার অভাব, আর সেই সংযমশিক্ষার অভাবেই আজ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে তোমার এ বিশৃঙ্খলা, এ বিড়ম্বনা, এ সর্ব্বনাশ এ অধঃপাত! এই জন্যই বলিতেছিলাম—ব্রহ্মচর্য্যের কথা আজ অপ্রসঙ্গের প্রসঙ্গ নহে।

ব্রাহ্মণ কুমার! বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে, সাধন ধর্ম্ম রক্ষার কথা তোমাকে বলিতেছিলাম, আচার্য্যের কথা শুনিলে, ব্রহ্মচর্য্যার কথাও শুনিলে ইহাতেই বুঝিয়া লও সংসার—ধর্ম্মই তোমার পক্ষে যথা শাস্ত্ররূপে কতটুকু রক্ষিত হইতেছে! ভাবিয়া লও—ইহারও পরে তোমাকে সাধন ধর্ম্ম রক্ষার উপায় করিতে হইবে। সংসার ধর্ম্মেই যখন এই অশিক্ষা অপটুত্ব, তখন সাধন ধর্ম্মের জন্য তোমাকে কি পরিমাণে সাবধান সতর্ক ও সচেষ্ট হইতে হইবে! সংসার ধর্ম্মের সঙ্গে সাধন ধর্ম্মের যাহা ভেদ বা বিরোধ তাহা দেখাইবার অবকাশ পাইলেও আমরা সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম; কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি?—সংসারধর্ম্ম থাকিলে তবে ত তাহার সঙ্গে ভেদ বা বিরোধ দেখাইব? কারণ সংসারে এখন দেখিতে পাই, প্রায়ই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের

আধিপত্য! তাহার সহিত আর নূতন বিরোধ কি দেখাইব? অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের বিরোধ, ইহা ত চিরকাল সকলেই জানে। যাহাই হউক, তথাপি বক্তব্যের অনুরোধে বর্ত্তমানে অদৃশ্য হইলেও সেই পুরাতন দৃশ্য সংসার ধর্ম্মের ছায়া লইয়াই সাধন ধর্ম্মের ভেদ পার্থক্য যাহা যতটুকু আছে, দেখাইতে চেষ্টা করিব। সংসার ধর্ম্মে ও সাধন ধর্ম্মে বিরোধ যাহা, তাহা পরে দেখিও, ভেদ যাহা তাহা আগেই বুঝিয়া লও!

আর্য্যজাতির সংসার ও সাধন দুইই ধর্ম্ম; কিন্তু ভেদ এই যে, সংসার গৌন ও সাধন মুখ্য। তাই, যে ধর্ম্মে সংসার রক্ষাই প্রধান, সাধন তাহার অনুগত অর্থাৎ সাধনার অবিরোধে যদি সংসার থাকে, তবে থাক্ তাহাতে আপত্তি নাই; অন্যথা সাধনের বিরোধী হইলে, সে সংসার যাহাতে দূরতঃ পরিহার্য্য, তাহারই নাম সাধন ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধন প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ কুমার! তুমি এই ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই ব্রহ্মাংশ হইতে—ব্রহ্মলোক হইতে ধরাধামে অবতীর্ণ; তাই শাস্ত্র তার-স্বরে বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যা মধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্ম কোষস্য গুপ্তয়ে॥"

"ব্রাহ্মণ-জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বভূতের ধর্ম্ম ভাণ্ডার রক্ষার নিমিত্ত জানিও ঈশ্বর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।"

ব্রাহ্মণ! তুমি সেই ব্রাহ্মণ, বুঝিয়া লও—জগতের কোন গুরুতরভার লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ? হায়! কোথায় তুমি পরের ভার বহন করিবে, আর কোথায় আজ তোমার নিজের ভারেই ধরা অধবা—! থর থর কম্পিত কলেবরা! তাই বুঝি আজ ধরা ধর কুমারী ও অসহ্য বুঝিয়াছেন—তোমার আমার এ ভার ধরা!!

মার্জ্জন মন্ত্র—দ্রুপদা—মৈনসঃ।

(বঙ্গানুবাদ)

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষ মূল আশ্রয় করিয়া (সুশীতল ছায়ায়) স্বেদ-মুক্ত হয়; স্নাত ব্যক্তি যেমন মল নির্ম্মুক্ত হয়, পবিত্র কুশদ্বারা যেমন ঘৃত আগন্তুক মল নির্ম্মুক্ত হইয়া সংস্কৃত হয়; তদ্রূপ, জলদেবী আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন ॥

গূঢ়ার্থ সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, এই মন্ত্রে পাপক্ষালনের তিনটি উপমা দেওয়া হইয়াছে। (১) বৃক্ষ-মূল আশ্রয় করিয়া ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তির স্বেদ বিমুক্তি। (২) স্নাত ব্যক্তির মল প্রক্ষালন। (৩) পবিত্র দ্বারা ঘৃতের মল দূরীকরণ। আমাদের পাপ মোচনের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য কিরূপে? আর তিনটি উপমার তাৎপর্য্য প্রায় একরূপই বোধ হইতেছে। এরূপ স্থলে একটী উপমা ব্যবহার করিলেই ত চলিত; তিনটি উপমা কেন গ্রহণ করা হইয়াছে?

আচার্য্য] বৎস, বস্তু সমূহের মল দ্বিবিধ—সহজ ও আগন্তুক। অগ্নির মল ধূম ইহা সহজ মল; কারণ ইহা অগ্নির সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর দর্পণের মল ধূলি ইহা আগন্তুক। কারণ অগ্নির সহিত ধূম যেমন সহজভাবে মিলিত দর্পণের সহিত ধূলির সেরূপ সন্বন্ধ নাই। ইহা স্থানান্তর হইতে আসিয়া দর্পণে লাগিয়াছে, এই নিমিত্ত ইহা আগন্তুক।

জীবের মল পাপ ও পুণ্য। ইহাও সহজ ও আগন্তুক ভেদে দ্বিবিধ; সহজ পাপপুণ্য আবার প্রারব্ধ সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ ভেদে দ্বিবিধ।

'দ্রুপদাদি' ইত্যাদি মন্ত্রে উপমেয় পাপের পরিচয়ার্থ মলোপমা ব্যবহার করা হইয়াছে। উপমেয় বাক্য—জলদেবতা আমাকে পাপক্ষালন করিয়া শুদ্ধ করুণ। এই পাপক্ষালন কিরূপ তাহার পরিচয়ার্থ বলা হইয়াছে (১) ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষমূল অবলম্বনে স্বেদ-মুক্ত হয়, সেইরূপ। (২) স্নাত ব্যক্তি যেমন মল মুক্ত হয় তদ্রূপ। (৩) ঘৃত যেমন কুশ সংযোগে পূত হয় সেই প্রকার।

প্রথম উপমা দ্বারা প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের খণ্ডনার্থ প্রার্থনা। দ্বিতীয় উপমা দ্বারা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ পাপ পুণ্য খণ্ডনের জন্য প্রার্থনা। তৃতীয় উপমা দ্বারা সূচিত হইতেছে—ইহা পাপি সংসর্গ জনিত আগন্তুক পাপ পরিহারের জন্য প্রার্থনা।

এখন এই উপমাগুলি মিলাইয়া লইতে চেষ্টা কর। মনে রাখিও এই প্রার্থনা করিতেছেন—কর্ম্মাধিকারী জীব। বুদ্ধি ক্রোড়শায়ী চৈতন্যই জীব নামে অভিহিত। বুদ্ধি সত্ব গুণের পরিণতি,—সত্ব গুণ নির্ম্মল প্রকাশ স্বরূপ পদার্থ। কিন্তু অনাদি কর্ম্ম ত্রিবিধ দেহরূপে পরিণত হইয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণ বন্ধনী মধ্যে জীবের বুদ্ধিকে বন্ধনপূর্ব্বক 'অহং' 'মম' মোহে মূঢ় করিয়া রাখিয়াছেন। জীব রজও তমের সম্পর্কে ইন্দ্রিয় সমূহ ও দেহ পিণ্ডকে আমি মনে করিয়া লইয়াছে, দেহের সম্পর্কিত বস্তু ও ব্যক্তি সমূহকে 'আমার' মনে করিয়া এই 'আমি ও আমার' পোষণে জীব অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছে। এইযাতনা দূরীকরণের জন্য ভগবতী শ্রুতির আদেশে জীব প্রার্থনা করিতেছেন—ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন দ্রুপদ (বৃক্ষমূল) আশ্রয় করিয়া স্বেদ মুক্ত হয়, জল-দেবী আমাকে সেইরূপে পাপ মুক্ত করুন। বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ঘর্ম্মজল শোষণের সহিত পাপ মুক্তির সাদৃশ্য কিরূপ? পথিক দেহের অভ্যন্তরস্থ জলাংশ বাহ্যতাপ দ্বারা দেহে অভিব্যক্ত হইয়া ঘর্ম্ম জল নামে অভিহিত হয়, পরিশেষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার পরে বৃক্ষের সুশীতল ছায়া আশ্রয় করিলে উহা অপসারিত হয়। মহা প্রলয়ে জীব চৈতন্যের অভ্যন্তরে প্রারব্ধ সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ এই তিন প্রকার কর্ম্মেরই সূক্ষ্ম অবস্থা বা সংস্কার লুক্কায়িত থাকে—আশ্রয়হীন ছায়া যেমন সূর্য্যক্রোড়ে লুক্কায়িত হয়, সেইরূপ। এইরূপে অন্তর্নিহিত সংস্কার গুলি ত্রিতাপ-স্ফুরণে প্রারব্ধ কর্ম্মরূপে বিকসিত হইয়া ত্রিবিধ দেহরূপে জীবকে স্বীয় বন্ধনীতে আবদ্ধ করে। এই জন্যই অনাদি সংসার-পথিক এই জীব ঘর্ম্মাক্ত লৌকিক পথিকের সহিত উপমিত হইয়াছেন। লৌকিক স্বেদ-মুক্তির উপায় যেমন বৃক্ষমূল আশ্রয়, এখানেও স্বেদ বিন্দু সম পাপ রাশির বা স্বরূপের ত্রিবিধ আবরণ স্বরূপ এই ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্তির উপায় হইতেছে—এই সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল স্থানীয় শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবতীর শ্রীচরণাশ্রয়। অতএব প্রার্থনা করা হইতেছে—মাতঃ জলদেবি, তুমি আমাকে তোমার পরমপদ মূলে উপনীত কর, তোমার ত্রিতাপ শূণ্য শ্রীচরণচ্ছায়ায় পৌছিয়া আমার এই স্বেদ-বিন্দুরাশি—এই ত্রিবিধ দেহ অপনোদিত হউক।

ইহা প্রারব্ধ কর্ম্ম খণ্ডনের নিমিত্ত প্রার্থনা। যদিও বিনাভোগে প্রারব্ধ-ক্ষয় হয় না সুতরাং তদ্ বিষয়ে প্রার্থনা অনর্থক, তথাপি জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অবশিষ্ট প্রারব্ধ ভোগ যেমন নাটক দর্শনের ন্যায় আনন্দকর, তদ্রূপ আমি যেন ত্রিবিধ দেহ ও জগৎকে শ্রীজগদম্বারূপে দর্শন করিয়া আনন্দ-হিল্লোলে আন্দোলিত হইতে হইতে প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে পারি।

(২) দ্বিতীয় উপমা—অস্নাত অবস্থায় দেহে সঞ্চিত ও আগন্তুক নানাবিধ মল সঞ্চিত থাকে। যথাসময়ে প্রক্ষালিত না হইলে তাহা হইতে বিবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। স্নাত ব্যক্তি এই সঞ্চিত মলে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ আমার ও সূক্ষ্ম দেহে অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার বিদ্যমান, বিধৌত না হইলে ইহা হইতেও শত শত প্রারব্ধ দেহ উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব আমার প্রার্থনা—নিত্যজ্ঞানময়ি, জলদেবি, আমি যেন তোমার ভাব সুধাসাগরে সুস্নাত হইয়া সঞ্চিত কর্ম্মমল প্রক্ষালন পূর্ব্বক নির্ম্মল হইতে পারি।

(৩) তৃতীয় উপমা—ঘৃত তৈজস পদার্থ স্বয়ং নির্ম্মল। কিন্তু আগন্তুক মল সংযোগে উহা অপবিত্রীকৃত হয়, কিন্তু পবিত্র বা কুশ যেমন ঘৃতের সহিত মিলিত হইয়া ঘৃতকে আগন্তুক মলে নির্ম্মুক্ত করে তদ্রূপ এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমি স্বয়ং যে পাপে নির্ম্মুক্ত, সঙ্গ দোষে সে পাপ ও আমাকে কলঙ্কিত করিয়া থাকে। আমি যেন পরম পবিত্র তোমার সঙ্গ মহিমায় উহা খণ্ডন করিতে পারি। তোমারই জন্য আদর সঞ্চিত ভাবরাশির সহিত আমার হৃদয় যেন তোমারই সহিত নিত্য মিলিত ও তোমারই প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া সঙ্গজনিত পাপরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে।

অথবা—আজ্য বা হোমীয় ঘৃত যাবৎ পবিত্র (গর্ভশূন্য সাগ্রকুশ) দ্বারা সংস্কৃত না হয়, তাবৎ উহা হোমের উপযোগী নহে। অথচ আজ্যের উৎপত্তি হোমেরই জন্য। যথা সময়ে পবিত্র বা কুশ যেমন আজ্যের সহিত মিলিত হইয়া আজ্যকে হোমযোগ্য করে, পবিত্রস্পর্শে পূত আজ্য আহবনীয় বহ্নিতে সমর্পিত হইয়া আবহনীয় বহ্নিরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ আমারও উৎপত্তি তোমাতেই আত্ম-সমর্পন করিবার জন্য। কিন্তু আমি তোমার পতিতপাবন স্পর্শের অভাবে অপবিত্র হইয়া রহিয়াছি। বিশ্বমূর্ত্তি তুমি, শত শত মূর্ত্তি লইয়া সন্তানের নিকট দান গ্রহণে প্রস্তুত থাকিলেও শাস্ত্রমুখে আত্মদানের জন্য আমাকে প্ররোচিত করিলেও এ অপবিত্র আত্মা সমর্পণের অযোগ্য বলিয়া তোমার সে আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং আমার তৃতীয় নিবেদন—মা জলদেবি! তুমি তোমার

পূতচরণ স্পর্শে আমায় পবিত্র করিয়া লও, আমাকে চিরবাঞ্ছিত আত্ম সমর্পণের যোগ্য করিয়া তোল। আমি তোমার বিশ্বমূর্ত্তি চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া জন্ম সার্থক করি।

সদাচার ও সদনুষ্ঠান।

ভীষণ কলিমলগ্রসিত কলিকালে সনাতন মুনিঋষিগণের মুখ-নিঃসৃত বেদ-বাণী আজ তিরোহিত প্রায়। আজ আমরা তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লোপ করিতে সতত যত্নবান হইয়াছি। আমাদিগেরই বা দোষ কি? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা অনুভব করিয়া, তাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি দ্বারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও বিফল বা বৃথা হইবার নহে। তাঁহারা কত শত শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা আমাদিগের নিকট শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইতেছে তাহার ফল আমরা দিন দিন পদে পদে কালের গতির সহিত অনুভব করিতেছি ও প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইতেছি; ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের বাক্যের সত্যতার দৃঢ়তার প্রমাণ আর আমরা কোথায় অনু-সন্ধান করিব? প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে,—

"ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিতস্তপো বিরহিতং সত্যঞ্চদূরেগতম্।
ক্ষৌণীমন্দফলা নৃপাশ্চকুটিলাঃ শাস্ত্রেতরাঃ ব্রাহ্মণাঃ॥
লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃস্ত্রিয়োঽতিচপলাঃ পাপানুরক্তা জনাঃ।
সাধুঃসীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃপ্রবৃদ্ধে কলৌ॥
যদা যদা সতাং হানির্ব্বেদমার্গানুসারিণাম্।
তদা তদা কলেবৃ দ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥"

ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়াছে, তপস্যা বিশেষপ্রকারে রহিত হইয়াছে অর্থাৎ কায়-ক্লেশরূপ তপস্যা কষ্টসাধ্য বলিয়া লোকে তাহাতে আর প্রবৃত্ত হয় না, সত্যও দূরে গমন করিয়াছে। বসুন্ধরা মন্দফলা হইতেছে, নৃপগণ কুটিল ও ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র-বিহীন হইয়া পড়িতেছেন। লোকসমূহ নারীবশবর্ত্তী হইতেছে, নারীগণ অত্যন্ত

চপলস্বভাবা এবং জননিচয় পাপাসক্ত হইতেছে! এই প্রবৃদ্ধ কলিযুগে সাধু মহাত্মা হীন হইয়া পড়িতেছে, দুর্জ্জনের বৃদ্ধি পাইতেছে। যেমন যেমন বেদ-মার্গানুসারি সাধুবিদ্বানের হানি হইতে থাকিবে তখনই বিচক্ষণ ধীমান ব্যক্তি কলিকালের বৃদ্ধি অনুমান করিতে থাকিবেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে, যে,—

যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি শিবেশান্তে তদৈব প্রবল কলিঃ॥ ১॥
যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি স্বভর্ত্তারং তদৈব প্রবল কলিঃ॥ ২॥
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদাধন কণেহয়া।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবল কলিঃ॥ ৩॥
যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকীতথা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবল কলিঃ॥ ৪॥
কচিচ্ছিন্না কচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিনী।
ভবিষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবল কলিঃ॥ ৫॥

দেবাদিদেব পরমপুরুষ মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, 'হে, শিবে! হে শান্তে! যখন ম্লেচ্ছজাতীয় রাজাসমূহ ধনলোলুপ হইবে তখনই প্রবল কলি জানিবে। যখন স্ত্রীসমূহ অতিশয় দুর্দ্দান্তা, কর্কশ স্বভাবাপন্না, কলহপ্রিয়া এবং স্বকীয়া পতিকে তিরস্কার করিবে তখনই প্রবল কলি জানিবে। ভ্রাতাগণ, স্বজন, অমাত্যাদি অন্ন, ধন প্রাপ্তির আশায় পরস্পর প্রহারাদি করিবে তখনই প্রবল কলি জানিবে। হে শিবে! হে শান্তে! যখন বৈদিকী দীক্ষা অথবা পৌরাণিকী দীক্ষা থাকিবে না তখনই প্রবল কলি জানিবে। অয়ি, মহাপ্রজ্ঞা-শীলে! যখন সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইবে তখনই প্রবল কলি জানিবে। এইরূপ ভাবে সাক্ষাৎ শঙ্কর ভগবানের উক্তি অথবা আমাদের পুরুষগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখে কালের প্রবাহে নিত্য নিত্য ঘটিয়া যাইতেছে। এইরূপে এই কলিকালের বিষয়, দেবী ভাগবৎ, ভবিষ্যপুরাণ আদি প্রাচীন গ্রন্থে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়; প্রয়োজন বিধায় সে বিষয় পরে আলোচিত হইবে। আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তন্মধ্যে হিসাব করিয়া দেখিলে, বুঝা যায়, যে এই কলিকালের যে বর্ষ পরিমাণ

৪৩২০০০ বর্ষ নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র ৫০৩০ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, এখনও ৪২৬৯৭০ বর্ষ অবশিষ্ট আছে। ইতঃমধ্যে যে, উপরোক্ত প্রবাহ বিশেষরূপ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই কলিকালের প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকুক্ না কেন, যতই অনাচার, অত্যাচারের চূড়ান্ত হউক না কেন, তাঁহারাই আবার বলিয়াগিয়াছেন যে, বেদ, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, প্রকৃত সাধু ও সতীনারী এই চারিটী বস্তু এই পুণ্যময়ী ভারতভূমি হইতে কদাপি লুপ্ত হইবে না। এই বেদবাণীই হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগেরই সন্তান হইয়া তাঁহাদিগের গৌরব যদি কিছুমাত্রও সংরক্ষণ করিতে পারা যায়, সেই আশায় আশান্বিত হইয়া আজ এই "সদাচার ও সদনুষ্ঠান" প্রবন্ধটী লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারা যায়, লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মের যাহাতে পুনরুদ্ভব হয়; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি চারিবর্ণ; গৃহস্থ; ব্রহ্মচারি, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাদি সকলে স্বায় স্বীয় ধর্ম্মে দৃঢ় থাকিয়া যাহাতে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যত্নবান হইতে সমর্থ হয়েন তদ্বিষয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(ক্রমশঃ)

শ্রী৺ারানন্দ ব্রহ্মচারী
করণীবাদ, রামনিবাস, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, দেবঘর পোঃ
(সাঁওতাল পরগণা)

বেদে মূর্ত্তি পূজা।

(১)

"মূর্ত্তি পূজা নাকি বেদে নাই—এই কথা এদেশে কিছুদিন হইল শুনা যাইতেছে, ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া যোগ্যতা না থাকিলে ও অনেকে নিরাকারের উপাসনাই শ্রেয়ঃ বুঝিয়াছেন। পরন্তু পরমেশ্বরের কোন মূর্ত্তি হইতেই পারে না বলিয়া,—অনেকে প্রমাণ এবং যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদের তাদৃশ প্রমাণ এবং যুক্তি বিচার সহ কি না তাহা পরে আলোচ্য। বর্ত্তমান সন্দর্ভে "বেদে যে মূর্ত্তি পূজা আছে" আমরা প্রথমতঃ তাহাই দেখাইব।

(২)

বেদের সাধারণ পরিচয়।

সমগ্র বেদকে ঋষিগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বুঝিয়াছেন। বেদের ঐ দুইভাগের নাম **"মন্ত্র"** (১) এবং **"ব্রাহ্মণ"**। "ঋগ্‌বেদ সংহিতা" "যজুর্ব্বেদ সংহিতা" প্রভৃতিকে মন্ত্রভাগ বলা হয়, "শত পথ" ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বলা হয়। মহর্ষি আপস্তম্ব যজ্ঞ পরিভাষায় বলিয়াছেন যে—**"মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এতদুভয়ের নাম বেদ"**। বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ঋষিকথিত উক্ত লক্ষণকেই বহুবিচার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। * বেদকে **"কর্ম্ম কাণ্ড"** (১) এবং **"জ্ঞানকাণ্ড"** (২) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ও বুঝা যাইতে পারে, কল্পসূত্র এবং ব্রাহ্মণ ভাগ দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম সমূহের বুৎপাদন করা হইয়াছে, সুতরাং; ঐ সব গ্রন্থ "কর্ম্মকাণ্ড"। সাধারণতঃ "উপনিষদ্" ভাগকে "জ্ঞান-কাণ্ড" বলা হয়। আচার্য্যগণ উপনিষদ্ ভাগকে "ব্রহ্মাবিদ্যাও" বলিয়াছেন। ১

মীমাংসকগণ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বুঝিয়াছেন; ঐ চারিভাগের নাম—"বিধি" (১) "মন্ত্র" (২) "নামধেয় (৩) এবং "অর্থবাদ" (৪)।

---

* "মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকত্বংতাবদ দুষ্টং লক্ষণম্ অতএব আপস্তম্বো যজ্ঞ পরিভাষায়া মেবমাহ মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নাম ধেয় মিতি ॥

ঋগবেদ সংহিতার সায়ণভাষ্যে উপোদ্‌ঘাত প্রকরণীয় বেদ প্রাধান্যবিচার প্রকরণ "অপৌরুষেয় বাক্য বেদ" (১) "ঈশ্বর উচ্চরিত শব্দরাশি বেদ" (২) শাস্ত্রে বেদের এইরূপ অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সায়ণাচার্য্য কৃত বেদ ভাষ্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১। "সেয়ং ব্রহ্ম বিদ্যা উপনিষচ্ছব্দ বাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতো সংসারস্য অত্যন্তরে সাদনাৎ, উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদ স্তদর্থত্বাৎ। তাদর্থ্যাৎ গ্রন্থোঽপি উপনিষদুচ্যতে।"

শঙ্করাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য ভূমিকা,

উপনিষৎ স্বয়ংই উপনিষৎকে **"পরাবিদ্যা"** বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা,—

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমভিগম্যতে" (মুণ্ডকোপনিষৎ)

উহার তাৎপর্য্য এই যে যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায় তাহার নাম "পরা বিদ্যা"; ব্রহ্মবিদ্যাই একথার ফলিত সিদ্ধান্ত।

বিবিধ শব্দের ব্যাখ্যা।

বিধায়ক বাক্যকে বিধি বলে, যেমন স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নি হোত্র যাগ করিবে (১) "প্রতিদিন যথাসময়ে ত্রিসন্ধ্যা করিবে" (২) এইগুলি বিধি বাক্যের উদাহরণ। *

মন্ত্র শব্দের ব্যাখ্যা।

যাহার দ্বারা স্বাভিমত দেবতার **"মনন"**—অর্থাৎ ধ্যানাদি করা যায় তাহাকে **"মন্ত্র"** বলে। মীমাংসকগণ বলেন **"মন্ত্র"** প্রয়োগ সমবেত পদার্থের "স্মারক" বলিয়া সার্থক। যেমন আমি ইষ্টদেবতার নাম জপ করিব বা তাঁহাকে ধ্যানাদি করিব সেখানে ঐ জপ ধ্যানাদি কার্য্যই **"প্রয়োগ"** তাদৃশ প্রয়োগে ইষ্টদেবতাই **"প্রয়োগ সমবেত পদার্থ"** অর্থাৎ আমার সেই জপরূপ প্রয়োগ বা ধ্যানরূপ প্রয়োগে ইষ্টদেবতা সর্ব্বথা সমবেত অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং ইষ্টমন্ত্র সেখানে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করায় বলিয়া সর্ব্বথা সার্থক, মন্ত্রের অর্থচিন্তা ভিন্ন দেবতার জপ বা ধ্যান সার্থক

---

* "বিধি র্বিধায়কঃ"। ন্যায়দর্শন সূত্র। ২। ১। ৬২ সূত্র।

"যদ্ বাক্যং বিধায়কং চোদকং স বিধিঃ। যথা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ"। ন্যায় সূত্র বৃত্তি ব্যাখ্যা। "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত"। "এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং নিত্যং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতং, যস্য নাস্ত্যাদর স্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে," ইত্যাদি।

(স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকৃত আহ্নিকতত্ত্ব)

১। "মনাদ মন্ত্র উচ্যতে"। ইতি স্মৃতি শাস্ত্র।

"তদর্থশাস্ত্রাৎ"। ইতি ধর্ম্মমীমাংসা দর্শন সূত্র।

"যস্য দৃষ্টং ন লভ্যেত স্যাৎ তস্যাদৃষ্ট কল্পনা।
অনুষ্ঠেয় স্মৃতেশ্চেহ মন্ত্রোচ্চারণ মর্থবৎ॥
স্মরণঞ্চ প্রয়োগার্থং প্রয়োগাচ্চ ফলোদয়ঃ।
এবং দৃষ্টার্থতালাভাৎ নাদৃষ্টপরি কল্পনা॥"

ইতি পার্থ সারথি মিশ্রকৃত শাস্ত্রদীপিকা। মন্ত্র লিঙ্গাধিকরণ। ১। ২। ৪

হয় না; এই জন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক জপাদি কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। ১। এবিষয়ে বিশেষ কথা পরে ব্যক্ত হইবে।

নাম ধেয় শব্দের ব্যাখ্যা।

শত্রুমারণ কামনায় শ্যেনাখ্য যাগ করিবে, "শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্র নিপতিত হইয়া তাহার লক্ষ্যবস্তু ধারণ করে তেমনি এই যজ্ঞ শীঘ্র শত্রুকে নিপাতিত করে এই সাদৃশ্য বশতঃ উহার নাম "শ্যেন" যাগ। শ্যেন পক্ষিদ্বারা অর্থাৎ শ্যেনপক্ষী বধ করিয়া যাগ করিবে ইহা উহার অর্থ নহে। ২

অর্থবাদ শব্দের অর্থ।

"অর্থবাদ" নিন্দা এবং প্রশংসাভেদে দুই প্রকার, যেমন—"বায়বীয় যাগ শ্বেত ছাগল দ্বারা করিবে" এই বিধি বাক্যের প্রশংসায় বলা হইয়াছে—"বায়ু ক্ষিপ্রকারি দেবতা," উহাই প্রশংসারূপ অর্থবাদের উদাহরণ; ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে "ক্ষিপ্র দেবতা সাধ্য কর্ম্ম ক্ষিপ্রফল দান করে"- ইত্যাদি।

"শিবরাত্রিতে উপবাস" করিবে—এই বিধি বাক্যে "শিবরাত্রিতে অন্ন

"প্রয়োগ সমবেতার্থ স্মারকতয়া মন্ত্রস্য সার্থকত্বমিতি।" মীমাংসা ন্যায় প্রকাশে আপোদেব। "তজ্জপ স্তদর্থ ভাবনম্।" ইতি পতঞ্জলি। যোগদর্শন সমাধি পাদ। ২৯ সূত্র।

২। "শ্যেনেন অভিচরন্ যজেত"। ইত্যস্য কর্ম্মনামধেয়ত্বং তদ্ব্যপদেশাৎ তেন ব্যপদেশ উপমানম্, তদন্যথানুপপত্ত্যা ইতি যাবৎ।

(মীমাংসা ন্যায় প্রকাশে আপোদেব)

"তদ্ ব্যপদেশঞ্চ"। ইতি মীমাংসা দর্শন সূত্র।

(ক) "তেন শ্যেনাদিনা ব্যপদেশঃ সাদৃশ্যং যস্য কর্ম্মণ স্তৎ তদব্যপদেশম্, যতঃ কর্ম্ম তদ্ব্যপদেশং শ্যেনাদি সদৃশং অতঃ শ্যেনাদি শব্দাঃ কর্ম্মনাম ধেয়ানীতি।"

(গ) শ্যেনঃ পক্ষিবিশেষো যথা নিপত্য পতিত্বা আদত্তে অন্যং পক্ষিবিশেষং গৃহ্নাতি এবময়ং দ্বিষন্তং ভ্রাতৃব্যং নিপত্য আদত্তে"॥

(মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ টীকা)

ভক্ষণ অপেক্ষা গোমাংসভক্ষণ ও বরং ভাল” ইহাই নিন্দারূপ অর্থবাদের দৃষ্টান্ত।*

সংক্ষেপে বেদের একটা সামান্য পরিচয় বলা হইল। বেদ যথার্থ ভাবে বুঝিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন অবলম্বনপূর্ব্বক শাস্ত্রসমুদ্রে নামিতে হইবে। বর্ত্তমানে সেই সাধনা এবং সাহস নাই বলিয়াই আজ বেদ আমার নিকটে আত্মগোপন করিয়াছেন, নতুবা বেদসূর্য্য স্বতঃ প্রকাশ; আমি পেচক সাজিয়া চির আঁধারে ঘুরিতেছি, বেদালোক আমার চক্ষুতে ভাসিবে কেন? আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক আত্মনিবেদন না করিলে কেহই কাহারও নিকটে আত্ম প্রকাশ করেন না। আমি যদি সর্ব্বদা তোমাকে অবিশ্বাস করতঃ আত্মগোপন করি, তবে কি তুমি আমার কাছে আত্ম প্রকাশ কর? যদি সামান্য বিষয়েই এইরূপ হয়, তবে সেই “পঞ্চাশ ল্লিপিভির্ব্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃ স্থলা”-শব্দে ব্রহ্মময়ী মাতা, অবিশ্বাসীর নিকটে আত্ম প্রকাশ করিবেন কেন? তাই ত আজ

---

*“স্বাধ্যায় বিধিনা বেদঃ পুরুষার্থায় নীয়তে। সর্ব্বস্তেনার্থবাদানাং প্রাশস্ত্যেন প্রমাণ্যতা॥”

পার্থ সারথি মিশ্রকৃতশাস্ত্রদীপিকা কারিকা। অর্থবাদ প্রামাণ্যবিচার প্রকরণ।

“অর্থবাদানাঞ্চ ভূতার্থ প্রতিপাদনেন প্রয়োজনাহনবাপ্তে র্যস্ততো লক্ষ্যমাণ ক্ষিপ্রদেবতা সাধ্যং; কর্ম্ম ক্ষিপ্রমেব ফলং দদাতীতি প্রাশস্ত্যরূপঃ অর্থঃ।”

উক্তকারিকার গদ্য ব্যাখ্যা

“বায়ব্যং শ্বেত ছাগল মালভেত।” এই বিধিবাক্যের—“বায়ু বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা”—ইহাই অর্থবাদ বাক্য। “শিবরাত্রিমুপবসেৎ।” বিধিবাক্য।

“সুরাপানং বরং প্রাহুর্ব্বরং গোমাংসভক্ষণম্
বরং স্বমাতৃ গমনং শিব রাত্র্যন্ন ভক্ষণাৎ।” ইত্যাদি অর্থাবাদ বাক্য। ঐ সব নিন্দার্থ বাদের দ্বারা শিবরাত্রিব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য, উহা না করিলে অতীব পাপ হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্য আছে কি না এ বিষয়ে আচার্য্যগণের মতভেদ আছে, সেই সুবিশাল রহস্যালোচনা বর্ত্তমানে সন্দর্ভের বিষয় নহে। সুধীগণ মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনে তাহা দেখিবেন।

বলিতেছি—"বেদে মূর্ত্তি পূজা নাই"। কিন্তু উহা যে আছে এখন তাহাই বুঝিতে হইবে।

(৩)

"মন্ত্র" এবং "ব্রাহ্মণ" ভেদে বেদ দুই প্রকার ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। "যজুর্ব্বেদ সংহিতা" বেদের মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। উক্ত যজুর্ব্বেদ সংহিতার অন্তর্গত রুদ্রাধ্যায় গ্রন্থে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি পূজার কথা আছে—রুদ্রাধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র এই—

"নম স্তে রুদ্র! মন্যব উতত ইষবে নমঃ।
নমস্তে অস্ত ধন্বনে বহুভ্যামুত তে নমঃ॥"

যজুর্ব্বেদ সংহিতা। রুদ্রাধ্যায়। ১ম অনুবাক। ১ম মন্ত্র।

মন্ত্রের পরিচ্ছেদ বা অন্বয়—"হে রুদ্র! তে মন্যবে নমঃ। উততে ইষবে নমঃ। তে ধন্বনে নমঃ। উত তে বাহুভ্যাং নমঃ।"

মন্ত্রের অনুবাদ—"হে রুদ্রদেব! তোমার ক্রোধকে নমস্কার করিতেছি, তোমার ইষু (বাণ) এবং ধনুকে নমস্কার করিতেছি। অপি চ—ধনুর্ব্বাণ শোভিত তোমার উভয় হস্তকে নমস্কার করিতেছি।"

এখন একথা বলা বাহুল্য যে যাঁহার মূর্ত্তি নাই তাঁহার ক্রোধ ধনুর্ব্বাণ, এবং ধনুর্ব্বাণ শোভিত বাহু হইতেই পারে না, কারণ ঐ সব দেহীরই ধর্ম্ম, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র রুদ্রদেবের ক্রোধময়ী একটী মূর্ত্তিই প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মূর্ত্তিটি এইরূপ—

"আকর্ণকৃষ্টে ধনুষি জ্বলন্তীম্
দেবীমিষুং ভার্ম্মাত সংদধানম্।
ধ্যায়েন্ মহেশং মহনীয়বেষম্
দেব্যা যুতং যোধতনুং যুবানম্"॥

(ভট্টভাস্কর কৃতভাষ্য দ্রষ্টব্য)

উদ্ধৃতধ্যান পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র হইতেই ফলিত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি কশ্যপ তাদৃশ মন্ত্রবলে তাদৃশ মূর্ত্তিমতী রুদ্রদেবতাকে দর্শন করতঃ নমঃ নমঃ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র নমঃ নমঃ না বলিতে পারিলে দৃশ্য দর্শনে আনন্দ কোথায়?

তাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মন্ত্রমুখে বলিতেছেন "হে রুদ্রদেব! তোমার ক্রোধকে নমস্কার, বাণকে নমস্কার, ধনু-কে নমস্কার, তাদৃশ ধনুর্ব্বাণ শোভিত হস্তদ্বয়কেও নমস্কার। এইরূপ আরও একদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপ্রান্তরে বিশ্বরূপের সম্মুখে নমস্কার নাদ ঝঙ্কৃত হইয়াছিল—"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্ব ত এব সর্ব্ব"। মন্ত্রার্থের সামান্য আভাস দেওয়া হইল। রুদ্রদেবতার তত্ত্ব কি, উদ্ধৃত ধ্যানের অর্থ কি এবং তাদৃশ ধ্যান ঐ মন্ত্র হইতে কিরূপে ফলিত হইল তাহা পরে ব্যক্ত হইবে। এখন মূলকথা "মূর্ত্তিহীনের ক্রোধ নাই, ধনুর্ব্বাণ নাই, হস্তও নাই," অথচ বেদমন্ত্র স্পষ্টতঃ উহাদিগকে নমস্কার করিতেছেন, সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃ মূর্ত্তিপূজা, তাই ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম মন্ত্র ব্যাখ্যানের প্রারম্ভেই বলিতেছেন যে—

"প্রথমানুবাকে ভগবতো রুদ্রস্য যা প্রধানভূতা তনুরিষুধনুর্হস্তা তাং বহুধা প্রসাদ্য, তস্য যে লীলাবিগ্রহা জগন্নির্ব্বাহ হেতব স্তে অষ্টভিরনুবাকৈঃ প্রসাদ্যন্তে"।

(যজুর্ব্বেদ সংহিতা, রুদ্রাধ্যায়, ২য় অনুবাকের ভাষ্যভূমিকা দ্রষ্টব্য)

যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ের প্রথম অনুবাকে ১৫ পঞ্চদশ মন্ত্র দ্বারা শ্রীরুদ্রদেবের **"ধনুর্ব্বাণহস্ত প্রধানতনু"-কে** প্রসন্ন করা হইয়াছে, পরে ৮ আটটি অনুবাকের মন্ত্র সমূহদ্বারা তাঁহার **যে সব লীলাবিগ্রহ** এই জগন্নির্ব্বাহের কারণ **সেই সব বিগ্রহকে** প্রসন্ন করা হইতেছে" ইহাই সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন। সুতরাং যজুর্ব্বেদ স্পষ্টাক্ষরেই পরমেশ্বরের মূর্ত্তিপূজা ঘোষণা করিতেছেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; যথাশ্রুতভাবে বেদের ভাষ্যকারগণও তাহাই বলিতেছেন; রুদ্রদেবের তাদৃশ প্রধানতনু কিরূপ এবং তাঁহার **লীলাবিগ্রহই** বা কিরূপ তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

(৪)

যজুর্ব্বেদে যে মূর্ত্তিপূজা আছে রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র দ্বারাই ইহার সূচনা করা হইল। বেদের অন্যত্রও যে পরমেশ্বরের মূর্ত্তিপূজার কথা আছে তাহা বেদনিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক স্পষ্টভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি যাস্ক বলিতেছেন—

"অথ **আকারচিন্তনং** দেবতানাম্। **পুরুষবিধাঃ** স্যুরিত্যেকম্, চেতনাবৎ তদবদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি তথাঽভিধানানি।"

(নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড)

উদ্ধৃত যাস্কসন্দর্ভের বিশদ আলোচনা পরে করা হইবে, এবং মহর্ষি যাস্ক প্রদর্শিত বৈদিক মন্ত্র সমূহও দেখান হইবে; এখন সুধীগণকে কেবল এইমাত্র লক্ষ্য করিতে বলিতেছি যে ঋষি "আকারচিন্তন্" এবং "পুরুষবিধ"—এই দুইটী কথা বলিয়াছেন আকার এবং মূর্ত্তি একই বস্তু, "পুরুষবিধ" শব্দের অর্থ "পুরুষাকার বিগ্রহ" (নিরুক্তভাষ্য) সুতরাং বেদে মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে মহর্ষি যাস্কও নীরব নহেন। আজ সূচনা মাত্র করা হইল আমরা সকল কথার আলোচনা ক্রমশঃ করিব।

শ্রীশরৎকমল ন্যায়স্মৃতিতীর্থ।

জন্মান্তরবাদ ও জ্যোতিষশাস্ত্র।

সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতিতে, ঐ গুণত্রয়ের সমভাবে স্থিতি আছে। আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে অসংখ্য অসংখ্য মানব বিরাজ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে ঐ গুণত্রয়, উহাদের যোগেও অঙ্কপাশ পরিবর্ত্তনে যত যত সংখ্যা হইতে পারে, তত তত পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন অংশ বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ কোন মানবের সত্ত্বগুণ একাংশ, রজোগুণ দুই অংশ ও তমোগুণ তিন অংশ, কাহারও সত্ত্বগুণ দুই অংশ, রজোগুণ এক অংশ এবং তমোগুণ একাংশ। ফলে মানব দেহে ঐ গুণত্রয়ের যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বা ভাগেস্থিত তাহা তাহাদের জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল জনিত। যিনি জন্মজন্মান্তর হইতে শুভকর্ম্মের আয়োজন করিয়া আসিতেছেন তাহার দেহে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য আছে। আর যিনি অন্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন তাহার দেহে তমোগুণের প্রাধান্য আছে। দেহীর দেহে কোন্ গুণের প্রাধান্য আছে, তাহা তাহার চক্ষু, ভ্রূ, হস্তপদাদি চলনভঙ্গী, মুখোচ্চারিত শব্দ, দেহস্থিত রেখা জন্মকাল বা জন্মদণ্ড ইত্যাদি বিচারে নির্দ্ধারণ করা যে বিশেষ বিদ্যার সহায়তায় সম্পাদিত হয় তাহাই জ্যোতিষ শাস্ত্র নামে অভিধেয়। এই পুণ্যক্ষেত্রে এই দুরূহ বিদ্যার চর্চ্চা এক যুগে প্রবলরূপে হইয়াছিল। যেমন মহর্ষি পতঞ্জলি, যোগশাস্ত্রের চর্চ্চায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়া

চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন মহর্ষি কপিল প্রভৃতি মুণিগণ দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়া জগৎমান্য হইয়াছিলেন তদ্রূপ ভৃগুমুণি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া ত্রিলোক পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। এই পুণ্যক্ষেত্র হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রকৃত চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি দৈবক্রমে জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ দুই একটি ব্যক্তি নয়নগোচর হয়। এ সম্বন্ধে যে ঘটনাটি নিম্নে লিখিত হইল তাহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে।

আমার পরেই আমার একটি ভগ্নী জন্মায়। যথাসময়ে তাহার কলিকাতা হাইকোর্টের গভর্ণমেণ্টের সিনিয়র উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রের সহিত বিবাহ হয়। ইংরাজী ১৮৭৭ সালে আমার সেই সহোদরা দেহত্যাগ করে। ইহার তিন মাস পরেই আমার ভগ্নীপতিও মারা যান। আমার পিতার ও অন্নদা বাবুর পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। আমার অপর একটি ভগ্নীর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, পিতা মহাশয় উহাব, অন্নদা বাবুর অপর একটি পুত্রের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য আমায় আদেশ দেন। আমি তদনুসারে প্রস্তাব করিলে অন্নদা বাবু বলেন যে উহাতে আমার মত আছে। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার ভোগদণ্ড গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত রামতারক শিরোমণি আমায় বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ঐ পুত্রটীর আঠার বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইলে যেন বিবাহ দেওয়া না হয়, কারণ উহার ঐ বয়সে মৃত্যুযোগ আছে। ফলে আঠার বৎসর বয়সে ঐ বালকটি মারা যায়। তদবধি আমার ঐ জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জাগ্রত হয়। ইহার বহু দিবস পরে আমার সহিত শিরোমণি মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভ হয়। সাক্ষাৎকালে আমি আমার জন্মকাল সম্বন্ধে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কোন প্রকার ইঙ্গিত করি নাই, আমার জন্মপত্রিকাখানি আমার পকেটে ছিল মাত্র। শিরোমণি মহাশয়কে আমার জন্ম সময় ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার কপোলদেশ স্বহস্তে কুঞ্চিত করিয়া কাগজে একটি অঙ্কপাত করেন। পরে অনেক গুণ বিভাগের পরে আমার জন্মবর্ষ, মাস, দিন ও দণ্ড লিখিয়া দেন ও পরে জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া দেন। উহা গোপনে আমার জন্মপত্রিকার সহিত সর্ব্বতোভাবে মিল হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু উহা শিরোমণি মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করি নাই। ইহার পরে স্ব ইচ্ছায় শিরোমণি মহাশয় তাঁহার কৃত আমার জন্মকুণ্ডলী অবলম্বনে আমার পত্নীর জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়া

দেন। প্রথমে আমি উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু কিছু দিবস পরে আমার শ্বশুরালয় হইতে আমি আমার পত্নীর যে জন্মপত্রিকা পাই তাহার সহিত বর্ণে বর্ণে মিল হইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই। আমার স্ত্রীর গর্ভ গণনা করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মিল হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে, "অদ্য হইতে পাঁচ বৎসর আট মাসের মধ্যে পিতৃবিয়োগ হইবে" ইহা লিখিয়া দেন ও আমারও মরণকাল লিখিয়া দেন। উক্ত সময় হইতে পাঁচ বৎসর ছয় মাস গত হইলে আমার পিতা মহাশয়ের অতি কঠিন রোগ হয় ও তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সের জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা যান। এ অবস্থাতে প্রকারান্তরেও শিরোমণি মহাশয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত তাঁহার মরণকালের কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। ফলে বহু চিকিৎসায়, বহু চেষ্টায়, পিতা মহাশয় আরোগ্য লাভ করেন। শিরোমণি মহাশয়ের দ্বারা নির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে তিনি মারা যান নাই। ঐ সময় অতিক্রম করিয়া আরও দুই বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। পরে সজ্ঞানে যে প্রকারে দেহত্যাগ করেন তাহা বর্ণনাতীত। আমরা সংক্ষেপে ইহাই বলিব যে তাঁহার মত ধার্ম্মিক, নিষ্কামী পুরুষ সংসারে অতি বিরল। আমাদের মনে হয় পিতা মহাশয় ইহজন্মে শুভকর্ম্মের আয়োজনের ফলে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফলকে কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যদ্যপি ইহজন্মে নানা শুভকর্ম্মের আয়োজন না করিতেন তাহা হইলে জ্যোতিষ গণনানুযায়ী, তিনি পূর্ব্বোক্ত পাঁচ বৎসর আট মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিতেন। ফলে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির প্রণিধান করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মরাশির ফল ও বর্ত্তমান জীবনের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল মানবের একত্রে ভোগ হয়, এবং জন্মান্তরের কর্ম্মফলের সহিত ইহজন্মের চেষ্টা প্রসূত কর্ম্মের সহিত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। ইতি—

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেবশর্ম্মা (রায় চৌধুরী)
৭৭।১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

আবার একদিন আমরা কৈলাস পাহাড়ে গিয়া সাধুবাবার চরণে প্রণতা হইলাম। তাঁহার বদনে আনন্দ, সন্তোষ ও জ্যোতি। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সমাধির কথা উঠিল। আমার কনিষ্ঠা কন্যাটীর ইচ্ছা যে, বাবার সমাধি হয় কি না আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। অসঙ্গত বোধে প্রথমে আমি চুপ করিয়াছিলাম। পরে উহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কথাটা একটু ঘুরাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবার কোন্ স্থানে প্রথম সমাধি লাভ হইয়াছিল?' আমার প্রশ্নের উত্তরে বাবা স্নিগ্ধ মধুর হাস্য করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "মা, সমাধিতেই ত রহিয়াছি।"

আজ এই সব কথা লিখিতে বসিয়া একটী আনন্দকর ঘটনা মনে উদয় হইতেছে। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব সম্বন্ধে কোন কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, অল্পক্ষণ ভগবৎ প্রসঙ্গ কিম্বা জগন্মাতার কথা অথবা কোন ভাব সঙ্গীত শ্রবণ করিলেই তাঁহার সমাধি হইয়া যাইত। কিন্তু কোন দিন কাহারও সমাধিমগ্ন মূর্ত্তি চাক্ষুষ দর্শন না হওয়ায় উহা দর্শনের জন্য প্রাণে একটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভগবৎকৃপায় সে বাসনা একদিন আমাদের পূর্ণ হইয়াছিল। সন ১৩৩২ সালে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার পর দিবস ৫ই মাঘ আমরা তপোবন দর্শন গিয়াছিলাম। সে সময় শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ করণীবাদে তাঁহার রামনিবাস আশ্রমে ছিলেন। আমার তপোবনে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সাধনগুহা এবং পাহাড়ের অন্যান্য অংশ ঘুরিয়া দেখিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছিল। আমরা যে সময় রামনিবাস আশ্রমের পাশ দিয়া গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম, সে সময় যদিও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এত নিকট দিয়া যাইতেছি, যদি একবার শ্রীগুরুচরণ দর্শন পাই তবে একটী বার মাত্র প্রণাম করিয়াই চলিয়া আসিব মনে করিয়া ঐ স্থানে গাড়ী থামাইয়া আমরা আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম। যে সময় আমরা আশ্রমে প্রবেশ করিলাম সে সময় আশ্রমে বালেশ্বর মহাদেবের আরতি কেবলমাত্র সমাপ্ত হওয়ায় আশ্রমের বিদ্যার্থী বালকবৃন্দ এবং কতিপয় শিষ্য একত্র মিলিত হইয়া সমস্বরে মহাদেব মন্দিরে রুদ্রীর অধ্যায় আবৃত্তি করিতেছিল। ঠিক ঐ মন্দিরের সম্মুখে

তখন বালেশ্বরী মাতার মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি মধুর রবে নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছিল। বালেশ্বরী মাতার মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে একটী বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার মূলদেশ বহুদূর লইয়া উচ্চ করিয়া বাঁধন আছে। আমরা দুই মন্দিরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইতেই দেখিতে পাইলাম সেই নিম্ববৃক্ষ নিম্নে একটী বৃহৎ ধুনী প্রজ্বলিত হইয়াছে এবং উহার সম্মুখে উত্তরাস্য হইয়া শ্রীগুরুমহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামিজী উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে ঐ সময় প্রায় প্রতিদিন তিনি নির্জ্জনে ধ্যানকুটীরে থাকেন কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ সে দিন তিনি ঐ স্থানে আছেন দেখিয়া আমরা মহা আনন্দিত হইলাম এবং নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। তিনি সে সময় হাত রাখিবার জন্য তাঁহার * আশা দণ্ডটী চাওয়ায় তাঁহার জনৈক শিষ্য মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী উহা আনিয়া তাঁহার নিকট দিয়া গেলেন। তিনি সেইটীর উপর হস্তদ্বয় রাখিয়া আসন করিয়া বসিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই একেবারে সমাধিমগ্ন হইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একেবারে স্থির নিশ্চল হইয়া গেল। তথায় সে সময় আমার স্বামী, আমি, আমাদের দুই কন্যা এবং একজন আত্মীয় ব্যতীত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের পুরাতন ও প্রধান শিষ্য শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও আশ্রমের বৃদ্ধ পণ্ডিতজী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সেই নিবাত স্থানেতেস্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ মত স্থির সুন্দর উজ্জ্বল প্রশান্তমূর্ত্তি দর্শনে এবং ঐ সমাধি অবস্থার প্রভাবে আমরা ঐ স্থানের সকল ব্যক্তিই তখন কেমন এক প্রকার শুদ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ স্বামিজী তৎকালে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া যোড়হস্তে ঈষৎ নিমীলিত নয়নে শ্রীশ্রীগুরুদেবের দিকে মুখ করিয়া ভাবাভিভূত তন্ময় অবস্থায় একেবারে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীও স্থিরভাবে ভাবাভিভূত অবস্থায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতি নিষ্পন্দ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়া ছিলেন। আমাদের সকলেরই সে সময় অল্প বিস্তর ভাবাভিভূত অবস্থা হইয়াছিল।

* 'আশা দণ্ড' অর্থাৎ যোগীদের নিকট ইংরাজী 'টি' (T) অক্ষরের মত যে একপ্রকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত জিনিষ থাকে, যাহা সাধনাদিকালে মেরুদণ্ড সোজা রাখিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, উহার নাম 'আশা দণ্ড'।

(ক্রমশঃ)

অন্য সিদ্ধগণ বলিলেন আছে এবং নাই—এই দুই কোটির মধ্যবর্ত্তী যে সাক্ষীচৈতন্য বা অধিষ্ঠান চৈতন্য—বা সন্মাত্র ইনি প্রকাশ্য বস্তু-মাত্রেরও প্রকাশক—এই আত্মার আমরা উপাসনা করি। অর্থাৎ, অস্তি, নাস্তির প্রকাশক যে সন্মাত্র আত্মা আমরা তাঁহার উপসনা করি।

অন্যে ঊচুঃ।

যস্মিন্ সর্ব্বং যস্য সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যস্মায়িদম্।
যেন সর্ব্বং যদ্ধি সর্ব্বং তৎ সত্যং সমুপাস্মহে ॥১২

যস্মায়িদম্ = যস্মৈ ইদমিতি চ্ছেদঃ। সপ্তমীবিভক্তিমারভ্য ব্যুৎক্রমেণ সর্ব্বাবিভক্তয়ঃ ষণ্ণাং কারকাণাং সম্বন্ধ প্রাতিপদিকার্থা-ভেদস্য চ প্রদর্শনায়াত্রনির্দ্দিষ্টাঃ। তথাচ যৎব্রহ্ম সর্ব্বাধারত্বাৎ সর্ব্ব-স্বামিত্বাদেঃ সর্ব্বোপাদাননিমিত্তাবধিভাবাৎ সর্ব্বপারার্থ্যসম্প্রদানাদি-ভাবনির্ব্বাহকত্বাৎ সর্ব্বকর্ত্তৃকরণাদিভাবাৎ চ মায়য়া সর্ব্বজগৎ-ব্যবহারনির্ব্বাহকং সর্ব্বাত্মকং চ ভবতি তৎ সর্ব্বাধিষ্ঠানং পরমার্থসত্যং প্রত্যগাত্মৈবেতি বোধেন সম্যগুপেত্য তদ্ভূতা আস্মহে ইত্যর্থঃ ॥ ১২

অন্য সিদ্ধগণ বলিলেন সাতটি বিভক্তি অর্থাৎ সপ্তমী, ষষ্ঠী, পঞ্চমী, চতুর্থী, তৃতীয়া, দ্বিতীয়া, প্রথমা এই সমস্ত বিভক্তি দ্বারা যিনি মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন তিনিই আমাদের উপাসনার বস্তু। যাঁহাতে এই সমস্ত, যাঁহার এই সমস্ত, যাঁহা হইতে এই সমস্ত, যাঁহাকে এই সমস্ত বলে, যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত, যিনি এই সমস্ত সেই সত্য বস্তুকেই আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ পরমার্থ সত্য ব্রহ্মই আমরা—আমারা তদ্ভাবাপন্ন হইয়া আছি।

অন্যে ঊচুঃ।

অশিরস্কং হকারান্তমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে ॥ ১৩

অঃ শির ইব প্রথমো যস্য তমকারাদিমিত্যর্থঃ। হকারোন্তে যস্য তাং হকারান্তমহং পদমশেষবস্তুপ্রকাশকবেদ শাস্ত্রাদিশব্দজাল-

প্রকৃতিভূতানামশেষবর্ণনামক্ষয়েসমাম্নায়ে অকারহকারান্তরালনিবেশাদ- শেষজগদাকারে সপ্রপঞ্চে ব্রহ্মণি ন হন্যতে ন হীয়তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অহব্যাপ্তাবিতি ধাতুনিষ্পত্ত্যা চ ন শিষ্যতে অকারোযস্মিন্ ইত্যশেষাকারে নির্গুণে চ সংস্থিতং তাৎপর্য্যনিষ্ঠাং প্রাপ্তমজস্রং ক্রিয়মাণেষু স্বব্যবহারেষু উচ্চরন্তং অহঙ্কারোপাধিনিরাসেন তং বর্ণিতা— হম্পদার্থং "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসী" দিত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ- ব্রহ্মাত্মানমুপাস্মহে নিরন্তরং ভাবয়াম ইত্যর্থঃ। অথবা অশেষ- বস্ত্বাকারসংস্থিতং লং বং রং যং হং ইতি হকারান্তং পঞ্চবীজপ্রতিপাদ্য- পঞ্চমহাভূতাত্মকং জগৎ অশিরস্কং শিরোভূতমূলাজ্ঞানরহিতং কর্ত্তুমিব অস্ত্যাস্থতি বা মায়াং তং জগদিতি ব্যুৎপত্ত্যা অস্মচ্ছব্দনিষ্পন্নমকার— শিরস্কহকারান্তমহম্পদমজস্রমুচ্চরন্তম্। যুষ্মসিভ্যং মদিগিত্যস্তেরস্য- তের্ব্বাস্মচ্ছব্দব্যুৎপাদনাদিত্যর্থঃ। অথবা অশেষজগদাকারসংস্থিতং নিষ্প্রমাণকত্বেন নির্ম্মূলত্বাচ্ছ্রুতিশিরো বাহ্যত্বাচ্চাশিরস্কং হকারান্তং সোহং পরমার্থাসঙ্গচিদেকরসত্বাদজস্রমুচ্চরন্তং উদস্য চরন্তমুদ্ধৃত্য ভক্ষয়ন্তং বা স্বং প্রত্যগ্রূপমাত্মানমুপাস্মহে ইত্যর্থঃ।

সংগ্রহে তু সশিরস্কং হকারাদিমিতি পাঠঃ। তস্য চ সুরনরতির্য্যগান্ত —শেষশরীরাকারেষু সংস্থিতং সশিরস্কং হকারাদি হংস ইতি মন্ত্রম্— অজপা গায়ত্রী রূপেণ ষট্শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রসংখ্যয়া অজস্র প্রত্যহং শ্বাসোচ্ছাসচ্ছলেনো চ্চরন্ত মিত্যর্থঃ। অথবা পূর্ব্ববদ্রূপেণাপ- হারান্ন শিষ্যতে অকারো যত্র তদশেষাকারং সো ইতি পদং তত্র সংস্থিতং অতএব অশিরস্কং শিরোভূতপ্রথমবর্ণরহিতং হকারান্তং হকারমাত্রাব শেষং অহং পরং সোহং মন্ত্রমিতি যাবৎ। অজস্রমুচ্চরন্তমিত্যাদি প্রাগ্বৎ ॥১৩॥

অন্যে কহিলেন—শির যেমন দেহের প্রথম সেইরূপ অকার শিরের মত প্রথম যার অর্থাৎ অকারাদি আবার হকার অন্তে যার সেই হকা- রান্ত অর্থাৎ অকারাদি হকারান্ত শব্দের অর্থাৎ অহং এই পদের লক্ষ্য স্থান যিনি; আর যিনি অশেষ জগদাকারে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপে আত্ম চৈতন্য ভাসিতেছেন এবং প্রতি ব্যবহারে যিনি উচ্চারিত বা প্রকটিত

হইতেছেন সেই অহং, যে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাধি; আমরা সেই অহং উপাধি নিরাস করিয়া ব্রহ্মকেই নিরন্তর ভাবনা করি ॥

অন্যে উচুঃ।

সন্ত্যজ্য হৃদ্গুহেশানং দেবমন্যং প্রযান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌস্তুভাঃ ॥ ১৪

"হৃদ্গুহেশানং" "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ঠঃ" "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমিতি ॥ ১৪

অন্যে বলিলেন যে সকল লোকে আপনার হৃদয়পদ্মস্থ ঈশানকে, অর্থাৎ আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবের উপাসনা করে, তাহারা হস্তস্থিত কৌস্তুভমণি ত্যাগ করিয়া অন্য রত্ন বাঞ্ছা করে ॥১৪

অন্যে উচুঃ।

সর্ব্বাশাঃ কিল সন্ত্যজ্য ফলমেতদবাপ্যতে।
যেনাশা বিষবল্লীনাং মূলমালা বিলূয়তে ॥ ১৫

অন্যে তৎপ্রাপ্তৌ বৈরাগ্যমেব মুখ্যং সাধনমিত্যাহুঃ সর্ব্বাশা ইতি। এতৎ হৃদয়স্থং জ্ঞানফলং ব্রহ্ম। অবাপ্যতে লভ্যতে। যেন তল্লাভেন মূলমালা বাসনাজালজটিলহৃদয়গ্রন্থিঃ "রসোপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তত" ইতি ভগবদ্বচনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫

অন্যে কহিলেন—সর্ব্বপ্রকার আশা ত্যাগ করিলে—হৃদয়স্থ জ্ঞান ফল স্বরূপ এই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। এই লাভের দ্বারা বাসনা রূপা বিষবল্লীর মূলমালা অর্থাৎ বাসনাজাল জটিল হৃদয়গ্রন্থি সমূলে ছিন্ন হয়। যিনি কোন আশা রাখেন না—তাঁহার বাসনাজাল আর থাকে না তাহা হইলেই হৃদয়স্থ আত্মদেবকে লাভ করা যায়।

অন্যে উচুঃ।

বুদ্ধাপ্যত্যন্তবৈরস্যং যঃ পদার্থেষুদুর্ম্মতিঃ।
বধ্নাতি ভাবনাং ভূয়ো নরোনাসৌ স গর্দ্দভঃ ॥ ১৬

পদার্থেষু—ভোগ্যবিষয়েষু। ভাবনাং ভোগতৃষ্ণাম্ ॥

যে দুর্ম্মতি ভোগ্যবিষয় যে অত্যন্ত বিরস ইহা জানিয়াও আবার ভোগতৃষ্ণাতে মন বাঁধিয়া রাখে সে মানুষ নয় গর্দ্দভ ॥

অন্যে উচুঃ।

উত্থিতানুত্থিতানেতানিন্দ্রিয়াহীন্ পুনঃ পুনঃ।
হন্যাদ্বিবেকদণ্ডেন বজ্রেণেব হরির্গিরীন্ ॥ ১৭

অন্যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এব মুখ্যং সাধনমিত্যাশয়েনাহুঃ উত্থিতানিতি। হরিরিন্দ্র তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—"একমেকং কালকূটমিন্দ্রিয়ং নাশকৃৎ পুনঃ। তদেব শোধিতং সাক্ষাৎ বিষমিপ্যমৃতং যথা" ইতি। তথাচ ভারতে পি।

ইন্দ্রিয়ান্যেব তৎসর্ব্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ ॥ ১৭

অন্যে বলিলেন—এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতেছে এই সকলকে ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বত হনন করেন সেইরূপ যিনি বিবেকদণ্ডের দ্বারা হনন করিতে পারেন তিনিই আত্মদেবকে লাভ করেন।

অন্যে উচুঃ।

উপশমসুখমাহরেৎ পবিত্রং
শমবশতঃ শমমেতি সাধুচেতঃ।
প্রশমিতমনসঃ স্বকে স্বরূপে
ভবতি সুখে স্থিতিরুত্তমা চিরায় ॥ ১৮

অন্যে তু উপশম এব মুখ্য সাধনমিতরৎ সর্ব্বং তদর্থমিত্যাশয়েনোপ সংহরন্তি উপশমেতি। উপশমো বাহ্যাভ্যন্তরেন্দ্রিয়ব্যাপারোপরমস্তেন বিক্ষেপদুঃখোপশমবদাবির্ভূতমাত্মসুখমাহরেৎ সম্পাদয়েৎ। তদ্ধি ন বিষয়সুখবৎ দোষহেতুঃ কিন্তু চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাৎ পবিত্রম্। শমবশতো নিরিন্ধনাগ্নিবচ্চেতঃ শমমুপক্ষয়ং প্রয়াতি। এবং প্রশমিতমনসঃ সুখে নিরতিশয়ানন্দে স্বকে স্বীয়ে পরমার্থস্বরূপে স্থিতির্ভূমিকাপরম্পরা-রোহণক্রমেণোত্তমা সপ্তভূমিকা প্রতিষ্ঠা লক্ষণা চিরায় বিদেহকৈবল্যা-বধি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮

অন্যে বলিলেন—উপশমই হইতেছে মুখ্যসাধন—অন্য যা কিছু সাধন এই উপশমেরই জন্য—এইজন্য বলিতেছেন উপশম অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়ব্যাপারের উপশম—ইহা দ্বারা বিক্ষেপ দুঃখের উপশমবৎ আবির্ভূত যে আত্মসুখ তাহাই আহরণ করিবে—তাহাই সম্পাদন করিবে। এই সুখই পবিত্রসুখ কারণ বিষয়জন্য যে সুখ তাহাতে দুঃখ থাকিবেই কিন্তু উপশম দ্বারা চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে যে সুখ লাভ হয় তাহাতে কোন দুঃখের লেশমাত্র থাকে না বলিয়া ইহা পবিত্র। উপশম হইলে কাষ্ঠশূন্য অগ্নির মত চিত্ত শম বা উপক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মন প্রশমিত হইলে যে সুখ লাভ হয় সেই স্বীয় পরমার্থস্বরূপে যে স্থিতি—ক্রমে ক্রমে এই সাধনভূমিকাতে আরোহণ করিতে পারিলে উত্তমা সপ্তভূমিকা প্রতিষ্ঠারূপ কৈবলমুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করা যায়।

রাম—সিদ্ধগীতা অর্থ কি ?

বশিষ্ঠ—যাহা গানযোগ্য তাহার নাম গীতা ইহাই গীতার অক্ষরার্থ। উপনিষদ্ যেমন বেদের উপনিষদ্ সেইরূপ গীতাগুলি স্মৃতির উপনিষদ্। উপ-নি-ষদ্-ক্বিপ্ করিয়া উপনিষদ্ পদসিদ্ধ অর্থাৎ তুমি অতি সমীপে (উপ) ইহা নিশ্চয় করিয়া (নি) যে বিদ্যা সংসার সাদন (সদ) অর্থাৎ সংসার নিবৃত্তি করে তাহাই উপনিষদ্।

রাম—সিদ্ধগীতায় মুখ্য কথা কি ?

বশিষ্ঠ—চৈতন্য যাহা তাহা সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ। এই পরিদৃশ্যমান জগতের যাহা কিছু দেখা যায় শুনা যায় স্মরণ করা যায় সমস্তই এই পরিপূর্ণ চৈতন্যের গায়ে ভাসিয়াছে। এই চৈতন্য এক অখণ্ড দণ্ডায়মান বস্তু। ইনি আত্মা। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় আত্মা আকাশের মত অপরিচ্ছন্ন। আত্মাকে ধরিয়া কেহ নাই—পরন্তু ইনিই সকলের আধার আকাশেরও আধার ইনি। আত্মা এই শরীররূপ উপাধিতে অভিব্যক্ত, অন্যস্থানে অব্যক্ত। শরীরে অভিব্যক্ত হইলেও ইনি বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার মন এই সকলের সঙ্গে মিশিয়া আছেন। এই সকলের দ্বারা ইনি প্রচ্ছন্ন। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ইন্দ্রিয়—ইত্যাদি

শরীরের গুণ ও ক্রিয়াগুলি উদ্রিক্ত না হয়—যদি এইরূপ সাধনা করা যায় তবে আত্মদেবের দর্শন লাভ হয়। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনার কথা এই সিদ্ধগীতাতে বলা হইল। সকল সাধনাই মনের বা চিত্তের উপশম জন্য। উপশম হইলেই আত্মাকে পাওয়া যায়।

— —

উপশম ৯

সিদ্ধগীতা—রাজা জনকের বিষাদ ও বিচার।

রণরব শ্রবণে ভীরু যেমন বিষাদপ্রাপ্ত হয়, রাজা জনকও সিদ্ধগীতা শ্রবণে সেইরূপ বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। স্বীয় তীরবৃক্ষানুরাগী নদী যেমন সমুদ্রের প্রতি ধাবিত হয় সেইরূপ রাজা পরিবারবর্গ সঙ্গে থাকিলেও গৃহগমনে ত্বরান্বিত হইলেন। পরিবারবর্গকে গৃহে রাখিয়া সূর্য্যদেবর উদয়াচল আরোহণের ন্যায় রাজা প্রাসাদের উপরে আরোহণ করিলেন। রাজা তখন লোকগতি আলোচনা করিয়া—সংসারের স্থিতি আলোচনা করিয়া—অতিশয় ব্যাকুল হইলেন—তাইত! সংসারের সমস্তই উড্ডয়নে লোলুপ পক্ষী পক্ষের ন্যায় অতি চঞ্চল। রাজা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হায়! কি কষ্ট! পাষাণ যেমন পাষাণে লুণ্ঠিত হয় সেইরূপ কে আমাকে বলপূর্ব্বক এই অতি কঠোর জন্ম জরা ভয় মরণাদি অতি কষ্ট-প্রদ সাংসারিক দশায় যেন লুণ্ঠিত করিতেছে। কাল অসীম, সেই অসীম কালের কতটুকু অংশ আমার জীবন? তাহাতেই আমি আশা বাঁধিয়া বসিয়া আছি "ধিঙ্মামধমচেতনম্" ধিক্ আমারে—আমি কি অধম চেতন? এই আমার রাজত্ব! আমার জীবনযাপনের জন্য ইহাতে আমার কি প্রয়োজন? আমি যদি ভাবিদুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া মূর্খের মত কাল কাটাই তবে এই রাজ্যে আমার কি হইবে? এই দেহমাত্রই কি আমি? আমি যে অনাদি, অনন্ত—মধ্যে কিছুদিনের জন্য এই

ক্ষণভঙ্গুর দেহটাকে আমি আমার করিয়া লইয়া বালক যেমন চিত্রিত চন্দ্র দেখিয়া উল্লসিত হয় সেইরূপ আমিও এই দেহাদিতে সুখ দর্শন করিতেছি! দেহ আমার কে? হায় কষ্ট! আমি কি কোন ঐন্দ্র-জালিক দ্বারা পরিমোহিত হইয়াছি?

যদ্বস্তু যচ্চ বা রম্যং যদুদারমকৃত্রিমম্।
কিঞ্চিত্তদিহ নাস্ত্যেব কিং নিষ্ঠেহ মতির্ম্মম ॥১০

যাহা সত্য বস্তু (বসতীতি বস্তু—চিরদিন যাহা থাকে তাহাই বস্তু) যাহা চিররমণীয়, যাহা উদার অর্থাৎ অপরিচ্ছন্ন; যাহা অকৃত্রিম—যাহা জন্য নয়—এই জগতে এমন কি কিছু আছে? তবে আমার নিষ্ঠা কিসে হইবে? তবে আমি কি লইয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত হইব?

দূরস্থমপ্যদূরস্থং যন্মে মনসি বর্ত্ততে।
ইতি নিশ্চিত্য বাহ্যার্থভাবনাং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥১১

সেই প্রসিদ্ধ বস্তু কি বহুদূরে আছেন? না তা নয়। দূরস্থত্বেন প্রসিদ্ধমপি যৎকিঞ্চিদ্বস্তু অদূরস্থমেব। কুতঃ? যৎ যস্মাৎ মে মনসি বর্ত্ততে। নহি মনোদেহাদ্বহির্দ্দূরং ব্রজতি তথা সতি দূরে এব তৎপ্রথা-নুভুয়েত ন হৃদি। হৃদ্যেব হি সর্ব্বে বাহ্যবস্তুবোধমনুভবন্তি। তস্মাৎ দূরাদিকল্পনাপ্যন্তর্ভাসমানা ন বাস্তবীত্যনর্থ এবেতি তদ্ভাবনা ত্যাজ্যৈব নোপাদেয়েত্যর্থঃ ॥১১

কোন বস্তুই দূরে নয়। কতদূরে লোকে বলে বটে কিন্তু কোন বস্তুই দূরে নাই। কেন? যেহেতু মনেই সব আছে। লোকে বলে বটে মনটা বহুদূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মন কিন্তু দেহের বাহিরে কখন যাইতে পারে না। তাহা হইলে 'দূরে' এই কথাটা বলা একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে—সেই প্রথা অনুসারে তুমি দূরে বলিয়া অনু-ভূত হয়, হৃদয়ে আছ বলিয়া অনুভূত হয় না। কিন্তু সমস্ত বাহ্যবস্তুর অনুভবই হৃদয়েই হয়। সেইজন্য বলিতেছি দূরাদিকল্পনাও অন্তরেই ভাসে—দূরে আছ এই কল্পনা সত্য নহে—ইহা অনর্থই। এই জন্য ইহা ত্যাজ্য উপাদেয় নহে।

অজ্ঞানীর অতি দূরে কিন্তু বিবেকীর অতি নিকটে যিনি বলা হয় তিনিত আমার মনেই বিদ্যমান কারণ নিকট বা দূর ইহা বলা একটা প্রথা দাঁড়াইয়াছে—সমস্তই মনে। এইটি নিশ্চয় করিয়া আমি বাহিরের সমস্ত বস্তুর ভাবনা ত্যাগ করিব। "ইতি নিশ্চিত্য বাহ্যার্থভাবনাং সন্ত্যজাম্যহম্।"

ভোগের জন্য ধনার্জ্জনাদি যে প্রবৃত্তি (আজবঞ্জবী ভাবঃ) তাহা সলিলাবর্ত্তের মত ভঙ্গুর—নশ্বর ফল—জন্ম মরণাদি দুঃখের হেতু—ইহাত বহুশ দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়াও সুখের প্রতি আস্থা কেন থাকিবে? প্রতি বৎসর, প্রতি মাস, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ যাহা সুখ বলিয়া ভোগ করিতেছি তাহাত দুঃখপিণ্ড নিবিড় দুঃখ তাহাত সুখ নহে সুখগন্ধি দুঃখ—তবেত দুঃখই পুনঃ পুনঃ ভোগ হইতেছে। বিচার করিলে দেখা যায় এই সংসারের যাহা কিছু তাহা কিঞ্চিৎ কালের জন্য দৃষ্ট হইলেও সদ্যই নষ্ট হয়—আমার এই রাজ্য সম্পদ্ অতি তুচ্ছ ইহাত আমি ভাবনা করিনা কারণ বিশিষ্ট বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মাত্বও থাকে না—এখানে তবে এমন কি আছে যাহাতে স্থিতি লাভ করা যায়? আজ যাঁহারা মহৎগণের মস্তকে অবস্থিত, কাল তাঁহারাই অধঃপতিত হইতেছেন। রে হতচিত্ত—রে মোহ হতচিত্ত! তবে মহত্ত্বের উপরে তোমার বিশ্বাস কি? 'হতচিত্ত মহত্তায়াং কৈষা বিশ্বস্ততা বত।" রজ্জু নাই তথাপি আমি বদ্ধ, পঙ্ক নাই তথাপি আমি কলঙ্কিত, ঊর্দ্ধে থাকিয়াও আমি নিপতিত হে আত্মা! তোমার স্বরূপে স্থিতি যে হত হইল! আমার বুদ্ধি আছে তথাপি কি জন্য অকস্মাৎ এই মোহ আসিল—ভাস্করের সম্মুখে শ্যামবর্ণ মেঘ কিরূপে আসিল? এই মহাভোগ সকল কি? এই বন্ধুবান্ধব কি? বালকের ভূত কল্পনার মত আমার আমার সম্বন্ধ কল্পনায় আমি আকুল হইলাম! আমি স্বয়ং জরামরণের প্রিয়সখী এই উদ্বেগ-কারিণী সাংসারিক আস্থা দ্বারা আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। যাক্ বা থাক্ এই ভোগবান্ধব সম্পদের প্রতি আমার এই আগ্রহ কেন থাকিবে? ইহা যে জলবুদ্বুদের মত অকস্মাৎ উঠিয়া পরক্ষণেই মিলাইয়া যায়। পৃথু মরুত্ত প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিগণের ঐশ্বর্য্য ভোগ

সৌধেষু বনরাজীষু পুলিনাদিষু সংবভৌ।
হেমলেখাং রাজপুত্রো ভোগেষনতি কামিনীম্ ॥ ৪৯
উদাসীনাং সদাদৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ রহসি ক্বচিৎ।
কিং প্রিয়ে নানুরক্তাঽসি প্রিয়ে মষ্যনুরাগিণি ॥ ৫০

টীকা] সর্ব্বং তয়োরভিপ্রায়ম্। তৎ তস্মৈ কন্যাদানম্ ॥ ৪৬-৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ] রাজকুমার মুক্তা-চূড়ও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে লইয়া নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন এবং অতি সন্তুষ্ট হইয়া বিধিপূর্ব্বক মহোৎসবের সহিত তাহাকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর রাজকুমার সৌধতলে বনরাজিতে ও নদীপুলিনাদি (রমণীয় স্থানে) সর্ব্বদা হেমলেখার সহিত ক্রীড়া পরায়ণ হইলেন। রাজপুত্র হেমলেখাকে সর্ব্বদাই ভোগে অনতি কামিনী ও উদাসীনা দেখিয়া এক দিন গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রিয়ে, আমি তোমার প্রিয় ও তোমার প্রতি অনুরক্ত, তথাপি তোমাকে অনুরক্ত দেখিতেছি কেন? ॥ ৪৭-৫০

কুতো ভোগেষু নাত্যক্ত মাসক্তাসি শুচিস্মিতে।
কিং ভোগাস্তে মনোযোগ্যা ন সন্ত্যত্র কুতস্ত্বিদম্ ॥ ৫১
অত্যুত্তমেষু ভোগেষু না সক্তেব বিভাসি মে।
ত্বয্যা সক্তি বিহীনায়াং কথং মে সুখদা রতিঃ ॥ ৫২
আসক্তে ময়ি চাপি ত্বং ভাস্যন্য গত মানসা।
ভাবিতাঽপিময়াভূয়ো ন শৃণোষ্যেব কিঞ্চন ॥ ৫৩
আগতং কণ্ঠং সংলগ্নং চিরাদপি বিভাব্যচ।
কদানাথাগতঞ্চেতি পৃচ্ছস্য বিদিতা যথা ॥ ৫৪

টীকা] কুতঃ কস্মাদ্ধেতোঃ। ভোগাভোগ সাধনানি। কুত ইদ মৌদাসীন্যম্ ॥ ৫১ ॥ ভোগা অনুত্তমা এবেত্যাশয়েনাহ—অত্যুত্তমেম্বিতি। অত্যুত্তমে অলভ্যে ঽপি ভোগে আসক্তেব ন বিভাসি। কিং মদাসক্ত্যা তবেতি চেদাহ ত্বয়ীতি—পরস্পরাসক্ত্যতিশয়েনৈব রতিঃ সুখদেত্যাশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ কথমনাসক্তিময়িত্বয়া নিশ্চিতা তদাহ আসক্তে ইতি অপি আসক্তে ত্বদেক ভাবে সত্যপি ত্বমন্যগত মানসেব ভাসীতি শেষঃ। অন্যগত মানসত্বং বা কথং ত্বয়াবগতমিতিচেদাহ—ভাবিতেতি ॥ ৫৩ ॥ চিরাৎ কণ্ঠসংলগ্নমপি কদা আগতমিতি পৃচ্ছসি ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ] সুহাসিনি, ভোগ্য, পদার্থে তোমার অত্যন্ত আসক্তির অভাব দেখিতেছি কেন? এখানে কি তোমার মনোমত ভোগ্য নাই? তাহাই বা কিরূপে? অত্যুত্তম ভোগেও তোমাকে অনাসক্তার ন্যায় দেখিতে পাই। তুমি আসক্তি শূন্য হইলে তোমাতে রতি আমার সুখদায়িনী হইবে কিরূপে? ॥ ৫১-৫৩ ॥ আমি আসক্ত হইলেও তোমাকে অন্যমনস্কা দেখিতে পাই, তোমাকে পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিলেও তুমি যেন কিছুই শুনিতে পাইতেছ না মনে হয়। আমি আসিয়াছি তোমার কণ্ঠ সংলগ্ন হইয়াছি, তুমি বহুক্ষণ পরে তাহা বুঝিতে পারিয়া নাথ! কখন আসিলেন বলিয়া অবিদিতার ন্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাক ॥ ৫৪

পেশলেষ্বপভোগেষু দুর্লভেষু ক্বচিন্নতে।
মন আসজ্জতে কস্মান্ন কিঞ্চিদনুমোদসি ॥ ৫৫
ময়া বিরহিতাং ত্বাংবৈ নিমীল্য নয়নে স্থিতাম্।
যদা যদোপগচ্ছামি পশ্যামি চ তদা তদা ॥ ৫৬
বিমুখ্যাং ত্বয়ি ভোগেষু বিষয়েষু সুখং মম।
কথং ভবেদ্দারুযোষা সঙ্গতস্যেব তদ্ বদ ॥ ৫৭
ন তবাভিমতং ত্যক্ত্বা কিঞ্চিন্মম সমীহিতম্।
সর্ব্বথা ত্বামনুগতো জ্যোৎস্নাং কুমুদবৎ কিল ॥ ৫৮
তদেবং তে কুতশ্চিত্তং ব্রূহি প্রাণাধিক প্রিয়ে।
যেন শুধ্যেৎতু মচ্চিত্তং শাপিতাঽসি ময়া প্রিয়ে ॥ ৫৯

ইতি শ্রীত্রিপুরা রহস্যে জ্ঞান খণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা] পেশলেষু সুন্দরেষু মনো ন সজ্জতে ইত্যপি কথং বিদিতমিতিচেদাহ ন কিঞ্চিদিতি। যতো ন কিঞ্চিদলভ্যমপি ভোগ্যমহোসুন্দর মিতি নানুমোদসে ॥ ৫৫-৫৭ ॥ ন চ ত্বামননুগতোঽস্মীত্যাহ নতবেতি ॥ ৫৮ ॥ এবং বিষয় বিমুখম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীত্রিপুরারহস্যে জ্ঞান খণ্ডে ব্যাখ্যায়াং,
তাৎপর্য্য দীপিকায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ] কোনও দুর্লভ সুখভোগ্য পদার্থেও তোমার মন আসক্ত নহে, কেনই বা কিছুই অনুমোদন কর না? ॥ ৫৫ ॥

আমি যখন তোমার নিকটে থাকিনা, এবং যখন যখন তোমার নিকটে উপস্থিত হই তখনই দেখি—তুমি নিমীলিত নয়নে বসিয়া আছ ॥ ৫৬ ॥

তুমি ভোগ বিমুখী হইলে বিষয়ে আমার সুখ কিরূপে হইবে বল? কাষ্ঠময়ী স্ত্রীর আলিঙ্গনে কি সুখ হয়? ॥ ৫৭ ॥

তোমার যাহা অভিলষিত আমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই কিছু করি নাই, কুমুদ যেমন (বিকাশে ও নিমীলনে) জ্যোৎস্নার অনুবর্ত্তন করে আমিও তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে তোমারই অনুগত হইয়া আছি ॥ ৫৮ ॥

প্রাণাধিক প্রিয়ে! বল তাহা হইলে তোমার চিত্ত কেন এরূপ হইল?

(বল) যাহাতে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে। প্রিয়ে, তোমার শপথ লাগে বল ॥ ৫০ ॥

শ্রীত্রিপুরা রহস্যের জ্ঞান খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়।

প্রিয়স্য কণ্ঠলগ্নস্য নিশম্যৈবং বচো হি সা।
ঈষৎ স্মিতাননা প্রাহ রাজ-পুত্রমনিন্দিতা ॥ ১
বুবোধয়িষতী রাজ পুত্রং যুক্তাঽব্রবীদিদম্।
রাজ-পুত্র শৃণু বচো নাহং ত্বয়ি বিরাগিণী ॥ ২
কিংস্যাৎ প্রিয়তমং লোকে কিন্নুস্যাদপ্রিয়ন্ত্বিতি।
বিচার পরমা নিত্যং নান্তমেত্যত্র মে মতিঃ ॥ ৩

টীকা] অধ্যায়ে মানপমিতেঽস্মিন্নাখ্যানে ন সুস্ফুটম্। বৈরস্যং ভোগ জালেষু বৈরাগ্যায় নিরূপ্যতে ॥ অনিন্দিতেতি—ন তস্যা বিদিত-বেদ্যায়া বিষয় —বৈমুখ্যং মৌঢ্যা দিনেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ বুবোধয়িষতী এনং বোধয়িষ্যতীতীচ্ছা যুক্তা। যুক্ত্যেতি—কেবল স্ববচসি তস্যা নাশ্বাস সম্ভবাদিতিভাবঃ। ইদং— বক্ষ্যমাণম্ ॥ ২ ॥ যদি নাসি বিরাগিণী, তর্হিকুত এবমিতি চেদাহ— কিংস্যাদিতি। বিচার এব পরমো মুখ্য ধ্যেয়ো যস্যাঃ। অন্তং নিশ্চয়ম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ] অনিন্দিতা হেম-লেখা কণ্ঠ-সংলগ্ন প্রিয়জনের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে বলিলেন ॥১॥ হেমলেখাতত্ত্ব-যুক্তির সাহায্যে রাজপুত্রকে বুঝাইবার অভিলাষে নিম্নলিখিত বাক্য বলিলেন—রাজপুত্র, আমার বাক্য শ্রবণ কর—আমি তোমার প্রতি বিরাগিনী নহি ॥২॥ এই ভূলোকে কোন্ বস্তু প্রিয়তম হইতে পারে, কোন বস্তুইবা অপ্রিয় হইতে পারে অনুক্ষণ এই বিষয়ের বিচারকেই আমার বুদ্ধি পরম কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছে, তথাপি আমার বুদ্ধি এই বিষয়ের নিশ্চয় প্রাপ্ত হয় নাই ॥৩॥

ধ্যায়াম্যেতচ্চিরান্নিত্যং স্ত্রী স্বভাববশাদহম্ ।
নৈতজ্জানামি তত্ত্বংমে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥৪
এবং প্রোক্তো হেমচূড়ঃ প্রহস্য প্রাহ তাং প্রিয়াম্ ।
নূনং স্ত্রিয়ো মূঢ়ধিয় ইতি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥৫
প্রিয়াপ্রিয়ে হি জানন্তি পশু-পক্ষি-সরীসৃপাঃ ।
যতস্তেষাং দৃশ্যতে হি প্রিয়েষ্ব প্রিয়কেষু চ ॥৬
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ কিমত্র বহু-চিন্তনম্ ॥
সুখং যস্মাৎ তৎ প্রিয়ং স্যাৎ দুঃখং যস্মাৎ তদপ্রিয়ম্ ॥৭

টীকা] কিমেতদ্ ধ্যানেন তে ফলমিতি চেদাহ স্ত্রী স্বভাবেতি। তত্ত্বমিতি-প্রিয়া প্রিয়-স্বরূপস্য তত্ত্বং যাথার্থ্যম্ ॥৪॥৫॥ কুতোমূঢ় ধিয় ইতি চেদাহ-প্রিয়েতি। যত্তির্য্যঞ্চোঽপি জানন্তি, তত্র কোঽয়ং বিচার ইতি ভাবঃ ॥৬॥ কথং ত্বয়ৈতৎ পশ্বাদি জ্ঞানং বিজ্ঞাতমিতি চেদাহ প্রবৃত্তীতি। প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিভ্যামনুমীয়ত ইত্যর্থঃ। অত্র তিরশ্চামপি প্রসিদ্ধে হর্থে। নমু তর্হি প্রিয়া প্রিয়ায়োর্লক্ষণং বদেতি চেদাহ সুখমিতি ॥৭

বঙ্গানুবাদ] আমি স্ত্রী স্বভাব বশতঃ বহুদিন হইল ইহাই অনুক্ষণ ধ্যান করিতেছি, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিলাম না। অতএব তুমিই আমাকে এ বিষয় তত্ত্বতঃ বল ॥৪

হেমচূড় এইরূপে উক্ত হইয়া পরিহাস পূর্ব্বক প্রিয়া হেম-লেখা কে বলিলেন স্ত্রীলোকদিগকে মূঢ়বুদ্ধি বলা হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত সত্য; ইহাতে সংশয় নাই ॥৫ ॥

পশু পক্ষী ও সরীসৃপগণ ও কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, তাহা বুঝিতে পারে।

কারণ—তাহাদের ও প্রিয় বিষয়ে প্রবৃত্তি, অপ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্তি দেখা যায়। এ বিষয়ে বহু চিন্তার কি আছে? যাহাতে সুখ হয়, তাহাই প্রিয়; যাহাতে দুঃখ হয়, তাহাই অপ্রিয়।

কিমত্র মুগ্ধ ভাবেন নিত্যং চিন্তয়সি প্রিয়ে।
শ্রুত্বা প্রিয়বচঃ প্রাহ হেমলেখা পুনঃ প্রিয়ম্ ॥৮
সত্যং স্ত্রিয়ো মুগ্ধ-ভাব নাস্ত্যাসাং সদ্বিমর্শনম্।
তথাপ্যহং বোধনীয়া ত্বয়া সম্যগ্ বিমর্শিনা ॥৯
সুবোধিতা ত্বয়া চাহং চিন্তা মেতাং বিসৃজ্যতু।
ত্বয়া ভোগেষু সততং ভবাম্যনুদিনং ততঃ ॥১০
রাজন্ সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ যাভ্যাং ভবতি তে ননু।
প্রিয়াপ্রিয়ে বিনির্দ্দিষ্টে ত্বয়া সূক্ষ্ম বিমর্শিনা ॥১১
একমেব সুখং দুখং কালদেশাকৃতে ভিদা।
জনয়েদত্র তৎ কস্মাৎ প্রতিষ্ঠাধ্যবসায়িনী ॥১২

টীকা] অত্র প্রসিদ্ধে হর্থে ॥৮॥ সদ্বিমর্শনং সম্যগ বিচারঃ। ভোগেষ্বা—সক্তা ভবামি। ততঃ বোধনানন্তরম্ ॥১০॥ তল্লক্ষণং দূষয়িতুমনুবদতি রাজন্নিত্যাদি ॥১১॥ ভিদা-ভেদেন; একমেব বস্তু কালাদি ভেদেন সুখং দুঃখঞ্চ জনয়েৎ। অত্র এবম্ভূতে বস্তুনি। প্রতিষ্ঠা-সুখসাধনমেবেতি অব্যভিচারি প্রতিষ্ঠিত স্বরূপতা ॥.২॥

বঙ্গানুবাদ] প্রিয়ে এই (প্রসিদ্ধ) বিষয়ে নিত্য মুগ্ধ ভাবে কি চিন্তা করিতেছ?

হেমলেখা প্রিয় (স্বামী) বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়কে বলিলেন ॥৮ সত্যই স্ত্রীগণ মূঢ়-ভাব সম্পন্ন—ইহাদের সম্যক্ বিচারের সামর্থ্য নাই। তথাপি সম্যক্ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন তুমি—তোমার আমাকে বুঝাইতে হইবে ॥৯॥

তুমি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও, তারপর আমি এই চিন্তা ত্যাগ করিব; এবং প্রতিদিন সতত তোমার সহিত ভোগে আসক্তা হইব ॥১০॥

রাজন্, সূক্ষ্মবিচারসম্পন্ন তুমি নির্দ্দেশ করিলে—যাহতে সুখ ও দুঃখ হয়, তাহাই যথাক্রমে— প্রিয় ও অপ্রিয় ॥১১ ॥

(কিন্তু দেখিতেছি) কাল, দেশ ও আকৃতিভেদে একই বস্তু সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহা হইলে ইহা অব্যভিচারি-রূপে সুখ সাধন বা দুঃখ সাধন এইরূপ নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব?

যতো বহ্নিঃ কালভেদাৎ পৃথগেব ফলপ্রদঃ।
তথা দেশ-বিভেদেনাপ্যাকারস্য বিভেদতঃ ॥১৩
শীতকালে প্রিয়োবহ্নি রুষ্ণে ত্বপ্রিয় এবহি।
হিমোষ্ণ দেশভেদেন প্রিয়শ্চাপ্রিয় এব চ ॥১৪
শীত প্রকৃতি-জীবানাং প্রিয়োঽন্যেষাং তথেতরঃ।
অথাপ্যধিক ভাবেনাল্প ভাবে নৈব মীরিতঃ ॥১৫
এবং শীতং ধনং দারাঃ পুত্রা রাজ্যং তথেতরৎ।
অথাপ্যেবং মহারাজ দার-পুত্র-ধনৈর্বৃতঃ ॥১৬

টীকা] তদেব নিরূপয়তি—যত ইতি। পৃথক ফলস্য সুখাদেঃ প্রদ এব ॥১৩॥ এতদৈব বিবিচ্যাহ শীতেতি ॥১৪॥ প্রকৃতি-রূপাকার ভেদেঽপি তথেত্যাহ অথেতি। এবং সুখা সুখয়োঃ সাধকত্বেন প্রিয়োঽপ্রিয়শ্চ ॥১৫॥ উক্তমর্থ মন্ত্রাতিদিশতি এবমিতি; ইতর-পশ্বাদি। এবং ন কস্যচিৎ সুখমাত্র সাধনত্ব মিত্যুক্ত্বা সুখ সাধন ত্বং নাস্ত্যেবেত্যাহ অথাপীতি। সর্ব্বসুখ সাধনে সত্যপীত্যর্থঃ। মহারাজো মুক্তাচূড়ঃ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ] যেহেতু—একই অগ্নি কালভেদে সুখ দুঃখাদি পৃথক্ পৃথক ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। সেইরূপ দেশ ও আকারের ভেদে একই বস্তু পৃথক্ ফল প্রদ হইয়া থাকে—দেখা যায় ॥ ১৩

একই অগ্নি শীত কালে প্রিয়, গ্রীষ্ম কালে অপ্রিয় হইয়া থাকে। এইরূপ হিম প্রধান দেশে ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশ ভেদে প্রিয় ও অপ্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১৪

শীত প্রকৃতি জীবের পক্ষে অগ্নি প্রিয়, উষ্ণ প্রকৃতি জীবের পক্ষে অপ্রিয়। এইরূপ অগ্নি কাহারও অধিক প্রিয়, কাহারও অল্পপ্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১৫

এইরূপ শীত, ধন, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, পশু প্রভৃতি সকলই কাল দেশে ও আকার ভেদে সুখ কর ও দুঃখ কর হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা গেল কোন বস্তুই কেবল সুখের কারণ নহে, সুখ দুঃখ উভয়েরই কারণ। এখন প্রদর্শিত

হইতেছে কোন বস্তুই সুখ সাধন নহে-কারণ) পক্ষান্তরে আরও দেখুন মহারাজ মুক্তাচূড় স্ত্রী পুত্র ধন প্রভৃতি সুখকর পদার্থে পরিবেষ্টিত॥ ১৬

শোচত্যনুদিনং কস্মান্ন শোচন্তী তরে কুতঃ।
যোঽয়ং ভোগঃ সুখার্থোঽস্তি সোঽপ্য নন্তো ভবেন্নতু॥ ১৭
ন কেনচিৎ তদখিলং প্রাপ্তং যস্মাৎ সুখং ভবেৎ।
যৎ কিঞ্চিল্লাভতো যস্মাৎ সুখং তত্রাপি সংশৃণু॥ ১৮
ন তৎ সুখং ভবেন্নাথ যতো দুঃখ বিমিশ্রিতম্।
দুঃখন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্য মান্তর মিত্যপি॥ ১৯
বাহ্যং শরীর সম্ভূতং ধাতু দোষাদি সম্ভবম্।
আন্তরং মানসং প্রোক্তং তচ্চ বাঞ্ছা সমুদ্ভবম্॥ ২০

টীকা] দারাদ্যখিল সুখ সাধন যুক্তোঽপি কস্মাদনুদিনং শোচতি? ইতরে সুখ সাধন রহিতা বিরাগিণঃ। ননু মৎপিতুরখিল-বিষয়া প্রাপ্ত্যা শোকঃ। অতঃ অখিল—বিষয়াণাং সম্ভূয় সুখ সাধনত্বমি-তিচেদাহ যো য মিতি॥ ১৭॥ তস্যানন্ত্যেন প্রাপ্ত্য সম্ভবান্নেত্যাহ—ন কেন চিদিতি। মাঽস্ত্বখিল লাভ স্তথাপি কদাচিৎ কিঞ্চিল্লাভে কস্যচিৎ সুখং ভবত্যেবেতি চেদাহ তত্রাপীতি—তৎসুখ বিষয়ে ঽপীত্যর্থঃ॥ ১৮॥ দুঃখ বিমিশ্রিতমিতি প্রকাশান্ধকারয়োরিব সুখ দুঃখয়ো বিরুদ্ধঃ স্বভাবত্বান্নৈকদা সম্ভবঃ, অত স্তৎকালে দুঃখস্যানুভূয়মানত্বান্ন ত্বদভিমতং সুখ মিতি ভাবঃ। ননু তৎকালে দুঃখানুভবোঽস্তীত্যাশঙ্ক্য তদ্দুঃখমুপপাদয়িতু বিভজতি—দুঃখন্তিতি॥ ১৯॥ ধাতবো বাত পিত্তাদয়ঃ,আদিনা স্ফোটা ভিঘাতাদিঃ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ] তথাপি তিনি প্রতিদিন শোক করেন কেন? আর যাহাদের সুখের উপকরণ কিছুই নাই, এমন বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরা শোক করেন না কেন? (তার পর যদি ইহা মনে করা যায়, যে আমার পিতা মুক্তাচূড়ের সমগ্র সুখ সাধনের অভাব ছিল, তাই তিনি শোক করেন, সমগ্র সুখসাধন একসময়ে যাহার আছে, সে সুখী. ইহাও সমীচীন নহে কেননা—) এই যে সুখের উপকরণ ভোগ রাশি রহিয়াছে ইহাও অনন্ত নহে॥ ১৭

আর সুখের সে সমগ্র উপকরণ কেহই প্রাপ্ত হয় নাই যাহাতে সুখ হইতে পারে। যৎ কিঞ্চিৎ সুখের উপকরণ পাইয়া যে সুখ হয়, তাহাতে ও অনেক বক্তব্য আছে শ্রবণ কর॥ ১৮

নাথ, তাহাও সুখ নহে যেহেতু তাহা দুঃখ মিশ্রিত। দুঃখও আবার বাহ্য ও ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ॥ ১৯॥ শারীরিক দুঃখকে বাহ্যদুঃখ বলে, ইহা রস রক্ত প্রভৃতি ধাতুর দোষ হইতে সমুদ্ভূত। মানসিক দুঃখকেই আভ্যন্তর দুঃখ বলে, ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ২০

মহত্তরং মানসং স্যাদ্ যেন গ্রস্ত মিদং জগৎ।
বাঞ্ছৈব দুঃখ বিটপিবীজং সুদৃঢ় শক্তিকম্॥ ২১
যয়া কিঙ্করতাং প্রাপ্তাঃ কুর্ব্বন্ত্যেব দিবা নিশম্।
ইন্দ্রাদয়ো ঽপি বিবুধাঃ স্বর্নিবাসাঃ সদোদিতাঃ॥ ২২
সুখং বাঞ্ছাবশেষেঽপি যদস্তি নৃপ সম্ভব।
তদ্ দুঃখমেব জানীহি যৎকৃমিষ্বপি সম্ভবেৎ॥ ২৩

টীকা] শরীরান্মানসং মহত্তরম্। কুতো মহত্তরত্বং তদাহ যেনেতি। বীজ স্বভাবাদপি তস্য মহত্তরত্বমাং—বাঞ্ছৈবেতি। সুদৃঢ় শক্তিকমবশ্যম্ফল পর্য্যবসায়ীতি ভাবঃ। নৈবং ধাতু দোষাদি, তস্য সুপ্রতিকার্য্যত্বাৎ॥ ২১

অতএবামৃতাশিনামপি সাদৃশ্যত ইত্যাহ—যয়েতি। বাঞ্ছয়েত্যর্থঃ। স্বর্গাত্মক গুণোত্তর দেশ সেবনেন সদোদয় নিমিত্তামৃতপানেন বা তং প্রতিকর্ত্তুমসমর্থা এব দেবা ইত্যাশয়ঃ॥ ২২॥ নমু মন্দান্ধকারে প্রকারে প্রকাশান্ধ কারয়ো রবিরুদ্ধয়োরিব বাঞ্ছাকালে সুখ দুঃখয়োঃ সহভাব ইষ্যত ইতি চেদাহ সুখ মিতি—দুঃখ মিশ্রিতস্য সুখস্য কৃমিষ্বপি দুঃখ প্রকৃতিকেষু সম্ভবান্ন-তন্মুখ্যং সুখং। কিন্তু মন্দান্ধকারস্থ প্রকাশাভাসবৎ সুখাভাস বেবেত্যাশয়ঃ॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ] তন্মধ্যে মানস দুঃখই মহত্তর, যাহাদ্বারা এই জগৎ কবলিত হইয়া রহিয়াছে। বাঞ্ছাই দুঃখ বৃক্ষের সুদৃঢ় শক্তি শালী বীজ॥ ২১॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ গুণাধিক স্বর্গাদি স্থানের অধিবাসী হইয়াও অমৃত পানে সদা অভ্যুদিত হইয়াও এই বাঞ্ছারই কিঙ্কর হইয়া দিবা রাত্রি কর্ম্ম ব্যাপৃত রহিয়াছেন॥ ২২॥

রাজকুমার! বাঞ্ছার ফলস্বরূপ যে সুখ জগতে বিদ্যমান, তাহা দুঃখ বলিয়াই মনে করিবে কারণ ইহা কৃমি যোনিতেও অনুভূত হইয়া থাকে॥ ২৩

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষ্মণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই রামভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধুপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি সম্পাদিত

দেহতত্ত্ব

দেহী সকলেই অথচ দেহের আভ্যন্তরিক খবর কয় জনে রাখেন? আশ্চর্য্য যে, আমরা জগতের কত তত্ত্ব নিত আহরণ করিতেছি, অথচ যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল করিয়া থাকি, সেই দশেন্দ্রিয়ময় শরীর সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। দেহের অধীশ্বর হইয়াও আমরা দেহ সম্বন্ধে এত অজ্ঞান যে, সামান্য সর্দ্দি কাসি বা আভ্যন্তরিক কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলেই, ভয়ে অস্থির হইয়া দুই বেলা ডাক্তারের নিকট ছুটাছুটি করি।

শরীর সম্বন্ধে সকল রহস্য যদি অল্প কথায় সরল ভাষায় জানিতে চান, যদি দেহ যন্ত্রের অত্যদ্ভুত গঠন ও পরিচালন-কৌশল সম্বন্ধে একটি নিখুঁৎ উজ্জ্বল ধারণা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি সম্পাদিত "দেহ তত্ত্ব" ক্রয় করিয়া পড়ুন এবং বাড়ীর সকলকে পড়িতে দেন।

ইহার মধ্যে—কঙ্কাল কথা, পেশী-প্রসঙ্গ, হৃদ্-যন্ত্র ও রক্তাধার সমূহ, মস্তিষ্ক ও গ্রীবা, নাড়ী-তন্ত্র মস্তিষ্ক, সহস্রার পদ্ম, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির সংস্থান এবং উহাদের বিশিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি—শত শত চিত্র দ্বারা গল্পচ্ছলে ঠাকুরমার কথন নিপুণতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা মহাভারতের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ, উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ইহা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের এবং গ্রাম্য চিকিৎসকবৃন্দ-বান্ধবের, নিত্য সহচর হউক।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে—(৪১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা মুল্য মাত্র ২॥৵০ আনা, ডাঃ মাঃ পৃথক।

শিশু-পালন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত, ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আকারে, বহু চিত্র সম্বলিত হইয়া সুন্দর কার্ডবোর্ডে বাঁধাই, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা; মুল্য নাম মাত্র এক টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 58[illegible]

[illegible]৪শ বর্ষ।] চৈত্র, ১৩৩৬ সাল। [১২শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৩৭ সালের বিজ্ঞাপন।

শ্রীভগবানের কৃপায় "উৎসব" আগামী বৈশাখ মাসে পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। "উৎসবে" যে ভাবে "ত্রিপুরা রহস্য," "যোগবাশিষ্ঠ," "অধ্যাত্মরামায়ণ" এবং অন্যান্য প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতেছিল, সেই ভাবেই প্রকাশিত হইবে। অনেকেই পরম পূজ্যপাদ ভার্গব শ্রীশ্রীশিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের যে সমস্ত সুন্দর প্রবন্ধ লেখা আছে তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। আমরা তাঁহার যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিব উহার তালিকা বৈশাখ সংখ্যায় দিব।

"উৎসব" পত্র আমরা নানা চেষ্টা করিয়াও মনের মত চালাইতে পারিতেছি না। এখন দেখিতেছি শুধু আমাদের নিজের চেষ্টায় হইবে না। এই জন্যই আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহোদয়দিগের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য এই পত্রের বহুল প্রচারের চেষ্টা করেন।

"উৎসব" পরিচালনায় নানা কারণে আমাদের ভ্রম ও ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতে পারে। আমাদের প্রার্থনা, গ্রাহক মহোদয়গণ যেন আমাদিগকে এই কার্য্যের সেবক বোধে ক্ষমা করেন।

নববর্ষের অগ্রিম চাঁদার জন্য ১ম সংখ্যা "উৎসব" **১৫ই বৈশাখ হইতে ভি, পি, ডাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিব।** যাঁহারা বুক পোষ্টে কাগজ লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা যেন চৈত্র সংখ্যা পাইয়াই দয়া করিয়া মনিঅর্ডারে চাঁদা ৩৲ পাঠাইয়া দেন। ভি, পি, ডাকে কাগজ লইলে ৵০ অধিক লাগিবে এবং ২য় সংখ্যা পাইতে বিলম্ব হইবে। কারণ ভি, পি, পির সমস্ত টাকা আদায় না হইলে ২য় সংখ্যা পাঠান হয় না।

এই বৎসরের টাকা যাঁহারা এখনও পাঠান নাই, আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই সংখ্যা পাইয়াই টাকা পাঠাইয়া দেন, **নচেৎ আমরা আগামী বর্ষের কাগজ পাঠাইতে পারিব না।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী বর্ষে যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া এই সংখ্যা পাইয়াই আমাদিগকে সংবাদ দিয়া বাধিত করেন। কারণ ভি, পি, পি ফেরৎ দিলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়। ইতি—

বিনয়াবনত—**ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়**

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৪শ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩৩৬ সাল। { ১২শ সংখ্যা

১৩৩৬ বর্ষ-শেষে।

সবইত যাইবে, কিছুইত থাকিবেনা—থাকিবে তুমি, ছিলে তুমি এবং আছ ও তুমি।

জগতের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে এক যায় আর আসে তথাপি প্রবাহ একই আছে। গঙ্গার জল নিরন্তর সরিয়া যাইতেছে, তথাপি গঙ্গা একই আছেন। এক বৎসরে জগতের কত প্রাণি চলিয়া গেল কিন্তু প্রাণি প্রবাহ একই রহিল। যাহারা গেল, যাহারা যাইতেছে তাহাদের সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত তাহারা কতই হাহাকার করিল কিন্তু জগৎ প্রবাহ তাহাদেরদিকে চাহিয়াও দেখিল না, জগতের কোন কার্য্যই বন্ধ হইল না। বলিতে কি বিচিত্র এই জগতে সমকালে সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ চলিতেছে। সমষ্টিভাবেও চলিতেছে আর ব্যষ্টি ভাবে প্রতি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে, প্রতি প্রাণির মধ্যে, প্রতি নর নারীর মধ্যে সমকালে সৃষ্টি স্থিতি সংহার চলিতেছে। সৃষ্টি শক্তি, স্থিতি শক্তি ও সংহার শক্তি লইয়া খেলা করিতেছেন কে? একমাত্র চৈতন্যই আপন শক্তিকে আপনার বক্ষে লইয়া জগৎ খেলা খেলিতেছেন। কালচক্র ঘুরাইতেছেন মায়িক পরমেশ্বর। ইচ্ছা করিলেই জগৎ খেলা আবার ইচ্ছা করিলেই খেলা সাঙ্গ—তথাপি সর্ব্বকালে যেমন স্থির, শান্ত, অবিচল তেমনিই। মায়ার খেলা মিথ্যা—যিনি আছেন তিনিই একভাবে

বিরাজ করিতেছেন। সূর্য্য কিরণ মরুপ্রদেশে পড়িয়া যেমন কত কি দেখায় সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রভা মহাশূন্যে প্রসারিত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ দেখাইতেছেন।

তুমি শোক মোহে কতই না কাতর হও কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কার্য্য কি বন্দ থাকে? তাঁহার ইচ্ছায় যাহা চলে তাহাতে তোমার ইচ্ছা শোক মোহের হাহাকার তুলে কেন?

খাণ্ডববনে কত জীব জন্তু বসতি করিত—সকলকে সংহার করিয়া অগ্নিমধ্যে আহুতি দিবার জন্য একদিকে সুদর্শন চক্র লইয়া দাঁড়াইয়াছেন শ্রীভগবান্ আপনি, আর অন্যদিকে গাণ্ডীব লইয়া দণ্ডায়মান করাইয়াছেন তাঁহার প্রাণ প্রিয় সখাকে। কোন প্রাণির নিস্তার নাই—সকলকে অগ্নি মুখে পড়িতে হইবে। আহা—জীব সকল কত যাতনা পাইতেছে কাহার ও চক্ষু স্ফুটিত হইয়া ছুটিয়া পড়িতেছে, কাহারও মুখ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কাহারও উদর ভগ্ন হইতেছে, কাহারও মস্তক হস্তপদ অগ্নিতে জ্বলিতেছে—আর জীব কতই চীৎকার করিতেছে—তথাপি পরমকারুণিক পরমেশ্বর কাহারও আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া আপন কর্ম্ম শান্ত করিতেছেন না, তাঁহার ভক্তও করিতেছেন না। এ কি বিচিত্র রঙ্গ শ্রীভগবানের? খাণ্ডবন দহন লীলা—এত সামান্য—ইহার উপরেও মহাপ্রলয়ের সংহার লীলা। হরি হরি এই সংহার লীলা ও চলিবে আর জীবকে—মানুষকে—তাঁর ভক্ত নর নারীকে স্থির থাকিতেও হইবে। যিনি জীবকে অসহ্য যাতনায় নিঃক্ষেপ করিতেছেন তিনিই আবার স্থির হইবার জন্য শান্ত হইবার জন্য উপায়ও বলিয়া দিতেছেন। শান্ত হইবার উপায় লইয়া উঠিয়াছেন শাস্ত্র। বেদ বল, তন্ত্র বল, রামায়ণ বল, মহাভারত বল, গীতা বল, ভাগবত বল, চণ্ডী বল—সমস্ত শাস্ত্রই জীবের হাহাকারের প্রতিকার জন্য। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগত স্পৃহঃ। বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ—ইহা হইবার জন্যই শাস্ত্র। যে যেমন অধিকারী তাহাকে ক্রমঅনুসারে শান্ত হইবার পরামর্শ দিতে শাস্ত্র। রামায়ণে কি দেখান হইয়াছে? মহাভারতে কিসের চিত্র আঁকা আছে? শ্রীচণ্ডীতে কি দেখান হইয়াছে? ভাগবতে কিসের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে? যে সংসারকে পরম রমণীয় বলিয়া তুমি চিরদিন ধরিয়া থাকিতে চাও সেই সংসার হাহাকারেই পূর্ণ—সংসার সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে। আর শাস্ত্র—এই হাহাকার নিবৃত্তি জন্য। ভগবানের বাক্যই শাস্ত্র। তোমার মনে যাহা ভগবৎ বাণী বলিয়া তুমি মানিয়া লও তাহা যদি

শাস্ত্রবাক্যের বিপরীত হয় তবে, তোমার মতে শাস্ত্র ভুল আর তোমার মনে শ্রুত বাণীই সত্য, কিন্তু যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বর বিশ্বাসী তাঁহাদের মতে তোমার বিবেক বাণীটা যদি শাস্ত্রবাক্যের বিপরীত হয় তবে উহা যথার্থ বিবেক বাণী নহে তোমার অসংযত মনের কল্পনা মাত্র ইহা—শাস্ত্র বাক্যই সত্য। তুমি যদি শাস্ত্রমত অনুষ্ঠান পরায়ণ হও তবে তোমার মনে যে বিবেকবাণী ভাসিবে তাহা শাস্ত্র বাক্য হইতে ভিন্ন হইতেই পারে না।

জ্বালামালাময় সংসার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শাস্ত্র, সকল প্রকার মানুষকে কি করিতে বলিতেছেন? বলনা এই দুঃখপূর্ণ সংসারের দাবদাহে জ্বলিতেছে না এমন কি কেহ আছে? কেহ নাই, কেহ নাই। মানুষ এই দুর্ব্বিষহ সংসার দুঃখকে কিছুতেই সরাইতে পারে না—সহিবার শক্তিও বুঝি মানুষের নাই। এই জন্য মানুষ কাহারও আশ্রয় চায়। এখানে একমাত্র আশ্রয়ই ভগবান্। শাস্ত্র, উচ্চতর, উচ্চতম সকল অধিকারীকে শত উপদেশ দিতেছেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য বলিতেছেন—"মামেকং শরণং ব্রজ" আমার শরণে আইস—আমি তোমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিব—আমি তোমাকে সংসার দাবদাহ হইতে রক্ষা করিব—শাস্ত্র বলিতেছেন সংসারের মায়া হইতে কেহই আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিবে না কিন্তু মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে। যে আমার শরণাপন্ন হয় সেই এই সংসার মায়া-নদীর পরপারে যাইতে পারে। আমি তাহাকে সংসার সাগর পার করিয়া দিয়া থাকি।

বলনা আর কে এখানে আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ? কে এই জ্বলন্ত সংসার হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারে? কে তোমার প্রাণের হাহাকার শান্ত করিতে পারে? আর কেহ নাই—আর কেহই নাই—একমাত্র ঈশ্বরই পারেন। তাই শাস্ত্র সর্ব্বত্রই বলিতেছেন—যা করিতে হয় কর, কিন্তু ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণে চলা ফেরা কর; নতুবা কখন্ কোন্ ভয়ানক হিংস্র জন্তুর কবলে পড়িবে কে বলিতে পারে? আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে—এইক্ষণেই---এই মুহূর্ত্তেই শরণ লওয়া উচিত।

হায় ভগবন্!----তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে চলিয়াই আজ আমরা তোমার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া এই বিপত্তিতে পড়িয়াছি। তথাপি তুমি আমাদিগকে ত্যাগ কর নাই। শত দোষ লইয়া—শত পাপ করিয়াও যদি কাতর না হই তবে আর উপায় নাই। কিন্তু যতদূরে আসিয়াই পড়ি না কেন, অসহায়

অবস্থা বুঝিয়া—জীবনে যাহা যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তাহার জন্য যদি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি—রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া যদি তোমার নাম লইয়া থাকি, সর্ব্বদা নাম করিতে বদ্ধ পরিকর হই তবে আবার তোমার কাছে যাইতে পারি—তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি। এই আশাত সবাই করিতে পারে। বড় বড় সাধনা—না হয় না করিলে—কিন্তু স্বধর্ম্মের আজ্ঞা যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করিয়া---যদি সর্ব্বদাই তোমার নামে বিশ্রাম করিতে পারি---তবে আবার সবই ফিরিয়া পাই। আমরা উৎসবে ২৪ বৎসর ধরিয়া এই কথাই বলিতেছি আরও বলিব। যদি একজনও ইহা ধরিবার মতন করিয়া আচরণ করেন, আর অন্ততঃ আমিও করি তবে বুঝি তোমার প্রিয়কার্য্য করা হয় আর ইহার প্রচার জন্য যদি আমরা সকলে চেষ্টা করি তবে সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কর্ম্ম করিয়া আমরা ধন্য হইয়া যাইতে পারি।

বিশুদ্ধ ব্রজবুলী—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

আজু জো হরিহি ন শস্ত্র গহাঁউ
তো লাজো গঙ্গা জননীকো সন্তনুসুত ন কহাঁউ ॥
সর ধনু তোড়ী মহারথ খণ্ডোঁ
কপিধ্বজ সহিত গিরাউঁ
পাণ্ডবসৈন সমেত সারথি
শোনিত সরিত বহাউঁ ॥
জীবোতো যশলেহুঁ জগত মে জীত নিশান ফিরাউঁ
মরো সো মণ্ডল ভেদি ভানুকো সুরপুর যায় বসাউঁ ॥
ইতী ন করোঁতো,শপথ মোহিঁ হরিকি
ছত্রিয় গতিঁহি ন পাউঁ
সুরদাস রণবিজয় সথাকো জীয়ত ন পীঠ দিখাউঁ ॥

আজ যদি হরিকে শস্ত্র গ্রহণ করাইতে না পারি তবে গঙ্গাজননীর নিকট লজ্জিত হ'ব শান্তনুর পুত্র বলিয়া আর পরিচয় দিব না। শরধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিব, মহারথ চূর্ণ করিব কপিধ্বজ সহিত ভূমিতে নিপাতিত করিব, সারথির

সহিত পাণ্ডব সেনাগণকে নিপাতিত করিব এবং তাঁহাদের রক্তে নদী প্রবাহিত করিব। এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া যদি জীবিত থাকি তবে যশস্বী হইব এবং জগতে জয়পতাকা উড্ডীন করিব আর যদি মরি তবে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া সুরলোকে যাইয়া বাস করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে না পারি তবে আমি হরির নামে শপথ করিতেছি যেন আমার ক্ষত্রির গতি লাভ না হয় আর জীবিত থাকিতে শ্রীকৃষ্ণকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব না—ইহা সুরদাস বলিতেছেন।

ভজন-রহস্য।

আর কিছুই নাই। তুমিই আছ। আবার সব হইল। সব হইল তোমাকে লইয়া। ভিতরে রহিলে তুমি, বাহিরে, তোমার অঙ্গে ভাসিল সব। মহাপ্রলয়ে কিছুই থাকে না—সৃষ্টির আরম্ভে সূচীর শত পত্র ভেদের ন্যায় তোমাকে অবলম্বন করিয়া সব ভাসে। ছিলে "মহতো মহীয়ান্"—সব ভাসিলে "মহতো মহীয়ান্" থাকিয়াও "অণোরনীয়ান্" হইয়া সকলের আত্মা হইয়া রহিলে। সব সাজিলে যখন, তখন বাহিরে ভিতরে রহিলে তুমি—তোমার অভাব কোথাও নাই, তথাপি বাহিরে ধরা গেল না তোমাকে। যিনি তোমাকে আবরণ করিয়া ভাসিলেন তিনিই ধরিতে দিলেন না। তথাপি অন্তরে এমন রহিলেন যে তোমার অবস্থান প্রতিক্ষণে বুঝাইলেন, অথচ তেমন করিয়া পাওয়া হইল না। পাওয়া হইল না বলিয়া যাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল, সব দেখিয়াও—তুমিই সব সাজিয়াছ জানিয়াও তেমন করিয়া যখন দেখা হইল না, পাওয়া হইল না তখন একটা জ্বালা আসিল। চক্ষু বাহিরে কতরূপ দেখিল কিন্তু তোমার রূপ না দেখিয়া চক্ষু আপ্যায়িত হইল না;—কর্ণ কত কথা শুনিল কিন্তু তোমার শ্রীমুখের কথা না শুনিয়া কর্ণ আপ্যায়িত হইল না; নাসিকা কত সুগন্ধ আঘ্রাণ করিল, কিন্তু তোমার অঙ্গগন্ধ না পাইয়া আপ্যায়িত হইল না; জিহ্বা কত রস আস্বাদন করিল, কিন্তু তোমার প্রসাদের রস আস্বাদন না করিয়া আপ্যায়িত হইল না; ত্বক কত স্পর্শ অনুভব করিল কিন্তু তোমার স্পর্শ

না পাইয়া আপ্যায়িত হইল না; মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার কত কি ভাবিল, কত কি নিশ্চয় করিল, কত কি অনুসন্ধান করিল, কত কি তে কত অভিমান করিল কিন্তু তোমাকে না ভাবিয়া, তোমাকে নিশ্চয় না করিয়া, তোমাকে অনুসন্ধান না করিয়া, তোমাকে অহং জ্ঞান না করিয়া ইহারা কেহই তৃপ্ত হইল না। হস্ত পদাদি তোমার জন্য কর্ম্ম না করিয়া, তোমার জন্য না ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহারাও আপ্যায়িত হইল না। বড় জ্বালা—সবেতেই তুমি, সকল দেখায় তুমি—তথাপি দেখা গেল না, সকল কথায় তোমার কথা তথাপি তোমার কথা তেমন করিয়া শুনা গেল না—আহা একি হইল? নদী সমুদ্রের নিকটে আসিয়া সমুদ্রের মুখে বালুকাস্তূপে আটকাইয়া গেল—সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গের শব্দ শুনিতেছে, ঊর্দ্ধ উৎক্ষিপ্ত জলরাশি দেখিতেছে—আরও জ্বলিতেছে মিশিতে পারিতেছে না বলিয়া। আহা—জ্বালা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল—আর বাহিরের কিছু দেখিতে চায় না, বাহিরের কিছু শুনিতে চায় না, বাহিরের কিছু আঘ্রাণে রুচি হয় না, বাহিরের কোন রস আস্বাদনে প্রাণ চায় না, বাহিরের কোন কিছু স্পর্শে ইচ্ছা নাই; হায়! কোথায় তুমি—হা গোবিন্দ আমায় কৃপা কর, হা রঘুনাথ আমায় কৃপা কর, হা জগদম্ব আমায় কৃপা কর—এই হাহাকার করিতে করিতে "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে" যখন হইয়া গেল; পৃথিবীর কোন ভোগের অনুসন্ধান ত রহিলই না—কোন ভোগ আপনা হইতে আসিলেও সে ভোগেও রুচি রহিল না; চিত্ত সব ছাড়িয়া দিয়া কেবল তোমার জন্যই হায় হায় করিতে লাগিল এই সর্ব্বাভিলাষ ত্যাগের অবস্থায়, এই তোমার চরণ প্রাপ্তির প্রবল আশা মাত্র অবলম্বনের অবস্থায়—অহো! যখন চক্ষু, জলে ভাসিয়া যায় তখন—একি হইল? আহা! সর্ব্বদা হা দেবতা আমায় কৃপা কর বলিয়া বলিয়া তোমার নাম লইতে লইতে, তোমার আজ্ঞা পালন করিতে করিতে—একি হইল—একি রূপ, চক্ষু দেখিল, একি আদর ভরা ডাক কর্ণ শুনিল, একি অঙ্গগন্ধ নাসিকা আঘ্রাণ করিল, একি কোমল স্পর্শ ত্বক অনুভব করিল? আহা! ও কে? তুমি হৃদয়ে আসিলে—আহা—ভিতরে দেখিয়াও হইল না! বাহিরে—চক্ষু চাহিল আর দেখিল ও কে? আহা! এই মুখারবিন্দ। কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য, কোটি মদন কোথায় লাগে? আহা! এই—

জটা ভুজঙ্গ পিঙ্গল, স্ফুরৎফণা মণিপ্রভা
কদম্ব কুঙ্কুমদ্রব, প্রলিপ্ত দিগ্ বধূ মুখে।

মদান্ধ সিন্দুর স্ফুরৎ, ত্বগুত্তরীয় মেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূত ভর্ত্তরি॥

আহা! এই ভূতভর্ত্তার অপরূপরূপে মন ডুবিয়া গেল—প্রলয়তাণ্ডব সময়ে এই জটা মধ্যবর্ত্তি ভুজঙ্গসমূহের ফণাস্থিত মণিগণের ইতস্ততঃ বিকীর্ণ পিঙ্গলবর্ণ কিরণ রূপ কুঙ্কুম জল দ্বারা দিক্ বধূর মুখমণ্ডল কেমন বিচ্ছুরিত হইল—মদমত্ত হস্তীর চর্ম্মরূপ উত্তরীয় দ্বারা স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ মন আমার কি অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিল—

নবীন মেঘমণ্ডলী নিরুদ্ধ দুর্দ্ধর স্ফুরৎ
কুহু-নিশীথিনী তমঃ প্রবন্ধ বদ্ধ কন্ধরঃ।
নিলিম্প নিঝর্রীধর স্তনোতি কীর্ত্তি সিন্ধুরঃ
কলা নিধান বন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ॥

নবীন মেঘমণ্ডলীর নিবিড় শ্যামবর্ণে আচ্ছাদিত, অমাবস্যার মধ্য রজনীর অন্ধকারের ন্যায় কালকূটের শ্যামলবর্ণে যাঁহার গলদেশ রঞ্জিত, যিনি দেব নির্ঝরিণী গঙ্গাকে মস্তকে বহন করেন, যিনি করি চর্ম্ম ধারণ করেন, চন্দ্রকলা দ্বারা যাঁহার দেহ বিভূষিত, সেই ত্রৈলোক্যভারধারী মহাদেব আমাদের কল্যাণ বর্দ্ধন করুন।

তাই বলি প্রাণের কাতরতাই তোমার দ্বারে লইয়া যায়। আর সুকৃতিই তোমার অপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রাখে। দ্বারে দাঁড়াইয়া দ্বার উন্মোচনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নাম করিতে করিতে তোমার কৃপা অনুভব হয়। প্রাণকে তোমার জন্য কাতর করাই ভজন রহস্যের ভিত্তি। ইহাতেই সৎসঙ্গ হয়, ইহাতেই সৎশাস্ত্রের কৃপা লাভ করা যায়। ইহাই জীবন সার্থক করিবার একমাত্র উপায়। অন্য কার্য্য যদি করিতে হয় তাহাও তোমার নাম করিতে করিতে হউক, সব করিয়াও তোমাকে ছাড়া হইল না। কলিযুগে নাম করিতে করিতে দেখা যায় নামের ভিতরেই সকল সাধনা রহিয়াছে। তাই বলি এস এস নাম অবলম্বন করি আর সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখি নাম করিতে করিতে মনের অপর চিন্তা মন হইতে বাহির করিতে হইবে। প্রভো! কৃপা কর—আমাদিগকে তোমার করিয়া লও। ইতি

হৃদয়-মন্দিরে।

(১)

কপটী পাতকী কামী, জেনেও জানিনা, কত অপরাধ।
কি জানি কেনবা, জেগে উঠে দেখাদেখি, সাধুর এ সাধ॥
পত্র পুষ্প ফল জল, লুকাইয়া আনি, তোমায় পুজিতে।
মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ, দাঁড়াইয়া থাকি, নারি প্রবেশিতে॥
সাধন ভজন নাই, দুরাচারে রত, কাঁদিতেও না পারে যেজন।
কে আসিবে তার তরে, খুলিবারে দ্বার, কে আছে আপন?
রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া, নাম জপি, কি করিব আর।
কৃপা কি করিয়া কেহ, খুলে দিবে মোর তরে, মন্দিরের দ্বার?
স্বভাব তোমার শুনি, করুণায় ভরা, দ্বেষা প্রিয় নাই।
হা গোবিন্দ! দাস বলে, চরণে কি, না মিলিবে ঠাঁই?
কত লোক যায় আসে, খুলে যায়, হৃদয়ের দ্বার।
চাতকে কবেগো, নব জলধর, কৃপাকরি করিবে উদ্ধার॥
না-না মিছা কথা, চাতকের মত, শুষ্ককণ্ঠ নই আমি।
স্বভাব তোমার, দয়া বরিষণ, কঠিন নহত তুমি॥
জানি আমি কর্ম্মদোষে, ঢেকে যায়, হৃদয় মন্দির।
হা দেবতা ধরি, শ্রীচরণে তব, করে দাও মন স্থির॥

শ্রীআমি।

কিছু নাই এর দেশ।

যে দেশে শোক নাই, মোহ নাই, তাপ নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, মন কেমন করা নাই, আলস্য নাই, অনিচ্ছা নাই, কোন কিছুর অভাব নাই; যে দেশে সব পূর্ণ, সব আনন্দ এমন দেশ কি কোথাও আছে? এদেশের সম্বাদ কেহ কি দিতে পারেন?

পারেন বৈ কি। সব মানুষই প্রতিদিন এই দেশে গিয়া থাকে।

কিরূপে?

মানুষ প্রতিদিনই একবার করিয়া সমস্ত অঙ্গ স্থির করিয়া পড়িয়া থাকে, তারপরেই কোথায় চলিয়া যায়? সেখানে কি কিছু থাকে; সেই ত কিছু নাই এর দেশ।

তুমি ত সুষুপ্তির কথা বলিতেছ। সেখানে ত সব অজ্ঞান। জানিয়া শুনিয়া ত মানুষ সেখানে থাকিতে পারে না।

না—তা পারে না বটে। যখন কিন্তু জানিয়া শুনিয়া সে দেশে মানুষ যায় তখন তার আর কোন অভাব থাকে না। জানিয়া শুনিয়া মানুষ আনন্দের ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়ে। অর্থাৎ পৃথিবীর কোলাহল আর তার কর্ণে পৌঁছায় না—কোন দুঃখ জ্বালাও থাকে না—থাকে নিরতিশয় আনন্দ। যাবে সেই দেশে? সেখানে আর কিছুই নাই—শুধু মা আছেন—শুধু আনন্দময়ী আছেন—সে জ্যোতির দেশ—সেখানে সব প্রকাশ—কোথাও অন্ধকার নাই।

সে দেশে কি জ্ঞাত সারে যাওয়া যায়?

যায়বৈকি। সুষুপ্তিতে যেমন মানুষ অজ্ঞানে সে রাজ্যে যায় সাধনা দ্বারা জ্ঞানে সেই রাজ্যে যাওয়া যায়।

আর কিছু নাই দেশের সম্বাদ দেয় কে?

অজ্ঞানে মানুষ সেদেশে যায়। যিনি সেই দেশে লইয়া যান তিনিই সম্বাদ দিতেছেন জ্ঞান পূর্ব্বক সেই দেশে যাওয়া যায় কিরূপে?

কে ইনি?

সকল সম্বাদ যিনি দিতেছেন তিনিই। শ্রুতিই এই সম্বাদ দিতেছেন। অহরহ জীব একবার করিয়াও মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। সজ্ঞানে তথায় যাওয়ার জন্যই তপস্যা করিতে হয়। যতদিন তাহা না হয় ততদিন এই ব্রহ্মানন্দকে বাসনানন্দে ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ জপতপাদি সাঙ্গ করিয়া সেই আনন্দকে ভাবনা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। মনে করিতে হয় এই ত সেই দেশ—এই দেশে আমি আসিয়াছি। আমার কোন ভাবনা নাই, কোন অভাব নাই—আহা! পূর্ণ বস্তুতে মিশিয়া আমি পূর্ণই হইয়াছি। তথাপি যতদিন এই অবস্থা ঠিক ঠিক অনুভূত না হয় ততদিন দুঃখ আসিলেও উদ্বেগ শূন্য হওয়া, সুখ আসিলেও তাহাতে বিগতস্পৃহ হওয়া, রাগ ভয় ক্রোধ—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া—তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া—হৃদয় হইতে বিগলিত করা —অর্থাৎ ধ্যান অবলম্বনে—গুরু স্মরণে—জাগ্রতের ভয় উদ্বেগ ত্যাগ করা ইহাই ধ্যেয় বাসনা ত্যাগের সাধনা। ইহাতেই স্বরূপ স্থিতি আনিবেই। শুধু পাঠ করিলে ইহা হয় না—পাঠ করিয়া ইহা প্রতিদিনের অভ্যাসের কার্য্য করিতে হয়—তবেই গুরু কৃপায় ইহা লাভ হয়।

কেন হইতেছেনা—কোথায় ভুল রহিল।

[১]

সবত করা হয়, তথাপি ক্ষণে তৃপ্তি ক্ষণে অতৃপ্তি ইহা রহিয়া গেল কেন? এদিকেও ত শেষ হইয়া আসিল। ভুল রহিয়া গেল কোথায়?

আহা! যত্ন করিয়া সুন্দর সুন্দর ফুল তোলা হইল, সুন্দর সূত্র দিয়া মালা গাঁথা হইল—ভুল হইল সূত্রের দুই মুখ একত্র করিয়া গ্রন্থি দিতে। গ্রন্থি নাই বলিয়া মালা তুলিতে গিয়া সব ফুল ঝরিয়া পড়িল; মালা গাঁথা বিফল হইল।

বহু ক্লেশে নানাপ্রকার রন্ধন করা হইল; কিন্তু ব্যঞ্জনে লবন দিতে ভুল হইল—কিছুই মুখে দেওয়া গেলনা।

দেখ দেখি জীবনে ভুল রহিয়া গেল কোথায়? আহা! সব করিলাম কিন্তু গুরু যে বলিয়া দিলেন যাহা করিবে তাহা তোমার দ্বারা ঠিক হইবে না—ঠিক হইতেছে না বলিয়া—রস আসিতেছেনা বলিয়া—রসের আস্বাদন হইতেছে না বলিয়া—প্রাণটা জুড়াইতেছেনা। রস আসিলে চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত, শরীরে পুলক দেখা দিত, প্রাণ তাহার জন্য বড় ব্যাকুল হইত। হরি হরি এই দুঃখইত বড় দুঃখ যতক্ষণ না অনুভব হয় আমার কর্ম্ম তোমাতে পৌঁছিতেছে ততক্ষণত তৃপ্তি নাই। গুরুত প্রতীকার দিয়াছেন। এখনও সময় আছে। মালার গ্রন্থি তাহাই—ব্যঞ্জনের লবন তাহাই। মালার গ্রন্থি বা ব্যঞ্জনের লবণই শ্রীভগবান আত্মা। এখনও যে টুকু সময় আছে সেই কটা দিন ধরিয়া শ্রীগুরুর শেষ উপদেশ ধরিয়া চলি এস। নিশ্চয়ই হইবে—গুরু বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না।

[২]

কি কথা—কোন্ উপদেশ—কোন্ গ্রন্থি—কি সেই লবণ—আবার বলিয়া দিতেছেন—কর আর স্বচ্ছন্দে সংসার সাগর পার হইয়া যাও।

গুরু বলিয়া দিয়াছিলেন যাহা করিতে যাইবে প্রথমেই কাতর প্রাণে বলিবে "হা গোবিন্দ! আমায় কৃপা কর"। বড় হিতকারী মন্ত্র ইহা। ইহাতেই গোবিন্দের কৃপা অনুভবে আসিবে। হা গোবিন্দ! আমায় কৃপা কর বলিয়া বলিয়া সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা করিতেছ তাহাই করিয়া চল। গোবিন্দের কৃপা ভিন্ন জগন্নাথ দর্শনেও দর্শন হয় না, সন্ধ্যা পূজা জপ ধ্যান আত্ম বিচার, স্বাধ্যায় কোন কিছুই সফল হয় না। তাঁর কৃপা ভিন্ন তোমার যে কোন কিছুই হইবে না ইহা দৃঢ় ধারণা করিয়া—কাতর প্রাণে হা গোবিন্দ আমায় কৃপা কর। ইহা সর্ব্বদার স্মরণের মন্ত্র করিয়া ফেল—নিশ্চয়ই যাহা চাও তাই পাইবেই।

শ্রীগুরু।

ওহে দয়াল গুরু কল্পতরু রঘুকুল রাজা।
শুনে থাকি তোমার নাকি, স্বভাব কাঙ্গাল খোঁজা॥
ও নাম শুনে ভগ্ন বীণে আপ্‌নি বেজে উঠে
পায়নি কভু, কারো সাড়া, সারা জীবন ছুটে॥
ডাকে না কেউ, আয় বোলে হায়, আমায় অমন কোরে
ভয় কিরে তোর আমি আছি, আয় ছুটে আয় ঘরে॥
গুরুবিনে এ অদিনে, কেহ কারো নয়,
যা করি সব, গুরু বোলে, দিয়ে নামের জয়।
কে লবে ভার, গুরু বিনে, কে লবে এ বোঝা
প্রার্থনা এই চরণ ছায়ে, হয়ে রব প্রজা
প্রার্থনা এই ঐ চরণের হয়ে রব প্রজা॥

৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর জীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"আমি (পূর্ব্বেই জানাইয়াছি) বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসপ্রার্থী। শাস্ত্র-পাঠপূর্ব্বক, প্রকৃত সাধুসঙ্গ করিয়া 'সন্ন্যাস' শব্দের যে অর্থ বুঝিয়াছি, তদর্থের প্রয়োগভূমি হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, আমি লৌকিক সন্ন্যাসী হইবার প্রার্থী নহি, গৈরিক বসন পরিধান, শিখা সূত্রবর্জ্জন, দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ সন্ন্যাসীর বাহ্য লিঙ্গ মাত্র, ইহারা মুক্তি বা অভ্যুদয়ের কারণ

নহে। তথাপি (বাহ্যলিঙ্গ হইলেও) এতদ্দ্বারা অনেকস্থলে বহু লাভ হইয়া থাকে, ইহাদের উপযোগিতা আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বড় দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, এখন লক্ষের মধ্যে একজন প্রকৃত জ্ঞানী, বৈরাগ্যবান্ পরিব্রাজক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সন্ন্যাসাশ্রমে বাসপূর্ব্বক যাঁহারা আশ্রমোচিত ধর্ম্ম রক্ষা করেন না, শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করেন, তাঁহাদের (শ্রুতি ও স্মৃতির শাসনানুসারে বলিতেছি) অনন্ত নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাঁহাদের (সন্ন্যাসাশ্রম পরিভ্রষ্ট পুরুষবৃন্দের) গতি নাই ("পারিব্রাজ্যং গৃহীত্বা তু যস্ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি। তমারূঢ়চ্যুতং বিদ্যাদিতি বেদানুশাসনম্॥ মোক্ষাশ্রমাৎ পরিভ্রষ্টো ন গতিস্তস্য বিদ্যতে।" শাট্যায়নোপনিষৎ)। আমি অনেক দিন হইতেই প্রকৃত গুরুর অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মনোমত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বিশিষ্ট গুরুর (যাঁহার নিকট হইতে দণ্ড গ্রহণ করিতে পারি) সন্ধান পাইতেছিনা। ভয় হয়, পাছে, গুরুভক্তি বিহীন হইয়া, আশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালনে অসমর্থ হইয়া, অনন্ত নরকে পতিত হইবার পথ পরিষ্কার করি। আজকাল গৃহীরাও সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা বুঝেন না, সুতরাং তাহাতেও পতনের আশঙ্কা আছে, ভিক্ষা করিতে যাইলে বিপদের ভয় আছে। এক সংসার ছাড়িয়া আর এক সংসার (অশাস্ত্রিত, নরকপতনহেতু) গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত নহে। এই সকল কারণ বশতঃ বহুদিন হইতে ইচ্ছাসত্বেও পারিব্রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। মধ্যে মধ্যে (বিশেষতঃ যখন বাধা পাই) সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবৃত্তি বলবতী হয় কিন্তু পতনের ভয় তদ্‌গ্রহণপথে অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। আমি তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে দণ্ডগ্রহণাদি বাহ্য সন্ন্যাসলিঙ্গ ধারণের সংকল্প করিয়াছিলাম। ভিতরে সন্ন্যাসই মুখ্য সন্ন্যাস। কিন্তু অনভিমত সাংসারিক অবস্থাতে নিপতিত হইয়া, বিবিধ দুঃখের তাড়না সহ্য করিয়া শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাই মনে করিতেছি, বাহ্য সন্ন্যাসলিঙ্গ ধারণ করিব। কিন্তু তাহা করিলেও যে, (যাদৃশ কাল পড়িয়াছে) বিনা বাধায় স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিব, তাহা বিশ্বাস হইতেছে না। আমি দণ্ডগ্রহণ করিব এইরূপ ইচ্ছা একজন দণ্ডীর কাছে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তিনি আমার কাছে (প্রায় ১৯ বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার দণ্ডগ্রহণের অগ্রে) গায়ত্রীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইনি ভারতবর্ষের বহু স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, বিদ্বান্ না হইলেও, অনেকতঃ বৈরাগ্যবান্। কিন্তু ইহার সহিত আলাপ করিয়া মন শঙ্কাপূর্ণ ও হতাশ হইয়াছে। ইনি বলেন, আপনি যে ভাবে জীবন অতিবাহিত

করিতেছেন, তাহাতে আমি বলিতে পারি আপনার মত সন্ন্যাসী আমি বেশী দেখি নাই। আমি আপনাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলি। তিনি তথাপি আমার ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আমি এই নিমিত্ত কি করিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। বৃদ্ধ পিতা ও অসহায় পুত্রাদিকে ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিব, কিন্তু সেই মোক্ষাশ্রমেও যদি উদরের জন্য চিকিৎসা করিতে হয়, লৌকিক সমস্ত ব্যাপারই করিতে হয়, মারামারী, দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্য্যন্ত করিতে হয় (আজকাল শতকরা ৯৯ জন সন্ন্যাসী এইরূপ করিয়া থাকেন, আরও যাহা করেন, তাহা বলিলেও পাপ হয়) তবে আর হইল কি? অতএব আপাততঃ, যতদূর সম্ভব, একান্তে বাসপূর্ব্বক সাধনা, অধ্যয়ন ও গ্রন্থপ্রণয়নাদি কার্য্য করিব, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দণ্ড গ্রহণ করিব, ইহাই স্থির করিলাম।"

স্বামীজী জীবনে প্রাগুল্লিখিত পত্রের মর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন, আরও একুশ বৎসর সংসারের তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, যথাশক্তি লোকোপকারক পরমতত্ত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থ প্রণয়নাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এই কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তদন্তে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইতঃপর প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

ইহধাম ত্যাগ করিবার কাল সমুপস্থিত হইল, কিন্তু যোগ্য গুরুর অভাব এখনও বর্ত্তমান থাকাতে পরমাত্মা স্বয়ংই স্বামীজীর গুরুদেবের (ব্রহ্মীভূত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী১০৮ শিবরামানন্দ সরস্বতী স্বামীর) রূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নযোগে আসিয়া এই জাতসন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়া গেলেন।

দেহত্যাগের প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে এক দিবস প্রাতঃকালে স্বামীজী আমাদিগকে বলিলেন—আমি গতকল্য স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার গুরুদেব আসিয়া আমাকে সন্ন্যাস প্রদান করিতেছেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি এক দিবস প্রাতঃকালে বলিলেন—দেখ, আমি গতকল্য স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি দেহত্যাগ করিতেছি। ইহার কয়েক দিবস পরেই তিনি উপস্থিত শিষ্য

---

*'তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত' এই কথার 'তোমাদের পাপাদির নাশ পূর্ব্বক তোমাদের মুক্তির পথ নিরর্গল করিবার নিমিত্ত'।

ও ভক্তবর্গকে উদ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে বলিলেন—দেখ, আমি, ইতঃপর ইহধাম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, তোমরা ইহাতে বাধা দিওনা, আমি যদি তোমাদের কল্যাণের নিমিত্তই দেহত্যাগ করি, তাহাতে তোমাদের আপত্তি কি থাকিতে পারে? কেহ সম্মতিসূচক কোন কথা না বলিলেও স্বামীজী আন্তর ভগবৎ প্রেরণানুসারেই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন, একমাসকালব্যাপী উপবাস দ্বারা সকলের পাপের ক্ষালন করিবার ইচ্ছা করিলেন।

কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করা বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করার অর্থ, তাহার মুক্তির ভার গ্রহণ করা। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আমুক্তি সম্বন্ধ। যতক্ষণ শিষ্যের মুক্তি না হয় ততক্ষণ গুরুর নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। স্বামীজীর শিষ্যসংখ্যা এক দৃষ্টিতে বহু হইলেও অন্য দৃষ্টিতে অল্পই কিন্তু যাহাদিগকে তিনি অভয় দিয়াছিলেন, তাহাদিগের বস্তুতই সংসার সাগর হইতে ত্রাণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রকৃত মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই তিনি এইরূপে অভয় দিয়াছিলেন—'তোমার আর কোন ভয় নাই, তুমি ইতঃপর নির্ভয় হইলে, জানিও, তুমি মুক্ত হইলে; তোমার যতদিন মুক্তি না হয়, ততদিন আমি মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিব না। যদি ভগবান্ আমাকে মুক্তি দান করিতে আসেন, আমি বলিব, আগে ইহাকে মুক্তি দাও, পরে আমাকে মুক্তি দিও।' ঈদৃশ প্রেমবিশিষ্ট পুরুষ যে শিষ্যগণের নিমিত্ত শরীরে যত কষ্ট হইতে পারে সকলই সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবেন, তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিবার নিমিত্ত যত কঠোর তপস্যার আবশ্যক হয়, তাহারই আচরণ করিতে উদ্যুক্ত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

স্বামীজীর জীবনবেদের ব্যক্তরূপে, তাঁহার ছন্দোময় জীবনের প্রায় প্রত্যেক কল্যাণময় ব্যবহারেই আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ ভাব বর্ত্তমান থাকিত, অধিকারী অনুসারে ইহাদের অন্যতম ভাব উপলব্ধ ও গৃহীত হইত, তাঁহার প্রত্যেক ব্যবহার হইতে সকলেরই কিছু-না-কিছু কল্যাণ সাধিত হইত, কোন-না-কোনরূপ শিক্ষালাভ হইত। স্বামীজীর শাসন ও শিক্ষাব্যাপার সদাই বড় মধুর ও ব্যাপক—দূর প্রসারী ভাবসমূহ দ্বারা অন্বিত থাকিত। 'রামরূপ' স্বামীজীর সকল কার্য্যেই এক অপরূপ রমনীয়তা, এক অলৌকিক মধুরতা পরিদৃষ্ট হইত, এমন কি, তাঁহার শাসন কার্য্যও এ মধুরতা বিরহিত ছিল না। তিনি অনেক সময়ে আন্তরভাবেই শিষ্যগণের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

তাঁহার প্রায় প্রত্যেক ব্যবহারেই দুইটী ভাবের প্রবাহ লক্ষিত হইত, একটী স্থূল ও নিম্নাধিকারি গ্রাহ্য, অন্যটী সূক্ষ্ম ও উচ্চাধিকারি গ্রাহ্য। স্বামীজীর শাসনে কোনরূপ দুঃখময়ত্ব দৃষ্ট হইত না; বেদে শিষ্যশিক্ষার যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, স্বামীজীর শিক্ষাপদ্ধতি তদনুরূপই লক্ষিত হইত। *স্বামীজী কোন কার্য্যের নিমিত্তই কাহাকেও কোনরূপ ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার অন্তিম কালের ব্যবহারেও তাঁহার এ নিয়ম অতিক্রান্ত হয় নাই।

স্বামীজী জানিতেন, তাঁহাকে একমাসব্যাপী উপবাস করিতে দিতে কেহই ইচ্ছা করিবে না, সকলেই বিশেষ কাতরতার সহিত বাধা দিবে, সে কাতরভাব তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না, অতএব ইষ্ট সিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটিবে; রোগাদিরূপ কোন হেতুর আশ্রয় করিয়া থাকিলে ইহা অপেক্ষাকৃত অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে পারিবে। ঈদৃশ হেতুর অভাব কিছু ছিল না, কারণ, অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তিরূপ ব্রাহ্মণের উত্তম বৃত্তিপালনে বদ্ধপরিকর থাকাতে এবং জ্ঞানার্থীকে জ্ঞানদান করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী থাকাতে গৃহস্থগণ দ্বারা সাধারণতঃ পালিত শারীর (স্বাস্থ্যবিষয়ক) নিয়মাদি তাঁহা দ্বারা কখনও পালিত হইত না, গৃহস্থগণের ন্যায় যথাসময়ে স্নান, আহার ও নিদ্রাদির সেবন তাঁহার কখনও ছিলনা বলিলেই হয়। শরীরের প্রতি তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিতেন। এতদনুসারে বহুপূর্ব্বেই শরীরে কোন কঠিন রোগ হইয়া তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইবার কথা, কিন্তু তাঁহার যোগবলে তাহা হইতে পারিত না। শরীরে কোন কঠিন রোগের আবির্ভাব হইলে তিনি প্রথমতঃ প্রারব্ধবোধে তাহা ভোগ করিতেন, তপস্যারূপে তজ্জনিত ক্লেশ সহ্য করিতেন, মারাত্মক আকার ধারণ করিলে যোগবলে তাহা নিবৃত্ত করিতেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তিনি কয়েকখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। রাত্রিতে সামান্য কিছু লঘু আহার করিবার পর ঘণ্টা দুই তিন একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া পুনরায় প্রায় রাত্রি একটার সময় হইতে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিতেন এবং পরদিন দিবাভাগের অনেকটা কাল

---

* "য আতৃণত্ত্যবিতথেন কর্ণাবদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সম্প্রযচ্ছন্।"—নিরুক্তে (উপোদ্ঘাত) ধৃত শ্রুতি। "* * * যো হি কিঞ্চিদাতৃণত্তি স দুঃখয়তি, অয়ং পুনঃ সুখমাতৃণত্তি * * *"—নিরুক্তভাষ্য।

অতিক্রান্ত হইয়া গেলে তবে বিরত হইতেন। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু (যোগের) ক্রিয়া করিয়া লইতেন। ইহা দ্বারা শারীরিক অবসাদ অনেকতঃ তিরোহিত হইত, ক্ষয়ের অনেকতঃ পোষণ হইত। এক এক দিবস লেখা সমাপ্ত করিয়া উঠিতে প্রায় বেলা দুইটা বাজিয়া যাইত। তখন উঠিয়া অবশিষ্ট আহ্নিকাদি সমাপন করিতে প্রায় বেলা চারিটা বাজিয়া যাইত। এইরূপ অত্যাচার হইতে থাকায় আমরা শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা করিতাম, তবে, তাঁহার অসীম সংকল্পশক্তির কথা এবং তাঁহার সমগ্র জীবনের ইতিহাস স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে, আমাদের সে আশঙ্কা হৃদয়ে অধিক কাল স্থান পাইতনা। কিন্তু এখন তিনি স্বয়ংই দেহত্যাগের ইচ্ছা করাতে ভৌতিক জগতের শরীরাদি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম তাঁহার শরীরে ক্রিয়া করিবার অবসর প্রাপ্ত হইল।

তিনি দিবাভাগের আহার সমাপনান্তে কৃপাপূর্ব্বক যাঁহারা যেদিন নিকটে থাকিতেন তাঁহাদিগকে স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। সেই অমৃত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। ইদানীং আহার সমাপন করিতে না করিতেই বিবমিষা অনুভূত হইতে লাগিল। তজ্জন্য আর প্রসাদ বিতরণ করিতে পারিতেন না, শীঘ্রই আচমন করিয়া লইতেন। ক্রমে ভোজনকালেই বিবমিষার আবির্ভাব হইতে লাগিল, এবং আর কিছু দিন পরে আহার আরম্ভ করিতে না করিতেই ইহার উদ্রেক হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিলেন, একটা কঠিন রোগের সূত্রপাত হইতেছে। ইহার কয়েক দিবস পরেই আমাতিসার ও তৎপরেই রক্তাতিসার দেখা দিল।

স্বামীজী অসুস্থ হইলেও সাধারণতঃ ঔষধাদি সেবন করিতে পারিতেন না বা পথ্যাদিবিষয়ে কোন নিয়ম পালন করিতে পারিতেন না, এবং প্রায়ই এই মর্ম্মে বলিতেন—যে সময়ে দেখিবে যে আমার এরূপ রোগ হইয়াছে যাহাতে আমাকে ঔষধ সেবন করিতে হইবে বা পথ্যাদির নিয়ম পালন করিতে হইবে, তখনই জানিবে যে, আমার শরীরের স্থিতি অধিককালব্যাপিনী নহে।

রোগ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। স্বামীজীর পিতৃপ্রাণ কনিষ্ঠ পুত্র * পিতাকে

---

* প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র পারদর্শী, পিতার সকাশ হইতে লব্ধচিকিৎসাবিজ্ঞানতত্ত্ব, তীক্ষ্ণপ্রতিভাসম্পন্ন, ধীর ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সান্যাল।

রোগাক্লিষ্ট দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, পিতার নিকট হইতে চিকিৎসা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পুত্রের খেদনিবৃত্তির নিমিত্ত স্বামীজী অনুমতি দিলেন। কিন্তু যিনি স্বয়ংই দেহত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছেন, চিকিৎসার শ্রেষ্ঠপদ্ধতিরূপ যে যোগচিকিৎসা, যিনি সেই যোগচিকিৎসা ভিন্ন অন্য চিকিৎসা প্রায়ই অবলম্বন করিতেন না, স্থূল চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার রোগাপনয়ন সম্বন্ধে আর কতদূর সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে? ফলে রোগের মধ্যে মধ্যে উপশম হইতে থাকিলেও একেবারে নিবৃত্তির কোন লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল না। এক দিন স্বামীজী বলিলেন—আমার চিরদিনই গঙ্গায় থাকিতে ভাল লাগে, অতএব একখানা বড় নৌকা স্থির করিয়া আমাকে গঙ্গাগর্ভে রাখ। তাহা হইলে আমার শরীর শীঘ্র নিরাময় হইতে পাবে। রুগ্নশরীরে গঙ্গার শীতল বায়ুস্পর্শ হইলে রোগবৃদ্ধি হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নৌকা স্থির করিতে অনেকেই প্রথমে অনিচ্ছুক হইলেন; কিন্তু স্বামীজীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারায় অবশেষে একখানি বৃহৎ নৌকা স্থির করা হইল। প্রথম দিনে নৌকায় যাইবার পর স্বামীজীর মন বিশেষতঃ প্রফুল্ল দৃষ্ট হইল। পরদিন প্রাতে শরীর সম্বন্ধেও কিছু উপকার লক্ষিত হইল। দ্বিতীয় দিনে সায়ংকালে দুই একটী আকস্মিক কারণবশতঃ রোগের এক নূতন পর্ব্ব পরিদৃষ্ট হইল।

সায়ংকালে নৌকাখানি কোন্নগরের তটভাগের অদূরবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছিল। প্রকৃতি কালোচিত শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একটী ঝটিকা উপস্থিত হইল। ঝটিকার বেগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে ইহা অতি প্রবল ও ভয়ানক রূপ ধারণ করিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের স্থির, প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষ এখন তরঙ্গগণ দ্বারা বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। ঝটিকার শীঘ্র উপশমের কোন চিহ্ন দেখা গেলনা। বাত্যার প্রাবল্য হেতু তরঙ্গগণ ক্রমেই বৃহদাকার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। উত্তাল তরঙ্গমালা দ্বারা আহত-প্রতিহত হইয়া নৌকাখানি (ইহা একখানি বৃহৎ 'বজরা' হইলেও) ভীষণরূপে আন্দোলায়িত হইতে লাগিল। নৌকার মধ্যে কোন বস্তুকেই স্থিরভাবে রক্ষা করিতে পারা যাইতেছিল না। কোন ব্যক্তিই দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে পারিতেছিলেন না।

এই সময়ে স্বামীজীর শরীরে একটী নূতন উপসর্গ দেখা দিল। অন্ত্র হইতে প্রভূত পরিমাণে রক্তস্রাব আরম্ভ হইল। সেই ক্ষীণ দেহ হইতে বোধ হয়

তিন চারি সের পরিমাণ রক্ত বিনির্গত হইয়া গেল। চারিখানি দৈর্ঘ্যে দশ হস্ত-পরিমাণ পরিধেয় বস্ত্র শোণিত-সিক্ত হইয়া গেল। আকস্মিক এই অবস্থার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা করা ছিলনা, তৎকালোপযোগী কোন ঔষধ সঙ্গে লইয়া যাওয়া হয় নাই। অতএব তৎকালে ইহার স্থূলভাবে কোন প্রতীকার করিতে পারা গেলনা। স্বামীজী বলিলেন, 'নৌকা তটলগ্ন কর এবং আমাকে তীরে সংস্থাপন কর'। পাছে দেহত্যাগ করেন এই আশঙ্কায় নৌকা তটস্থ করিতে আমরা ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আদেশ দেওয়াতে আমরা অগত্যা নৌকা তীরস্থ করিবার ব্যবস্থা করিলাম। ঝটিকার বেগ তখনও মন্দীভূত হয় নাই, নাবিকগণ অতি কষ্টে নৌকা তীরাভিমুখে লইয়া যাইতে লাগিল। নৈশতমোবশতঃ এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা হেতু তীরস্থ পদার্থ ভাল লক্ষিত হইতেছিল না। নৌকা তটবর্ত্তী হইলে অস্পষ্টালোকে দেখা গেল তথায় কোন ভাল ঘাট নাই। অগত্যা একটী ভগ্ন ঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশেই নৌকা লগ্ন করা হইল এবং বহুজনের প্রাণের প্রাণকে সভয়ে তত্রত্য অসমতল প্রদেশে অবতরণ করাইয়া স্থাপিত করা হইল। তীরে নামিয়া স্বামীজী বলিলেন 'নাড়ীটা দেখ, দেখি'। স্বামীজীর কনিষ্ঠ পুত্র নাড়ী দেখিতে লাগিলেন। নাড়ীর অবস্থা বস্তুতই বড় মন্দ হইয়াছিল। স্বামীজী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখিলে?' শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ উত্তর করিলেন, 'নাড়ীর অবস্থা ভাল নহে, এক এক বার পাওয়া যাইতেছে, আবার কিছুক্ষণ পাওয়া যাইতেছেনা'। আমরা তখন অতি কাতরভাবে এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিলাম, 'আপনি ইচ্ছা করিলেই এ অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন, অতএব এখন দেহত্যাগ করিবেন না; আপনি এখন দেহত্যাগ করিলে আমরা অনাথ হইয়া যাইব। অতএব আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আর কিছু দিন শরীররক্ষা করুন'। আমাদের কাতরোক্তিতে স্বামীজীর হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল; আমাদিগকে আরও কিছুদিন সনাথীকৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং উত্তরে বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি এখন দেহ ত্যাগ করিব না'। তখন আমরা আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে বাটীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, এবং অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, একখানি ভগবৎপ্রেরিত 'মোটর বাস'এ তাঁহাকে উত্তরপাড়ার বাসভবনে লইয়া আসিলাম। বলা বাহুল্য, এইরূপ অবস্থায় 'মোটর-বাসে' আসিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। তথাপি সে কষ্ট তিনি স্বাভাবিক সহনশীলতাগুণে ধীরভাবেই সহ্য করিয়াছিলেন।

স্বামীজী উত্তরপাড়ার ভবনে প্রত্যাগত হইয়াই বলিলেন, 'এ গৃহে আমি আর থাকিব না, গঙ্গাতীরে অন্য স্থান নিরূপণ কর, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তথায় থাকিতে ইচ্ছা করি' এবং নিজ বাস-কক্ষে আর প্রবেশ না করিয়া ছাদেই রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিনে বিশেষ অনুনয় করাতে দালানে গিয়া অবস্থান করিলেন। ততঃপর তাঁহার আজ্ঞানুসারে একটী উপযোগী স্থানের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করা হইল।

এই সময়ে স্বামীজী লেখককে ডাকিয়া বলিলেন,—'আমি এখন সন্ন্যাস লইতে ইচ্ছা করি। কোন যোগ্য সন্ন্যাসীকে ৺কাশীধাম হইতে আবাহন করিয়া লইয়া আইস, তাঁহার সকাশ হইতে স্থূলভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। আদেশ শ্রবণানন্তর আমি ভাবিতে লাগিলাম—বৈষ্ণবী নিষ্ঠাকে পূর্ণরূপে অদূষিত রাখিয়া চতুর্থাশ্রমকে অলঙ্কৃত করিতেছেন এরূপ কোনও সন্ন্যাসী বর্ত্তমানকালে কোন স্থানকে সনাথীকৃত করিতেছেন কিনা তাহা ত আমি জানিনা। ৺কাশীধাম সন্ন্যাসিগণের বিশেষতঃ আবাসস্থান বটে কিন্তু ৺কাশীতে বর্ত্তমানে যে সকল অপেক্ষাকৃত আশ্রনবৃত্তিস্থিত সন্ন্যাসী আছেন ইহাঁদিগের যাঁহারা গুরু ছিলেন সেই বৃদ্ধ স্বামিগণও স্বামীজীকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর ৺কাশীধামে অবস্থানকালে তাঁহার সকাশে বেদান্তাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপে আগমন করিতেন। তাঁহারা ত এখন ব্রহ্মীভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্যগণ যাঁহারা আছেন তাঁহারাও স্বামীজীর নিকটে বেদান্ত এবং কেহ কেহ কোন কোন বেদাঙ্গও অধ্যয়ন করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা স্বামীজীকে দীক্ষিত করিবেন কিরূপে? এইরূপ চিন্তা করিয়া, আমি উত্তরে নিবেদন করিলাম—সরস্বতী সম্প্রদায়ের অথবা অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও আপনাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিবার মত কোনও পুরুষকে ত দেখিনা। দুই এক জনের কথা মনে পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহারাও ত সকলেই ৺কাশীধামে আপনার নিকটে বেদান্তাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন, আপনাকে গুরুদৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও সকাশ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ কিরূপে হইতে পারে? তাঁহারাও আপনাকে দীক্ষিত করিতে সম্মত হইবেন না বোধ হয়। তখন স্বামীজী বলিলেন—'তাহা হইলে আমি স্বয়ংই 'প্রেষ' উচ্চারণ পূর্ব্বক আতুরসন্ন্যাস গ্রহণ করিব', এবং এতদ্বিষয়ক বিধিসমন্বিত শাস্ত্রসকল আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে আমাকে পাঠ করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিলাম।

গঙ্গার পশ্চিম কূলে উপযোগী কোন বাসভবন প্রাপ্ত না হওয়াতে গঙ্গার পূর্ব্বকূলে বরাহনগরের উত্তরসীমার নিকটে একখানি বৃক্ষবাটিকা (উদ্যান-সংযুক্ত একখানি দ্বিতল ভবন) স্বামীজীর নিমিত্ত স্থির করা হইল। বাটির অধিকারিণী স্বামীজীকে জানিতেন এবং তাঁহার চরণে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব পোষণ করিতেন, অতএব তিনি কোন ভাটক গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, এবং স্বামীজীর পাদস্পর্শে ভবনটি পবিত্রীকৃত হইবে এইরূপ জ্ঞান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

বাটি নিরূপিত হইয়াছে এই সংবাদ স্বামীজীকে প্রদান করা হইলে তিনি প্রেষমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আতুরসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নৌকাযোগে গঙ্গার পূর্ব্ব-পারস্থ নির্দ্দিষ্ট বাটিতে যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর দেহত্যাগ পর্য্যন্ত প্রায় একমাস কাল স্বামীজী এই বাটিতে বাস করিয়া-ছিলেন। উত্তরপাড়া হইতে যাত্রা করিবার সময়ে স্বামীজী বলিয়া দিলেন—'আমি এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি' আমার সহিত আমার পূর্ব্ব শরীরের পরিচিত কোন ব্যক্তি যেন না যায়। যাঁহারা তাঁহার সহিত তাঁহার সেবার্থ গমন করিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীর কোন কোন পুত্র তাঁহার পরিচর্য্যার্থ তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু শিষ্যরূপে, কারণ স্বামীজী তাঁহাদিগকে ৺কাশীধামে সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অতিবর্ণাশ্রমী স্বামীজীর ব্যবহারে যদ্যপি কখন পুত্রাপুত্র বা মিত্রামিত্ররূপ ভেদ দৃষ্ট হইত না, তথাপি তিনি শাস্ত্রীয় শৈলীর কথন লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিতেন না।

স্বামীজী গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে মধ্যে মধ্যে এই মর্ম্মে বলিতেন---'আমি দেহত্যাগের পূর্ব্বে কিছুকাল আহার ত্যাগ করিব, প্রথমে ফলাদি এবং শেষে একমাস কেবল জল গ্রহণ বা উপবাস করিয়া থাকিব। কার্য্যতঃও তাহাই করিলেন। বরাহনগরের বাটিতে আসিলে একদিন মাত্র তাঁহাকে অন্ন দেওয়া হইয়াছিল, খান নাই, তাহার পর হইতে প্রায় একমাসকাল প্রথমে ফলের রস, পরে অল্পপরিমাণ সরবত বা গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়াই থাকিয়া-ছিলেন। শেষ তিন দিবস অনশন করিয়াছিলেন, একেবারে কিছুই খান নাই।

বরাহ নগরে গঙ্গাতীরস্থ ভবনে যাইবার দুই এক দিবস পরে, জগতের কল্যাণের আশ্রয় স্বরূপ স্বামীজীর স্থূল শরীরটীর তাহা হইলে কিরূপে রক্ষা হইবে,

এইরূপ ভাবিয়া একদিন আমি তাঁহাকে কিছু গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম। উত্তরে এইরূপ বলিলেন—"আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না, কোন বস্তুই আহরণের আমার আর প্রবৃত্তি নাই, এখন আমি পূর্ণরূপে গুণবৈতৃষ্ণ্য অনুভব করিতেছি, প্রকৃতির কোন পদার্থগ্রহণেই আর ইচ্ছা নাই।"

স্বামীজীর এই অল্পাক্ষরাত্মক উক্তির মর্ম্ম সকল পাঠকের হয়ত উপলব্ধি না হইতে পারে। অতএব এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক মনে করি, এস্থলে "আহরণের" এই শব্দের অর্থ 'কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তদিন্দ্রিয়ার্থের গ্রহণ'। স্বামীজীর এই অবস্থার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ পুরুষের পক্ষে অসম্ভব, নিম্নতরপর্ব্বস্থিত যোগাভ্যাসীও এ অবস্থার স্বরূপোপলব্ধি করিতে অক্ষম। ইহা যোগের অতি উচ্চ ও আনন্দপ্রদ অবস্থা। পর বৈরাগ্যকেই গুণবৈতৃষ্ণ্য বলে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়সম্পাদিত কোন অবস্থা বা পদার্থে যখন আর স্পৃহা থাকেনা, প্রকৃতির সকল অবস্থা, সকল পর্ব্বের প্রতিই যখন বিরাগ উপস্থিত হয় যোগীর সেই অবস্থাকে গুণবৈতৃষ্ণ্য বলে। আত্মসাক্ষাৎকার হইতে এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব ("তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণ-বৈতৃষ্ণ্যম্।"—পাং দং ১১১৬। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন, ইহা জ্ঞানপ্রসাদস্বরূপ, এই অবস্থা হইলে যোগীর যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাতে তাঁহার চিত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে—"যাহা পাইবার ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, পাইবার আর কিছু নাই; যাহারা ক্ষেতব্য ছিল, যাহাদের ক্ষয়ের নিমিত্ত এতদিন প্রযত্ন করিতেছিলাম, সেই অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ এখন ক্ষীণ হইয়াছে; অবিচ্ছিন্ন সংসারপ্রবাহ, যাহার বিচ্ছেদ না থাকাবশতঃ প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত হয়, এবং মরণোত্তর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে, সেই অবিচ্ছিন্ন সংসারপ্রবাহ এখন ছিন্ন হইয়াছে"। ঈদৃশ বৈরাগ্য জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা, এই বৈরাগ্য হইতে কৈবল্য পৃথক্ পাদার্থ নহে, কৈবল্য ইহারই নামান্তর।

স্বামীজী জীবনে ইতঃপূর্ব্বে প্রায়ই বলিতেন,—যদি মৃত্যুর কিছু দিনপূর্ব্বে আমার রোগও হয়, তাহা হইলেও দেহত্যাগের পূর্ব্বে আমার কোন রোগ থাকিবেনা। কার্য্যতও ঠিক তাহাই দৃষ্ট হইল। স্বামীজীর শরীরে শেষ তিন চারি দিন আর কোন রোগই ছিলনা। যাবতীয় উপসর্গ সহ সকল রোগই বিলোপ প্রাপ্ত হইয়ছিল।

এক দিবস তাঁহাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া এই মর্ম্মে নিবেদন করা হইল—"চিকিৎসাতত্ত্ব ত আপনি পূর্ণরূপেই বিদিত আছেন, অতএব আপনার শরীরের

এই বর্ত্তমান অবস্থাতে যাহা উপকারক হয়, তাহা দয়া করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিন, আমরা তাহার সংগ্রহের ব্যবস্থা করি"। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "হাঁ, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে চিকিৎসাতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞানই দিয়াছিলেন, আমাকে সুচিকিৎসক করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। আমি জ্ঞাত আছি, আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থাতে কোন্ ভেষজ উপকারক হইবে, কিন্তু আমি এখন তাহা বলিব না, আমি এখন স্বয়ং কিছু করিবনা, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।"

প্রায় দুই মাস অন্নগ্রহণ না হইলেও, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ও বলহীন হইলেও, কথা কহিবার শক্তি অনেকতঃ বিলুপ্ত হইলেও, স্বামীজী এক এক সময়ে উচ্চকণ্ঠে, গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত স্বরে ভগবানের নাম গান করিতেন। বহিঃপ্রদেশ হইতে শুনিলে মনে হইত, সবলকায়, সুস্থশরীর কোন পূর্ণসঙ্গীততত্ত্বজ্ঞ, সাধকপ্রবর, ভক্তশ্রেষ্ঠ পুরুষ গান করিতেছেন। এক এক দিন বাজাইবার নিমিত্ত খোলও চাহিয়া লইতেন। অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন, এরূপ অবস্থায় শরীরে এত বল, গলায় এত জোর কোথা হইতে আসিত তাহা স্থির করিতে পারিতেন না।

প্রায় এক মাস উপবাস অতীত হইলে স্বামীজী একদিন বলিলেন— আমাকে নিম্নতলে লইয়া চল। সকলেরই মনে আশঙ্কা ছিল যে, নিম্নতলে যাইলেই উনি দেহ ত্যাগ করিবেন। একে একে অনেককেই ডাকিয়া বলিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে নিম্নতলে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। এক দিন বলিলেন, আমি বোধ হয়, বিজয়া দশমীর দিন মার সঙ্গে চলিয়া যাইব। সকলেই ভীত হইয়া সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠার সহিত যাপন করিলেন। সে দিনে স্বামীজী দেহত্যাগ করিলেন না। তদবধি মধ্যে মধ্যে নীচে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলের প্রাণাধার যিনি, তাঁহাকে কে বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে পারে? অবশেষে স্বামীজী একদিন বলিলেন—আমি উপরে দেহত্যাগ করিলে আমার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাদের একটা অপযশ হইবে। এইরূপে আরও দুই তিন দিবস কাটিল। একদিন স্বামীজী বলিলেন—আমি বোধ হয় কোজাগর পূর্ণিমার দিন শরীর ত্যাগ করিব; কিন্তু তাঁহাকে নীচে নামান না হওয়াতে তাহাও করিতে পারিলেন না। দেহত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও, নীচে নামান হইতেছিল না বলিয়া দেহ ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না; কাহারও

কোনরূপ অপযশ হয় ইহা স্বামীজীর অসহ্য ছিল। এই সময়ে স্বামীজীর শরীরের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, প্রায়ই নাড়ী ছাড়িয়া যাইত এবং নাড়ী ছাড়া অবস্থাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া থাকিতেন। তথাপি তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইত না, এবং এই অবস্থাতেও তিনি অনেক সময় উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম গান করিতেন। ভৃগুসংহিতার "আয়ুস্তস্য করে স্থিতঃ" এই কথার ইহা হইতে প্রকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এক দিন এইরূপে নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ায় আমার একটী সতীর্থ অতি ব্যগ্রতার সহিত আমাকে গিয়া সংবাদ দিলেন এবং তখন কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রকার বলিলাম—'ভাই! আমি তোমাকে এক দিনের ঘটনা বলিতেছি। তাহা হইতেই তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে। একদিন * আসনে উপবেশন করিয়া উপদেশ দিতে দিতে আমাকে বলিলেন, আমার নাড়ীটা এখন দেখ, এবং একটু পরে আবার দেখিও। আমি দেখিলাম, নাড়ী তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপ থাকে, সেইরূপই আছে। উনি কিছু যোগের ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। একটু পরে আমি দেখিলাম নাড়ী নাই। ইহার একটু পরেই ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া বলিলেন, 'আর কিছুক্ষণ এরূপ অবস্থায় থাকিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া (Heart এর action„) একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।' অতএব ইহাঁদের নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া মাত্র বিশেষ ভয়ের কারণ নহে, তবে যদি বাবা সত্য সত্যই দেহত্যাগের সংকল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জগতের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের কথা বটে।

বরাহনগরের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে গিয়া অবধি স্বামীজী ভাষণ অল্পই করিতেন। শেষভাগে আরও অল্প করিতেন এবং জীবনের শেষ তিন দিন একেবারেই ভাষণ করেন নাই; সর্ব্বদা প্রণবাদির জপ এবং যোগাবলম্বনে প্রাণটী রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন যে, কেহই তাঁহাকে নিম্নতলে লইয়া যাইতে চাহেনা, তখন তিনি পার্শ্বস্থগণের মনের উপরি ক্রিয়া করিলেন এবং এরূপ অবস্থা দেখাইলেন যাহাতে তাঁহাদের তাঁহাকে নীচে নামাইবার প্রবৃত্তি হইল। যখন তাঁহাকে নীচে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তোলন করা হইল, তখন দেখা গেল যে, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় এরূপ ভাবে কম্পিত

* তখন স্বামীজী ৺কাশীধামে সোণারপুরার বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন।

হইতেছে যাহাতে বুঝা যায় যে তিনি 'রাম' নাম * জপ করিতেছেন। তাঁহাকে নামাইয়া আনিয়া নীচের ঘরের গঙ্গাতীরস্থ বারান্দায় রাখা হইল। তখন তিনি একবার চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক গঙ্গা-মাতার দিকে তাকাইলেন, এবং তখনই প্রাণ আকর্ষণ করিয়া স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিলেন।

—* কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, প্রণবই যতি বা সন্ন্যাসিগণের এক-মাত্র জপ্য বা ধ্যেয় মন্ত্র, অতএব স্বামীজী প্রয়াণকালে "রাম" মন্ত্রের উচ্চারণ করিলেন কেন? যাঁহারা 'প্রণব' এবং 'রাম' এই উভয় মন্ত্রের স্বরূপ জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, তবে যাঁহারা তাহা বিদিত নহেন, তাহাদিগের নিমিত্ত এ স্থলে দুই এক কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, স্থানান্তরে বিষয়টি বিশদীকৃত করিবার চেষ্টা করিব। 'প্রণব' এবং 'রাম' এই উভয় মন্ত্রে বস্তুতঃ ভেদ নাই, 'ওঙ্কার' এবং 'রাম' এই উভয় মন্ত্রের যথাশাস্ত্র বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

রামরহস্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, মুমুক্ষুগণ, বিরক্তগণ অথবা আশ্রমবাসিগণ এই সকলেরই রামমন্ত্র ধ্যেয়; প্রণবত্ব হেতু ইহা যতিগণের (সন্ন্যাসিগণের) বিশেষতঃ ধ্যেয়; যিনি রামমন্ত্রার্থবিজ্ঞানী, তিনি নিঃসংশয় জীবন্মুক্ত পুরুষ ("মুমুক্ষূণাং বিরক্তানাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্। প্রণবত্বাৎ সদা ধ্যেয়ো যতীনাং চ বিশেষতঃ। রামমন্ত্রার্থবিজ্ঞানী জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ")। প্রণব যে রামতত্ত্বাত্মক তাহা বুঝাইতে যাইয়া রামোত্তরতাপনী উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রি র্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষর সম্ভূত; শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥ ১
প্রজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥ ২॥
শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিণী।
উৎপত্তিস্থিতি সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৩॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥৪॥"

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

আমার স্বামীর যে সময় আপনা হইতেই মনোমধ্যে খুব নামের প্রবাহ চলিয়াছিল এবং তিনি বিশেষ অভিভূত অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন, তৎকালে কি প্রয়োজনে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্য তারানন্দ ঐস্থানে আসিয়া শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের ঐ প্রকার সমাধিমগ্ন মূর্ত্তি দর্শনে স্তব্ধ ও অভিভূত হইয়া একেবারে অচল অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। সকলেরই সে সময় একরূপ মুগ্ধ পরমানন্দ ভাব, কিন্তু ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে এবং আমাদের ৪।৫ মাইল দূরে জসিডিতে ঘোড় গাড়ীতে ফিরিতে বহু বিলম্ব হইবে বিবেচনায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিন কোয়ার্টার পর সে দিন আমরা ঐ স্থান হইতে উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তখন আমাদের ঐস্থান ত্যাগ করিতে কোন মতেই ইচ্ছা হইতেছিলনা। আমরা কয়েকদিন পরে যখন পুনরায় আশ্রমে গিয়াছিলাম, তখন শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ স্বামীজীর নিকট শুনিয়াছিলাম সে দিন প্রায় আরও দুইঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ ঐরূপ সমাধিমগ্ন অবস্থায় ঐভাবে ঐ নিম্ববৃক্ষ তলে উপবিষ্ট ছিলেন। যখন অধিক রাত্রে সমাধি ভঙ্গ হইয়াছিল, তখন উঁহারা শ্রীশ্রীগুরু মহারাজকে বহু অনুরোধ করিয়া তবে ধ্যান কুটিরে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক সাধু বাবা একদিন গুরুভক্তি সম্বন্ধে যে কাহিনীটি আমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন তাহাই এখন বলি। গুরুর প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং কিরূপ গাঢ় ভক্তি থাকা প্রয়োজন তাহার উদাহরণ দিয়া তিনি এই গল্পটি বলিয়াছিলেন।

একদা একরাজা গুরু লাভের নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সিংহাসনে বসিয়া থাকিলে গুরু মিলিবেনা ভাবিয়া তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। একদিন রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি রাত্রিশেষে রাজধানী ত্যাগ করিয়া অরণ্যের পথ ধরিব"।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহারাজ রাজধানী ত্যাগ করিবেন"?

রাজা উত্তর করিলেন, "আমার জীবন বৃথাই বহিয়া যাইতেছে, আজও আমি দীক্ষা পাইলাম না, তাই আমি সঙ্কল্প করিয়াছি ছদ্মবেশে রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাজধানী ত্যাগ করিব, এবং সূর্য্যোদয়ে যাহাকে আমি সম্মুখে দেখিব

তাহাকেই আমি গুরু পদে বরণ করিব। কিন্তু তাহাকে আমি দক্ষিণা দিব কি?

যাও মন্ত্রী, আমার ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠ রত্ন লইয়া এস, আমি তাহাই গুরু দক্ষিণা দিব"।

মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন, তথায় এক চোর ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাজার কথা তাহার কানে গেল; সে সঙ্কল্প অাঁটিল যেমন করিয়া হউক ঐ রত্নটী সংগ্রহ করিতে হইবে। এ দিকে রাত্রিশেষে রাজা যখন রাজধানী ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিয়াছেন তখন তস্করও তাঁহার অনুশরণ করিয়া চলিল। এবং অরুণোদয়ে রাজাকে দর্শন দিয়া রত্ন প্রার্থী হইল। রাজা তাহাকে প্রণাম করিয়া রত্নটি দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিলেন এবং মন্ত্র প্রার্থী হইলেন। তস্কর কহিল, "বেঠে" বলিয়াই সে প্রস্থান কবিল। রাজার মনে দৃঢ় বিশ্বাশ হইল ইহাই মন্ত্র। ইহার অর্থ বোধহয় সকল স্বার্থ বাসনা ত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবৎ ধ্যানে বসিয়া যাও। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাজা মন হইতে সমস্ত স্বার্থ বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া ঐ স্থানে আসন করিয়া বসিলেন এবং অতি ভক্তি পূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আহার নিদ্রাত্যাগ করতঃ দিবানিশি ঐ "বৈঠো, বৈঠো" মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিনা গুরুর আদেশে তিনি ঐ স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। এবং ঐ মন্ত্রই একাগ্রচিত্তে সাধন করিতে লাগিলেন। এদিকে বিশ্বপালন কর্ত্তা বিষ্ণু দেখিলেন, রাজা যেরূপ কঠোরতার সহিত তপ করিতেছেন তাহাতে তাঁহার জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন; রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি দুষ্ট লোকের বাক্যে প্রতারিত হইয়াছ। এখন এখান হইতে উঠিয়া বাড়ী যাও এবং আহারাদি কর।" রাজা বিষ্ণুর বাক্য শ্রবনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু, অনর্থক গোলমাল করিয়া আমার কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছ? অমি তোমার বাক্য শুনিতে চাহিনা, তুমি এখনই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।" ভগবান বিষ্ণু দেখিলেন, ঐ চোরকে প্রকৃত সৎব্যক্তি বলিয়া রাজার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। রাজা সত্যই তাহাকেই গুরু মানিয়া লইয়া তাহার বাক্য মন্ত্রজ্ঞানে যখন এত ভক্তি সহকারে জপ করিতেছেন, তখন সেই চোরকেই তাঁহার নিকট আনিতে হইবে, অন্যথা এরূপ ভাবে একাসনে নিদ্রাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিক দিন থাকিলে রাজার প্রাণ সংশয় হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে একদিন বিষ্ণু

চোরকে সঙ্গে লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। চোরের আহ্বানে রাজা চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং সম্মুখে উভয়কে দণ্ডায়মান দর্শন করিয়া গুরুকৃপায় গোবিন্দের দর্শন পাইলাম মনে করিয়া মহা উল্লাসিত হইয়া গুরুজ্ঞানে প্রথমে চোরকে প্রণাম করিয়া পরে ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন। গল্পের এই পর্য্যন্ত বলিয়া সাধুবাবা এই শ্লোকটী বলিলেন।

"গুরু গোবিন্দ দোনো খাড়ে, কিস্‌কে লাগু পায়,
বলিহারী গুরু আপনে যিন্ গোবিন্দ দিও দেখায়॥"

অর্থাৎ রাজা চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক প্রথমে উভয়কে সম্মুখে দেখিয়া ভাবিলেন যে গুরু এবং গোবিন্দ দুইজন সামনে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি পূর্ব্বে কাহাকে প্রণাম করিব? পরে বিচার পুর্ব্বক দেখিলেন যে গুরুই সর্ব্বাগ্রে বন্দনীয়; কেন না, তাঁহারই কৃপায় অদ্য আমি গোবিন্দের দর্শন পাইলাম, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি প্রথমে গুরুকে প্রণাম করিয়া পরে ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

এই গল্প দ্বারা সাধুবাবা বুঝাইলেন যে গুরুর প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তিরই এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি থাকা প্রয়োজন। এইরূপ গভীর ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে এবং একান্ত প্রাণে সাধনায় ভগবান লাভ সম্ভব ও সহজ হয়, নচেৎ ভগবৎকৃপা লাভ কঠিন হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ একটী কথা বলেন যে, প্রথমে আত্মকৃপা, পরে গুরুকৃপা তৎপরে ভগবৎকৃপা লাভ হয়। আর সাধুবাবা বলেন, চতুর্থ বেদ কৃপা চাই। অর্থাৎ বেদ মানে ব্রহ্মবিদ্যা, উহা হৃদয়ে গাঁথা হইয়া যাওয়া চাই।

সর্ব্বভূতের মধ্যে যে এক পরমাত্মাই বিরাজিত সে সম্বন্ধে একদিন কথা হইয়াছিল, সাধুবাবা বলিতেছিলেন যে, যে দেখিতে জানে সে বাহিরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিলেও মূলে একই বস্তু দেখিতে পায়, তাঁহার নিকট পৃথক বোধ নাই। উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাবা একটী গল্প বলিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন, গল্পটী এই:—

একজন ভক্ত ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ নির্ম্মিত শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণজী, সীতা মায়ীর এবং মহাবীর হনুমানের মূর্ত্তি ছিল। সে ব্যক্তি প্রত্যহ ঐ মূর্ত্তিগুলি ভক্তি পূর্ব্বক পুজা করিত।

এক সময় অতিশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ঐ ব্যক্তির দিনাতিপাত করা কঠিন হইয়া উঠিল। অভাবের ভয়ানক পীড়নে সে অতিশয় অস্থির হইয়া অবশেষে স্থির করিল যে সুবর্ণ নির্ম্মিত ঐ মূর্ত্তিগুলি বিক্রয় করিয়া অন্ততঃ

কিছুদিন স্বচ্ছল অবস্থায় দিনযাপন করিবে। যখন দিন আর চলে না এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইল, তখন সেই ব্যক্তি ঐ সুবর্ণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি গুলি লইয়া এক কর্ম্মকারের দোকানে বিক্রয়ার্থে গমন করিল। কর্ম্মকার মূর্ত্তিগুলি ওজন করিয়া যখন শ্রীরাম চন্দ্রের মূর্ত্তি হইতে হনুমানের মূর্ত্তির অধিক মূল্য বলিল, তখন ঐ ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "এ কিরূপ কথা? প্রভু অপেক্ষা সেবকের মূল্য অধিক?" ঐ বাক্য শ্রবণে কর্ম্মকার বলিল, "আমার নিকট সেব্য সেবকের কিছু প্রভেদ নাই, কারণ সকল মূর্ত্তি গুলির মধ্যেই আমি কেবল মাত্র সুবর্ণই দেখিতে পাইতেছি।"

সাধুবাবা আমাদের তাই বলিতেছিলেন যেমন মূর্ত্তি গুলি বিভিন্ন হইলেও সকল গুলির মধ্যে একই সুবর্ণ বিদ্যমান তেমনি আধার পৃথক পৃথক হইলেও এক পরমাত্মাই সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে এবং সর্ব্ব জগতে ব্যপ্ত হইয়া আছেন। সকল জীবের মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ। তিনিই প্রত্যেক ঘটে ঘটে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভক্তের নিকট সেব্য সেবক ভিন্ন বোধ হইলেও কর্ম্মকার যেরূপ মূর্ত্তি গুলির মধ্যে বিভিন্নতা না দেখিয়া কেবল মাত্র এক সুবর্ণই দেখিতে পাইতেছিল, তেমনই যিনি জ্ঞানী পুরুষ, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের মধ্যে কেবল সেই এক পরমাত্মারই প্রকাশ অনুভব করিয়া থাকেন। মায়া বিদূরিত হইলে সর্ব্বভূতে একই সত্বার অনুভূতি উপলব্ধি হয়, তখন আর ছোট বড়, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ বোধ তিরোহিত হইয়া যায়। যেরূপ একই সুবর্ণ দ্বারা কত প্রকার মূর্ত্তি ও অলঙ্কার প্রস্তুত হয় এবং কোনটীকে বলয়, হার, চুরি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়; কিন্তু সেগুলি যখন উত্তাপ দিয়া গলান হয়, তখন তাহাদের নাম, আকৃতি সমস্তই লোপ পাইয়া যায়, তখন দেখা যায় এক সুবর্ণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইরূপ যে ব্যক্তি দর্শন করিতে জানে সে সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে এক পরমাত্মাই দর্শন করিয়া থাকে।

সাধু বাবার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে গীতার একটী শ্লোক আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি মৃদুকণ্ঠে আপন মনে তাহা আবৃত্তি করিলাম।

"আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত,
সর্ব্বত্র সমান দর্শী যোগী করে অনুভূত।
যে আমাকে দেখে সর্ব্ব, সর্ব্বত্র আমাকে আর,
হয় না অদৃশ্য মম, না হই অদৃশ্য তার।" ৬।২৯।৩০

উহা সাধু বাবা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ত সেই শ্লোক বলিতেছেন"—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন॥
যো মাম্ পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥" গীতা ৬।২৯।৩০

এইরূপ সৎপ্রসঙ্গে সময় বেশ আনন্দে অতিবাহিত হইতেছিল, আমরা যখন সাধুবাবাকে প্রণামান্তর বিদায় লইয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম দেব গিরি বা দিঘরিয়া পাহাড়ের বাম ধারে অস্ত গমনোন্মুখ প্রকাণ্ড স্বর্ণ থালার মত সূর্য্য দেব শোভা পাইতেছেন। পাহাড় হইতে চতুর্দ্দিকে মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত সান্ধ্য গগণের অপরূপ শোভা দর্শন করিতে করিতে আমরা সেদিন সানন্দে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম।

ক্রমশঃ

জনৈক ভদ্র মহিলা—রাজসাহী।

নিত্যস্মরণে ধারণাভ্যাস।

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ"-চিত্ত! এই সঙ্কেত বাক্য তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। রজস্তম প্রবাহে নিরন্তর নৃত্য করিতেছ তাই তোমার দোষ প্রদর্শন করাইলে উষ্ণ হইয়া উঠ। ইহার পরিণাম যে তুমি বুঝিতে না পার তাহা নহে কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চাও না। এই যে তুমি সর্ব্বদা অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছ, এই যে তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইতে পারিতেছনা; ইহার শোচনীয় পরিণাম—তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিলে, কাঁদিতে কাঁদিতে তোমাকে যাইতে হইবে। যাইবার সময় বাহিরে রোগের অসহ্য যন্ত্রণা এবং ভিতরে কৃত কর্ম্মের জীবন্ত ছবি গুলি যুগপৎ তোমার মানস নেত্রে ভাসিয়া উঠিবে। তখন তোমাকে যে

কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহা একটু প্রণিধান করিয়া দেখ। তোমার চারিদিকে কত লোকের নিয়ত এই দশা ঘটিতেছে তাহা দেখিয়াও তোমার সুবুদ্ধির উদয় হইল না, ইহাই তোমার দুর্ভাগ্য। চিত্ত! সময় থাকিতে এখনই সাবধান হও। এই অসম্বন্ধ প্রলাপ দমন করিবার একমাত্র উপায় সর্ব্বদা বিজ্ঞানের সহিত ইষ্ট মন্ত্র জপ করা। বহুবার ভুল হইলেও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে।

সবইত বুঝিলাম—শুধু কথায়ত চিড়ে ভিজেনা। জলের আবশ্যকতাও আছে।

চিত্ত! বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলিয়াছ। তোমার প্রশ্ন আরও বিশদ করিয়া বলা হইতেছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের মীমাংসা কল্পে শ্রীগুরু দেব করুণা করিয়া যাহা বলাইবেন তাহাই বলা হইতেছে। চিত্ত! চিৎভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে নিবেদন করা হইতেছে। নিবেদন করা যদি ঠিক প্রণালী মত হয় আর তুমি যদি দয়া করিয়া ঠিক প্রণালী মত গ্রহণ কর তবে তোমারও মুক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগ্যেরও মুক্তি।

শুধু কথায় চিড়ে ভিজেনা—কথাটা সত্য। পরম সত্য নহে, আপেক্ষিক সত্য। সাংসারিক হিসাবে সত্য বটে কিন্তু পারমার্থিক হিসাবে মিথ্যা কেননা তখন শুধু কথাতেই চিড়ে ভিজিবে। জলের আবশ্যকতা মোটেই হইবেনা।

স্থূল বুদ্ধিতে দেখা যায় চিড়ে ভিজাইতে হইলে জলের আবশ্যক হয়। জাগতিক ব্যাপারে ইহা অতি সত্য। কোন ব্যক্তি রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, রোগের উপশমের জন্য ঔষধ প্রদান না করিয়া যদি বলা হয়—দেহ অনিত্য, কর্ম্ম ভোগ ক্ষয় হইয়া যাক্। ইহাতে রোগীর প্রাণে কি শান্তি আসিতে পারে? কত ব্যক্তি ধর্ম্ম পথে থাকিয়া উদয়াস্ত প্রাণপাত করিতেছে তবুও উদরান্নের সংস্থান তাহার হইতেছেনা। ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিকে তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় অন্ন ও পানীয় প্রদান না করা পর্য্যন্ত তাহার স্বস্তি কিছুতেই হইবে না। ইহা অতীব সত্য। চিৎ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া যখন তুমি চিত্ত হইয়াছ তখন তোমার একটী রূপ হইয়াছে—একটী নাম হইয়াছে। তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, রোগ শোক আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য অন্ন পানীয় রোগের জন্য ঔষধ, শোকের জন্য সান্ত্বনার একান্ত আবশ্যকতা আছে। এখন কথা হইতেছে তুমি অপরের বিষয় বৈভবের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পাত করিয়া

নিজের হীন অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইতেছ কেন? চিত্ত! শাস্ত্র বাক্য স্মরণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইতে চেষ্টা কর। "যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং"। ধর্ম্ম পথে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে যে অর্থ লাভ হয় তদ্দারাই চিত্ত বিনোদন করিতে হইবে। বৃথা দুঃখ করিয়া লাভ কি? ইহা ব্যতীত আর যে পথ নাই। তুমি যে ঘৃণিত বা অসৎকর্ম্ম করিতে পারনা। সত্য বটে তোমার গতি অতি মৃদু তথাপি তুমি যে মুক্তি পথের যাত্রী। শ্রীগুরুদেব যে করুণা করিয়া তোমাকে পাথেয় দিয়াছেন। চিত্ত! একবার ভাবিয়া দেখ সুখেই হউক দুঃখেই হউক দিনান্তে অন্ততঃ এক মুষ্টি অন্ন তোমার জুটিতেছে আর এমন কেহ আছে যে তাহার তাহাও জুটিতেছেনা। চিত্ত! মূল কথা এই যে সকল প্রকার স্পন্দন পরিত্যাগ করতঃ ধারণাভ্যাসী হইয়া একাগ্র হইবার চেষ্টা কর। একটু একাগ্র হইলেই বুঝিতে পারিবে "কত মাণিক পড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে"। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি চিত্ত এই ধারণা দৃঢ় আছে ততক্ষণ নামরূপ সত্য, সুখ দুঃখ সত্য, মানাপমান সত্য, আদর উপেক্ষা সত্য, ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্য। কিন্তু সুদীর্ঘ এই জীবন নাটকের কতিপয় গর্ভাঙ্ক লইয়া যখন এই অঙ্কের শেষ হইবে অর্থাৎ যখন বাধ্য হইয়া তোমাকে নাম রূপ ত্যাগ করিতে হইবে, যখন তুমি "আকাশস্থ নিরালম্বঃ বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" হইয়া থাকিবে তখন ত তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবেনা। যত বিভীষিকাময় হউক না কেন অবশ হইয়া তোমাকে অভিনব নাম রূপ গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার স্বাতন্ত্র্য কিছুই থাকিবেনা। এই যে অশীতি লক্ষ জন্মরূপ একটী দীর্ঘস্বপ্ন, এই স্বপ্নের ভিতর তুমি তোমার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নাম লইয়াছ—চিত্ত। যতদিন এই স্বপ্ন দেখিবে ততদিন লয় বিক্ষেপ, ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক থাকিবেই। এই স্বপ্ন ভাঙ্গিতে অন্ন, পানীয় ও অর্থের কোন আবশ্যকতা নাই। শুধু আবশ্যকতা আছে তাঁহারই একান্ত শরণাপন্ন হওয়া—যিনি—

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধ যুক্তং।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগ বৈদ্যং শ্রীমৎগুরুং নিত্যমহং নমামি॥

যিনি অবাঙ্‌মনসোঽগোচর তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য অর্থাৎ এই দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তোমারই প্রদত্ত সুকৃতি ও দুষ্কৃতির আবরণে আবৃত হইয়া শ্রীগুরু বিগ্রহ রূপে তোমার নিকট উপস্থিত, চিত্ত! একটু স্থির হও। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে কারণে, কারণ হইতে "জ্ঞান স্বরূপং নিজবোধ

যুক্তং” তুরীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য নিয়ত অভ্যাস কর। ভব-রোগ-বৈদ্য-গুরু-বিগ্রহের মুখ কমল হইতে ভব ব্যাধির ভেষজ রূপ পরম সত্য বাক্য বিনির্গত হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই পরম সত্য বাক্যই তোমার ভব-ব্যাধি দূর করিয়া দিবে—এই সুদীর্ঘ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবে। তোমার ধারণাভ্যাসের জন্য একটী শাস্ত্রীয় আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইতেছে।

দশজন ব্যক্তি গঙ্গা পার হইয়া ওপারে গিয়াছেন। এক জনের মনে হইল আমরা দশজনই পার হইয়া আসিয়াছি কিনা গণনা করিয়া দেখা যাক। অমনি একজন গণনা করিতে লাগিলেন। প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি করিয়া নবম পর্য্যন্ত গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, নিজকে আর গণনা করিলেন না। এই প্রথম সংশয় উঠিল—একজন হয় ত গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। অন্য আর একজন গুণিতে আরম্ভ করিয়া ঐরূপ করিলেন। ক্রমে সকলেই—নবম পর্য্যন্ত গণনা করিয়য়া ক্ষান্ত হইলেন। সংশয় দৃঢ় ধারণা রূপে পরিণত হইল। অমনি একজন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—সে যে আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, গঙ্গায় ডুবিয়া মারা গেল, এখন তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব। এইরূপে সকলেই মহা কোলাহল করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি ইহাদের চিৎকার শুনিয়া স্নেহ মধুর বচনে বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া পুনরায় গণনা করিতে বলিলেন। ইহারা আর কিছুতেই গণনা করিবেন না, কেননা ইহাদের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তার পর তিনি অতি স্নেহের সহিত একজনের হাত ধরিয়া গণনা করাইতে লাগিলেন—প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি। নবম পর্য্যন্ত গণনা করিয়া হস্ত আর চলিতে চায় না। তখন সেই সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ বল পূর্ব্বক গণনাকারীর হাতখানা তাহার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া সহাস্যে বলিলেন এই দশম ব্যক্তিই তুমি। হরি! হরি! বৃথা কোলাহল করা হইতেছিল। ভুল ভাঙ্গিয়া গেলে সকলের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! দর বিগলিত ধারায় অশ্রুপাত, নাসারন্ধ্র হইতে শ্লেষ্মার নির্গমন, মুখে মধুর হাসি, বিস্ময় জনিত সর্ব্বাঙ্গে পুলক, দুঃস্বপ্ন ভঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস। তবেই পাওয়া গেল যাহা ছিল তাহাই আছে এবং চিরদিন তাহাই থাকিবে। ক্ষণিকের জন্য একটা ভুল হইল—ভীষণ কোলাহল উঠিল; তার

পর ভূল ভাঙ্গিয়া গেলে সব শান্ত—যাহা ছিল তাহাই রহিল। চিত্ত! এখনত বুঝিলে কথাতেই চিড়ে ভিজিল।

অপূর্ব্ব কথা শুনিলাম। কৃতার্থ হইলাম। ন্যায় নিষ্ঠার প্রতি একটা প্রবল আসক্তি থাকার ফলে স্বীয় দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অন্যের আচরিত কর্ম্মের সমালোচনা করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। ভুল হইয়া যায় যে সেই আধারেও শ্রীগুরু বিরাজ করিতেছেন। লৌকিক ব্যবহারে অন্যের দুর্ব্বলতা চক্ষে প্রতিভাত হইলেও আমাকে তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে। মহেন্দ্রক্ষণে অভ্যাস করিবার যে ইঙ্গিত পাইয়াছি এই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহা অভ্যাস করিতে কৃত সংকল্প হইলাম।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

অহল্যা।

এই বার আমরা এই ঘটনার সর্ব্ব প্রধান অভিনেতা ইন্দ্রের পরিচয় গ্রহণ করিব। শ্রুতি ও পুরাণ এক বাক্যে বলিতেছেন—ইনি ইন্দ্র অর্থাৎ পরম ঐশ্বর্য্য যুক্ত বিশ্বনিয়ন্তা। ইনি মঘবা—নিত্য যাগশীল; ইনি পুরুহুত—যজ্ঞ ফল দাতা; ইনি দিবস্পতি—স্বর্গপতি, ইনি দেবরাট—দেব মণ্ডলের অধিপতি; ইনি বিড়োজা বিশ্ব ব্যাপী তেজ সমন্বিত; ইনি বৃদ্ধশ্রবা নিয়ত বৃদ্ধগণের উপদেশ পালন শীল; ইনি সুত্রামা ত্রিলোকের দুঃখত্রাণের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট; ইনি বজ্রপানি লোকপাল অতএব অসুর বিনাশে নিত্য উৎসাহ যুক্ত। ইনি শতক্রতু একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ যথা বিহিত রূপে সম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রত্ব পাইয়া ছিলেন অর্থাৎ দেব মণ্ডলের নিয়ন্তা হইয়াছিলেন। এখন এই অবসরে যদি প্রশ্ন হয়, দেবতা কোন্ বস্তু? তবে তাহার উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় যে শক্তি বিগ্রহ বিশ্বের সুসংযত প্রকাশের জন্য সতত ক্রিয়াশীল তাহাই দেবতা "দেবো দ্যোতনাৎ প্রকাশাৎ"। জীবের প্রকৃত কল্যাণের নিমিত্ত তাহার ফলদানোন্মুখ কর্ম্মকে সুসংযত ভাবে নিয়মিত করিয়া ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি বিশ্বকে আনন্দের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য যে শক্তিমান ঈশ্বর বিগ্রহ সর্ব্বদা

তৎপর তিনিই দেবতা। ইন্দ্র, এই দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইনি দেবরাজ অর্থাৎ সমস্ত জগতের বিকাশ ও পরিরক্ষণের কেন্দ্র, ও লোকপাল। যজ্ঞ দ্বারা ইহাঁর কৃপা লাভ করিবার পর শ্রীভগবান নারায়ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বলিয়া ইনি নারায়ণের অগ্রজ। ইনি যাজ্ঞিক, যজ্ঞ ফল দাতা ও যজ্ঞ রক্ষক; অনতিক্রমনীয় বিশ্ব নিয়তির জ্ঞান ময় কেন্দ্র শক্তি বলিয়া ইনি বজ্রধর ও প্রভু। দুষ্টের নিগ্রহ ও শিষ্টের ইষ্ট সিদ্ধিদ্বারা নিয়তি চক্রের সদা সংরক্ষণ ইহাঁর এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ইনি সর্ব্বতশ্চক্ষু সহস্রাক্ষ। বিশ্ব নিয়মনের সমস্ত শক্তি নারায়ণ কর্ত্তৃক ইহাঁতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইনি দর্পীর দর্প খর্ব্বকারী অর্থাৎ "আখণ্ডল" এবং নিত্য অপ্রমত্ত বলিয়া ইনি স্বরাট। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে ২৯শ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায় "সর্ব্বথা অপ্রমত্ত হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিপালন এবং সম দম তিতিক্ষা ও প্রিয়কার্য্য প্রভৃতির যথাবৎ উপসেবন করাতেই মঘবা সর্ব্বপ্রধান অমর রাজ্য লাভ করিয়াছেন।" এই সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমাযুক্ত ইন্দ্র, লোক পালগণের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ইন্দ্র, শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য অপ্রমত্ততা প্রভৃতি গুণ গরিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র, দুষ্টাসুর বিদ্রাবী ও তপ শুদ্ধি দাতা ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও যজ্ঞ পালক ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষিসংঘ কর্ত্তৃক নিত্য সংস্তুত সর্ব্বান্তর্দর্শী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, যখন মহাতপস্বিনী ব্রহ্ম পুত্রী অহল্যাও দেব দানব দুর্দ্ধর্ষ তপোবল সমন্বিত ব্রহ্মর্ষি গৌতমের সহিত বিসদৃশ ব্যবহার করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাহার কারণ কি একটা জুগুপ্সিত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি? নিতান্ত মূর্খেও ইহার উত্তরে বলিবে "না"। তবে এমন হইল কেন? দেবী অহল্যা যখন অযোনি সম্ভবা, অতএব কাম প্রভাব পরিশূন্যা ও অনিন্দনীয়া এবং দেবরাজ ইন্দ্রও যখন যজ্ঞ ধর্ম্মশীল ও অপ্রমত্ত, তখন এমন ঘটনা ঘটিল কেন? অহল্যা পুত্র মহর্ষি শতানন্দের ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্ততম উত্তর "দৈবেন দুরনুষ্ঠিতম্" ইহা দৈব কৃত বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু এ কথা বলিলে তো সাধারণ জনের সন্দেহ দূর হয় না। অতএব একটু পরিষ্কার ভাবেই ইহার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন এবং এই জন্য এখন আমরা এই ব্যাপারের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি ঘটনার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব।

(২)

রামায়ণের উত্তর কাণ্ড পাঠ করিলে দেখা যায়' রাক্ষস-কুলপতি রাবণ মাথা কাটা কঠোর তপস্যা করিয়া বিধাতার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছেন।

তিনি সেই দেবদত্ত বর প্রভাবে দেবতা দৈত্য দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষস প্রভৃতি মহাবল ভূত সমূহের অধৃষ্য ও অবধ্য হইয়াছেন। ক্ষুদ্র প্রাণ মনুষ্যাদি জীব-বৃন্দকে তিনি নিতান্ত তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতেন বলিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে কোন বর গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমান্ দশাননের এই বর প্রাপ্তির কথা যখন চারি-দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালবাসিগণের সকলেই বিশেষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে অল্প কালের মধ্যেই কুবের পালিত লঙ্কা রাজ্য ও পুষ্পক রথ দশাননের করতলগত হইল এবং ইহার পরেই পুষ্পকাশ্রয়ে ইনি ত্রৈলোক্য বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। পাতালের মহাবল নাগদৈত্য দানবগণ ও মর্ত্ত্যের (দুই একজন তেজস্বী পুরুষ ভিন্ন) সকলেই এই বর-বলদৃপ্ত রাক্ষস পতির উদ্ধত বাহিনীর নিকট শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিলেন না; এমন কি মৃত্যুপতি যমও এই প্রবল শক্তিধরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এমনি করিয়া দিগ্বিজয় ব্যপদেশে দশগ্রীব রাবণ দেবতা ঋষি যক্ষ গন্ধর্ব্ব দৈত্য দানব প্রভৃতি সকলকেই নিরঙ্কুশ ভাবে হতাহত ও নির্য্যাতিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। "দেবর্ষি—যক্ষ—গন্ধর্ব্বান্ সঞ্জঘ্নে হি নিরঙ্কুশঃ।" কিন্তু এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অপরাধ, তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন ও দেব যজন প্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ কার্য্যের ফলে দেবতারা বল পুষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই রাবণের ধ্বংস লীলার বাধা দিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণদের উপর ইহাঁর ভয়ানক আক্রোশ ছিল। এজন্য তিনি বহু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও তপস্বী সাধুকে হত্যা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট করা ছিল এই দাম্ভিক রাক্ষস পতির একটা প্রিয়তম ব্রত। তিনি এই কার্য্যে এত আনন্দ লাভ করিতেন যে, যখন নিজে অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন অনুচরবর্গের দ্বারা এই "শুভ কর্ম্ম" সম্পাদন করাইতেন। বিষম উৎপাত নিবারণের জন্যই মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশ-রথের নিকট শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন

পৌলস্ত্যবংশ প্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যং বাধতে ভৃশম॥
মহাবলো মহাবীর্য্যো রাক্ষসৈবর্হুভির্বৃতঃ।
যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্ন কর্ত্তা মহাবলঃ॥

তেন সঞ্চোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ।

মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ যজ্ঞ বিঘ্নং করিষ্যতঃ॥

"যজ্ঞ বিঘ্ন" কথাটা শুনিতে খুব ছোট হইলেও ব্যাপারটা কিন্তু নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু ছিল না। ইহার পরিমাণ যে কতখানি গুরুতর ছিল তাহা মারীচের নিজের কথাতেই বেশ বুঝা যায়। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষায় যখন রামচন্দ্র নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মারীচ বলিয়াছিল—

অদ্মো দ্বিজান্ দেবযজীন্ নিহন্মঃ

কুর্ম্মঃ পুরং প্রেত নরাধিবাসম্।

ধর্ম্মোহ্যয়ং দাশরথে নিজোনঃ

নৈবাধ্যকারিস্মহি বেদবৃত্তে॥

অর্থাৎ হে দাশরথে ব্রাহ্মণগুলাকে খাইয়া ফেলা, দেবতা উপাসকদিগকে হত্যা করা ও তাহাদের দেবমূর্ত্তিগুলি চূর্ণ করা' বৈদিক ধর্ম্মের অনুসরণকারিদিগের গ্রাম ও নগর সকল অস্ত্র ও অগ্নির সাহায্যে শ্মশানে পরিণত করাই আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কারণ বৈদিক সংযমাত্মক ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদের সামর্থ্যগত কোন অধিকার নাই।

এই তো গেল যজ্ঞবিঘ্নের বহর। রাবণ এইটুকু করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। নানা স্থান হইতে কন্যাহরণও ছিল তাঁহার একটা উৎকট আনন্দ বিশ্বাস। তিনি দিগ্বিজয় হইতে ফিরিবারকালে পথিমধ্যে যাহাকেই সুন্দরী যুবতী বলিয়া বুঝিতেন, তাহাকেই তাহার আত্মীয় স্বজনকে নিহত করিয়া হরণ করিতেন। এইরূপে রাজকন্যা, ঋষিকন্যা. রাক্ষসকন্যা, নাগকন্যা, অসুরকন্যা, সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা, যক্ষ গন্ধর্ব্ব দানবকন্যা যে কেহই হউক না কেন, একবার তাহার দৃষ্টিপথে পড়িলে আর অব্যাহতি পাইত না। মুনীশ্বর বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ২৯ সর্গে এই মর্ম্মন্তুদ অত্যাচার কাহিনীর যে লোমহর্ষণ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ অত্যাচার এই পৃথিবীতে খুব অল্পবারই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বর বলদৃপ্ত রাবণ ও তাঁহার অনুচরবর্গের এমনি অত্যাচারে ক্রমে সমৃদ্ধ জনপদ সমূহে শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল; সৃষ্টির অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধক যজ্ঞসমূহ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র যজ্ঞক্ষেত্র ঋষিরক্ত

ও ব্রহ্মরক্তে কর্দ্দমিত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র ঋষিকন্যা স্ব স্ব সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নিপ্রবেশ করিতে লাগিলেন, লক্ষ লক্ষ গৃহস্থকন্যা নারীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব হারাইয়া ঘৃণায় ও ক্ষোভে কলুষিত দেহভার বিসর্জ্জনের জন্য আত্মহত্যা করিতে লাগিলেন ও দেব নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র ও নিরপরাধ কত লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা অকালে প্রাণ হারাইল। নিষ্ঠুর রাক্ষসগণের উদ্ধত শাসনে মন্দির সকল লুণ্ঠিত হইল' দেববিগ্রহ চূর্ণিত হইল, পুণ্য তপোবন সমূহ বিধ্বস্ত হইল ও দৈব পৈত্র সমস্ত কর্ম্মই বিঘ্নবহুল হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম যখন এমনি গ্লানিযুক্ত, শ্রাদ্ধ তপস্যা ও বেদাদি শাস্ত্র যখন নিতান্ত দলিত ও অবজ্ঞাত, ধর্ম্মশীলগণের বংশধারা নিঃশেষিত প্রায়, দক্ষিণ ভারত যখন প্রায় জনশূন্য ও রাবণানুচর খর দূষণ প্রভৃতি সমুদ্র পারীয় রাক্ষসগণের তাণ্ডব লীলায় সমাচ্ছন্ন, তখন নিঃসহায় ঋষিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ একান্ত আর্ত্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য লোকপালগণ বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না। এমন কি মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞক্ষেত্রে ইন্দ্রকে ময়ুর, বরুণকে হংস, ধর্ম্মকে কাক ও কুবেরকে কৃকলাসমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া রাজার যজ্ঞ নিরাপদ করিতে হইল।

সহস্র সহস্র ঋষি ও ব্রাহ্মণ নিহত হইলেন, শত শত ধর্ম্মরক্ষক নরপতি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন, একটির পর একটি করিয়া দেবশক্তির কেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তথাপি ভারতের অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দেবপূজা যজ্ঞ বা তপস্যা ত্যাগ করিলেন না। তথাপি তাঁহারা নিবিড় অরণ্য ও দুরারোহ পর্ব্বতের নিভৃত স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তথাপি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে "ইন্দ্রায় স্বাহা" "পিতৃভ্যঃ স্বধা" প্রভৃতি শব্দ সকল রাক্ষসগণের ধর্ম্মদাহ উৎপাদন করিতে লাগিল! অবশেষে রাবণ এই যজ্ঞ পদ্ধতির মূল উৎপাটনের জন্য আপন মায়াবলপুষ্ট বিরাট বাহিনীকে ইন্দ্রলোক অভিমুখে পরিচালিত করিলেন।

সংসারে এ যাবৎ যত বড় বড় যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূলে ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্বন্ধ বড়ই অল্প! সমস্ত বিকট যুদ্ধের মূলেই হয় ভোগ সংঘর্ষ আর না হয় ভাব সংঘর্ষ বর্ত্তমান। ভোগের প্রতীক যেমন অন্ন, বিত্ত-নারী-প্রজা, ভাবের প্রতীক ও তেমনি ধর্ম্ম ও উৎকর্ষতা! রাক্ষস সম্প্রদায়ের সহিত দৈবসম্প্রদায়ের এই উভয় ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দ্বন্দ্বে চিরজয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষায় দেব-দৈত্য নরত্রাস দশানন আপনার যোগ্য পুত্র কাকধ্বজ মেঘনাদের সহিত

সসৈন্যে ইন্দ্রলোকের নিকটস্থ হইলেন। দৈব সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনা বিজয়ই যে, রাক্ষসাসুর সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য।

দেবশক্তি নিয়ামক ইন্দ্র রাবণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে বলিলেন ও যুদ্ধের পূর্ব্বে একবার অনন্তশায়ী নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। যাঁহা হইতে সমস্ত সৃষ্টি প্রবাহিত হয়, হইয়া যাঁহাতে আশ্রিত রূপে অবস্থান করে ও পরে যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য হয়, সৃষ্টির এমন পরম আশ্রয়স্বরূপ স্বেচ্ছাধৃত পরমাত্মবিগ্রহ যিনি, তিনিই নারায়ণ। এই নারায়ণই, অচঞ্চল অমৃতপদ ও সচঞ্চল সৃষ্টিপদের মধ্যবিন্দু। ইনিই সৃষ্টি পদ্মের নাভি এবং সমস্ত দৈবশক্তি বা প্রকাশশক্তির অমৃত উৎস ও পালক। ইন্দ্র এই অমৃত তটস্থ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সমীপবর্ত্তি হইয়া বলিলেন,—হে নারায়ণ হে শ্রীমান্, হে পদ্মনাভ, হে সনাতন ,হে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণো আমি কিরূপে এই রাবণের প্রতিকার করিব তাহা বলুন! এই দুরাত্মা কেবল পদ্মযোনি ব্রহ্মার বরপ্রভাবেই এইরূপ বলশালী হইয়াছে। কারণ এরূপ করিলে সত্যসঙ্কল্প প্রজা পতি মিথ্যাবাদী হইবেন এবং তিনি মিথ্যাবাদী হইলে তাঁহার সঙ্কল্পিত এই বিশ্ব মুহূর্ত্তেই মিথ্যারূপে পরিণত হইয়া বিধ্বস্ত ও বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমানে রাবণকে মারিয়া সাময়িক ভাবে সৃষ্টীরক্ষা করিতে গেলেও প্রকারান্তরে সৃষ্টীর চিরধ্বংসই হইয়া যাইবে। এইরূপ অদ্ভুত অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য আপনি উপদেশ করুন!

শ্রীমান নারায়ণ দেবরাজ ইন্দ্রের কথা শুনিয়া প্রথমে তাঁহাকে আশ্বস্ত করি লেন ও পরে তাঁহাকে এমন একটি পরামর্শ দিলেন, যাহা মহর্ষি অগস্ত বা বিশ্বা মিত্র কেহই স্পষ্ট করিয়া রামচন্দ্রকে বলেন নাই এবং ধর্ম্মগতি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি বাল্মিকীও সে পরামর্শ অবগত হইয়াও তাহাকে রহস্যের আবরণে আবৃত রাখিয়া গিয়াছেন। দেবদেব নারায়ণ বলিলেন—হে সুরেশ্বর, পুত্র সহিত এই বলোৎকট রাক্ষস কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেই একটি মহৎ কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবে। যতদিন উহা না হইতেছে, ততদিন বরদানে দুর্জ্জয় এই দুষ্টাত্মাকে কেহই আয়ত্ত করিয়া নিঃশেষে পরাজিত বা নিহত করিতে পারিবে না ইহা আমি স্বাভাবিক জ্ঞান প্রভাবেই দেখিতে পাইতেছি।

ন তাবদেষ দুষ্টাত্মা শক্যো পেতুং সুরাসুরৈঃ।
হন্তুঞ্চাপি সমাসাদ্য বরদানেন দুর্জ্জয়ঃ॥ ১৫॥

সর্ব্বথাতু মহৎ কর্ম্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ।
রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্নিসর্গতঃ॥ ১৬॥

এরূপ ক্ষেত্রে এখন আমার নিজেরও যুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত নয়, কারণ এ অবস্থায় আমি গেলেও পরাজিত হইব। ইহাতে আসল উদ্দেশ্যের কোন আনুকুল্য তো হইবেই না, উপরন্তু "বিষ্ণু শত্রু সংহার না করিয়া নিবৃত্ত হন না" এই সত্যশ্রুতি ও বিফল হইবে। "দুর্ল্ভশ্চৈব কামোহস্য বরগুপ্তাদ্ধি রাবণাৎ"।

ইহার পর শ্রীভগবান আরও বলিলেন—হে শত অশ্বমেধ যজ্ঞকারি দেবরাজ আমি যেরূপে এই রাক্ষসের মৃত্যুর হেতুভূত হইব তাহা তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি।

প্রতিজানে চ দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো।
ভবিতাস্মি যথাস্যাহং রক্ষসো মৃত্যুকারনম্॥ ১৯॥ [ঐ]

কাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিলেই আমি নিশ্চয়ই সবান্ধব রাবণকে নিহত করিয়া দেবতাগণকে আনন্দিত করিব।

অহমেব নিহন্তাস্মি রাবণং সপুরঃ সরম্।
দেবতা নন্দয়িষ্যামি জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্॥ ২০॥ [ঐ]

হে শচীপতে একনিষ্ঠ দেবরাজ, হে মহাবল, এই আমি তোমাকে আসল রহস্য কথাটি বলিলাম, এখন তুমি দেবগণের সহিত নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে।
যুধ্যস্ব বিগতত্রাসঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং মহাবল॥ ২১॥ [ঐ]

এই সকল নারায়ণ বাক্যের ভিতর এমন কতকগুলি কথা আছে যাহাদের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই, যেমন—

(১) "সর্ব্বথা তু মহৎকর্ম্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ"

এই মহৎ কর্ম্মটি যে কি, তাহা ইন্দ্র অবশ্যই আপন দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য শুনিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে ইহা অনুক্ত।

(২) "ভবিতাস্মি যথাস্যাহং রক্ষসো মৃত্যুকারনম্"

যেরূপে ইহাকে বধ করিব, বলিবার পর সেই উপায়টি বা কৌশলটির কোন উল্লেখ আর গ্রন্থমধ্যে স্পষ্টভাবে নাই।

(৩) জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্—এইকাল কবে আসিবে, তাহা নারায়ণ নিজেই স্থির করিবেন, অপরের উপদেশ অনাবশ্যক।

(৪) "এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে"

শ্রীভগবান এখানে ইন্দ্রকে শচীতে একনিষ্ঠ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ও তাহার পর তাঁহাকে একটি তত্ত্ব অর্থাৎ রহস্য কথা (গোপনীয় কথা শুনাইয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। এই গোপনীয় কথাটি যে কি, তাহা পরবর্ত্তী কার্য্য পরম্পরার বিচার না করিলে বুঝা যাইবে না। কারণ গ্রন্থমধ্যে উহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

ইন্দ্র নারায়ণের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু চিন্তার বিরাম নাই। বিশ্ব সংরক্ষণের কেন্দ্র বলিয়া ইহাঁর দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই গুরুতর দায়িত্ব বোধ লইয়া তিনি যতই সৃষ্টীসংরক্ষণের কামনায় অভিনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন, বরদানে মুক্তকচ্ছ প্রজাপতির উপর ততই তাঁহার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। দুর্দ্ধর্ষ রাবণের পৈশাচিক অত্যাচার সঞ্জাত, ইন্দ্রের এই তীব্র কামনা ও প্রদীপ্ত ক্রোধের ফলে মহৎ কর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল. তাহাই উত্তর কালে সমগ্র রামায়ণে অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে। এখন ইন্দ্র ও দশাননের যুদ্ধের অনুসরণ করা যাউক।

(৪)

দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণের নিকট হইতে দেবলোকে ফিরিয়া আসিলেন ও দেব সৈন্যের প্রতি যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলেন। দেবরাক্ষসের ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে একদিন যখন রণশ্রান্ত মেঘনাদ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন পুত্রবৎসল রাবণ তাঁহাকে বিশ্রামের আদেশ দিয়া নিজেই সেই যুদ্ধার্ণবে নামিয়া পড়িলেন। মেঘনাদ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নামিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

"সোঽপি যুদ্ধাদ্বিনিক্রম্য রাবণিঃ সমুপাবিশৎ।"

প্রতাপশালী শূর দশানন বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ও অগ্নিময় বিষ উদ্গীরণকারী সর্প সমূহে সমাবৃত মহারথে আরোহণ করিয়া রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও মরুদ্গণ পরিচালিত বিরাট দেবসৈন্য দলিত ও মথিত করিতে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে সেই বিশাল রণক্ষেত্র ধ্বংসের স্তূপে পরিণত হইয়া গেল।

ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যাথ প্রণষ্টং তু স্বকং বলম্।
ন্যবর্ত্তয়ৎ অসম্ভ্রান্তঃ সমাবৃত্য দশাননম্॥
এতস্মিন্ অন্তরে নাদো মুক্তো দানব-রাক্ষসৈঃ।
হা হতাঃ সন্ ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্॥
(উঃ কাঃ ৩৪ সর্গ)

অনন্তর ইন্দ্র দূর হইতে এইরূপে নিজের সৈন্যগণকে প্রণষ্ট হইতে দেখিয়া ব্যূহ প্রাকার বেষ্টন পূর্ব্বক রণাঙ্গনে আসিলেন এবং অবলীলাক্রমে দশাননকে নিবারিত করিলেন ও পরে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া অর্থাৎ "শক্রেণ রাবণম্ গ্রস্তম্ দৃষ্ট্বা" দানব ও রাক্ষসগণ হাহাকার করিয়া উঠিল।

ইহার পর ভগ্নদূত যথাকালে রাবণের বন্ধন সংবাদ শিবির মধ্যগত ও বিশ্রামনিরত মেঘনাদের কর্ণগোচর করিল। পিতার বন্ধন সংবাদে পুত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও পরে সর্ব্বাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সেই ভীষণ দেবসেনা সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। ইন্দ্র ও মেঘনাদে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এবার কিন্তু দেবরাজ বহু চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। মেঘনাদ তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আপন পিতাকে মুক্ত করিলেন ও অবশেষে বিজিত ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সদলবলে লঙ্কায় চলিয়া গেলেন। আর এই অদ্ভুত ব্যাপারে অতিশয় বিস্মিত হইয়া দেবতাগণ বলিতে লাগিলেন—এ কি হইল?

"বিদ্যাবানপি দেবেন্দ্রো মায়য়াপহৃতো বলাৎ॥"

দেবরাজ আসুরী মায়া ছেদনে পরম পণ্ডিত হইয়াও সবলে অপহৃত হইলেন?

যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল; তাক্তরণ দেবতারা প্রজাপতিকে ইন্দ্র হরণের সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মা সত্বর লঙ্কায় আসিয়া নানাপ্রকার বরদানে ইন্দ্রজিৎকে সন্তুষ্ট করিয়া ইন্দ্রকে মুক্ত করিলেন। মর্ম্মাহত দেবতারা ধীরে ধীরে স্বর্গের অভিমুখে চলিয়াছেন, সুস্নিগ্ধ দেবযান পথ যেন আজ মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছিল। কাহারও মুখে কথাটি নাই, ইন্দ্র দেবশ্রীভ্রষ্ট ও চিন্তাপীড়িত হইয়া যেন ধ্যান তৎপরের মত দেখাইতেছিলেন। ব্রহ্মা

ইন্দ্রকে তদবস্থায় দেখিলেন এবং একটু করুণ হইলেন। কিন্তু এখন করুণ হইলে কি ইন্দ্রের পরাজয়ের বাধা ঘুচিবে? তা তো নয়। এ জন্য তিনি এই পরাজয়ের হেতু প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—

"শতক্রতো কিমু পুরা করোতি স্ম সুদুষ্কৃতম্?"

শতক্রতু, কেন তুমি ইতিপূর্ব্বে এমন দুষ্কর্ম্ম করিলে?

"তেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্যাতোনান্যেন বাসব।"

বাসব, সেই দুষ্কর্ম্মের ফলেই তুমি শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছিলে, অন্য কারণে নয়।

যে দুষ্কর্ম্মের ফলে ইন্দ্র আসুরী মায়াচ্ছেদনে পরম পণ্ডিত ও বজ্রধর হইয়াও অসমকক্ষ ও অপরিণত যোদ্ধা মেঘনাদের হস্তে পরাজিত বন্দী হইলেন, তাহা কিরূপ, ইহা বুঝাইবার জন্য সুরজ্যেষ্ঠ প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন—দেবেন্দ্র, আমি পূর্ব্বে বড় যত্নে, বড় আগ্রহে একটি মানসী কন্যা গঠন করিয়াছিলাম। অনিন্দনীয়া বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলাম 'অহল্যা"। দেবতারা সকলেই এবং তুমিও এই কন্যাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে। কিন্তু আমি তোমাদের কাহাকেও সেই কন্যা দান না করিয়া মহাতপা গৌতমের আশ্রমে তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। পরে মহর্ষি গৌতমের অদ্ভুত জিতেন্দ্রিয়তা ও অপূর্ব্ব তপঃশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া সেই তপস্বী প্রধানকেই অহল্যাদান করিয়াছিলাম। ইহাতে দেবতারা সকলেই নিরাশ হইলেন।

ইহার পর তীব্র কামনা ও প্রদীপ্ত ক্রোধের বশে তুমি একদিন সেই মহার্ষির আশ্রমে গিয়া অহল্যাকে ধর্ষণ করিয়াছিলে। ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ তোমাকে "বীর্য্যহীন হও" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, তুমি যুদ্ধে বৈরী হস্তে বন্দী হইবে। ক্রোধ চালিত ঋষির সেই তীব্র অভিসম্পাতেই এই সকল অনর্থ ঘটিয়াছে এবং তুমিও যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়াছ—ইহার অন্য কারণ নাই।"

ব্রহ্মা এইরূপে নিজের বরদানের কথা চাপিয়া, ঋষিবর গৌতমের অভিসম্পাতকেই ইন্দ্রের প্রকৃষ্ট পরাজয়ের প্রত্যক্ষ হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিলেন এবং কথাগুলি পরে পরে এমন ভাবে গুছাইয়া বলিলেন যাহাতে সকলেরই মনে

হইতে পারে যে, গৌতমের সহিত অহল্যার বিবাহ হইবার পরই ইন্দ্র অহল্যাকে দূষিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু কত পরে? এ প্রশ্নের জবাব উত্তর কাণ্ডে স্পষ্টতঃ নাই, তবে আদিকাণ্ডে কিছু আছে। সেখানে ৫১ সর্গের ১ম ও ২য় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, রাজর্ষি জনকের মাননীয় প্রধান পুরোহিত মহর্ষি শতানন্দ এই গৌতম ও অহল্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং অহল্যার সহিত সাক্ষাতের পর রামচন্দ্র যখন মিথিলার রাজ সভায় প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া এই মহাতপা ও মহাতেজা শতানন্দ হর্ষ-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া উঠিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তেজস্বী শতানন্দ যখন জ্যেষ্ঠপুত্র, তখন গৌতম ও অহল্যার একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার পর ইন্দ্র গৌতমাশ্রমে গিয়াছিলেন। ইহার উপর এই আদিকাণ্ডে ৪৮ সর্গে ১৬ শ্লোকে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

স চাত্র তপ আতিষ্ঠৎ অহল্যসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগান্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশঃ॥

অর্থাৎ হে রাজপুত্র, মহাযশা গৌতম পূর্ব্বে অহল্যার সহিত বহুশতাব্দী ধরিয়া এই আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে, মহর্ষি গৌতম ও দেবী অহল্যার বিবাহের বহু শতাব্দী পরে ইন্দ্র সমাগম হইয়াছিল। বিবাহের ঠিক পরেই নয়। কিন্তু উত্তরকাণ্ডের ৩৫ সর্গে প্রজাপতি ব্রহ্মার সংক্ষেপ উক্তিগুলি বলিতে গিয়া মহর্ষি অগস্ত্য যে ভাবে বাক্য বিন্যাস করিয়াছিলেন তাহাতে আপাত-দৃষ্টিতে অহল্যাধর্ষণকে বিবাহের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। যথা—

স তয়া সহ ধর্ম্মাত্মা রমতেস্ম মহামুনিঃ।
আসন্নিরাশা দেবাস্তু গৌতমে দত্তয়া তথা॥ ২৮॥
ত্বং ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টাবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥ ২৯॥
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা।
দৃষ্টস্ত্বঞ্চ তদা তেন আশ্রমে পরমর্ষিণা॥ ৩০
ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা।
গতোঽসি যেন দেবেন্দ্র দশাভাগবিপর্য্যয়ম্॥ ৩১

কিন্তু এগুলি সংক্ষেপ উক্তি। পরে পরে বলা হইয়াছে বলিয়া ব্যাপারটাকে বিবাহের ঠিক পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় মাত্র; কিন্তু এরূপ মনেকরা ভুল। কারণ এরূপ মনে করিলে আদিকাণ্ডে "বর্ষাপুগান্যনেকানি" কথার কোন অর্থই থাকে না। অতএব উভয়কাণ্ডের সমন্বয় দ্বারা নিশ্চিত বুঝা গেল, অহল্যার বিবাহের বহুকাল পরে, ইন্দ্র অহল্যার নিকট গমন করিয়াছিলেন। এবং তৎপূর্ব্বে কখনও গমন করেন নাই। এইবার আমরা ইন্দ্রাভিগমনের সময় আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্র নারায়ণের নিকট গিয়াছিলেন এবং আরও দেখিয়াছি ইন্দ্র নারায়ণের নিকট হইতে একটি গোপনীয় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণ, এই বর্ত্তমান বিপদে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হওয়ায়, ইন্দ্র যেমন সৃষ্টিসংরক্ষণ কামনায় নিতান্ত অভিনিবিষ্ঠ হইয়াছিলেন, বরদ প্রজাপতির উপরও তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই তীব্র কামনা ও অসহ্য ক্রোধের কথার উল্লেখ করিয়াই ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—"ত্বং ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা" "কামার্ত্তেন সমন্যুনা" ব্রহ্মার কথিত "কাম ও ক্রোধ" সাধারণ ইতর অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। কারণ ইন্দ্রের প্রকৃতি সেরূপ হইলে ইন্দ্র বহু পূর্ব্বেই অহল্যাধর্ষণ করিতেন। বিশেষতঃ বহু সন্তান প্রসূতি, গত যৌবনশ্রী, তপঃশীর্ণদেহা অহল্যার রূপ অপেক্ষা অজাতাপত্যা যৌবনশ্রীবিভূষিতা, গৃহলক্ষ্মীর আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তিমতী অহল্যার রূপ অধিকতর চিত্তাকর্ষক। ইন্দ্র, কিন্তু অহল্যার এই চিত্তাকর্ষক রূপ যৌবনশ্রী যতদিন উদ্দীপ্ত ছিল ততদিন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়ার কোন চিন্তাই করেন নাই। তিনি অহল্যা সন্নিধানে গিয়াছিলেন তখন, যখন অহল্যা বর্ষীয়সী, তপঃকর্ষিত-দেহা ও সিদ্ধিপ্রজ্ঞানসম্পদা বিশেষতঃ ইন্দ্র যখন নারায়ণের নিকট গিয়াছিলেন তখন নারায়ণ তাঁহাকে শচীপতি বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র যে তৎপূর্ব্বে অহল্যধর্ষণ করিয়াছিলেন এমন কথা তিনি আদৌ বলেন নাই। এই অহল্যা ধর্ষণের কথা ব্রহ্মাই প্রথমে ইন্দ্রকে বলিলেম। আর কেহ বলেন নাই। আর এই অহল্যাধর্ষণের পর ঋষি যে অভিসম্পাত দিয়া চলেন "তাহাতেই ইন্দ্রের মেঘনাদ হস্তে পরাজয় হইয়াছিল। তথাচ দেখা যাইতেছে ইন্দ্র ইতিপূর্ব্বে সুদক্ষ সেনানায়ক, পরম কৌশলী ও নিপুন যোদ্ধা, অক্লান্ত রণপণ্ডিত রাবণকে কিছুক্ষণের জন্য অনায়াসে "অসন্ত্রস্তঃ" আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে সহজেই বলা যায় যে, নারায়ণের সহিত

সাক্ষাৎ ও রাবণকে আবদ্ধ করিবার পর এবং মেঘনাদের হস্তে বন্দী হইবার পূর্ব্বেই দেবরাজ অহল্যাধর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায়, না অন্য কাহারও প্রেরণায়? "বৃদ্ধশ্রবা" ইন্দ্র কখনও কিন্তু বৃদ্ধগণের পরামর্শ না লইয়া কোনও গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে, যেখানে দেবদানবদুর্দ্ধর্ষ তপোবলসমন্বিত ব্রহ্মর্ষি গৌতম তাঁহার প্রতিপক্ষ। সুতরাং এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে এই বৃদ্ধটি হইতেছেন সেই অমেয়াত্মা নারায়ণ, যিনি ইন্দ্রকে কিছু তত্ত্ব কথার উপদেশ করিয়াছিলেন। আর এই জন্যই অহল্যাধর্ষণের পর স্বর্গে আসিয়া ইন্দ্র লোকপালগণকে, অন্যান্য দেবতাগণকে, ঋষিগণকে, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও চারণগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন

কুর্ব্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্য্যমিদং কৃতম্॥

[আদিকাণ্ড ৪৯ সর্গ]

অর্থাৎ আমি মহত্মা গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন ও ক্রোধের উৎপাদন করিয়া দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইন্দ্রের এই দুষ্কর্ম্ম "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির" জন্য নয় পরন্তু দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য ও ইহার মূলও ইন্দ্র হৃদয়ে নহে, স্থানান্তরে।

এখানে আরও বক্তব্য এই যে, রামায়ণের বর্ণনা ত্রিলোকব্যাপী, স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল তিনই রামায়ণের বর্ণনার বিষয়। কিন্তু এই তিন লোকের কালের পরিমাণ একরূপ নয়। মর্ত্ত্য লোকের এক বৎসর অর্থাৎ ৩৬০ দিনে দেবলোকের বা স্বর্গের একদিন বা ৫০ দণ্ড। সুতরাং পৃথিবীর ৫ দিনে স্বর্গের ১দণ্ড। যদি ইন্দ্র স্বর্গপ্রাঙ্গনগত যুদ্ধে রাবণকে এক দণ্ড ও আবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও পৃথিবীতে যথাভিলষিত কার্য্য করিবার তাঁহার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আর যাঁহারা দেবতার স্বচ্ছন্দ মনোজবত্বে-মনের মত অবাধ দ্রুত গতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মনে তো এইকাল সমস্যা উঠিতেই পারে না। আমরা এতক্ষণ দেবরাজের দিক দেখিলাম, এইবার অহল্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিব।

(৫)

কেহ কেহ দেবী অহল্যার লালসার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। কারণ দেবী অহল্যা কস্মিন্ কালেও আশ্রম ছাড়িয়া অভিসারিকার বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই বা ইন্দ্রও আপনার চিরযৌবন মণ্ডিত দেবশ্রীসম্পন্ন সুরপতি মূর্ত্তি লইয়া অহল্যার সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন সুবৃদ্ধ মহর্ষি গৌতমের মূর্ত্তি লইয়া। কাজেই লালসার প্রথম উত্তেজক হেতু যে রূপজ মোহ তাহা অহল্যার হৃদয়ে একেবারেই অনুপস্থিত। বিশেষতঃ গৌতমের আশ্রমে ইন্দ্র অহল্যার মিলন রামায়ণে যে ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেশধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥
ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥
মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্ম্মেধা দেবরাজ কুতূহলাৎ॥

(আদিকাণ্ড ৪৮ সর্গ)

অর্থাৎ শচীতে একনিষ্ঠ সর্ব্বতশ্চক্ষু (ইন্দ্র) গৌতমের আশ্রমানুপস্থিতি কালে সেই মুনির বেশ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে সুসমাহিতে কার্য্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ ঋতুকালের অপেক্ষা করে না অতএব হে সুমধ্যমে আমি তোমার সহিত সঙ্গ ইচ্ছা করি। দুর্ম্মেধা (অহল্যা) মুনিবেশধারী সহস্রাক্ষকে বিশেষরূপে জানিয়াই দেবরাজের আগ্রহাতিশয্যবশে তাঁহার বাসনা পূরণে সম্মতা হইয়াছিলেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে ইন্দ্র গৌতম মূর্ত্তিতে অহল্যার নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে"। ইহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, প্রথম প্রার্থনায় দেবী অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতম বিবেচনায় ঋতুকালের অভাবের কথা বলিয়াছিলেন এবং তাহারই উত্তরে ইন্দ্র বলিতে

বাধ্য হইয়াছিলেন হে সুসমাহিতে অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে একাগ্রচিত্তশালিনি সমাধিনিষ্ঠে, কার্য্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ ঋতুকালের অপেক্ষা করে না। এখানে "সুসমাহিতা" বিশেষণ ও ঋতুকালের অভাবোক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছে যে, দেবী অহল্যার হৃদয় নির্ম্মল তীর্থোদকের মতই সর্ব্বপ্রকার মলশূন্য ছিল।

ইন্দ্র কিন্তু এই উক্তিদ্বারাই অহল্যার নিকট ধরা পড়িয়াছিলেন। কেন না এরূপ অধীরতার কথা তো ঋষির কথা নয়। পরিচয় জিজ্ঞাসায় ইন্দ্র অবশ্যই এই "তপসা দ্যোতিপ্রভা" সমাধিশালিনী বর্ষীয়সী ঋষিপত্নীর নিকট আত্ম পরিচয় তাঁহার আগমনের হেতু ও দেবকার্য্যের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার কথা বলিয়াছিলেন এবং এই প্রার্থনায় বিচলিত হইয়াই অহল্যা ইন্দ্রোক্ত গর্হিত কর্ম্মে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। "মতিং চকার দুর্ম্মেধা দেবরাজ কুতূহলাৎ"। এই যে দেবরাজের কুতূহল অর্থাৎ আগ্রহাতিশয্য, ইহার বিষয় কি? ইহা কি ইন্দ্রিয়াসক্তি? অথবা আর কিছু? যদি বলা হয় ইন্দ্রিয় তাড়না, তবে অবশ্যই প্রশ্ন হইবে, এই কার্য্যের পর কেমন করিয়া ইন্দ্র "দেবান্ অগ্নিপুরোগমান্ সর্ষিসংঘান্ সচারণান্" সকলকে ডাকিয়া বলিতে পারেন "সুরকার্য্যমিদং কৃতম্"? আর কেমন করিয়াই বা অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ইহার অনুমোদন করিলেন? বিশেষতঃ ব্যক্তিগত লাম্পট্যে মাত্র ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ই তৃপ্ত হয়; উহাতে দেবকার্য্যসিদ্ধ হয় না। আর অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ এত নির্ব্বোধ ও চাটুকার ছিলেন না যে, ব্যক্তিগত ব্যভিচারকে বিনা বাক্যব্যয়ে সুরকার্য্য বলিয়া মানিয়া লইবেন। অতএব দেখা যাইতেছে, অহল্যাধর্ষণ ব্যাপারে কোন পক্ষেই লালসা বা লাম্পট্যের গন্ধমাত্রও ছিলনা। যাহা ছিল তাহা দেবকার্য্য সাধনের প্রয়াস। এই দেবকার্য্য কি দেখা যাউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভগবান ও নিষ্কাম কর্ম্ম।

১। নিষ্কাম কর্ম্ম কর। প্রথমেই ভগবান আছেন বিশ্বাস কর। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার জন্যই কর্ম্ম।

২। যেমন রাজা, রাজার আমি প্রজা বটে। কিন্তু তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি যেমন সকলকে পালন করিয়া থাকেন সেইরূপ আমাকেও পালন করেন। আমি কিন্তু চাই একবার রাজাকে দেখিতে। আহা! যিনি আমাকে রাজ্যে স্থান দিয়াছেন, যিনি আমাকে আহার দিতেছেন, যিনি আমার সুখ স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। শুনি রাজা বড় সুন্দর, শুনি রাজা বড় ভাল। তাঁহাকে একবার দেখা আমার উচিত।

৩। আর একটু কারণ আছে, যাহার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করা আমার উচিত। রাজা ভাল কিন্তু তথাপি নানা প্রকার অশান্তি আমার হইয়াছে। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে রাজার সঙ্গে দেখা কর, তিনি ভিন্ন তোমার দুঃখের প্রতিকার হইবে না।

৪। আমি দীনহীন প্রজা আমি রাজদর্শন করিব কিরূপে? রাজার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িবে কিরূপে? তিনিত সকলের উপরে সমদৃষ্টি। আকাশ যেমন জগতকে সমানভাবে দৃষ্টি করে, সূর্য্য যেমন সকলকে সমান ভাবে কিরণ বর্ষণ করেন, মেঘ যেমন সুমিষ্ট ফলের বীজ বা বিষের বীজ গননা না করিয়া সকলের উপর সমান জল বর্ষণ করে সেইরূপ রাজাত সকলের উপর সমান দৃষ্টি করেন। কিন্তু আমি নানা কারণে উৎপীড়িত হইতেছি। আমার দোষেই আমি শান্তি পাই না। আমি রাজাকে আমার দুঃখ জানাইতে চাই। তিনি ভিন্ন আমার দুঃখ কেহ দূর করিতে পারিবে না। এই জন্য তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আমার উপর যাহাতে পড়ে তাহাই আমাকে করিতে হইবে।

৫। রাজার বিশেষ দৃষ্টি আমার উপরে পড়িবে কিরূপে? তিনি কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি কর্ম্ম করিতে সকলকেই বলিয়াছেন। শুনি তিনি যেমন করিয়া তাঁহার কর্ম্মগুলি পালন করিতে বলিয়াছেন, যে সেই ভাবে তাঁহার নিয়মগুলি পালন করে সেই তাঁহার দর্শন পায়।

৬। কি কি কর্ম্ম তিনি করিতে বলিয়াছেন? কোন্ কোন্ নিয়ম পালন করিতে তিনি বলিয়াছেন? এবং কিরূপ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম গুলি করিতে হইবে?

৭। কতক গুলি লৌকিক কর্ম্ম তিনি সকলকে করিতে বলিয়াছেন—কতক গুলি বৈদিক কর্ম্মও তিনি সকলকে করিতে বলিয়াছেন। উভয়বিধ কর্ম্ম মধ্যে (১) নিজের শরীর রক্ষার জন্য কোনও প্রাণীর শরীর রক্ষার বিঘ্ন না করা (২) নিজের মন সুস্থ রাখা, অন্য কোন ব্যক্তির মন অসুস্থ না করা (৩) নিজের বুদ্ধি দ্বারা আমি কে, জগৎ কি ইত্যাদি বিচার করা—অন্যকেও বিচারেরদিকে আকর্ষণ করা মোটামুটি ধরিতে গেলে ইহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীভগবান সকলকেই শক্তি দিয়াছেন। শরীর রক্ষা প্রাণ শক্তিকে ছন্দমত স্পন্দন বা উপাসনা করাইতে পারিলে হইবে। বুদ্ধিকে শান্ত করা—বিচার শক্তিকে ছন্দমত স্পন্দন করাইলেই হইবে। আহার বিহার লোক ব্যবহার এই গুলি লৌকিক কর্ম্ম এবং যজ্ঞ দান তপস্যা এইগুলি বৈদিক কর্ম্ম। এই কর্ম্মগুলি তিনি যে নিয়মে করিতে বলিয়াছেন সেই নিয়মে করিতে হইবে।

৮। কোন্ নিয়মে কর্ম্ম করিতে হইবে? কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে ইহাই তাঁহার নিয়ম।

৯। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা কিরূপ?

১০। যে কর্ম্মই কেন না কর তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। যে কর্ম্ম নিজে করিবে বা অন্যকে করিতে পরামর্শ দিবে অগ্রেই এই তিনটি বিষয় পালন করা যাইবে কিনা বিচার করিয়া কর্ম্ম কর বা কর্ম্ম করাও। যদি দেখ এমন কর্ম্ম করিতে তোমার প্রবৃত্তি যাইতেছে যাহাতে ঐ তিনটি বিষয়ের কোন একটিও করা যাইতেছে না তাহা হইলেই বুঝিবে কর্ম্মটি নিষিদ্ধ, উহা একবারেই ত্যাগ করিবে। কোনটি নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাহা নিশ্চয় করিবার আর একটি বিচার আছে। সে বিচারটি এই। যে কর্ম্মটি করিতে যাইতেছ বা করাইতে যাইতেছ প্রথমেই বিচার কর যদি সেই কর্ম্মটি সকলকেই করান যায়—অর্থাৎ কর্ম্মটি যদি সর্ব্ব দেশের সমস্ত লোক করে তবে তদ্দ্বারা আমার বা অন্য সমস্ত লোকের কোন অমঙ্গল বা অনিষ্ট সাধিত হয় কি না? যদি দেখ যে কর্ম্ম করিয়া আমি সুখ পাই—সেই কর্ম্ম যদি আমার প্রতিবেশীও করে তবে আমি ক্লেশ পাই সেইরূপ কর্ম্ম করিবেনা। তাহাই নিষিদ্ধ কর্ম্ম। মনে কর পরনিন্দা। সকলেই যদি পরনিন্দা করে, পরচর্চ্চা করে তবে তুমি যে বিকৃত সুখের জন্য পরনিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হও অন্যের নিকট তোমার নিন্দা শুনিয়াও সেই বিকৃত সুখ অপেক্ষা তোমার ক্লেশ

অধিক হইবে। এইরূপে পরনিন্দা সকলের মধ্যে চলিয়া গেলে সকল মানুষই বিশেষ ক্লেশ পাইবে। এইরূপ মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া, পরস্ত্রীকে কুঅভিসন্ধিতে দেখা, পরধন অপহরণ করা, কর্কশ কথা বলা দুর্ব্বলকে পীড়ন করা, প্রাণীহিংসা করা—এইরূপ কর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম। ইহা বর্জ্জনীয় কারণ ইহাতে শ্রীভগবানের নিয়ম মত কর্ম্ম হইতে পারে না। এই সাধারণ বিচার দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্ম যাহা করিবে তাহাতে নিম্ন লিখিত তিনটি বিষয়ের কোন একটিতেও লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিও।

১০। কোন তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে কর্ম্মটি নিষ্কাম হইবে?

১১। (১) ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করা—শ্রীভগবান! তুমি রাজা তুমি হৃদয়েরও রাজা। আমি এই কর্ম্ম করিলে তুমি কি প্রসন্ন হইবে? তুমি করিতে বলিয়াছ বলিয়া কর্ম্ম করিতেছি, ইহাতে কি হইবে কি না হইবে জানি না—ঠিকমত যে পারিব তাহাও তুমি শক্তি না দিলে হইবে না- হে ভগবান আমি প্রাণপণ করিতেছি তুমি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া আমাদ্বারা নিষ্পত্তি করাইয়া লও।

(২) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া কর্ম্ম করা। নিজের সুখ বা অন্যের সুখ আকাঙ্ক্ষা করিয়া এ কর্ম্ম আমি যেন না করি। তুমি করিতে বলিয়াছ বলিয়া প্রাণপণে করিতেছি! দাস যে ভাবে প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে সে যেমন সুখ হইবে বা দুঃখ হইবে বিচার করে না, আমিও সেইরূপ তোমার আজ্ঞা পালনে যেমন সুখ বা দুঃখ এই ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারি।

(৩) অহং কর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা। তুমিই আমার হৃদয়ের রাজা—তুমিই শক্তি দিয়া কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাইতেছ। আমি কর্ত্তা নই এই ভাবিয়া কর্ম্ম করা।

১২। একবারে অহংকর্ত্তা এই অভিমান শূন্য হইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন তাঁহারই পূর্ণভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয়। ইহা সকলে একবারে পারেনা বলিয়া ঈশ্বর প্রীতি জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিতে হয়। শেষে অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগ হইয়া যায়। অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগেরই পূর্ব্ববর্ত্তী সোপান, কর্ম্মের প্রথম দুইটি অবস্থা।

১৩। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারিলে শেষ অবস্থায় মানুষ কিরূপ ভাবে থাকিয়া কর্ম্ম করিবে?

১৪। শেষ অবস্থায় মানুষের বিচার এইরূপ। চিত্তই কর্ম্মকেন্দ্র। এই চিত্ত আমি নহি। চিত্ত স্পন্দন তুলুক বা না তুলুক তাহাতে আমার কোন অভিমান নাই। আমি পরম শান্তভাবে অবস্থান করিতেছি। যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম আসিলেও হস্তপদাদির দ্বারা সে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে তাহাতে আমার পরম শান্ত ভাবে অবস্থানের কোন ক্ষতি হইতেছে না। বৃক্ষ আপন স্তব্ধভাবেই নিরন্তর দণ্ডায়মান। বায়ু যখন চঞ্চল করিল তখন চঞ্চল হয় আবার বায়ু থামিয়া গেলেই যে স্থির সেই স্থির। এই পরম শান্তভাবে অবস্থান করিয়া ব্যবহারিক কার্য্য করিবার জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ। ইহাতেই রাজদর্শন ও রাজাকে বলিতে না বলিতে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি।

শিশুর প্রশ্ন।

(প্রাপ্ত)

সবাই যাকে হরি বলে মা,
সে হরি মা কোথায় থাকে ?
কোন ডাকে সে দেয় মা সাড়া,
কেন সবাই তাকে ডাকে ?
সে কি আমার সে কি তোমার,
সে কি খোকার সে কি বাবার,
হরি কি মা তোমার মত,
যাদু বলে নেবে বুকে ?
হরি কি মা খায় চুমো
কোলে ক'রে বলে ঘুমো
তোমার মতন হরি কি মা
ননী মাখন তু'লে রাখে ?
হরি কি মা ভাল বাসে,
কাঁদলে কি সে কাছে আসে,
খিদে পেলে দুধের বাটি
দেয় কি হরি আকাশ থেকে ?
আমার সাথে পুতুল খেলা
খেলবে কি সে সারা বেলা
মাগো! তোমার সেই হরিটি
কোথায় আছে, দেওমা ডেকে ?

বর্ষ-সূচী ১৩৩৬।

গ

চ

জ

ড

ত

দ

ন

প

ব

ভ

ম

য

র

শ

স

হ